(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল ডিগ্রির জন্য রচিত অভিসন্দর্ভ)

ইকবালের রাষ্ট্র দর্শন ও খিলাফত ব্যবস্থা

তত্ত্বাবধায়ক
ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান
অধ্যাপক
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রচনা ও উপস্থাপনায়
মুহাম্মদ মুহিব্বুল্লাহ ভূঞা
এম. ফিল গবেষক
রেজিঃ নম্বর :৬২, শিক্ষাবর্ষ : ২০০৮-২০০৯
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

ইকবালের রাষ্ট্র দর্শন ও খিলাফত ব্যবস্থা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল ডিগ্রি অর্জনের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

মুহাম্মদ মুহিব্বুল্লাহ ভূঞা
এম. ফিল গবেষক
রেজিঃ নম্বর : ৬২, শিক্ষাবর্ষ : ২০০৮-২০০৯
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের এম.ফিল গবেষক মুহাম্মদ মুহিব্বুল্লাহ ভূঞা কর্তৃক **"ইকবালের রাষ্ট্র দর্শন ও খিলাফত ব্যবস্থা"** শীর্ষক এম. ফিল অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। এ গবেষণাকর্মটি মুহাম্মদ মুহিব্বুল্লাহ ভূঞা-এর নিজস্ব ও একক গবেষণাকর্ম হিসেবে রচিত ও উপস্থাপিত হয়েছে। আমার জানামতে ইতোপূর্বে এ শিরোনামে এম.ফিল ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে কোন গবেষণাকর্ম রচিত হয়নি।

আমি এ অভিসন্দর্ভটি পুরোপুরি পাঠ করেছি এবং এম.ফিল ডিগ্রি অর্জনের জন্য উপস্থাপন করার অনুমতি প্রদান করছি।

(ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ও
অধ্যাপক
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"ইকবালের রাষ্ট্র দর্শন ও খিলাফত ব্যবস্থা"** শীর্ষক এ এম. ফিল অভিসন্দর্ভটি আমার একক গবেষণাকর্ম। আমি এ গবেষণাকর্মটির বিষয়বস্তু পূর্ণ অথবা অংশ বিশেষ কোথাও ডিগ্রি লাভের জন্য প্রকাশ করিনি।

(মুহাম্মদ মুহিব্বুল্লাহ ভূঞা)
এম.ফিল গবেষক
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ৬২
শিক্ষাবর্ষ : ২০০৮-২০০৯

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা ও ঋণ স্বীকার

সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং বাগ্মিতা শিখিয়েছেন আর শিখিয়েছেন কলম দিয়ে যা সে জানেনা। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি সেই পরম করুণাময় প্রভুর প্রতি যিনি তাওফিক দিয়েছেন এই গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করার।

অসংখ্য সালাত ও সালাম পেশ করছি বিশ্বমানবতার পরম বন্ধু, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল মানুষের অনুকরণীয় আদর্শ মহাপুরুষ, দিকহারা মানুষের পথের দিশারী ও মহান আদর্শ শিক্ষক বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা আহমদ মুস্তফা (সা.)-এর প্রতি এবং তাঁর আহলে বাইত ও সকল সন্তুষ্টচিত্ত সাহাবায়ে (রা:) কেরামগণের প্রতি। যাঁর উম্মত পরিচয়ে আমরা ধন্য, সৌভাগ্যবান ও গৌরবান্বিত।

কৃতজ্ঞতা ও ঋণ স্বীকার করি পরম শ্রদ্ধেয় আব্বা-আম্মার প্রতি, যাদের অক্লান্ত-নিস্বার্থ চেষ্টা ও দোয়ার ফলে আজ আমি প্রাচ্যের ওক্সফোড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে অনার্স, মাষ্টার্স সম্পন্ন করে এমফিল পর্যায়ে এ গবেষণা কর্মে ব্রত হয়েছি। কৃতজ্ঞতা জানাই আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই-বোনদের প্রতি যারা পড়া-লেখায় হাতে খড়ি থেকে এ পর্যন্ত সার্বক্ষণিক ছায়ার মত আমার পাশে থেকে পথনির্দেশ করেছেন, প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও গবেষণা কর্মে উৎসাহ যোগিয়েছেন। আত্মীয়-স্বজন, ঘনিষ্টজন, পাড়া-প্রতিবেশি,সতীর্থজন সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই- যারা সার্বক্ষণিক আমাকে দোয়া করেন, আমার কষ্টে ব্যথিত হন এবং আমার সাফল্যে গৌরববোধ করেন।

আমি হৃদয়ের সবটুকু আবেগ উজাড় করে দিয়ে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি আমার আদর্শ শিক্ষক অধ্যাপক ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খানের প্রতি- যিনি দয়া করে, মমতাভরে আমাকে তাঁর শিষ্যত্বের সুযোগ দিয়েছেন, মানুষ হবার দীক্ষা দিয়েছেন, অভিভাবকত্বের দায়িত্ব পালন করেছেন, মানবতা ও মনুষ্যত্বের তালিম দিয়েছেন এবং বিগত এক যুগেরও বেশী সময় ধরে সুখে-দুঃখে, সময়ে-অসময়ে কাছে টেনে জীবনকে জ্ঞান, প্রেম ও সৃষ্টির সেবায় উৎসর্গ করার পথে এগিয়ে চলার পথ-নির্দেশনা দিয়েছেন। বর্তমান গবেষণাকর্ম ও অভিসন্দর্ভ রচনা- সেটিও সম্পাদিত হলো তাঁরই সহযোগিতা, তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনার আলোকেই। তাই তাঁর ঋণ কখনো শোধ করার মতো নয়।

আমি গভীর ও সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের সবচেয়ে প্রবীন শিক্ষিকা মা'দারে যবানে ফারসি দার বাংলাদেশ বা বাংলাদেশের ফারসি ভাষার মা হিসেবে খ্যাত ড. কুলসুম আবুল বাশার ম্যাডামের প্রতি, ড. আবু মূসা মোঃ আরিফ বিল্লাহ স্যার, বিভাগীয় সাবেক চেয়ারম্যান ও আমার সম্মানিত শিক্ষক ড. মোঃ মুহসীন উদ্দিন মিয়া স্যার, বিভাগের বর্তমান চেয়ারম্যান, ড. তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী স্যার, ড. আব্দুস সবুর খান স্যার, ড. আবুল কালাম সরকার স্যারের প্রতি, যারা পরম মমতায় অনার্স ও মাস্টার্স পর্যায় আমাদের পাঠদান করেছেন এবং যাদের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা নিয়ে আজকের এই গবেষণাকর্ম সম্পাদনের পর্যায় উপনীত হয়েছি। বিভাগীয় শিক্ষক ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন, মুমিত আল রশিদ এবং বন্ধুবর ও বিভাগীয় শিক্ষক আহসানুল হাদীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যারা বিভিন্ন পর্যয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে আমাকে সহযোগীতা করেছেন।

আমি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার শিক্ষকতুল্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা বিভাগের অধ্যাপক ড. এম শামীম খান এবং অধ্যাপক ড. মোঃ নূরুল হুদার প্রতি- অনার্স, মাস্টার্স ও এম. ফিল পর্যায়ে নানান স্তরে যাদের সান্নিধ্য ও সহযোগিতা লাভ করেছি। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউ এর ফারসি ভাষার সম্মানিত শিক্ষক ড. শামীম বানু ম্যাডাম ও ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা এর ফারসি ভাষা কোর্সের প্রাক্তন শিক্ষক ড. মাওলানা মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী স্যারের প্রতি, যারা আমাকে ফারসি হাতে খড়ি দিয়েছেন।

আমার বিভাগের সকল কর্মকর্তা, কর্মচারি, ছাত্র-ছাত্রী বৃন্দ, রাজশাহী, চট্রগ্রাম ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সহিত্যের সম্মানিত শিক্ষক-শিক্ষকা ও সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি অন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

শিরোনাম	পৃষ্ঠা নম্বর
প্রত্যয়ন পত্র	৩
ঘোষণা পত্র	৪
কৃতজ্ঞতা ও ঋণ স্বীকার	৫
ভূমিকা	৯
অধ্যায় ঃ এক ইকবালের রাজনৈতিক দর্শন	
ইকবাল : জীবন ও কর্ম	১৪
জন্ম ও শিক্ষাজীবন	১৪
ইকবাল রচনাবলী	১৯
রাজনৈতিক চিন্তাধারার উৎস	২২
রাজনৈতিক চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ	২৩
রাজনৈতিক চিন্তাধারার ইসলামী ভাবধারা	২৫
ইকবালের ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন	৩০
ইকবাল ঃ স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদ	৩৪
ইকবাল ও গণতন্ত্র	৪৭
ইকবাল ও কমিউনিজম	৫৫
ইকবাল ও পাশ্চাত্য সভ্যতা	৬০
অধ্যায়–দুই ইকবালের সমাজ ও রাষ্ট্রদর্শন	
ইকবাল : ব্যক্তি ও সমাজ	৬৬
ইকবাল : ধর্ম ও রাষ্ট্র	৬৯
ব্যক্তি ও সমাজ বিকাশে ইকবালের খুদী দর্শন	৭৫
ইকবালের ইনসান-ই-কামিল	৯৩
ইজতিহাদ ও ইকবাল	১০৮
ইকবালের আদর্শ সমাজ	১১৬
আদর্শ সমাজের নীতিমালা	১২৬
নির্বাচন পদ্ধতি	১২৭
সাংবিধানিক সরকার ব্যবস্থা ও ইকবাল	১২৮
সার্বভৌমত্ব ও খিলাফত	১৩১
অধ্যায়-তিন ইসলামের সমাজ দর্শন ও ব্যক্তিসত্তা	
মানব প্রকৃতি ও সমাজ জীবন	১৩৬
ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ জীবন	১৩৯
ইসলাম ও স্বভাবধর্ম	১৪২

Dhaka University Institutional Repository

স্বভাব ধর্মের সুস্পষ্ট দাবি ১৪৪
সমাজ জীবনের অমূল্য অবদান ১৪৭
বৈরাগী মহাত্মাদের সমস্যা ১৫০
সামাজিকতার উদ্দেশ্য ১৫৩
সমাজগ্রন্থী ও ইসলামী সমাজের বিনির্মাণ পদ্ধতি ১৫৪
ইসলামের জীবন দর্শন ১৫৫
জীবনদর্শনে ধর্মের ভূমিকা ১৬০
দার্শনিকদের দৃষ্টিতে সমাজ সমষ্টি ১৬৯
কুরআনের দৃষ্টিতে সমাজ সমষ্টি ১৭০
বিবেক বুদ্ধির দৃষ্টিতে সমাজ সমষ্টি ১৭৪
ইসলামী সমাজের স্বরূপ ১৭৫

অধ্যায় : চার খিলাফত মতাদর্শ ও ইমামত

খিলাফত ধারণা ১৮৭
খিলাফত রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি ১৯২
খিলাফতের মৌল আদর্শ ১৯৮
নবী আদর্শের খিলাফত ২০৬
নবী প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য ২১১
খিলাফতে রাশেদা ২১৩
খুলাফায়ে রাশেদীনের নির্বাচন ২১৫
খিলাফতে রাশেদার রাষ্ট্রস্বরূপ ২১৭
রাষ্ট্র ও সরকারের ধারণা ২১৭
বিচার বিভাগ ২১৯
আইন বিভাগ ২১১
নির্বাহী বিভাগ ২২৩
প্রতিরক্ষা বিভাগ ২২৭
ইমামত ও খিলাফত ২৩০
খিলাফত ও ইমামতের সমন্বয় ২৩২

অধ্যায় পাঁচ ইসলামে রাষ্ট্র ও নেতৃত্ব

ইসলামে রাষ্ট্রের ধারণা ২৩৫
ইসলামী রাষ্ট্র ও সংশ্লেষণবাদ ২৪০
ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অপরিহার্যতা ২৪১
ইসলামে সামষ্টিক জীবন ও নেতৃত ২৪৮
ইসলামে নেতৃত্বের আনুগত্য ও জরুরী গুনাবলী ২৫১
ইসলামী হুকুমাতের বিশেষত্ব ২৬১
ইসলামী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ২৬৪
ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগ ২৬৫
মজলিসে শুরা (আইন প্রণয়ন বিভাগ) ২৬৫
মজলিসে শুরা গঠনের মূলনীতি ২৬৬

Dhaka University Institutional Repository

শুরা সদস্যদের গুনাবলী ও যোগ্যতা	২৬৬
মজলিসে শুরার কার্যবিধি	২৬৭
নির্বাহী বিভাগ	২৬৮
বিচার বিভাগ	২৭০
সাক্ষ্যদান ও সাক্ষ্যগ্রহণ এবং বিচারকদের প্রতি নির্দেশনা	২৭৩
ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান বির্বাচন দায়িত্ব ও ক্ষমতা	২৭৬
ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব-কর্তব্য	২৭৮
রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা	২৮০
ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধানের পদচ্যুতি ও সমালোচনা	২৮১
উপসংহার	২৮৪
গ্রন্থপূঞ্জি	২৮৭

Dhaka University Institutional Repository

ইকবালের রাষ্ট্র দর্শন ও খিলাফত ব্যবস্থা

ভূমিকাঃ

আল্লামা ইকবাল বর্তমান শতকে মুসলিম জাহানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তা নায়ক বলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সুধী মহলের কাছে সমাদৃত। জীবন দর্শনের কবি ইকবালের অমূল্য চিন্তাধারা কেবল প্রাচ্য দেশসমূহের নয়, বরং গোটা মুসলিম জাহানের চিন্তার রাজ্যে এক বিপ্লবাত্মক ও কল্যাণ অভিসারী পরিবর্তন এনে দিয়েছে। বিগত কয়েক শতকের পতনমূখী গতিপথে চালিত মুসলমানদের নিষ্ক্রিয়-গতিহীন জীবনে এনেছে অপূর্ব কর্মোন্মাদনা ও গতিচাঞ্চল্য।

ইকবালের চিন্তাধারার বুনিয়াদ প্রধানত ইসলামের উপর। ১৯৩০ সালে ২৯ ডিসেম্বর নিখিল-ভারত মুসলিম লীগ অধিবেশনের সভাপতির ভাষণে ইকবাল বলেছিলেন ঃ 'আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ ব্যয় করেছি ইসলামের সযত্ন অধ্যয়নে - ইসলামের কানুন ও রাষ্ট্রব্যবস্থা, তার তমদ্দুন, তার ইতিহাস ও সাহিত্য অধ্যয়নে। আমার মনে হয়, ইসলামের প্রাণবস্তুর সাথে এই অবিরাম সংযোগের ফলে তা আমার উপলব্ধিতে যেভাবে প্রকাশ লাভ করেছে, তার ফলে বিশ্বজনীন সত্য হিসেবে ইসলামের তাৎপর্য সম্পর্কে আমি এক ধরনের অন্তর্দৃষ্টির অধিকার লাভ করেছি।'

ইকবালের কাছে ইসলামের প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী নিছক ধর্মানুষ্ঠান পদ্ধতি নয়; বরং এ এক পূর্ণাঙ্গ ও সম্পূর্ণ জীবন বিধান। মানব জীবনের কোনো বিশেষ দিকই ইসলামের আওতার বাইরে পড়ে না; তাই রাজনৈতিক দর্শনকেও তিনি এই জীবন দর্শনেরই এক অপরিহার্য অংশ মনে করতেন। এই সুস্পষ্ট ধারণা নিয়েই তিনি জীবনের অন্যান্য দিকের ন্যায় সমভাবে রাজনীতির দিকেও মনোযোগী হয়েছিলেন। ইকবালের মতে 'রাজনীতির মূল রয়েছে মানুষের আত্মিক জীবনের গভীরে' এবং ধর্মকে তিনি মনে করতেন 'ব্যক্তি ও রাষ্ট্র উভয়ের জীবনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি' বলে। আধুনিক দুনিয়ার অধিকাংশ চিন্তাবিদ যখন ধর্মকে রাজনীতি থেকে আলাদা করে নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপারে পরিণত করবার স্বপক্ষে ক্রমাগত প্রচার চালিয়ে এসেছেন, ইকবাল তখন অকুতোভয়ে ঘোষণা করেছেন ঃ 'ইসলাম মানুষের একত্বকে আত্মা ও বস্তুর সমন্বয়াতীত দ্বৈতবাদে বিভক্ত করে না। ইসলামে আল্লাহ ও বিশ্বপ্রকৃতি, আত্মা ও বস্তু, উপাসনাগার ও রাষ্ট্র পরস্পরের পরিপূরক।'

ধর্ম ও রাষ্ট্রের প্রাচীন বিতর্কে ইকবাল ধর্মহীন রাষ্ট্রের (Secular state) প্রবল বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মতে মার্টিন লুথার খৃস্টবাদের ভয়ানক শত্রু, কেননা তিনিই ধর্ম ও রাষ্ট্রকে দুটি ভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী বস্তু বলে চিহ্নিত করেছেন।

ইউরোপে যে জীবন দর্শনের প্রভাবে ধর্ম ও রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে তার মূলে রয়েছে জড় ও আত্মার (Matter and spirit) দ্বৈতবাদ। এ ভ্রান্ত দর্শনই মানবতার কাফেলাকে বস্তুবাদের (Materialism) ঊষর মরুতে বিভ্রান্ত ও দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ঘুরে মরতে বাধ্য করছে। ইকবালের দৃষ্টি ধর্ম ও রাষ্ট্র, দেহ ও আত্মার সমতূল্য– এদের পারস্পরিক নিবিড় সংযোগ জীবনের প্রতিক্ষেত্রে অপরিহার্য আর এ দু'টির পারস্পরিক বিরোধ-বিচ্ছেদের নিশ্চিত পরিণতি ধ্বংস। ইকবালের রাষ্ট্র দর্শনে দেহ ও প্রাণ, জড় ও আত্মা দু'টি অবিচ্ছিন্ন মৌলিক উপাদান। **'গুলশানে রাজই জাদীদ'** গ্রন্থে তিনি বলেছেন-

''বস্তু ও আত্মার দ্বিধাবিভক্তি আপত্তিকর ;
বস্তু ও আত্মাকে ভাগ করা হারাম।

গীর্জা শুধু জপমালা নিয়ে থাকলো বিব্রত,
রাষ্ট্রনীতির সম্পর্ক সে করলো অস্বীকার।
পশ্চিমী দর্শন গড়ে উঠলো।
বস্তু ও আত্মার দ্বৈতবাদের উপর।
দৃষ্টিতে তার
রাষ্ট্র ও ধর্ম হলো স্বতন্ত্র।
পশ্চিমের অন্ধ অনুকরণে
এই জাতি হলো বিভ্রান্ত
ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক সে হলো বিস্মৃত।''

ইকবালের দৃষ্টিতে দীন ও দুনিয়া, রাষ্ট্র ও নৈতিকতার পূর্ণ সমন্বয়ে, শক্তি ও পরাক্রম এবং ফকিরী ও বাদশাহীর সামঞ্জস্য সাধনেই মানবতার কল্যাণ নিহিত রয়েছে। হযরত জুনাইদের দুনিয়া বিমুখতা এবং আর্দশিরের রাষ্ট্র দখল একত্রে সমন্বিত হলে চিন্তা ও কর্মের এমন এক জীবন্ত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠা সম্ভব, যার দরুণ মানুষ তার নিয়তিকে পূর্ণতা দান করতে পারে। অন্যথায় মানবতার উত্থান চরমভাবে ব্যর্থ হতে বাধ্য। ইকবালের দৃষ্টিতে আধুনিক সভ্যতা যে রাষ্ট্রনীতি উপস্থাপন করেছে তা একটি বল্গাহীন দৈত্য ছাড়া কিছুই নয়। যার উপর এর করাল দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয়, তাই জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। তিনি বলেন:

'আমার দৃষ্টিতে বর্তমান রাষ্ট্রনীতি ধর্মের প্রভাব মুক্ত
শয়তানের ক্রীতদাসী, নীচ প্রকৃতি, আত্মা তার মৃত।
গীর্জার প্রভাব যখন হলো বিবর্জিত, শাসন ক্ষমতা
হলো মুক্ত, স্বেচ্ছাচারী,
পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রনীতি হলো বল্গাহীন দৈত্যের মত।'

ইকবাল তার বিখ্যাত **'বালে জিবরীল'** গ্রন্থে **'দুনিয়া ও সিয়াসত'** শীর্ষক কবিতায় উল্লেখ করেছেন:

'বাদশাহী বিক্রম আর গণতন্ত্রের তামাশা,
ধর্ম রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হলে
অবশিষ্ট থাকে শুধু চেংগিজী নীতি।'

ইকবাল দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ভৌগলিক বা পক্ষপাতমূলক জাতিয়তাবাদ, অর্থনৈতিক সাম্যবাদ কিংবা চরম পূঁজিবাদ আর আধুনিক গণতন্ত্র মানুষকে সাময়িক আনন্দ দিলেও স্থায়ী সুখ দিতে পারে না, পারে না পরম উপযোগ নিশ্চিত করতে, এমন কি ন্যায় বিচার করতেও পারে না ; বরং অতীত ইতিহাস বলে এ মতবাদ গুলো স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারীতা এবং স্বাধীন পূঁজি গঠনের নামে পূঁজিবাদী শোষণকে অসহিষ্ণু করে তুলেছিল। আর সমাজতন্ত্র এসে হরণ করল পূঁজির স্বাধীনতাকে, রিক্ত করল সবার হাত, অবাঞ্চিত ঘোষিত হল ব্যক্তিগত সম্পদ। ফলে মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি চরমভাবে বাধাগ্রস্ত। ইকবাল মনে করেন এহেন পরিস্থিতি থেকে মুক্তির জন্যে প্রয়োজন এমন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা যার ভিত্তি হবে শুদ্ধ আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতা এবং যার কাঠামো হবে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা আর উপরি কাঠামো হবে সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ। এধরনের সামঞ্জস্যপূর্ণ সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় কাঠামোর নিশ্চয়তা দিতে পারে ঐশী বিধান। আর এ বিধানেরই প্রায়োগিক রূপ খিলাফত ব্যবস্থা।

মানুষের জীবন বিকাশে রাষ্ট্র একটি অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব না থাকলে ব্যক্তির অধিকার ও কর্তব্য যেমন নির্দিষ্ট ও নিরাপদ থাকেনা। তেমনি সমষ্টির ভূমিকা ও কর্তৃত্বও কোনো সংযম ও সীমা মেনে চলে

না। ফলে ব্যাক্তি ও সমষ্টির দ্বন্দ্বে সমাজে চরম অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। অশান্তি ও বিশৃংখলা মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। ফলে সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের ধারায় রাষ্ট্র আজ মানবীয় সমাজের এক অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য হলেও তা পরিচালিত হবে কোন চিন্তাদর্শন ও নীতিভঙ্গিতে? কে বা কারা নির্ধারণ করবে রাষ্ট্রের জন্য অত্যাবশ্যকীয় মৌলনীতি-দর্শন ও দিকনির্দেশনা?

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে সুস্পষ্টভাবে মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছেন। তাদের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য পাশ্চাত্য গণতন্ত্রকেই একমাত্র কল্যাণপ্রসূ ব্যবস্থা হিসেবে রায় দিয়েছেন। আর একটি অংশ গণতন্ত্রের পরিবর্তে সমাজতন্ত্রকেই শ্রেয়তর ব্যবস্থা হিসেবে দাবি করেছেন। আবার আর একটি অংশ এ দু'টির বিপরীতে, ইসলামকেই সর্বতোভাবে কল্যাণকর রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবে দুনিয়ার সামনে তুলে ধরেছেন। বলা বাহুল্য যে, দুনিয়ার মানুষ ইতিহাসের ধারায় এই তিনটি ব্যবস্থারই কার্যকারিত প্রত্যক্ষ করেছে। তারা দেড় হাজার বছর পূর্বে দেখেছে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার অপরিমেয় কল্যাণকারিতা। মানুষের অধিকার ও মর্যাদা কতটা নিরাপদ হতে পারে, তাদের জীবন ও সম্ভ্রম কতটা অলংঘনীয় হতে পারে, তার অনন্য নজির শুধু ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থাই উপস্থাপন করেছে।

পক্ষান্তরে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবে দুনিয়ায় প্রচলিত হলেও এ দু'টি ব্যবস্থার কল্যাণকারিতা আজও প্রমাণিত হয়নি, বরং মানুষের অধিকার ও মর্যাদা সংরক্ষণে এবং তার জীবন ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তা বিধানে এ দু'টি ব্যবস্থাই সমানভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে, যা কিনা অপ্রিয় সত্য হলেও বারবার প্রতিভাত হয়েছে। পৃথিবীর যেখানেই এ দু'টি ব্যবস্থা কার্যকর হয়েছে, সেখানেই এ ব্যর্থতার নজীর স্থাপিত হয়েছে। বিগত চারশত বছর যাবত ইউরোপ তথা পাশ্চাত্য জগতে গণতন্ত্রের পরীক্ষা-নীরিক্ষা চলেছে। পাশ্চাত্যের জনগণকে এর জন্যে অনেক মূল্যও দিতে হয়েছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সেখানে মানুষের জীবন ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হয়নি, তার অধিকার ও মর্যাদা সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। অন্যদিকে সমাজতন্ত্র একটি মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়ে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে মধ্য-এশিয়া ও পূর্ব-ইউরোপের বিরাট অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। পরবর্তীকালে চীনসহ পৃথিবীর আরো কিছু অঞ্চলে এর প্রভাব বলয় বিস্তৃত হয়েছে। কিন্তু এর প্রতিশ্রুত সেই মানবিক রূপটি আজও কোথাও পরিলক্ষিত হয়নি; বরং তৎপরিবর্তে মনুষ্যত্বের চরম অবমাননাই লক্ষ্য করা গেছে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সর্বত্র।

মানব রচিত দু'টি মতবাদের এই চরম ব্যর্থতার ফলেই আজ ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে দেখা দিয়েছে পৃথিবীর নির্বাচিত মানব জাতির জন্য। আর ইসলাম তো মূলগতভাবেই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্র ব্যবস্থা। এই রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে বাস্তবে রূপদান করার সুমহান দায়িত্ব পালন করেছেন খোদ ইসলামেরই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.)। নবুয়্যাতের সুদীর্ঘ তেইশ বছরে মানুষের সামষ্টিক জীবন সম্পর্কে যেসব আইন-কানুন ও বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয়েছে, তার সবকিছুই তিনি বাস্তবায়িত করেছেন পুরাদস্তর একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মাধ্যমে। শাসন-প্রশাসন, আইন প্রণয়ন, সামাজিক শৃংখলা রক্ষা, বিচার কার্য সম্পাদন, রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা বিধান ইত্যাকার প্রতিটি গুরুতবপূর্ণ কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে তিনি ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার একটি স্থায়ী বুনিয়াদ স্থাপন করেছেন নবুয়্যাতের তেইশ বছরের জীবনে।

মহানবী (সা.) এর তিরোধানের পর সেই স্থায়ী বুনিয়াদের উপরই গড়ে উঠে ইসলামের আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থা খিলাফতে রাশেদা। হযরত আবু বকর (রা:), হযরত ওমর (রা:), হযরত উসমান (রা:), ও হযরত আলী (রা:), মহানবী (সা:)-এর এই চার ঘনিষ্ঠ সাহাবী পরম যত্ন ও মমতায় বিন্যস্ত ও বিকশিত করে তুলেছেন নবুয়তি ধারার এই রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে। শুধু তাই নয় এর পরিধিকেও তারা সম্প্রসারিত করেছেন আরব উপদ্বীপের সীমানা পেরিয়ে গোটা ইরান ও রোমান সাম্রাজ্যের বিশাল অঞ্চল জুড়ে। বস্তুত: আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞানীরা যত

চমকপ্রদ তন্ত্রমন্ত্রই উদ্ভাবন করুক না কেন মানব জাতির ইতিহাসে মানবতার কল্যাণে নবুয়তি ধারার এই খিলাফতের ন্যায় বিপুল সাফল্য কোনো পদ্ধতিই আর অর্জন করতে পারে নি, এটি এক ঐতিহাসিক সত্য।

দুর্ভাগ্যবশত: নবুয়তি ধারার এ খিলাফত দুনিয়ার বুকে টিকে ছিল মাত্র তিশ বছর। এরপরই রাজতন্ত্র ও সৈরতন্ত্রের অভিশাপ নেমে আসে গোটা মুসলিম জাতির উপর। জাহিলিয়াতের অন্ধকার যবনিকা ঢেকে দিয়েছে তাদের সোনালী ভবিষ্যতকে। বর্তমানে তারই জের চলছে মুসলিম জাহানের দেশে দেশে। তদুপরি এর সাথে নতুন যুক্ত হয়েছে পশ্চিমের ইহুদী-খৃস্টানদের উদ্ভাবিত গণতন্ত্র নামক একটি নব্য জাহিলিয়াত। এর বিষময় পরিণতি গোটা মুসলিম জাহানকে আজ নিক্ষেপ করেছে রাজনৈতিক সংকটের ঘূর্ণাবর্তে। আধুনিক কালের তন্ত্রমন্ত্রগুলো তাদের কোনো সমস্যার সমাধান করাতো দূরের কথা, বরং নতুন নতুন সমস্যার জন্ম দিয়ে গোটা মুসলিম সমাজ এমনকি পুরো মানব সমাজকে ব্যাধিগ্রস্ত করে তুলেছে।

এই পরিস্থিতিতে আজ মুসলিম সমাজে ইসলামের আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থা খিলাফতে রাশেদা সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা-গবেষণার প্রয়োজন অত্যন্ত তীব্রতর হয়ে উঠেছে। মুসলমানদের সকল রাজনৈতিক ব্যাধির একমাত্র নিরাময় যে, নবুয়্যাতী ধারার খিলাফত, অন্য কোনো তন্ত্রমন্ত্র নয় এ সত্যটি আজ মুসলিম সমাজের নিকট সর্বোপরি মানব সমাজের নিকট উদ্ভাসিত করে তোলা একান্ত প্রয়োজন।

খিলাফত রাষ্ট্রব্যবস্থা ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থা তথা ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার নাম। হযরত নূহ (আ:) থেকে এ রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভব। যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ (আ:) স্ব স্ব জাতি ও দেশে খিলাফত কায়েমের চেষ্টা করেছেন। কেউ বাস্তবে খিলাফত কায়েম করেছিলেন আবার কেউ কেউ আজীবন তা কায়েমের চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। পূর্বতন নবীগণের (আ:) সময়ে যারা খিলাফত রাষ্ট্র কায়েম করেন তাদের মধ্যে হযরত ইউসুফ (আ:), হযরত মূসা (আ:), হযরত দাউদ (আ:) ও হযরত সুলাইমান (আ:) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সর্বশেষ হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর নেতৃত্বে নববী রাষ্ট্র এবং তাঁর অব্যবহিত পরে তাঁর প্রধান চারজন সাহাবীর নেতৃত্বে মদীনায় খিলাফত কায়েম হয়। খিলাফতে রাশেদার পরও ত্রুটি-বিচ্যুতিসহ খিলাফত ব্যবস্থা অব্যাহত থাকে এবং উম্মাহকে নেতৃত্ব দেয়। ১৯২৪ সালে তুর্কি নেতা মোস্তফা কামাল পাশা উসমানী খিলাফত বিলুপ্ত করে দেন। তখন থেকে খিলাফত ব্যবস্থা নামে মাত্রও আর বহাল রইলো না।

খিলাফত শুধু একটি তত্ত্বকথা নয় বরং এটি একটি বাস্তবধর্মী জীবন ব্যবস্থা। এর যেমন দার্শনিক ভিত্তি আছে ঠিক তেমনি আছে বাস্তব জীবনে মানুষের সমস্যা সমাধানের পন্থা। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে এ ব্যবস্থায়। ইনসাফ, শান্তি, সমৃদ্ধি, অগ্রগতি, উন্নতি এ রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য। দ্বীন ও দুনিয়ার যুগপৎ প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম খিলাফত রাষ্ট্র। তাই যে কোনো বিবেচনায় খিলাফত রাষ্ট্র জনগণের জন্যে কল্যাণকর এবং এটি অপরিহার্যও বটে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য যে পাশ্চাত্যের প্রভাবে আমরা মুসলমানরা আমাদের নিজস্ব ধর্ম, ইতিহাস-ঐতিহ্য সবই ভুলে গিয়েছি। আমাদের নিজস্ব রাজনৈতিক সংস্কৃতিও বিস্মৃত হয়েছি। এমনকি নিজস্ব রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কেও আমরা অবহিত নই। আমাদের অনেকেই খিলাফত ব্যবস্থাকে অবাস্তব মনে করে থাকি। অনেকেই আবার এ ব্যবস্থাকে সেকেলে বলে মনে করেন। কেউ বা আবার পশ্চিমা প্রভাবে খিলাফত প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে মৌলবাদ বলে আখ্যায়িত করেন। আর যারা ইসলামের প্রতি দরদ ও মমত্ববোধ লালন করেন তাদেরও অনেকের খেলাফত রাষ্ট্র সম্পর্কে সঠিক ধারণা নেই।

খিলাফতে রাশেদা বাস্তবত: তাই, যা আদর্শগতভাবে কুরআন-সুন্নাহ বিধৃত, রাসূলে করীম (সা:) নিজে তাঁর তেইশ বছরের নবুয়্যাতী জীবনে অবিশ্রান্ত সাধনা ও সংগ্রামের ফলে যে রাষ্ট্র ও সমাজ গঠন করেছিলেন

খিলাফতে রাশেদা তারই জের, তারই দ্বিতীয় অধ্যায়। কুরআন-সুন্নাহ যদি বীজ হয়, তাহলে খিলাফতে রাশেদা তার শাখা-প্রশাখা, পত্র-পল্লব ও ফুলে-ফলে সুশোভিত পূর্ণাঙ্গ বৃক্ষ।

রাসূলে করীম (সা:) যখন দুনিয়া থেকে চির বিদায় নিয়ে চলে গেলেন, তখন তিনি একদিকে রেখে গেলেন নিজ যত্নে সংকলিত আল্লার বাণী– আল-কুরআন, অপরদিকে তাঁর জীবনব্যাপী সংগ্রাম সাধনার ফসল একটি রাষ্ট্র ও সমাজ। কুরআন ও সুন্নাহ গ্রন্থাকারে আমাদের সামনে চির সমুজ্জ্বল হয়ে আছে, থাকবে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ও সমাজের সঠিক চিত্রও অংকিত রয়েছে সিরাতগ্রন্থ ও ইতিহাসের পাতায়। যদিও তা বর্তমান দুনিয়ার সামাজিক কাঠামোর কোথাও বলবৎ নেই। তথাপি সাধারণভাবে দুনিয়ার সুস্থ বিবেকবান ও সূক্ষ্ম চিন্তাশীল লোকদের নিকট, বিশেষত: ইসলাম ও রাসূলের প্রতি ঈমানদার লোকদের নিকট রাসূলে করীম (সা:) এর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা বর্তমান কালেও প্রেরণার অন্যতম প্রধান উৎস। এটিই তাঁদের নিকট এখনও আদর্শিক লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়ে আছে, চিরকালই থাকবে সন্দেহাতীতভাবে।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় ঃ এক

ইকবালের রাজনৈতিক দর্শন

ইকবাল : জীবন ও কর্ম :

বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কবি আল্লামা ইকবাল মুসলিম জাহানে ও ইসলামী চিন্তাবাদের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। তিনি যদিও কোন রাজনৈতিক নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন না, রাজনীতি চর্চা করাও তাঁর উপজীব্য ছিল না; কিন্তু নিছক কল্পনার পক্ষপুষ্টে ভর করে ভাবলোকে বিচরণ করতেও তিনি কিছুমাত্র অভ্যস্ত ছিলেন না। বরং চিন্তারাজ্যে যে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইতেন দার্শনিক যুক্তির ভিত্তিতে, সে সত্যকেই তিনি বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্যে চেষ্টা করতেন সাহিত্যিক আলোড়নের মাধ্যমে। Art for Arts sake -এর প্রচলিত মতবাদের মুকাবিলায় দার্শনিক কবি ইকবাল Art for life's sake-এর আওয়াজ তুলে তদানিন্তন কাব্য ও সাহিত্যের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। ইকবালের কাব্য পাঠে স্পষ্টত: বুঝা যায় যে, তিনি একটি বিশেষ বাস্তব জীবন দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। যে দর্শনকে কেন্দ্র করেই তিনি তাঁর কাব্যের ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করেছেন।

ইকবাল ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের ভিত্তিতে মুসলিম বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ ও সমন্বিত হওয়ার আহ্বান জানানোর পাশাপাশি কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। দার্শনিক কবি হিসেবে তিনি মুসলিম উম্মাহকে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পথনির্দেশনা দিয়েছেন। ইকবাল অস্থিতিশীল মুসলিম বিশ্বকে পুনর্গঠিত করার জন্য ইসলামের সময়োপযোগী আধুনিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। এদিক থেকে তাঁর "The Reconstruction of Religious Thought in Islam" এক অনুপম অবদান।

ইকবাল ১৯০৭ সালে ইউরোপে অধ্যয়নকালেই মুসলিম জাতীয়তাবাদের তুর্যবাদক বনে যান। তাঁর মানসিক বিবর্তন সেখান থেকেই শুরু হয়। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তা পুর্ণতা লাভ করে। দেখা যায় যে, প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর রচিত সমস্ত কবিতাই একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নিবেদিত। আর তা হলো মুসলমানদের আত্মসচেতন করে তোলা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা।

জন্ম ও শিক্ষাজীবন :

পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত সিয়ালকোট শহরে ১৮৭৭ সালের ৯ নভেম্বর (৩রা জিলকদ, ১২৯৪ হি:), শুক্রবার, বিশ্ববিশ্রুত কবি ও দার্শনিক আল্লামা স্যার মুহাম্মদ ইকবাল জন্ম গ্রহণ করেন।[৫৬(পৃ:-২২১)][1] তাঁর পিতার নাম শায়খ নূর মোহাম্মদ এবং মাতার নাম ইমাম বীবী। তাঁর পূর্ব পুরুষ ছিলেন সাপ্রু বংশীয় কশ্মিরী ব্রাহ্মণ।[৫৭/(পৃ:-১৬১৪)][2] সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে অথবা অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে এ বংশের অনুসারীরা

---

1 কবির সুযোগ্য পুত্র বিচারপতি (অব:) ড. জাভিদ ইকবাল 'যিন্দা রোদ' নামক তার উর্দু জীবনী গ্রন্থে প্রাপ্ত তথ্যাদি ও প্রামাণাদির ভিত্তিতে বিস্তারিত আলোচনার পর উক্ত জন্ম তারিখ সমর্থন করেন। জীবন চরিত্রটি ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত হয়।The Encyclopaedia of Religion, Vol. 7, New yrk, 1987. P-275 ইসলামী বিশ্বকোষ, ৩য় খন্ড, পৃ. ২৯৯; MM. Sharif, A History of Muslim Philosophy, Vol. 11. p-1614 সহ কিছু গ্রন্থে ইকবালের জন্ম তারিখ ১৮৮৩ সনের ২২ ফেব্রুয়ারি হিসেব উল্লেখ করা হয়েছে।

2 তাছাড়া ইকবাল নিজেই কবিতার মাধ্যমে তাঁর বংশ পরিচয় তুলে ধরেছেন। তিনি তাঁর ফার্সী গ্রন্থ 'পায়ামে মাশরিক' (পৃ- ৩৪৮, ১৭৮) এ লিখেন– تنم گلی زخیابان جنت کشمیر – دل ازحرم حجاز از شیراز است "আমার দেহ কাশ্মীর উদ্যানের পদচারণ ভূমি থেকে, মন হেজাযের পবিত্র স্থান থেকে, আরগান পারস্যের শিরায থেকে।" অন্য ফার্সী গ্রন্থ : 'যবুরে আযম' (পৃ- ৪০৫, ১৭) এ বলেন : مرا بنگر در هندوستان دیگر نمی بینی – برهمن زاده, رمز اشنائی روم وتبریز است "আমায় দেখ, কেননা, হিন্দুস্তানে আর কাউকে দেখবে না, ব্রাহ্মন সন্তান, রহস্যজ্ঞাত রোম ও তাবরিয এর।" উর্দূগ্রন্থ 'যারবে কলীম'(পৃ: ৫৩০, ৩০)–এ পাশ্চাত্য দর্শনে প্রভাবান্বিত জনৈক সৈয়দজাদাকে সম্বোধন করে তিনি বলেছেন :

ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন বলে ধারণা করা হয়।[১২/(পৃ:-৩০০)] উনিশ শতকের প্রথমার্ধে তাঁর পিতামহ শায়খ মুহাম্মদ রফীক কাশ্মিরের লুহার গ্রাম ছেড়ে শিয়ালকোটে গমন করেন এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। এখানেই তাঁর পিতা জন্ম গ্রহণ করেন। আল্লামা ইকবাল তাঁর দুই ভাই ও চার বোনের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র হিসাবে স্থানীয় মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর শিয়ালকোটের স্কচ মিশন স্কুল থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করেন। ইতোমধ্যে স্কচ মিশন স্কুল কলেজে পরিণত হলে তিনি সেখান থেকেই ১৮৯৫ সালে এফ.এ পাস করেন। এরপর ১৮৯৭ সালে লাহোর কলেজ থেকে বি.এ পাস করেন এবং বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৯৯ সালে একই কলেজ থেকে সম্মানের সাথে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে দর্শনে এম এ পাস করেন এবং একই সালে লাহোরের ওরিয়ান্টাল কলেজে আরবি প্রভাষক হিসেবে নিযুক্ত হন। কিন্তু কিছুদিন পরেই ইংরেজী ও দর্শনের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে লাহোর সরকারী কলেজে তিনি বদলী হয়ে আসেন। আরবি প্রভাষক থাকাকালীন ইকবাল অর্থনীতির উপর একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ঘটনাক্রমে এটিই ছিল উর্দূতে অর্থনীতির উপর প্রথম গ্রন্থ।

তিনি ১৯০০ সালে লাহোর ল' কলেজ থেকে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অত:পর ১৯০৫ সালে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্যে তিনি ইংল্যাণ্ড গমন করেন এবং ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি হন। এখান থেকে তিনি দর্শন শাস্ত্রে এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। এরপর তিনি জার্মানী গমন করেন এবং মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে পারস্যের দর্শন শাস্ত্রের উপর একটি মৌলিক গবেষণা সম্পন্ন করেন। ১৯০৭ সালে "The Development of Metaphysics in Persia- A contribution to the History of Muslim Phylosophy." শিরোনামের একটি গবেষণা কর্ম সম্পাদনের জন্যে মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। এ গবেষণা কর্মটি বই আকারে প্রকাশিত হলে তিনি সুধীমহলে ব্যাপক সমাদৃত ও পরিচিতি লাভ করেন।

ডক্টরেট ডিগ্রী পাওয়ার পর ইকবাল ইংল্যান্ড প্রত্যাবর্তন করেন এবং লিংকনস ইনের সাথে নিজেকে যুক্ত রাখেন। লন্ডনে অবস্থানকালে ইকবাল ইসলামী দুনিয়ার বিভিন্ন স্থান থেকে বিশেষত পাক-ভারত উপমহাদেশ থেকে আগত কিছু তরুন মুসলমানদের কার্যকলাপে আগ্রহ পোষণ করেন। এ সকল তরুণ প্যান ইসলামিজমের প্রবক্তা ছিল। এ কার্যক্রম পরিচালিত হতো আঞ্জুমান-ই-ইসলাম নামীয় সংগঠনের মাধ্যমে। পরবর্তীতে সংগঠনটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় প্যান ইসলামিক সোসাইটি।

প্যান ইসলামিক সোসাইটির উদ্যোগে ও সহযোগিতায় ইকবাল ইংল্যান্ডে কয়েকটি বক্তৃতা দেন; এর একটি বিখ্যাত ক্যাক্সটন হলে অনুষ্ঠিত হয় এবং ইংল্যান্ডের জাতীয় সংবাদপত্রগুলোতে তা প্রকাশিতও হয।

مین اصل کاخاص سومناتی – ابا مری لاتی ومناتی
توسید هاشمی اولاد – میری کف خاک برهمن زاد
هی فلسفه میری اب وگل مین – پوشیده هی رشید پائی دل می

"আমি আসলে নির্ভেজাল সোমনাতি
আমার বাপ-দাদা লাতি ও মানাতি
তুমি হাশেমী সৈয়দের বংশধর
আমার মাটির দেহ ব্রাহ্মন প্রসূত
দর্শন মজ্জাগত মোর কাদামাটিতে
গুপ্ত রয়েছে হৃদয়ের রন্দ্রে রন্দ্রে।"

১৯০৬ সালে উপমহাদেশে মুসলিম নবজাগৃতির স্বপ্ন সম্ভাবনা নিয়ে ঢাকায় মুসলমানদের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯০৮ সালে সৈয়দ আমীর আলী লন্ডনে এর একটি শাখা গঠন করেন। আল্লামা ইকবাল এ সময় ওতপ্রোতভাবে মুসলিম লীগের সাথে জড়িত হন।

ইকবাল ১৯০৭ সালের এপ্রিল মাসে ব্যরিস্টারী পাস করেন, কিন্তু অগ্রবর্তী ছাত্র হিসেবে লিংকনস ইনে যোগ দেয়ার কারণে ১৯০৮ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত তিনি আইন পেশা শুরু করার অনুমতি পাননি।

এ সময় ইকবাল লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ৬ মাসের জন্যে আরবির অধ্যাপনাও করেন। উল্লেখ্য, প্রবাসকালীন সময়ে ইকবাল মাত্র ২৪টি কবিতা লিখেছিলেন। তাও আবার অধিকাংশই তাঁর বন্ধু মাখজান সম্পাদক স্যার আবদুল কাদিরের অনুরোধে। প্রবাসে কর্মমুখর জীবন শেষে ২৭ জুলাই ১৯০৮ সালে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং লাহোর সরকারী কলেজে স্বীয় পদে যোগদান করেন। এ সময় সরকারী অনুমতি নিয়ে তিনি আইন ব্যবসাও শুরু করেন। কিন্তু দেড় বছর পর তিনি কলেজের অধ্যাপনা ছেড়ে দেন। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর সঙ্গী খাদিম আলী বখশকে বলেন, "আমি স্ব-জাতিকে বাণী দিতে চাই, কিন্তু সরকারি গোলামী তার প্রতিবন্ধকতা করছে। তাই আমি এই গোলামী ত্যাগ করলাম।"[৩৫(পৃ:-১০৯)] শিক্ষকতা ত্যাগের পর তিনি আইন ব্যবসা ও ক্ষুরধার লেখার মাধ্যমেই পরবর্তী জীবন চালনা করেন।

শিক্ষা ক্ষেত্রে অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলীর বদৌলতে তিনি বহু সংগঠন, সংস্থা, কমিটি ও প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন। ২ মার্চ, ১৯১০ সালে তাঁকে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নিয়োগ করা হয়। তিনি লাহোর সরকারী কলেজের ইতিহাসের প্রফেসর লালা রাম প্রসাদের সমন্বয়ে পাঠ্য পুস্তক হিসেবে ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা করেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ওরিয়েন্টাল ও আর্টস ফেকালটির সিনেট ও সিন্ডিকেটের সদস্যও মনোনীত হন ইকবাল। বোর্ড অব স্টাডিজের কনভেনর হিসেব দর্শন, আরবি ও ফার্সী বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট কমিটিসমূহের বৈঠকেও নিয়মিত যোগদান করতেন। ১৯১৯ সালে ইকবাল ওরিয়েন্টাল ফেকালটির ডীন নির্বাচিত হন। ১৯২৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত হন। ঐ বছরই তিনি প্রফেসরশিপ কমিটিরও সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯২৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটির সদস্য মনোনীত হন, যার মুখ্য দায়িত্ব ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ব্যবস্থা, উপদেষ্টা কমিটিসমূহ এবং নির্বাচন ও মনোনয়ন পদ্ধতি ইত্যাদির কার্যকারিতার উন্নতি সাধন কল্পে যথোপযুক্ত প্রস্তাবাদি উপস্থাপন করা।[৩১(পৃ:-৮৯)] ২৩ নভেম্বর, ১৯২৯ সালে তাঁকে আলীগড় ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ইউনিয়নের আজীবন অনারারী সদস্য মনোনীত করা হয়। ১৯৩৫ সালে তাঁকে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকেও অনারারী ডি-লিট ডিগ্রী প্রদান করা হয়। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ও ৪ ডিসেম্বর, ১৯৩৩ সালে সাহিত্য ও শিক্ষকতার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অবদানের জন্যে অনারীর ডি-লিট ডিগ্রীতে তাঁকে ভূষিত করে। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ও ১৯৩৭ সালে জুবিলী উৎসব উদযাপন উপলক্ষে তাঁকে ডি-লিট ডিগ্রীতে সম্মানিত করে। তিনি একই বছর হায়দরাবাদ ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনারারী ডি-লিট ডিগ্রী লাভ করেন।[৩১(পৃ:-৯০)] ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি-লিট ডিগ্রী প্রদান করে।[২৯(পৃ:-১৮৯)]

সাহিত্য ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদানের জন্যে ইকবালকে বৃটিশ সরকার ১লা জানুয়ারি, ১৯২৩ সালে 'স্যার' খেতাবে ভূষিত করে। পাঞ্জাবের তৎকালীন গভর্ণর স্যার এডওয়ার্ড ম্যাকলিগন ইকবালকে গভর্ণমেন্ট হাউসে দাওয়াত দেন এবং ইকবালের সম্মতিক্রমে সাহিত্য ক্ষেত্রে অমূল্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ 'নাইট হুড' বা স্যার খেতাবে ভূষিত করেন। তাঁর এ নাইট প্রাপ্তি ভক্ত-অনুরাগীদের মাঝে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করে। বিরুদ্ধবাদী কবিরা ব্যঙ্গাত্মক কবিতা লিখে তাঁকে আক্রমণ করে। অন্যদিকে বন্ধুরা চিঠি লিখে আশ্বস্ত করতে চায় ঘটনা যেন কোনক্রমেই তাঁর স্বাধীন মত প্রকাশে কিংবা জাতির প্রতি খেদমতে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি না করে। পুরনো বন্ধু মীর গোলাম ভীক নৈরাং এর চিঠির উত্তরে ইকবাল যা লিখেন তা তাঁর পরিকল্পিত মর্দে মুমিনেরই উচ্চারণ–

I have received hundreds of letters and telegrams regarding this conferring of knight hood and I wonder why people attach so much importance to these honours. With regard to the fears you have expressed. I can only say that I can swear in the name of the Glorious God who holds my life and honour in his possession, and I swear in the name of that great and distinguished personality to whom I owe my faith in God, that no power on earth can stop me from speaking the truth in practice. Iqbal may not be a Momin, but he has the heart of a Momin."[৪২(পৃ:-১৯৩)]

ইকবালের জীবন বিবেচনা করলে প্রতীয়মান হবে প্রাথমিক জীবনে রাজনীতির প্রতি তাঁর আগ্রহ কোন সুস্পষ্ট আকার নেয়নি। দার্শনিক ও কবি সুলভ বৈরাগ্য তাঁকে সবসময় নির্জনতার দিকেই আকর্ষণ করত। কিন্তু উপমহাদেশের নৈরাজ্যপূর্ণ অবস্থা বিশেষ করে মুসলমানদের দুঃখজনক চিত্র তাঁকে পীড়িত করে তোলে। ফলে তিনি ১৯২৬ সাল থেকে আমৃত্যু সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িত হন এবং মুসলমানদের প্রতিটি সমস্যায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯২৬ সালে পাঞ্জাব প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তিনি বিজয়ী হন। ১৯২৭ সালে ব্রিটিশ সরকার ভবিষ্যৎ ভারতীয় শাসনতন্ত্রের পটভূমি তৈরির প্রত্যাশায় সাইমন কমিশন প্রেরণ করলে কংগ্রেস দেশব্যাপী অসহযোগিতার ডাক দেয়। এমতাবস্থায় ইকবাল নওয়াব জুলফিকার আলী খান ও আহমদীয়া নেতা মাওলানা মোহাম্মদ আলীর সাথে যৌথভাবে এক বিবৃতি প্রকাশ করে কমিশনকে সহযোগিতা করবার আশ্বাস দেন এবং উল্লেখ করেন, মুসলমানরা যদি কমিশনকে সহায়তা না করে তবে তারা তাদের স্বার্থকেই বিঘ্নিত করবে।

যদিও ইকবাল এসময়ে রাজনৈতিক কোলাহলের মধ্যে প্রায় একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন তথাপি তিনি তাঁর কাব্য ও সাহিত্য সাধনাকে বিঘ্নিত হতে দেননি। ১৯২৮ সারের ডিসেম্বর মাসে ইকবাল মাদ্রাজে তাঁর বিশ্বনন্দিত 'ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পূনর্গঠন' শীর্ষক বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার আয়োজন শেষ না হতেই ইকবালকে উপস্থিত হতে হয় দিল্লীতে আহুত ন্যাশনাল কনফারেন্সের জাতীয় সম্মেলনে এবং পরে সভাপতি হিসেবে ১৯৩০ সালে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের বার্ষিক সম্মেলনে। সভাপতির ভাষণে ইকবাল তাঁর যুগান্তকারী স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ধারণা পেশ করেন। ভিনসেন্ট স্মিথের ভাষায়– Iqbal gave Indian Islam a sense of seperate destiny.[৪২(পৃ:-১৯৪)]

লাহোরে বসবাসকারী কাশ্মীরীরা সীমান্তের ওপারে তাদের ভাইদের সাহায্য করবার জন্যে আঞ্জুমান নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলে। ইকবাল ছাত্র জীবন থেকেই সংগঠনটির সাথে জড়িত ছিলেন। ছাত্র জীবনে ইকবাল তাঁর বহু বিখ্যাত কবিতাই এ সংগঠনটির বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করেছেন। ইংল্যান্ড থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি এর সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ডোগরা মহারাজার ক্রমবর্ধমান জুলুম ও বেইনসাফীর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৩০ সালে লাহোর সর্বভারতীয় কাশ্মীর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে কাশ্মীর প্রশাসনের অন্যায় নির্যাতনের সমালোচনা করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ সময়ে ইকবাল মুসলিম কনফারেন্সেরও সভাপতি ছিলেন। স্বাভাবিকভাবে কনফারেন্সের পক্ষ থেকেও ইকবাল কাশ্মীর সমস্যার কথা জোরালোভাবে সরকারের কাছে তুলে ধরেন। শুধু তাই নয়, মানবতাবাদী কবি ইকবাল তাঁর কবিতায় কাশ্মীরের দুঃখ ও লাঞ্ছনাকেও অসীম সমতা ও ভালবাসায় মূর্ত করে তোলেন–

"ভোরের বাতাস তুমি যদি জেনেভামুখী হও
তবে আমার আরজ পৌঁছে দিও জাতিপুঞ্জের কাছে
ওরা বেচে দিয়েছে কৃষককে, তার চাষের জমিকে
তীর তীর করে বয়ে চলা নদী আর উপত্যকাকে
বেচেছে মানুষকে একেবারে পানির দরে।"[৪২(পৃ:-১৯৫)]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী ইকবাল মুসলিম কনফারেন্সের সম্মেলনে আলোয়ার রাজ্যের মুসলমানদের সমস্যা বিবৃত করেন। পরবর্তীতে ভাইসরয় লর্ড ওয়েলিংটনের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। স্মারকলিপিতে তিনি রাজ্যের মুসলমানদের সমস্যা সমাধানের আহ্বান জানান। পরিণতিতে আলোয়ার রাজ্যের মুসলমানদের সকল সমস্যা ও মহারাজার নিপীড়ন দূরীভূত হয়।

১৯৩১ সালে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সহযোগিতা ও ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ ভারতের জন্যে একটি শাসনতন্ত্রের রূপরেখা প্রণয়নের লক্ষ্যে সরকার তখন ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে গোল টেবিল বৈঠকের আয়োজন করে। ইকবাল এ বৈঠকে আমন্ত্রিত হন এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও পালন করেন। এ সময় (১৯৩১ সালের ১৫ ডিসেম্বর) তিনি লর্ড লেমিংটনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হাউস অব কমনসের এক সভায় বক্তৃতাও দেন।

১৯৩৫ সালে মাওলানা জাফর আলী খান ও আহরার দল আহমদীয়াদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। এ সময় ইকবাল বিভিন্ন বক্তৃতা-বিবৃতীতে আহমদীয়া মতবাদের তীব্র সমালোচনা করেন এবং আহমদীয়া সম্প্রদায়কে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হিসেবে ঘোষণার দাবীকে জোরালো সমর্থন করেন।

এ সময় ভারতের মুসলমানদের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগ আভ্যন্তরীণ কোন্দল ও রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ফলে বিভিন্ন দল ও উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১৯৩৬ সালে ইকবাল পাঞ্জাব মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ডের সভাপতি নিযুক্ত হন। একই সালের ১২ই মে ব্যারিস্টার মিয়া আবদুল আজিজের বাসভবনে মুসলিম লীগের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে ইকবাল সভাপতিত্ব করেন। পাঞ্জাব মুসলিম লীগের পুনর্গঠনের লক্ষ্যে বৈঠকে এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং পরিশেষে ইকবাল সর্বসম্মতিক্রমে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। উল্লেখ্য, আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষে কায়েদে আযম ইকবালকে মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারী বোর্ডের সদস্যও মনোনীত করেন। এ সময় লাহোরের শহীদগঞ্জ মসজিদ মুসলমানদের জন্যে এক অপরিসীম উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মসজিদটি ছিল শিখদের দখলে এবং মুসলমানরা আইনানুগ পন্থায় এটি উদ্ধারের চেষ্টা চালিয়ে আসছিল। ২৬ জানুয়ারি, ১৯৩৮ সালে লাহোর হাইকোর্টের এক রায়ে মসজিদ পুনরুদ্ধরের দাবী অস্বীকৃত হলে মুসলমানরা সরাসরি জিহাদের ডাক দেয়। এক পর্যায়ে ইকবাল মুসলমানদের এ বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেয়ার প্রস্তাব দেন এবং মসজিদ পুনরুদ্ধারের জিহাদে শহীদ হতে যারা ইচ্ছুক তাদের সাথে কাজ করতে উৎসাহ দেখান।

আমাদের কাছে এখন স্পষ্ট হবে, ১৯২৬ থেকে ১৯৩৮ এ সময়ের মধ্যে ইকবাল মুসলমানদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিটি আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। তথাপি একটি ধারণা প্রচলিত আছে, রাজনৈতিক অঙ্গনে ইকবালের ভূমিকা তেমন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত নয়। একথা সত্য, সমকালের স্বার্থসন্ধানী দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদদের মত তিনি ছিলেন না। সংগত কারণেই তাদের অবস্থান দখল করবার মতো সুযোগ তাঁর ভাগ্যে ঘটেনি, কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, ভারতীয় মুসলমানদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণে তার অবদান খাটো করে দেখবার কোনই অবকাশ নেই।

১৯৩৪ সালে তিনি দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে আইন ব্যবসা ত্যাগ করেন। যদিও পরবর্তীতে সাময়িক উপশম হয়। ১৯৩৬ সালের শীতে ইকবাল পুনরায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। বিছানা ছেড়ে কয়েক কদম এগিয়ে যাওয়ার শক্তিও তিনি প্রায় হারিয়ে ফেলেন। এ বছরই আঞ্জুমান-ই হিমায়েত-ই-ইসলামের একটি অনুষ্ঠানে শেষবারের মতো তিনি জনসমুক্ষে উপস্থিত হন। উল্লেখ্য, এ সংগঠনটির মঞ্চ থেকেই ইকবাল প্রথম কবি হিসেবে জনস্বীকৃতি পেয়েছিলেন।

১৯৩৭ সালে ইকবালের দৃষ্টিশক্তি এতো কমে যায় যে, তিনি পড়া ও লেখা উভয়ই ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। ১৯৩৮-এর শুরুতে ইকবাল শেষবারের মতো ইসলাম ও ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ নিয়ে মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানীর সাথে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। এ সময় ইকবালের শরীর এত দুর্বল হয়ে গিয়েছিল যে, বুঝাই যাচ্ছিল তাঁর সময় শেষ হয়ে আসছে। সবশেষে ১৯৩৮ সালের ২১ এপ্রিল সকাল বেলায় ইসলামী পুনর্জাগরণের এই মহান সৈনিক এবং মুসলিম ভারতের দীপ্তিমান জ্যোতিষ্ক ইন্তেকাল করেন।

ইকবাল রচনাবলী :

ইকবাল ছিলেন মুক্তছন্দের কবি ও লেখক। গদ্য ও পদ্য উভয় রচনায়ই তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। বিভিন্ন বিষয়ের উপর তিনি লেখালেখি করেছেন। অর্থনীতির মত জটিল বিষয় থেকে শুরু করে আধ্যাত্মিকতার মতো বিমূর্ত বিষয় পর্যন্ত। গ্রন্থ রচনা করা ছাড়া তিনি বিস্তর প্রবন্ধ লিখেছেন। রাজনৈতিক বিবৃতি তৈরি করেছেন এবং প্রয়োজনে তাঁকে সাক্ষাৎকারও দিতে হয়েছে। এছাড়া ইসলামের অতি আধুনিক ব্যাখ্যাদাতা হিসেবে তাঁকে যোগাযোগ রাখতে হয়েছে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সাথে। ধর্মীয় নেতা, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ ও পণ্ডিত-বুদ্ধিজীবীদের সাথে তিনি আজীবন চিঠিপত্র বিনিময় করেছেন। ইকবাল রচনাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে সন্নিবেশিত হলো–

১. ইলমুল ইকতিসাদ : অর্থনীতির উপর লেখা উর্দু ভাষার প্রথম পুস্তক। লাহোর সরকারী কলেজের সহকারী অধ্যাপক থাকাকালীন ১৯০৩ সালে ইকবাল এটি রচনা করেন। বইটিতে ইকবাল অর্থনীতির বিভিন্ন বিষয় যেমন– ভূমি, শ্রম, পুঁজি, লভ্যাংশ, বেতন, রাজস্ব, সুদ, জনসংখ্যা ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেন।

২. তারিখ-ই-হিন্দ (হিন্দুস্তানের ইতিহাস) : এই পুস্তকটি ইকবাল ও লাহোর গভর্ণমেন্ট কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক লালা রাম প্রাসাদ যৌথভাবে রচনা করেন। ১৯১৩ সালে প্রকাশিত গ্রন্থটিতে ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে।

৩. আসরার-ই-খুদী : আসরার-ই-খুদী ইকবালের প্রথম ফার্সী কাব্যগ্রন্থ। যা ১২ সেপ্টেম্বর ১৯১৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এটি একটি মসনভী কাব্যগ্রন্থ। পানিপথের প্রসিদ্ধ সুফী সাধক হযরত বু-আলী শাহ কলন্দর পানিপথীর ফার্সী মসনভীর অনুকরণে পিতার নির্দেশে ইকবাল এটি রচনা করেন। বইটিতে ইকবাল তাঁর খুদী দর্শনের প্রকৃতি নিরূপণের চেষ্টা করছেন। তিনি এখানে প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত খুদী ও তার ব্যাখ্যাত খুদীর মধ্যে পার্থক্য চিত্রায়িত করেছেন। যদিও প্রচলিত অর্থে খুদী অর্থ অহমিকা ও ঔদ্ধত্য বুঝায় কিন্তু ইকবাল বুঝাতে চেয়েছেন খুদীই মানবের ক্রমাগত সৃষ্টিশীলতার প্রতীক।

৪. রমূযে বেখুদী : ১৯১৮ সালে বইটি প্রকাশিত হয়। যদিও এটির সূচনা হয় ১৯১৬ সালে এবং সমাপ্ত হয় নভেম্বর, ১৯১৭ সালে। প্রকৃত পক্ষে এ নতুন কবিতা সংকলন ছিল আসরার-ই-খুদীরই একটি ক্রমসম্প্রসারিত অংশ। খুদীর যে ব্যক্তি অস্তিত্ব তার সামাজিক রূপায়ন সম্ভব মিল্লাতের মধ্যে। ইকবালের ধারণা মিল্লাতেরও আছে ব্যক্তির মতই একটি খুদী। এ হলো সকলের সমন্বিত খুদীর একটি চিত্ররূপময় কারুকার্য। পরবর্তীকালে দু'টি কাব্যগ্রন্থ অসরার-ও রমূয নামে একই সাথে প্রকাশিত হয়। রমূযে বেখুদতে ইকবাল এক আন্তর্জাতিক ইসলামের চিত্র উন্মোচন করেছেন। রমূযে বেখুদীর অনুবাদক প্রখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ আর্থার জন আর্বারীর ভাষায়– He was in search of a caliphat centre to which 300,000,000 Muslims of the world could gravitate spiritually and palitically.[৪২(পৃঃ-২০১)]

৫. পায়াম-ই-মাশরিক : ২২২ পৃষ্ঠা সম্বলিত ফার্সী কাব্যগ্রন্থ 'পায়ামে মাশরিক' বা প্রাচ্যের পয়গাম বইটি ১৯২৩ সালে প্রকাশিত হয়। এসময় ইকবাল কবি হিসেবে সর্বজন খ্যাতি অর্জন করেছেন এবং তাঁর কবিতাশিল্প

পূর্ণ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। তিনি তাঁর এ কাব্যে যেমন পাশ্চাত্য দর্শনের অন্তরঙ্গ চিত্র উন্মোচন করেছেন, পাশাপাশি প্রাচ্যের জ্ঞান-ভাণ্ডার বিশেষত কুরআনী চিন্তার ফসলকেও তুলে ধরেছেন। এ কাব্যগ্রন্থ মূলত প্রসিদ্ধ জার্মান কবি গ্যাটের West ostlicher Divan-এর অনুসরণে এবং প্রতিউত্তরে রচিত। ভূমিকায় ইকবাল এ কাব্য রচনার পটভূমি ব্যাখ্যা করেছেন এবং পাশ্চাত্য জ্ঞানের ভাণ্ডারে গ্যাটের অসামান্য অবদানের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে জার্মানীতে গড়ে ওঠা ওরিয়ান্টালিস্ট আন্দোলনের উত্থান ও বিকাশের একটি চিত্রও পেশ করেছেন যা কিনা গ্যাটেকে তার বিখ্যাত ডিভান রচনায় অনুপ্রাণিত করেছিল।

৬. বাঙ্গ-ই-দারা (কারাভানের ডাক) : এটি ইকবালের উর্দূ কবিতার সংকলন। ইকবালের কবি জীবনের শুরু উর্দূ কবিতার হাত ধরে। উর্দূতেই তিনি রচনা করেছিলেন তাঁর শ্রেষ্ঠ দেশাত্মবোধক এবং জনচিত্তে আগুন ধরানো কবিতাসমূহ। কিন্তু উর্দূতে রচিত তাঁর কবিতাসমূহ গ্রন্থিত হতে বেশ সময় লেগেছিল। সবশেষে ভক্তদের পুনঃ পুনঃ দাবীর মুখে ইকবাল তাঁর প্রাথমিক জীবনের কবিতাসমূহ ১৯২৪ সালে বাঙ্গ-ই-দারা নামে প্রকাশ করেন। কাব্যটির তিনটি অংশ। প্রথম অংশের কবিতাসমূহ ১৯০৫ সালের পূর্বে লেখা, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর শ্রেষ্ঠ দেশাত্মবোধক কবিতাসমূহ। দ্বিতীয় অংশের কবিতা ১৯০৫ থেকে ১৯০৮ সালের মধ্যে লেখা। এগুলোর মধ্যে ইকবালের প্রকৃতিপ্রীতি সুস্পষ্ট। শেষাংশে রয়েছে ইসলামী অনুভূতিতে আচ্ছন্ন কবিতাসমূহ যা ১৯০৮ সালের পরে লেখা হয়েছিল।

৭. যবুর-ই-আযম : ১৯২৭ সালে ফার্সী কবিতার এ সংকলন প্রকাশিত হয়। এর দু'টি অংশ। প্রথম ভাগে রয়েছে কিছু ক্ষুদ্র কবিতা ও গীত এবং দ্বিতীয় অংশের নাম গুলশান-ই-রাজ-ই-জাদীদ (রহস্যাবৃত নতুন গোলাবকুঞ্জ)। সুফী কবি মাহমুদ শাবিস্ত্রীর সুপ্রসিদ্ধ মাসনবী গুলশান-ই-রাজের (রহস্যাবৃত গোলাবকুঞ্জ) অনুকরণে ইকবাল তাঁর এ মাসনবী রচনা করেন। মাসনবীতে ইকবাল তাঁর বিশিষ্ট দার্শনিক ভঙ্গিতে বর্তমান পৃথিবীর সমস্যাবলীর আলোকে কিছু উচ্চাঙ্গের প্রশ্ন সাজিয়েছেন এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে সেগুলোর তিনি উত্তরও দিয়েছেন। এছাড়া এ কাব্যে গ্রন্থিত হয়েছে 'বন্দেগী নামা' নামে আর একটি ছোট মাসনবী, যেখানে ইকবাল দাসত্ব ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে মানবতাকে সংগ্রামের ডাক দিয়েছেন। স্বাধীনতাবিহীন জাতির কাছে ইকবাল পেশ করেছেন মুক্ত মানবের সৃষ্টিশীল চিত্র। ধারণা করা হয়ে থাকে যবুর-ই-আযম কাব্যে ইকবালের গীতি কবিতাসমূহ চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে। কোন কোন লেখক মনে করেন ইকবালের নিজের মতেই এ কাব্য হলো তাঁর শ্রেষ্ঠ ফার্সী কবিতার সংকলন।

৮. Reconstruction of Religious Thought In Islam : ইকবালের বিশ্বনন্দিত বক্তৃতার সংকলন। এ বক্তৃতা হলো তাঁর সংস্কারক ও দার্শনিক মনের প্রোজ্জ্বল চিত্র। ইসলামী সমাজদেহ থেকে আপতিত জঞ্জাল সরিয়ে তার উপর কল্যাণ প্রযুক্ত লাবণ্য বিস্তারের যুগন্ধর ভূমিকা নিয়ে ইকবাল এখানে উপস্থিত। এ বক্তৃতার বিষয়বস্তু প্রস্তুত করতে তাঁর প্রচুর সময় ও শ্রমের প্রয়োজন হয়েছিল। ১৯২৮ সালের ৫ ডিসেম্বর পুরনো বন্ধু মীর গোলাম ভীক নৈরাংকে লেখা এক চিঠিতে ইকবাল এ বক্তৃতার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন এভাবে–

> The audience for these lectures are those Muslims who are influenced by western philosophy and are desirous of interpreting Islamic Philosophy in terms of western philosophy. If there are certain defects in the old ideas, they should be removed. My job in this matter is constrective and creative, but in doing so I have kept the best traditions of Islamic philosophy foremost in my mind.[৪২](পৃ:-২০২)

৯. জাভিদনামা (শ্বাশ্বত গাথা) : দান্তের ডিভাইন কমেডির অনুসরণে ইকবাল এটি রচনা করেন। জাভিদনামা প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সালে। সাহিত্য জগতে পারলৌকিক ও অতিপ্রাকৃতিক স্তরে পরিভ্রমণ হলো

কবি ও দার্শনিকদের চিরদিনের খেয়াল। ইকবালও তেমনি জীবন রহস্য, অস্তিত্ব, অনস্তিত্বের সমস্যা, খোদা, চিরন্তনতা, সময় প্রভৃতি সমস্যার মুখোমুখী হয়ে আধ্যাত্মিক পৃথিবীতে যাত্রার সিদ্ধান্ত নেন এবং সেখানে অবস্থান করেছেন এমন কিছু ব্যক্তিত্বের সাথে যারা কিনা পৃথিবীর ইতিহাসে স্বীয় কর্ম ও প্রতিভার ছোঁয়ায় স্থায়ী আবেদন রেখে গেছেন। তাদের সাথে ইকবালের আলোচনা কেন্দ্রীভূত হয় জীবনের নানা সমস্যা ও তার সমাধানের উপায় নিয়ে। খাজা সুজার কাছে লেখা ১৯৩১ সালের ২০ জানুয়ারি এক চিঠিতে ইকবাল তাঁর জাভিদনামার একটি রূপকল্প হাজির করেছেন–

> My latest poem is going to be Javid Nama which probably world consist of two thousand verses. It is not as yet complete and would most likely be finished in March. This is a sort of Divine Comedy written according to the pattern of Rumi's Mathnawi, Its introduction will be very intersting and would contain many things for India, Persia and for that matter, for the entire Muslim world.[৪২(পৃ:-২০৩)]

১০. বাল-ই-জিব্রীল (জিব্রাইলের ডানা) : বাঙ্গ-ই-দারা প্রকাশিত হবার পর ইকবাল পুনরায় ফার্সী কবিতার দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। তিনি নিজেও মনে করতেন, তাঁর দার্শনিক অনুভূতি ও চিন্তা বিবৃত করবার জন্যে ফার্সী হলো উত্তম মাধ্যম। কিন্তু আধুনিক মুসলিম ভারতের ভাষা হিসেবে উর্দূর জনপ্রিয়তা যেহেতু বেড়ে চলেছিল এবং তিনি নিজেও ছিলেন ভারতীয় মুসলমানদের কল্যাণকামী, তাই তিনি নতুন করে উর্দূর দিকে নজর দেন এবং ১৯৩৫-এ তাঁর উর্দূ কাব্যগ্রন্থ বাল-ই-জিব্রীল প্রকাশিত হয়। অনেকের ধারণা, বাল-ই-জিব্রীল ইকবালের শ্রেষ্ঠ উর্দূ কবিতার সংকলন। কল্পনার প্রসারতায়, বর্ণনার চিত্তহারী মাধুর্যে, শব্দ চয়ন ও সৌন্দর্যে কবিতাসমূহ মধুরতর হয়ে উঠেছে। কাব্যের বিষয়বস্তু কেন্দ্রীভূত হয়েছে খুদী, মোমিন, আযাদী, জিহাদ, ইশক প্রভৃতির উপর। এছাড়াও রয়েছে সাকীনামা নামে একটি ছোট মসনবী যাতে বিবৃত হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী ও শোষণ নির্ভর সমাজ ব্যবস্থার দুর্গতি। পাশাপাশি মুসলমানদের বিপর্যয়ের চিত্র উন্মোচন করে তিনি তাদের এ ঘুম থেকে জেগে ওঠারও আহ্বান জানিয়েছেন। এরপর রয়েছে রুমী ও তাঁর ভারতীয় সাগরিদের (ইকবালের) মধ্যে একটি কাব্যিক কথোপকথন যার মধ্যে উজ্জীবিত হয়েছে ইকবালীয় চিন্তার ফসল। বাকী কবিতাসমূহও চিন্তা ও প্রকাশভঙ্গিতে মনোরম। বিশেষ করে মুসলিম স্পেন বিষয়ক কবিতা ও খোদার সম্মুখে লেনিন এ এক অপূর্ব ভঙ্গিমায় জাজ্বল্যমান।

১১. পাস চে বায়াদ কারদ আয় আকওয়ামে শারক মা' মুসাফির : ইকবালের ফার্সী কবিতার সংকলন 'পাস চে বায়াদ কারদ আয় আকওয়ামে শারক (তবে কি করা উচিত, হে প্রাচ্যের জাতিসমূহ?) প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালের অক্টোবর মাসে। মসনবী পাস চে বায়াদ কারদ এর কিছু কপি বিক্রি হওয়ার পর তার সাথে এর পূর্বে প্রকাশিত চল্লিশ পৃষ্ঠা সম্বলিত সংক্ষিপ্ত মসনভী 'মুসাফির' কে তার সাথে একত্রে বাঁধাই করে একটি সমন্বিত গ্রন্থের রূপ দেয়া হয় এবং এর নামকরণ করা হয় 'পাস চে বায়াদ কারদ আয় আকওয়ামে শারক মা' মুসাফির- যা ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত হয়। ইকবালের প্রতি রুমীর উপদেশের মধ্য দিয়ে কাব্যটির শুরু। রুমী ইকবালকে নির্দেশ দিচ্ছেন প্রাচ্যবাসীকে ধর্ম ও রাজনীতির প্রকৃত গুরুত্ব অনুধাবন করাতে। সে পরিপ্রেক্ষিতেই ইকবাল এ কাব্যে দু'টি অংশ বিরচন করেন– হিকমত-ই-কলিমী (মুসার প্রজ্ঞা) এবং হিকমত-ই-ফিরাউনী (ফিরাউনের প্রজ্ঞা)। এর পরে বিবৃত হয়েছে ইকবালের বিচ্ছিন্ন কতগুলো চিন্তা ভাবনার ফসল; যেমন খোদার একত্ব, ইসলামী তাসাউফ, আযাদী, ইসলামী জীবন ব্যবস্থা, আধ্যাত্মিকতার সমস্যা, মানবতার ঐক্য ইত্যাদি।

গ্রন্থের শেষের দিকে ইকবাল আরবদেরকে সম্বোধন করে বলেন, তারা যেন পাশ্চাত্যের প্ররোচনায় পড়ে একতার বন্ধন ছিন্ন করে বিভিন্ন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে নিজেদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তিকে খর্ব না করে; বরং নিজস্ব প্রাচীন সমৃদ্ধ কৃষ্টি ও সভ্যতা থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে মুসলিম সমাজকে নতুনভাবে ঢেলে সাজায়। একইভাবে তিনি প্রাচ্যের লোকদের প্রতি জোর দিয়ে বলেন, তারা যেন পাশ্চাত্যের অনুকরণ বর্জন করে নিজস্ব আধ্যাত্মিক সম্বল থেকে শক্তি সঞ্চয় করে নিজেদের ব্যক্তিগতও সামাজিক জীবন গড়ে তুলে।

১২. যরবে কলীম (প্রজ্ঞার আঘাত) : এই বইটিও ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয়। এর একটি উপশিরোনাম (sub title) হলো এলান-ই-জং দাউর-ই-যুর কি খিলাফ (বর্তমান যুগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা)। নামকরণের মধ্যেই বইটির মূল প্রতিপাদ্য নিহিত। বিভিন্ন শিরোনামে বইটি বিভক্ত, যেমন ইসলাম ও মুসলমান, শিক্ষা, নারী, সাহিত্য ও সুকুমার কলা, রাজনীতি, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ইত্যাদি। কবিতাগুলো ছোট কিন্তু বর্তমান সভ্যতা, বিশেষত পাশ্চাত্য সভ্যতার সমালোচনায় পরিপূর্ণ।

১৩. আরমুগান-ই-হিজায (হিজাযের সওগাত) : ইকবালের মৃত্যুর পর এ কাব্য প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে গ্রন্থিত হয়েছে ফার্সী কবিতাসমূহ এবং শেষ দিকে কিছু উর্দূ কবিতা। ফার্সী কবিতার অধিকাংশই ক্ষুদ্রাকার কিন্তু এগুলো হচ্ছে ইকবালীয় চিন্তার এক একটি ফুল্লকুসুম। উর্দূ কবিতার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ইবলিস-কি মজলিস-ই-শুরা। এর মধ্যে বিধৃত হয়েছে বর্তমান দুনিয়ার অস্থির রাজনৈতিক চিত্র এবং মুসলিম মিল্লাতের উপর তার অশুভ প্রভাব। এরপরে রয়েছে বন্ধু স্যার রস মাসুদের অকাল মৃত্যুতে ইকবালের একটি শোকগাঁথা যা পরবর্তীতে আবেগের অবশিষ্ট প্রকাশে পরিণত হয় একটি উচ্চাঙ্গের দীর্ঘ কবিতায়। এ কবিতায় ইকবাল তাঁর খুদী, মোমিন ইত্যাদি দর্শনজাত উপলব্ধিকেও অন্তর্ভুক্ত করেন।

মূলত: ইকবাল ১৯০৫ সালের আগেই রচনাকর্মে হাত দেন। ওই সময়ে তিনি উর্দূতে এমন কিছু চিত্তাকর্ষক কবিতা রচনা করেন যেগুলোতে তাঁর প্রকৃতি প্রীতি ও দেশাত্মবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯০৫-০৮ সালে ইউরোপে অবস্থানকালে তিনি বিশ্ব ইসলামাবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। ১৯০৮ থেকে ১৯২৪ সালে পর্যন্ত তিনি যেসব কবিতা রচনা করেন সেগুলোর মূল বিষয় ছিল ইসলামের সমকালীন অবস্থার ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনা। ১৯২০-এর দশকে তার কবিতায় লক্ষ্য করা যায় আরো অনুধ্যানিক গভীরতা। এ পর্যায়ে তিনি আগ্রহী হয়ে উঠেন মানুষের ব্যক্তিত্ব (খুদী), স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার প্রতি।

রাজনৈতিক চিন্তাধারার উৎস :

আল্লামা ইকবাল রাজনীতি সম্পর্কে স্বতন্ত্র কোনো গ্রন্থ রচনা করেন নাই। তথাপি একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, তাঁর সকল রচনাই বিভিন্ন রাজনৈতিক তত্ত্ব বিশ্লেষণে ভরপুর। বস্তুত ইকবাল একজন আদর্শবাদী রাজনীতির দোষ-ত্রুটি সংশোধন এবং আল্লাহর বিধানের স্থায়ী বুনিয়াদে রাজনীতিকে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি কখনই নিশ্চিন্ত ও নির্বিকার ছিলেন না। এই জন্যে বলতে হয় : ইকবালের কাব্য ও রাজনীতি দান্তের কাব্য ও ফাবিন্সের রাজনৈতিক চিন্তাধারার মতই পরস্পর বিজড়িত ও অবিচ্ছিন্ন।

ইকবাল যে যুগে জন্মগ্রহণ করেছেন, তখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে মানুষের জীবন ও জীবনের বিভিন্ন বিভাগে এক অস্বাভাবিক ও বিস্ময়কর পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। এক দিকে প্রাচ্যের রাজতন্ত্র শোষণ-পীড়ন ও নিষ্ঠুর স্বৈরাচারের পতন, অপর দিকে প্রাচ্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইউরোপীয় সাম্রাজ্য বিস্তারের সাথে সাথে বিভ্রান্তিকর চিন্তাধারার প্রবল আধিপত্য। প্রাচ্যের-বিশেষত মুসলিম জাতির মনন ও দৃষ্টি পাশ্চাত্যের স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারমূলক মতাদর্শের উদ্দাম ঝটিকার সম্মুখে শুষ্ক তৃণখণ্ডের ন্যায় মৃহ্যমান হয়ে পড়েছিল। চারদিকে এক মহাবিপর্যয় ও জাতীয় চরিত্রের মেরুদণ্ড চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়ার উপক্রম প্রায়। গোলামী মনোবৃত্তির চরমে গিয়ে প্রাচ্যবাসীর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসরণ একটি অপরিহার্য কর্তব্যে পরিণত হয়েছিল।

ইকবাল যদিও পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদদের সম্মুখে শিক্ষার্থী হিসেবে নতজানু ছিলেন এবং পশ্চিমী সভ্যতার ভাণ্ডার হতে আকণ্ঠ মধু পান করেছিলেন; কিন্তু একথা সত্য যে, ইকবাল ইউরোপীয় চিন্তাধারা ও মতবাদের যত ঘনিষ্ঠতর পর্যবেক্ষণের সুযোগ পেয়েছেন, পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি তাঁর মন ততই বিক্ষুব্ধ ও বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল। আর মুগান-ই-হিযায' গ্রন্থে কবির পরিণত বয়সের চিন্তাধারা স্বতস্ফূর্ত ভাবে পরিস্ফূটিত হয়েছে; তিনি বলেন :

Dhaka University Institutional Repository

می از میخانه مغرب چشیدم
بجان کن که درد سر خریدم
نشستم بانکویان فرنگی
از ان بی سود تر روزی ندیدم
"পশ্চিমের শরাবখানায় আমি পান করেছি রঙিন সুরা,
তাতে লাভ হয়নি কিছুই আমার শরী-পীড়া ছাড়া।
পশ্চিমী পূর্ণাত্মাদের সাহচর্য লাভ করেছি আমি দীর্ঘকাল,
নিরর্থক সময় কাটেনি আমার তার চেয়ে আর কোনদিন।[৪৩](পৃ:-২৩)

প্রাচ্যবাসীর নানাবিধ চরম দূরবস্থা ও নিত্য-নৈমত্তিক দুঃখ-দুর্দশার তীব্র অনুভূতি ধীরে ধীরে ইকবালের চিন্তাধারায় এক নবতর অধ্যায়ের সূচনা করে।

মূলতঃ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের চিন্তাধারার স্বাধীন তুলনামূলক আলোচনা এবং পারস্পরিক মিশ্রণ ও সংযোগের ফলে এক নতুন রাজনৈতিক দর্শন ইকবালের কাব্য শৈলীর মাধ্যমে দুনিয়ার বুকে বিস্তার লাভ করে। তাঁর এই রাজনৈতিক মতাদর্শ শুধুমাত্র প্লেটো (Plato), এরিস্টটল, মেকিয়াভেলী, হাকিন্স, কান্ট ও রুশোর জ্ঞান-ভাণ্ডার থেকেই সংগৃহীত হয় নাই, তার মর্মমূলে সবচেয়ে বেশী উপাদান ও অনুপ্রেরণা যোগিয়েছে কুরআন হাদীস, গাজ্জালী, আল-রাযী, মাওয়ার্দী, নিজামুল-মুলক, ইবনে হাজম ও ইবনে খালদুনের চিন্তাধারা ও মতবাদ। শুধু তাই নয়, প্রাচ্যের রাজনৈতিক পরিবেশ ও সামাজিক আবেষ্টনীও এক বিরাট অংশ জুড়ে আছে এর সৃষ্টি ও সংগঠনে।

ইকবালের রাজনৈতিক মতবাদের কয়েকটি অংশ রয়েছে এবং প্রতিটি অংশেই তিনি কোনো না কোনো সমসাময়িক ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ কর্তৃক প্রভাবিত হয়েছেন। বিগত শতকের শেষের দিকে গণতন্ত্র (Democracy) -কে একটি সর্বোত্তম ও নিখুঁত শাসন নীতি বলে মনে করা হতো। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগেই ইউরোপের কোনো কোনো দার্শনিক এ মতবাদের উপর তীব্র আক্রমণ করেছেন। তন্মধ্যে নিটশে, লিবন, ফনট্রয়টস্কী, শপিংলার, স্ট্যাডার্ড, ম্যাগডোগল প্রমুখ চিন্তাবিদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইকবালের প্রথম যুগের জাতীয় দর্শন এবং গণতান্ত্রিক মতবাদ বিগত শতকের ইউরোপীয় চিন্তাধারার অত্যুগ্র প্রভাবের ফল, সন্দেহ নেই। কিন্তু জীবনের শেষভাগে ইকবাল বিশ্বের সকল প্রকার মানব রচিত মতাদর্শের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন এবং পরিণত বয়সে তিনি যা কিছু রচনা করেছেন তার একমাত্র উৎস ছিল ইসলামী ঐতিহ্য ও কুরআন-হাদীস। এই জন্যেই তাঁর পরিণত বয়সের রচনাবলী হতে কুরআন, হাদীস ও ইসলামী ঐতিহ্যের মর্মস্পর্শী ঝংকার অনুরণিত হয়ে উঠে।

রাজনৈতিক চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ ঃ

ইকবাল পাঠকদের মধ্যে সাধারণভাবে এই ধারণা বদ্ধমূল যে, ইকবালের রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রায়শই পরিবর্তিত- বিভিন্ন সময় ও অবস্থার কারণে তাঁর চিন্তাধারার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। তাই আসরারে খুদীর সমালোচনা করতে গিয়ে মিঃ ফরেস্টার লিখেছেন– "ইকবাল চিরদিন একই মতে দৃঢ় ও স্থায়ী থাকতে পারেন নি।"[৪৩](পৃ:-২৫) এই অভিযোগের সমর্থনে সাধারণত বলা হয় থাকে, ইকবাল এক সময় সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রেমে আত্মহারা হয়েছিল এবং ভাবাবেগের আতিশয্যে উচ্ছ্বাসিত হয়ে তিনি তাসবীরে দরদ (تصویر درد), তারানায়ে হিন্দী (ترانه هندی), নয়া শেওয়ালে (نیا شیواله) এবং হিন্দুস্তানী বাঁচ্চু কী কাওমী গীত (ہندوستانی بچون کی قومی گیت) এর ন্যায় ঘোর জাতীয়তাবাদী এবং স্বদেশিকতার উদ্দাম, উন্মাদনা ও ভাবালুতাপূর্ণ কবিতা রচনা করেছিলেন। এরপরই তাঁর চিন্তাধারা ও মতাদর্শে বিপ্লব সূচিত হয় এবং তিনি

সংকীর্ণ স্বদেশিকতার আকর্ষণ ছেড়ে বিলাদে ইসলামী (بلاد اسلامية), তারানায়ে মিল্লী (ترانه ملی), খিতাব জওয়ানানে ইসলাম (خطاب بجوانان اسلام), শিকওয়া ও জওয়াবে শিকওয়া (شکوه و جواب شکوه) এই ধরনের আরো অনেক ধর্মীয় ও প্রকৃত ইসলামী ভাবধারাপুষ্ট কবিতা রচনা করেছেন। এরপর তিনি পুঁজি ও শ্রমের (Capital and Labour) পারস্পরিক দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ প্রচার করেছেন। অতঃপর ফ্যাসীবাদে প্রভাবিত হয়ে Fascism-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। মোটকথা, অভিযোগকারীদের কথা অনুযায়ী ইকবাল এভভবে বারংবার পরিবর্তিত হয়ে নতুন নতুন মতবাদ প্রকাশ করেছেন।

বাহ্য দৃষ্টিতে এই অভিযোগের সত্যতা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু এর মাধ্যমে আমরা এক গভীরতত্ত্ব লাভ করতে পারি। ইকবাল বিশ্বপ্রকৃতির গভীরতর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যেসব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পেরেছিলেন, তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারার পরিণতি ও পরিপক্কতা লাভ করার মূলে সেসবের বিশেষ প্রভাব ছিল। এতে সন্দেহ নেই, এককালে ইকবাল ভারতের কোনো কোনো জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু তাঁর এই মতবাদ গঠনের মূলে দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং যেসব ইউরোপীয় পণ্ডিত সাধারণত জাতীয়তা, গণতন্ত্র ও দেশপ্রেমকে নিজেদের রাজনৈতিক চিন্তা-গবেষণার অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে গ্রহণ করেছেন, তাঁদের গ্রন্থাবলী অধ্যায়নই অধিকতর দায়ী।

একথা সত্য যে, পশ্চিমী সভ্যতার চোখ ঝলসানো চাকচিক্যের সম্মুখে বহু ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিও চক্ষু অবনত করতে বাধ্য হয়েছেন। আল্লামা ইকবালও পশ্চিমী চিন্তাধারার মায়া-মরীচিকার মোহে বিমুগ্ধ হয়েছিলেন অনেক দিন। কিন্তু পরক্ষণে প্রাচ্যের শিক্ষা-দীক্ষায় গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন, ইসলামী ও প্রাচ্য তমদ্দুনের মর্মকথার বলিষ্ঠ অনুভূতি, ইউরোপ ভ্রমণ এবং পশ্চিমী তমদ্দুনের নিকটতর পর্যবেক্ষণ, ব্যাপকতর অধ্যয়ন ও গবেষণা বিশ্লেষণ অচিরেই পাশ্চাত্যের বাহ্যিক রূপের নেশা কাটতে সক্ষম হয়েছে। ইকবাল নিজেই তা স্বীকার করে বলেন :

وائی برسادکی ماکه فسونش خوریدم

رهزنی بود کمین مرده ره ادم زد

"ধিক আমার সরলতায়!
প্রতারিত হয়েছি আমি
পশ্চিমী সভ্যতার ইন্দ্রজালে,
মানুষের চলার পথের গোপন বাঁকে
লুকিয়ে থেকে তারা করে রাহাজানি।[৪৩](পৃ:-২৬)

ইউরোপ পরিদর্শনের পূর্ব পর্যন্ত পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি ইকবালের মনে একটি তীব্র আকর্ষণ কাজ করেছিল। কিন্তু যখন তিনি ইউরোপকে নিজ চক্ষে প্রত্যক্ষ করলেন, ঠিক তখনই তাঁর মনে ও চিন্তারাজ্যে পশ্চিমী সভ্যতার প্রতি ভীষণ বিতৃষ্ণা ও বিদ্বেষভাব জেগে উঠে এবং তা তাঁর মানসপটে চিরতরে বদ্ধমূল হয়ে যায়। ইকবাল চারপাশের সকল সক্রিয় ও গতিময় শক্তি এবং অতীত ও ভবিষ্যতের সকল রাজনৈতিক-তামদ্দুনিক বিষয়ের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নিজের চিন্তা-গবেষণার একটি সীমা ও কেন্দ্রবিন্দু ঠিক করে নিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁর সকল শক্তি নিয়োজিত করেছেন তাঁর আদর্শ প্রচারের কাজে। সময়ের প্রতিটি আবর্তনের সাথে যুগের যে নতুন বাতাস বইছে, বর্তমান সভ্যতা যে বৈচিত্র- যে রং-আকার ও রূপ ধারণ করেছে ইকবাল তাঁর পূর্ব নির্ধারিত মাপকাঠি দিয়েই তার বিচার-বিশ্লেষণ করতেন। ফলে কোথাও স্ববিরোধী মত প্রকাশ হলেও সেজন্যে তিনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নন।

একথা অস্বীকার করার নয় যে, জীবন ও জগতকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার ব্যাপারে ইকবাল ক্রমবিকাশের নীতি অবলম্বন করেছেন। বস্তুত: নবী ও কবির মধ্যে এখানেই পার্থক্য। নবী বিশ্ব প্রকৃতির

গভীরতর তথ্য সম্পর্কে পূর্বেই পূর্ণ অবগত থাকেন; কিন্তু কবির পক্ষে ঘটনার আবর্তন ও কাল-প্রবাহের ঘাত-প্রতিঘাতে নিজের চলার পথ বেছে নেয়া এবং নিজের চূড়ান্ত লক্ষ্যপানে অব্যাহত গতিতে অগ্রসর হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। উপরন্তু এসবের সঠিক বিশ্লেষণ ও ফলাফল নির্ধারণের জন্যে একটি বাহ্যিক কার্যকারণের একান্তই প্রয়োজন। অবশ্য এটিও অনস্বীকার্য যে, কবির অনুভূতি সাধারণ মানুষের অনুভূতির চেয়ে অধিকতর তীব্র, তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্মগামী হয়ে থাকে। ইকবাল ইউরোপ গমনের পূর্বে ভারতের স্বদেশী আন্দোলনে প্রভাবিত হয়েছেন; কিন্তু পাশ্চাত্য জীবনধারা ও পশ্চিমী গণতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ দোষত্রুটি, কুটিলতা ও পংকিলতা তাঁর নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল গভীর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে। ফলে তিনি নিজেকে সংশোধিত করারও প্রয়াস পেয়েছিলেন।

রাজনৈতিক চিন্তাধারার ইসলামী ভাবধারা ঃ

ইকবালের চিন্তাধারার বুনিয়াদ প্রধানত ইসলামের উপর। ১৯৩০ সালে ২৯ ডিসেম্বর নিখিল ভারত মুসলিম লীগ অধিবেশনের সভাপতির ভাষণে ইকবাল বলেন, "আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ ব্যয় করেছি ইসলামের সযত্ন অধ্যায়নে- ইসলামের কানুন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা, তার তমদ্দুন, তার ইতিহাস ও সাহিত্য অধ্যয়নে। আমার মনে হয়, ইসলামের প্রাণবস্তুর সাথে এই অবিরাম সংযোগের ফলে তা আমার উপলব্ধিতে যেভাবে প্রকাশ লাভ করেছে, তার ফলে বিশ্বজনীন সত্য হিসাবে ইসলামের তাৎপর্য সম্পর্কে আমি এক ধরনের অন্তদৃষ্টির অধিকার লাভ করেছি।"[৪৩](মুখবন্ধ)

ইকবালের কাছে ইসলাম প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী নিছক ধর্মানুষ্ঠান পদ্ধতি নয়; বরং এক পূর্ণাঙ্গ ও সম্পূর্ণ জীবন-বিধান। মানব জীবনের কোনো বিশেষ দিকই ইসলামের আওতার বাইরে পড়ে না; তাই রাজনৈতিক দর্শনকেও তিনি এই জীবন দর্শনেরই এক অপরিহার্য অংশ মনে করতেন। এই সুস্পষ্ট ধারণা নিয়েই তিনি জীবনের অন্যান্য দিকের ন্যায় সমভাবে রাজনীতির দিকেও মনোযোগী হয়েছিলেন। ইকবালের মতে 'রাজনীতির মূল রয়েছে মানুষের আত্মিক জীবনের গভীরে' এবং ধর্মকে তিনি মনে করতেন 'ব্যক্তি ও রাষ্ট্র উভয়ের জীবনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি বলে।' আধুনিক দুনিয়ার অধিকাংশ চিন্তাবিদ যখন ধর্মকে রাজনীতি থেকে আলাদা করে নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপারে পরিণত করবার স্বপক্ষে ক্রমাগত প্রচার চালিয়ে এসেছেন, ইকবাল তখন অকুতোভয়ে ঘোষণা করেছেন : "ইসলাম মানুষের একত্বকে আত্মা ও বস্তুর সমন্বয়াতীত দ্বৈতবাদে বিভক্ত করে না। ইসলামের আল্লাহ ও বিশ্বপ্রকৃতি, আত্মা ও বস্তু, উপাসনাগার ও রাষ্ট্র পরস্পরের পরিপূরক।'

সমসাময়িক ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন সমূহের প্রতি কবি-দার্শনিক ইকবালের দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত গভীর ও সুদূর প্রসারী। তখনকার দিনের পাক-ভারত উপমহাদেশের রাজনৈতিক আদর্শ সমূহের প্রভাবে ইসলামের মৌলিক কাঠামো ও প্রকৃতির প্রভাবিত হবার সম্ভাবনা দেখেই কবি রাজনীতির প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগী হয়েছিলেন।

কুরআন মজীদের শিক্ষার আলোকে কবি জাতির পথ-নির্দেশ করে বলেছেন : "সুনির্দিষ্ট আদর্শের আলোকে যতক্ষণ না কোনো জাতি তাদের দৈনন্দিন কার্যকলাপের ক্ষেত্রকে ক্রমাগত প্রদীপ্ত করে তুলে তাদের নিজস্ব অবস্থার পরিবর্তন আনয়ন করার জন্যে উদ্যমশীল হয়, ততক্ষণ আল্লাহ তা'আলা সে জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না। ব্যক্তির নিজস্ব আত্মিক জীবনের আযাদীর উপর সুদৃঢ় ঈমান ব্যতীত কোনো কিছুই অর্জন করা যায় না। একমাত্র এই ঈমানই জাতির দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে তার লক্ষ্যের প্রতি এবং তাঁদেরকে বাঁচিয়ে রাখে চিরন্তন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থেকে।

অন্যান্য দার্শনিকের চিন্তা ও দর্শনের সাথে আল্লামা ইকবারের একটি মৌলিক ও সুদৃঢ় প্রভেদ রয়েছে। ইকবাল কেবল বুদ্ধি আর অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করেন নি; তিনি তার অনুসন্ধান ও চিন্তা প্রক্রিয়ার সাথে

সংযুক্ত রেখেছেন তাওহীদ নামক আদর্শিক বুনিয়াদকে। ব্যক্তি মানুষ এবং মুসলিম সমাজ তথা মুসলিম উম্মাহকে নানা দল উপদলে বিভক্ত হওয়ার আত্মঘাতী সংকট ও ভয়াবহতা থেকে বাঁচানোর জন্যে আল্লামা ইকবাল তাঁর কবিতা ও দর্শনকে যাবতীয় অনাকাঙ্খিত-অনুচিত চিন্তা-বৈকল্য ও চিত্ত-বিক্ষেপ থেকে খুবই সতর্কতার সাথে মুক্ত রেখেছেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে আল-কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ-আনুগত্য বজায় রেখেছেন; তাঁর চোখে, দর্শনে, বীক্ষণে সুরমা করে জড়িয়ে রেখেছেন মদীনার ধূলিকণা। বলেছেন :

"বিনষ্ট হয়েছে কবে মুসলিমের একতা বন্ধন
বল আজ মুসলমান কোন পথে করিবে গমন?
সমস্যা এ সমাধান কর প্রিয় আত্মা রাসূলের
কুরআন বুকেতে যার, কোথায় আজ লক্ষ্য তাদের?"[৩২]

আল্লামা ইকবাল সর্বান্তকরণে মুসলিম মানসকে ঐক্যবদ্ধ, গতিশীল ও সহিষ্ণু করবার জন্যে চিন্তা-সাধনা করেছেন। ক্ষমাহীন কণ্ঠে বজ্রকঠিন প্রতিবাদ করেছেন সংকীর্ণ গোষ্ঠীবাদ, জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। তথাকথিত গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও তিনি ছিলেন সদা সতর্ক। তাঁর ভাষায় :

جلال پادشاهی هوکه جمهوری تماشاهو
جدا هو دین سیاست سی تو ره جاتی هی چنگیزی
"বাদশাহী বিক্রম আর গণতন্ত্রের তামাসা,
ধর্ম-রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হলে
অবশিষ্ট থাকে শুধু চেংগিজী নীতি।"[৪৩](পৃ:-৩৭)
('বালে-জিবরীল' গ্রন্থের 'দুনিয়া ও সিয়াসত' শীর্ষক কবিতাংশ)

ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস হচ্ছে তৌহিদ। তাই ইকবাল রমুয-ই-বেখুদী কাব্য গ্রন্থের সূচনাই করেন তৌহিদের আকিদা প্রচারের মাধ্যমে। তিনি তৌহিদকে মিল্লাতে ইসলামিয়ার মৌলিক ভিত্তি এবং মুক্তির উৎস হিসেবে ঘোষণা করে বলেন :

"আত্মস্থ করেছে আহলে হক
তৌহিদের রহস্যকে
আর এতো কুরআনেরই নির্দেশনা :
যা কিছু আছে আসমান ও জমিনে,
সমর্পিত গোলামের রূপে
সবই হবে হাজির তারই সকাশে।"[১](পৃ:-৮৭)
[রমুযে বেখুদী: ৯১, সূরা ১৯ : ৯৩]

ইকবালের রমুয-ই-বেখুদী কাব্যগ্রন্থের প্রতি ছত্র থেকে এটা পরিস্ফুট হয় যে, তাঁর সমগ্র চিন্তাজগতকে কুরআনের আদর্শ আবিষ্ট করে রেখেছিল। হেদায়াতের এই মূল উৎস থেকে তিনি শুধু কল্যাণের ফসলধারাই সংগ্রহ করেননি; বরং স্বীয় চিন্তা-দর্শনের বাণী উপস্থাপনের সময় অকুণ্ঠ চিত্তে একের পর এক কুরআনের সূত্র উল্লেখ করেছেন এভাবে :

"আমরা মুসলমান; আমরা বংশধর খলিলের
প্রমাণ যদি চাও
তাহলে পড়ো এই মহান আয়াত :
'আপন পিতা ইব্রাহীমের মিল্লাতে হয়ে যাও প্রতিষ্ঠিত।'
আল্লাহই তো তোমাদের নাম
প্রথমেই রেখেছেন মুসলমান

Dhaka University Institutional Repository

আর এই কুরআনও তোমাদের দিয়েছে সেই একই নাম।"[১](পৃ:-৮৭)
(আল-কুরআন ৭৮:২২)

তাওহীদ ও রিসালাতের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আল্লামা ইকবাল স্বয়ং তাঁর বক্তব্যের প্রান্তটীকায় সংশ্লিষ্ট আয়াত উল্লেখ করেছেন অথবা ঐসব ইশারা-ইঙ্গিতের ব্যাখ্যা করেছেন যা আয়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইকবাল তাঁর প্রচারিত চিন্তা দর্শনের ভিত্তি হিসেবে আল কুরআনকে গ্রহণ করার সিদ্ধান্তে ছিলেন অটল। ফলে, কবিতা ও গদ্য রচনার উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর চিন্তাধারা কুরআনের আয়াতের তাৎপর্যের চৌহদ্দি কোনো অবস্থায়ই ডিঙ্গিয়ে যায়নি। তাই এটা নিশ্চিন্তে বলা যায় যে, তিনি স্বকপোলকল্পিত কোনো চিন্তাদর্শন অথবা ভিন্ন কোনো আক্বিদা-বিশ্বাসের রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত ছিলেন।

ইকবাল সার্বজনীন ইসলামী বিশ্বাস ও আদর্শজাত দর্শনকেই বার বার দৃঢ়তার সাথে তুলে ধরেছেন। ব্যক্তি ও উম্মাহর সর্বাঙ্গীন ও সার্বজনীন কল্যাণের মাধ্যমে বিশ্বজনীন কল্যাণের পথ সন্ধান দিয়েছেন আল্লামা ইকবাল।

ইকবালের মতে সমস্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার একমাত্র উৎস স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। সমাজবদ্ধ মানবসমষ্টির কোনো ব্যক্তি বা সংখ্যাগুরু দলই সার্বভৌম কর্তৃত্ব ও প্রভুত্বের অধিকারী হতে পারে না। তিনি বলেন :

سروری زیبا فقط اس ذات ہی ہمتا کو ہی
حکمران ہی بس وہی باقی بتان ازری
"সার্বভৌমত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকার
একমাত্র শাহানশাহ তিনি
লা-শরীক আল্লাহ
আর সব কিছুই আযরের প্রতিমা।"[৪৩](পৃ:-৬৮)

অতঃপর তিনি মানুষের খিলাফাত বা প্রতিনিধিত্বের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম-পদ্ধতিগুলো তাঁর কবিতার মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন। ইকবাল একটি শক্তিশালী সুবিচার প্রবণ ও ন্যায়নিষ্ঠ হুকুমত কায়েম করার জন্যে দৃঢ় ঈমান ও প্রেম অপরিহার্য বলে ঘোষণা করেছেন :

ولایت پادشاهی علم اشیاکی جهانگیری
یه سب کیاهی فقط اك نقطه ایمان کی تفسیرین
"কর্তৃত্ব, রাজশক্তি আর বস্তুবিজ্ঞানের বাহুদুরী
ঈমানের বাস্তব অভিব্যক্তি মাত্র।"[৪৩](পৃ:-৬৯)

হুকুমত ও নেতৃত্ব ইকবালের মতে খিদমত গুজারী অর্থাৎ মানব সেবারই অপর নাম। কিন্তু জীবনের সকল প্রকার কাজের বুনিয়াদ 'প্রেমের' উপর প্রতিষ্ঠিত না করলে মানুষের মধ্যে প্রকৃত ও নিঃস্বার্থ জনসেবার ভাবধারা জাগানো আদৌ সম্ভব নয়। একইভাবে 'হুকুমাতে ইলাহীয়া' কায়েম করার জন্যে 'ইশকে মুস্তফা' বা নবী প্রেম একান্ত অপরিহার্য বলে তিনি মত প্রকাশ করেছেন। অপরদিকে বৈরাগ্য ও রাজত্ব, দরবেশী ও বাদশাহীর পরস্পর সমন্বয় বিধানও একান্ত আবশ্যক। 'পায়াম-ই-মাশরিক' গ্রন্থে তিনি বলেন :

سروری دردین ما خدمت است
عدل فاروقی فقر حیدری
ان مسلمانان که امیری کرداند

درشهنشاهی فقیری کرده اند

هرکه عشق مصطفیا سامان اوست

بحر وبر در گوشه دامان اوست

"আমাদের জীবন বিধানে নেতৃত্ব
শুধুমাত্র মানব সেবা,
ফারুকের সুবিচার আর
আলী হায়দারের অনাড়ম্বর জীবন।
নেতৃত্ব করেছে যে মুসলমান
শাহানশাহীর সাথে করেছে তারা
ফকীরী জীবন-যাপন।
জীবন পাথেয় যার মুস্তফার প্রেম
পূর্ণ আধিপত্য বিরাজিত তার
জলস্থলের উপর।"[৪৩](পৃ:-৭০)

'আরমুগানে হিজাজ' গ্রন্থে তিনি বলেন :

خلافت برمقام ما گواهی است

حرام است نچه برما پادشاهی است

ملوکیت همه مکر است ونیزنگ

خلافت فقط ناموس اهي الهی است

"খিলাফত আমাদের দৃষ্টিতে সত্যের প্রতিভূ
হারাম আমাদের কাছে মানব প্রভুত্ব।
সাম্রাজ্যবাদ প্রতারণা সর্বস্ব ও বহুরূপী,
খিলাফতই হচ্ছে একমাত্র প্রতীক
খোদায়ী মর্যাদার।"[৪৩](পৃ:-৭০)

ইকবাল রাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদকে সম্পূর্ণ হারাম মনে করেন। ইউরোপ রাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের যে পদ্ধতি উপস্থাপন করেছে তা সওদাগরী, নরহত্যা, রক্ত শোষণ ও স্বার্থপরতা ভিন্ন আর কিছুই নয়। ফিরিঙ্গী সভ্যতার চরম উদ্দেশ্যও তাই। ইকবাল বলেন :

ازضعیفانان ربودن حکمت است

ازتن شان جان ربودن حکمت است

شیوه تهذیب نو ادم دری است

پردی ادم دری سوداگری است

"আজকের বিজ্ঞান হচ্ছে
দুর্বলের মুখের অন্ন ছিনিয়ে নেয়া
নরহত্যাও আজ বিজ্ঞানে শামিল।
মানবদেহকে ছিন্নভিন্ন করাই আজ
নব সভ্যতার বৈশিষ্ট্য,
এই নরহত্যার আড়ালে রয়েছে

সওদাগরীর চক্রান্তজাল।"[৪৩](পৃ:-৭০)

'আরমুগানে হিজাজ' গ্রন্থের রুবায়ীতে তিনি ইসলাম ও পাশ্চাত্য শাসনতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য পরিষ্কার করে বলেছেন :

مسلمان فقر وسلطانی بهم کرد
ضمیرش باقی وفانی بهم کرد
ولیکن الامان ازعصر حاضر
که سلطانی وشیطانی بهم کرد

"মুসলমানদের কাছে রাজশক্তি ও ফকীরী
পরস্পর সংযুক্ত,
আত্মা তার স্থায়ী, অথচ ধ্বংসশীল।
পরিত্রান চাই আধুনিক কালের প্রভাব থেকে,
রাজশক্তির পশ্চাতে রয়েছে আজ
শয়তানী ষড়ন্ত্র।"[৪৩](পৃ:-৭১)

আগেরকালে রাজনীতি ধর্ম বিচ্ছিন্ন ছিল না, বরং শাসনের সামগ্রিক রূপই ছিল ধর্মীয়। মার্টিন লুথার (১৪৮৩-১৫৪৬) ধর্ম থেকে রাজনীতিকে নির্বাসিত করেন। রাজনীতির উপর ধর্মীয় নেতা তথা পাদ্রীদের যে প্রভাব ছিল, তা লোপ করাই ছিল লুথারের উদ্দেশ্য।[২](পৃ:-৬৪) এ পথ ধরেই মুসলমানের মধ্যে কতক আলেম বলে থাকেন, আলিমদের রাজনীতি করা উচিত নয়; তারা ধর্ম চর্চা নিয়েই প্রবৃত্ত থাকবেন। অথচ নবীজীকে (সা:) আল্লাহ তাআলা ধর্মনীতি ও রাজনীতি উভয়ের সমন্বয় সাধনকারীরূপে পাঠিয়েছেন। তিনি একাধারে ধর্ম-প্রধানও ছিলেন আবার রাষ্ট্রপ্রধানও ছিলেন। খুলাফায়ে রাশেদীনও তদ্রুপ ছিলেন। নবীজী (সা:) একাধারে ধর্মপ্রধান ও রাষ্ট্রপ্রধান এবং ধর্মনীতি ও রাজনীতির সমন্বয় সাধনকারী ছিলেন। ইকবাল বলেন :

یه اعجاز هی ایك صحرا نشین کا
بشیری هی ائینه داری نذیری
اسی مین حفاظت هی انسانیت کی
که هون ایك جنیدی و اردشیری

"মরুবাসী নবীজীর অসাধারণ কৃতিত্ব:
তিনি ছিলেন একাধারে ধর্ম ও রাজনীতির নেতৃত্বদানকারী।
রাজনীতি ও ধর্মের সমন্বয়ে রয়েছে মানবতার রক্ষাকবচ,
একই ব্যক্তি হবে জুনায়েদ বাগদাদী ও সামানী শাসক আরদাশীর।"[২](পৃ:-৬২)

ইকবালের মতে ধর্ম ও রাজনীতি দু'টি শক্তি : একটি অপরটির পরিপূর্বক। তাঁর ভাষায় :

این دو قوت حافظ یك دیگراند
کائنات زندگی را محوراند

"ধর্ম ও রাজনীতি দু'টি শক্তি : একটি অপরটির হেফাযতকারী
জীবন বিশ্বের জন্যে এদু'টি হলো মেরুকেন্দ্র রেখা (axis) স্বরূপ।"[২](পৃ:-৬৩)

অন্যদিকে মার্টিন লুথারের বিপরীতে ইটালীর রাজনীতিক মেকিয়াভেলী (১৪৬৯-১৫২৭) বলে উঠলেন, রাজনীতিকে ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা হোক। তাঁর মতে, রাজনীতির স্বার্থে ও দেশের খাতিরে বৈধ-অবৈধ যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা সরকারের পক্ষে অসমীচীন হবে না।[২](পৃ:-৬৪) ধীরে ধীরে ইউরোপীয় রাজনীতিকগণ মেকিয়াভেলীর এই নীতি বিবর্জিত দর্শনের অনুসরণ করলেন। বর্তমান ইউরোপ, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে এই ধর্ম বিবর্জিত তথা নীতি বিচ্যুত শাসনই প্রচলিত রয়েছে।

ইকবাল ইসলাম বিরোধী এই ধর্মনিরপেক্ষ ও লোকায়ত শাসন পদ্ধতির বিরুদ্ধে দৃঢ় হস্তে লিখনী পরিচালনা করেন। ইকবাল বলেন, আল্লাহর ইচ্ছা হলো– দিশারীগণ ধর্ম ও রাজনীতি উভয়ের সমন্বয় করুক, উভয়ের জন্যে চেষ্টা করুক। দেশ ও শাসন ক্ষমতাকে যদি একটি দেহ ধরে নেয়া হয়, তবে ধর্ম হবে তার জন্যে রূহ তথা আত্মাস্বরূপ। রূহ না থাকলে যেমন কায়া প্রাণহীন হয়ে পড়ে, তেমনি ধর্ম ছাড়া রাজনীতি হবে অর্থহীন, নীতি বিবর্জিত ও কলুসিত। এজন্যে উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক থাকা জরুরী। ইকবালের ভাষায় :

این نکته کشائنده اسرار نهان است

ملك است تن خاکی ودین روح روان است

"কথাটি গোপন রহস্য প্রকাশের মতই;

দেশ মাটির কায়া, আর ধর্ম কার্যকর প্রাণ।"[২](পৃ:-৬৩)

ইকবালের ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন :

ইসলামিক চিন্তাধারার পুনর্গঠন নামক বক্তৃতামালায় ইকবাল এক জায়গায় বলেছেন, আধুনিক দুনিয়ার ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে যে, ইসলামিক বিশ্ব অতিদ্রুত গতিতে পাশ্চাত্যের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এতে অন্যায় কিছু নেই। আমাদের একমাত্র ভয় যে, ইউরোপীয় কালচারের চাকচিক্যে বিমুগ্ধ হয়ে আমরা আমাদের গতি হারিয়ে ফেলবো এবং ঐ কালচারের অন্তর্নিহিত রূপ উপলব্ধি করতে সমর্থ হবো না।[১](পৃ:-৫৪)

অন্যত্র ইকবাল বলেছেন, আমাদের সামনে একমাত্র খোলা পথ হচ্ছে– আধুনিক জ্ঞানকে সসম্ভ্রমে কিন্তু নিজেদের স্বকীয়তা রক্ষা করে আত্মস্থ করা এবং এই জ্ঞানের আলোকে ইসলামী শিক্ষার বিচার করা, যদিও এই পন্থায় আমরা আমাদের পূর্বসূরীদের সিদ্ধান্ত থেকে স্বতন্ত্র সিদ্ধান্তে উপনীতি হতে পারি।[১](পৃ:-৫৪)

ইকবাল প্রকৃতিকে জয় করতে এবং প্রাচীন সামাজিক প্রথার স্থলে নতুন সামাজিক নিয়ম প্রতিস্থাপন করতে প্রজ্ঞার উন্নতি ও উপযোগের কথা বলেছেন। তিনি এও বলেছেন যে, "The conquest of Nature through knowledge is an act of prayer .... the scientific observer of Nature is a kind of mystie seeker."[২৯](পৃ:-১৯০) অবশ্য তিনি নৈতিক মূল্যবোধের বিনিময়ে প্রজ্ঞার over development-এর বিপক্ষে ছিলেন। তিনি এ ধারণাও পোষণ করতেন যে, যদি আমরা শুধুমাত্র আল্লাহর দিকে রুজু হই আর জগৎ সম্পর্কে বেখবর থাকি অথবা যদি আমরা আল্লাহ সম্পর্কে বেখবর থাকি আর চরমভাবে হয়ে যাই দুনিয়াভোগী, এ দুটো অবস্থাই আমাদের জন্যে সমানভাবে ধ্বংসাত্মক। এ দুটোকে কোনোভাবেই পরস্পর থেকে পৃথক করা যায় না, সম্ভব নয়। যদি পৃথক করা হয়, তাহলে জীবনের যে পূর্ণতা তা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, বাধাগ্রস্ত হবে। জীবনের পূর্ণতার জন্যে পয়োজন প্রেম ও প্রজ্ঞার ঐক্য। পাশ্চাত্যের সমালোচনা করে তিনি বলেন,

> The West is power without love, knowledge without spirit; while the East is only love and spirit without knowledge and power or the creativeurge, content

with ignorance, weakness, intellectual and political slavery, Muslims should emulate the West with the vigorous search for knowledge and develop a divine discontent with the present state of things.[২৯](পৃ:-১৯০)

ইকবাল ইউরোপীয় কালচারের অন্তর্নিহিত সত্য হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করেছেন এবং আধুনিক ইউরোপীয় চিন্তার আলোকে ইসলামকে বুঝবার ও ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি বলেন, মুসলিম দার্শনিকরা গ্রীক দর্শন থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন, আবার তাদের অনুপ্রেরণাই ইউরোপে সঞ্চারিত হয়েছিল। কিন্তু মধ্যযুগের পর ইসলামী বিশ্ব এক স্থবিরতায় কবলিত হয়। অন্যদিকে চিন্তা এবং অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে ইউরোপে অভূতপূর্ব অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। ইকবাল তাই ইসলামী দর্শনের পুরাতন সূত্রগুলো আবিষ্কারের অভিযানে নেমেছিলেন। তার নিজের স্বীকারোক্তি অনুসারে তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ইউরোপ অনুপ্রাণিত। কিন্তু তিনি ইউরোপের অন্ধ অনুসারী নন। তিনি স্বাধীনভাবে তার বিচার করেছেন।

মুসলিম কর্তৃক সিরিয়া ও ইরান বিজিত হওয়ার পর থেকে উত্তরদিক থেকে গ্রীক চিন্তাধারা এবং অপরদিক থেকে ভারতীয় চিন্তাধারা ইসলামের উপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। আব্বাসীয় খলীফা আবদুল্লাহ আল মামুন (৮১৩-৮৩৩ খ্র:) বাগদাদে একাডেমী অব সায়েন্সেসের প্রতিষ্ঠা করলে, মুসলিমরা দেশ-বিদেশের চিন্তাধারার সংস্পর্শে এসে কতকটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। তার কারণও সুস্পষ্ট। গ্রীক চিন্তাধারার সাথে ভারতীয় চিন্তার কিছুটা সাদৃশ্য থাকলেও ইসলামী চিন্তাধারার সাথে তার কোনো সাজুয্যই নেই। গ্রীক ও ভারতীয় উভয় চিন্তাধারায় জড় পদার্থকে চিরন্তন বলে ধারণা করা হয়েছে। গ্রীক চিন্তানায়কদের চিন্তার মধ্যে সৃষ্টি সম্পর্কীয় কোনো ধারণাই নেই। জড় ও আকারের অথবা নির্বিশেষের সাথে জড়ের সংযোগের ফলেই এ বিশ্বের সব কিছুর উৎপত্তি বলে এ্যারিস্টটল ও প্লেটোর ধারণা ছিল। ভারতীয় চিন্তাধারায় সৃষ্টির অর্থ সমবায়। অর্থাৎ মহাপ্রলয়ের শেষে যখন এ জগতের উপাদানগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়,- তখন সেগুলোকে পুনরায় বিন্যাস করারই অপর নাম সৃষ্টি। অথচ সবগুলো হিব্রুধর্মে সৃষ্টির অর্থ হচ্ছে– শুন্য থেকে সৃষ্টি– Creation out of nothing ।[৩](পৃ:-৩২) তেমনি মানব-জীবনে বুদ্ধির প্রাধান্য স্বীকার করে তারই আলোকে এ জগৎ ও জীবন সম্পর্কে চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ছিল গ্রীকদের লক্ষ্য। ভারতে বিচার-বুদ্ধির প্রাধান্য স্বীকার করা হয়েছে বটে, তবে শুধুমাত্র বুদ্ধির দওলতে সত্যিকার জ্ঞানলাভ করা সম্ভবপর নয় বলেও ধারণা রয়েছে। বুদ্ধির প্রয়োগের পূর্বে মানব অন্তরের মধ্যে বিরাজমান নানাবিধ অতিন্দ্রীয় শক্তির বিকাশকে অত্যাবশ্যক বলে ধারণা করা হয়েছে। তার উপর স্বজ্ঞা বা intuition কে জ্ঞানের কাজে সর্বোচ্চ স্থান দেয়া হয়েছে। ইসলামের ঐতিহ্য অনুসারে কিন্তু মানব জীবনে বুদ্ধিই সর্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে বুদ্ধি ব্যতীত বোধী নামীয় অপর এক মাধ্যম রয়েছে– যার মাধ্যমে বিশ্বের সবগুলো বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও ধর্মীয় সত্য আবিষ্কৃত হয়েছে। এ স্বজ্ঞাকে সর্বপ্রথম প্রাধান্য দান করেন মনীষী প্লটিনাস। মধ্যযুগে তাঁর মতবাদ সম্পর্কে নানা আলোচনা হলেও আধুনিক যুগের সূচনায় তা একেবারে পটভুমিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে স্পিনোজা ও শেলি এবং অতি আধুনিককালে বের্গসঁ ব্রাডলি ও ক্রোচে প্রমুখ চিন্তানায়কগণ এ স্বজ্ঞাকে জ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম বলে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন।

আধুনিক যুগের মানুষ, জীবনে ইচ্ছাশক্তির গুরুত্ব সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। আর্থার শোপেন হাওয়ার তিনি এ বিশ্বের সর্বত্রই বেঁচে থাকার প্রবল আকাঙ্খা বা will to live-এর নিদর্শন পেয়েছেন। তারপর জার্মান চিন্তাবিধ ফ্রিডরিশ নীটশে সর্বজীবের মধ্যে শক্তিলাভের জন্যে ইচ্ছার ক্রিয়াশীলতা লক্ষ্য করেছেন এবং তাকে সমর্থনও করেছেন। বিগত শতাব্দীতে আমেরিকার মনীষী উইলিয়াম জেমস আমাদের সবগুলো প্রত্যয়ের মূলে ইচ্ছার কার্যকারিতা আবিষ্কার করেছেন। তাঁর মতবাদ অনুসারে আমাদের মানসে বৃদ্ধি নয় ইচ্ছাই কার্যকরী। আমাদের নানাবিধ বিষয়ে ইচ্ছাই প্রত্যয়শীল করে তোলে।

স্থান কাল সম্পর্কে নানা তর্কের উৎপত্তি হয়েছে। বৈজ্ঞানিক জগতে স্থান ও কালকে দুটো স্থিতি হিসেবে গণ্য করা হয়। অথচ এ স্থান ও কালের ধারণাকে কান্ট অভিজ্ঞতাপূর্ব মানসিক বিষয় বলে গণ্য করেছেন। কেবল স্থান-কাল নয়, বস্তুর স্বরূপ নিয়েও বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মহলে নানা তর্কের সৃষ্টি হয়েছে। সুদূর অতীতে বুদ্ধদেব বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার না করে, তাকে ঘটনার সমাবেশ বলতে চেয়েছেন। অতি আধুনিককালে আলবার্ট আইনস্টাইনও বস্তু বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার না করে তাদের ঘটনা বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

আত্মা সম্পর্কীয় ধারণায়ও পুরাকালের ও আধুনিক যুগের ধারণায় রয়েছে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। প্লেটো যে আত্মার ধারণা করেছিলেন তা ছিল শাশ্বত। এ মায়াময় পৃথিবীতে সে ছিল দেহের কারাগারে বন্ধী। তাই যখন সেই শাশ্বত ধারণার রাজ্যের ছায়া তার কারাগারের দেয়ালে পড়ত তখন তার মনে সেই আনন্দালোকে ফিরে যাওয়ার জন্যে আকুল বাসনা দেখা দিত। শংকর মানবাত্মার ধারণাকে অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা প্রসূত বলে ধারণা করলেও ব্রক্ষ্মজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত জন্ম-জন্মান্তরের শৃঙ্খল থেকে তার মুক্তি নেই বলে মতবাদ প্রচার করেছেন। প্লেটো বা শংকর যে দেহ-নিরপেক্ষ আত্মার ধারণা করেছিলেন, বর্তমান যুগের সূচনায় তা দেকার্তে কর্তৃক প্রথম 'মন' নামক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। তারপর স্পিনোজা তাকে তার সারসত্তার (Substance) একটা গুণরূপে ধারণা করেছেন। লেইবনীটজ এ বিশ্বের সর্বত্রই জীবাত্মার সমাবেশ আবিষ্কার করলেও তারা স্বয়ং সম্পূর্ণ পরমাণুরূপে তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়েছে। তাদের প্রতিভাসিকরূপ দেহের সাথে তাদের কি সম্পর্ক বর্তমান তা তিনি পরিষ্কার ভাষায় বর্ণনা করেন নি। কান্ট আত্মার, আল্লাহর ও জগতের ধারণার মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে বিধায় তাদের গঠনমূলক না বলে নির্ধারণমূলক বলে অভিহিত করেছেন। তবে জ্ঞানের ক্ষেত্রে একটা তুরীয় নীতি যে, ক্রিয়াশীল, এ সত্য স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। তবে আধুনিককালে ব্যবহারবিদগণ (Behaviourists) আত্মাকে স্নায়ুরই একটা প্রতিক্রিয়া বলে অভিহিত করেছেন। তেমনি আল্লাহ সম্পর্কে ধারণায়ও নানা মতবাদ দেখা দিয়েছিল।

কেবল তত্ত্বীয় জগতে নয় রাষ্ট্রনীতির জগতেও মতবাদ যথা গণতন্ত্র, ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ফ্যাসিবাদ প্রভৃতি নানাবিধ তন্ত্রের উৎপত্তি দেখা দেয়। এগুলোর আলোকেই যে কোনো রাষ্ট্রের গতি প্রকৃতি নির্ণয় করা হয়। এগুলোও ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের ধারণার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। তাই ইকবাল এগুলো সম্পর্কেও আলোচনা করে ইসলামী জীবন-ধারার সাথে এর ঐক্য ও অনৈক্যের পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তাধারার পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তিনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নিয়ে একে একে আলোচনা করেছেন–

১। জ্ঞানও ধর্মীয় অভিজ্ঞতা, ২। দর্শনের চোখে প্রত্যাদেশমূলক ধর্মীয় অভিজ্ঞতা, ৩। আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা ও ইবাদতের মর্ম, ৪। মানুষের খুদী তার স্বাধীনতা ও অমরতা, ৫। মুসলিম কালচারের মর্মমূল, ৬। ইসলামী জীবন-সংস্থার মধ্যে গতিশীলতা, ৭। ধর্ম কি সম্ভব? উপরোক্ত প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে প্রাচীন ও আধুনিক নানাবিধ মতবাদের সমালোচনা করে তিনি ইসলামী মতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন।

প্রথমতঃ জ্ঞানের রাজ্যে তিনি ইন্দ্রীয়জ জ্ঞান, যুক্তিলব্ধজ্ঞান এবং সজ্ঞার ক্রিয়াশীলতা স্বীকার করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, ইসলাম জ্ঞানের কোন পদ্ধতিকে তুচ্ছ বলে পরিহার করতে চায় নি। বরং যে ইন্দ্রীয়জ জ্ঞানের ওপর আরোহ পদ্ধতির প্রয়োগ বৈজ্ঞানিক জগতে অনিবার্য- সেজ্ঞান লাভের জন্যে কুরআনুল কারীমে তাগিদ দেয়া হয়েছে। তবে ধর্মীয় জ্ঞান লাভের পদ্ধতি হল স্বজ্ঞা বা Intuition। সে উপরোক্ত পদ্ধতিগুলো থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। এ পদ্ধতিতে যে জ্ঞান লাভ হয়, তাতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় পরস্পর থেকে ভিন্ন থাকে না বরং একই সত্তায় পরিণত হয়। এ জ্ঞানের বিষয়বস্তু সতঃপ্রমাণ। প্রত্যাদেশ (revetation) এরূপ জ্ঞানেরই একটা রূপ।

দ্বিতীয় বিষয় সম্পর্কে আলোচনাকালে তিনি নানাবিধ মতবাদের আলোচনা শেষে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সারসত্তা যুক্তি দিয়ে পরিচালিত একটি সৃষ্টিধর্মী জীবনীশক্তি। এ জীবনীশক্তিকে আত্মারূপে ব্যাখ্যা

করার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহকে মানুষের আকার ধারণা করা হয়। এতে আমাদের অভিজ্ঞতার একটি অতি সহজ সত্যকে স্বীকার করে বলা হয়, জীবন উদ্দেশ্যহীন তরল পদার্থের মত গতিশীল নয়। এর অর্থ হলো, জীবনে রয়েছে সমবায়মূলক এক ঐক্যের নীতির ক্রীয়াশীলতা এবং জীবন্ত দেহের সবগুলো প্রবণতাকে এ গঠনমূলক উদ্দেশ্যের জন্যে কেন্দ্রীভূত করে। দার্শনিক চিন্তার মধ্যে রয়েছে প্রতীক বা Symbolic character. এজন্যে ধর্মীয় জীবনের এ মহান ভূয়োদর্শনকে দর্শন সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। তা সম্ভব হয় কেবলমাত্র স্বজ্ঞা দিয়ে আর সত্তার ভিত্তি হচ্ছে কলব বা হৃদয়জাত উপলব্ধি।

তৃতীয় বিষয় সম্পর্কে তিনি বলতে চেয়েছেন– মানব জীবনে রয়েছে অনন্তকাল ব্যাপী এ ধরণীতে রাজত্ব করার প্রবৃত্তি। অথচ মানুষ তার অভিজ্ঞতায় সততই মৃত্যুর ভয়াবহ দৃশ্য দেখে সর্বদাই বিচলিত হচ্ছে। এজন্যে মানুষ সংঘবদ্ধ জীবন-যাপন করে অনন্তকালের বুকে অমরত্ব লাভ করতে চায়। তবে ব্যক্তিগত জীবনেই হোক কিংবা সংঘবদ্ধ জীবনেই হোক এ নীরব পৃথিবী থেকে মানুষ কোনো সহানুভূতিসূচক সাড়া পায় না বলেই অনন্ত অসীম জীবনী শক্তি থেকে সে অমরত্ব লাভের জন্যে শক্তি কামনা করে। এ প্রার্থনার মধ্যেই তার স্থিতির ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিকই রয়েছে। যে ব্যক্তি প্রার্থনা করে সে তার নিজের অস্তিত্বের অসারতা ব্যক্ত করে সেই চরম ও পরম শক্তিশালী অনন্ত জীবনী শক্তির নিকট থেকে চরম ও পরম কামনা করে।

মানবাত্মার স্বাধীনতা ও অমরত্ব সম্পর্কে আলোচনাকালে তিনি বলতে চেয়েছেন কুরআনুল কারীমের মধ্যে কোনো কোনো আয়াতে পরিষ্কারভাবে এমন উক্তি করা হয়েছে যে, মানুষ আল্লাহর মনোনীত জীব, মানুষের মধ্যে নানা দোষ-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও সে আল্লাহর প্রতিনিধি। মানুষ নানা বিপদের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও স্বাধীন সত্ত্বা। তিনি আধুনিক দর্শনের নানা দিকপালের যুক্তি তাঁর এ মতবাদের সমর্থনে পেশ করেছেন। তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় হলো এই– মানবাত্মাকে আমরা যুক্তির দিক থেকে যতই অস্বীকার করি না কেন, তাকে অবশ্যগ্রহণীয় সত্য হিসেবে মেনে নেয়া আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এ মানবাত্মার পথ প্রদর্শন ও পরিচালনা করার শক্তি থেকে প্রমাণিত হয় মানবাত্মার স্বাধীনতা রয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, মানবাত্মার পক্ষে অমরত্ব লাভ করার ক্ষমতা আছে কিনা? ইকবাল কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন আয়াত থেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন মানবাত্মার অমরত্ব তার কর্মফলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এ কর্মফলের দরুনই আত্মা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় অথবা ভবিষ্যৎ জীবনে চলার পথে অগ্রসর হয়। এ জন্যে ব্যক্তিগত অমরত্ব লাভ আমাদের জন্মগত অধিকার নয়। এ অধিকার আমাদের কর্মফলের দ্বারা লাভ করতে হয়। অমরত্ব লাভ মানুষের জীবনের সর্বপ্রধান কামনার বিষয়। আমাদের সাধনার দ্বারা তা লাভ করতে হয়।

মুসলিম সংস্কৃতির আলোচনাকালে তিনি বলতে চেয়েছেন মুসলিম মনীষীগণ নানাভাবে চিন্তা করলেও এ বিশ্ব সম্পর্কীয় চিন্তায় তাদের মধ্যে ঐক্য রয়েছে। তাঁরা সকলেই এ বিশ্বে এক বিরাট ও বিপুল গতির নিদর্শন পেয়েছেন। মানব জীবনের উৎপত্তিতেও তাঁরা ঐক্যসূত্রের স্বীকার করেছেন এবং কালকে অতিশয় বিষয়ীমুখ সত্য বলে গণ্য করেছেন।

ইসলামের মধ্যে গতিশীলতা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, ইসলামী সমাজ জীবন কোনোকালেই স্থানু নয়। এ জন্যে সে সমাজে নানা যুগে নানা আন্দোলন দেখা দিয়েছে। এ ইসলামী সংস্থার মধ্যেই যুক্তিবাদী মু'তাযিলারা যেমন দেখা দিয়েছেন, তেমনি মরমীবাদী সুফীরাও দেখা দিয়েছেন এ যুক্তিসর্বস্ব মতবাদের বিরুদ্ধ পক্ষ হিসেবে। এসব নানাবিধ মতবাদের উৎপত্তির সাথে সাথে বাগদাদ ধ্বংস হওয়ার পর ইমাম ইবনে তাইমিয়ার আবির্ভাব হয় এবং তিনিই এসব মতবাদের উৎপত্তির মূলে যেসব বিদআত বা Innovation রয়েছে তার মূলোচ্ছেদে অগ্রসর হন। তিনিই ইজতিহাদের উপর সম্পূর্ণ গুরুত্ব আরোপ করে ইসলামী নীতিগুলোকে স্বীকার করে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের পুনরায় পাঠ করতে অগ্রসর হন। তার ফলে মুসলিম মানস পুনর্বার মুক্তিলাভ করে এ জগৎ ও জীবন সম্পর্কে স্বকীয় জ্ঞানের আলোকে নানাবিধ ধারণা গঠন করার স্বাধীনতা লাভ করে।

অপরদিকে তুর্কিতে যে স্বদেশিক আন্দোলন দেখা দেয়, তার মূলমন্ত্র হল রাষ্ট্রকে ধর্মের আওতা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করা। এ আন্দোলনের নেতা হচ্ছেন ইউরোপের কবি ও সমাজতত্ত্ববিদ জিয়া গক-আল্‌প। অন্য দিকে সাইদ হালিম পাশা ইসলামের মধ্যে ভাববাদ ও বাস্তবতাবাদ (Positivism) এর সন্ধান পেয়ে ইসলামের কোনো বিশেষ স্বদেশ বা পিতৃভূমি রয়েছে বলে স্বীকার না করে তাকে সর্বদেশে কার্যকরী বলে গ্রহণ করেছেন। তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন, ইসলামী আদর্শকে কোনো বিশেষ দেশে রূপায়িত করে ইরানী, তুরানী বা ভারতীয় রূপ দান করলে তা ইসলাম থেকে দূরে সরে যেয়ে এ সব রূপ গ্রহণ করে। ইকবালের ধারণা, এতে জিয়া গকের মতবাদের সাথে সাইদ হালিমের মতবাদের কোনো বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। কারণ উভয় মতবাদই পরিণামে একইভাবে ফলপ্রসু হয়। কেননা এভাবে ইসলামের চর্চা হলে তাতে ইসলামের চেয়ে কোনো বিশেষ দেশের রঙ অধিকতরভাবে ফলে ওঠে। ইকবালের মত হচ্ছে– আজকের দুনিয়ায় মানবতার দাবী হলো তিনটে, এ দুনিয়াকে এক আধ্যাত্মিক সত্তা হিসেবে ব্যাখ্যা করতে হবে, ব্যষ্টির আধ্যাত্মিক মুক্তি দিতে হবে এবং এমন এক বিশ্বজনীন নীতি গ্রহণ করতে হবে যার কল্যাণে মানব সমাজের বিবর্তন একটা আধ্যাত্মিক ভিত্তিতে হবে।[৩](পৃ:-৩৫)

সবশেষে আধুনিক যুগের একটা মস্তবড় প্রশ্ন ইকবাল উত্থাপন করেছেন। তা হচ্ছে- এ যুগে কি ধর্মের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব? প্রশ্নের মীমাংসার পূর্বে ইকবাল ধর্মীয় জীবনের অর্থ বিশ্লেষণ করে তার মধ্যে তিনটি পর্যায় আবিষ্কার করেছেন। তাঁর মতে প্রথম পর্যায়ে ধর্মীয় জীবনে রয়েছে অত্যন্ত জোরালো প্রত্যয়। ধর্মীয় জীবনের এ প্রবণতা সামাজিক জীবন গঠনের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হতে পারে। তবে ব্যষ্টিজীবনের বৃদ্ধি বা প্রসারতার পক্ষে এ পর্যায় মোটেই অনুকূল নয়। এ পর্যায়ে ধর্মীয় নীতির কাছে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করার পর ধর্মীয় জীবনে দেখা দেয় সে অনুশীলনের মূলনীতির যথার্থ অনুসন্ধান। এ পর্যায়ে ধর্মীয় জীবনে তার মূলনীতিকে দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। তৃতীয় পর্যায় ধর্মীয় জীবনে মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতা দেখা দেয় এবং ধর্মীয় জীবনের অনুশীলনে লিপ্ত মানুষের মনে সেই আদিম সত্তার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিলিত হওয়ার আকাঙ্খা প্রকাশ পায়। এ পর্যায়েই ধর্মের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জীবনেও শক্তিলাভের প্রবণতা দেখা দেয় এবং ব্যষ্টি তার ব্যক্তি জীবনের স্বাধীনতা লাভ করে। ধর্মের এ তৃতীয় পর্যায় সম্ভব কিনা ইকবাল এখানে সেই প্রশ্নই তুলেছেন এবং দেশ-বিদেশের নানা জ্ঞানীর মতবাদ নিয়ে আলোচনা করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, ধর্মের পক্ষে আধুনিক যুগেও টিকে থাকা সম্ভব।

তাঁর এ বক্তব্যগুলোর সার হচ্ছে– প্রত্যাদেশ বা revelation- যা স্বজ্ঞা নামক জ্ঞানের সর্বোচ্চ পর্যায়। এজ্ঞানের মাধ্যম আমাদের কলব বা হৃদয়। তার মাধ্যমেই আমরা এ জ্ঞানের মর্ম উপলব্ধি করতে পারি। এ জ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ ধারক-বাহক হচ্ছেন নবী-রাসূলগণ। তাঁরাই এ জ্ঞানের আলোকে মানব জীবনকে সুপথে পরিচালিত করেছেন। তাঁদের প্রত্যাদেশলব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, সতত ক্রিয়াশীল এক অনন্ত শক্তির দ্বারাই এ বিশ্বজাহানের সৃষ্টি। এ সৃষ্টি কিন্তু এক বিশেষ মুহূর্তেই শেষ হয়ে যায় নি, অনন্তকালের অনন্ত ধারা বেয়ে সে সৃষ্টি গতিশীল রয়েছে।

ইকবাল ঃ স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদ :

ব্যক্তি জীবনে একজন ঐকান্তিক জাতীয়তাবাদী থেকে মুসলিম ভ্রাতৃত্ব ও প্যান ইসলামী চিন্তার প্রবক্তা হিসেবে রূপান্তর ঘটেছিল ইকবালের জীবনে। তাই আধুনিক বিশ্বাস ও রাজনৈতিক দর্শনসমূহের মধ্যে জাতীয়তাবাদ তাঁকে এত প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছিল; তাঁর কাব্য এবং কখনো কখনো দার্শনিক প্রজ্ঞামূলক নিবন্ধে এর চিত্র ফুটে উঠেছে। ইউরোপীয় শক্তির নিবর্তনমূলক আচরণে তাঁর এ প্রতীতি গভীর হয়েছিল। কিন্তু ইকবালের চিন্তার সামনে জাতীয়তাবাদের পাশাপাশি ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ধারণাও কার্যকরভাবে সক্রিয় ছিল।

ইকবালের কবি জীবনের প্রথম প্রসূন 'বাঙ্গ-ই-দারা' তাঁর স্বাদেশিকতা, দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদী চেতনার গীতিময় রূপায়ণ। স্বদেশ বন্দনা ও মাতৃভূমি প্রীতি এ সময় তাঁর এতদূর এগিয়েছিল যে, এর বাইরে তিনি কোনো কিছুই গ্রহণ করতে উৎসুক ছিলেন না। ইকবাল লিখেছেন :

سارجهان سی اجها هند وستان همارا

هم بلبلین هین اس کی یه کلستان همارا

"ভারত আমাদের সর্বোত্তম দেশ
সমগ্র বিশ্বের মাঝে,
আমরা যেন বুলবুল,
আর এই দেশ আমাদের গুলবাগিচা।"[৪৩](ভূমিকা)
(তারানায়ে হিন্দী)

তারানায়ে হিন্দ, মেরা ওয়াতান ওহি হ্যায়, হিন্দুস্তান হামারা প্রভৃতি কবিতায় তাঁর স্বদেশ তথা ভারতীয় প্রেম উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। নয়া শিওয়ালা কবিতায় তিনি গেয়েছেন–

"ওরে ব্রাহ্মণ! মন্দিরের দেবতা তোর পুরানো হয়ে গেছে!
নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ এতো তুই তাঁর কাছেই শিখেছিস,
খোদাই তো শিখিয়েছেন ওয়ায়েজকে ঝগড়া বিবাদ করতে।
মসজিদ মন্দির কোনোটাতেই আমার ভক্তি নেই।
ব্রাহ্মণ মোল্লা দুইই ছেড়েছি আমি।
তুই ভেবেছিস পাথরের মন্দিরে দেবতা আছে!
জন্মভূমির প্রতি ধূলিকণা কিন্তু আমার দেবতা।"[৪২](পৃ:-১১৮)

কিন্তু ইকবাল খুব বেশী দিন স্বদেশবাদী জাতীয়তাবাদী কবি হয়ে থাকেন নি। মহাযুদ্ধের পটভূমিতে ইউরোপীয় রাষ্ট্রশক্তি যখন মুসলিম দুনিয়ায় ঘাতকের বেশে অনুপ্রবেশ করল এবং উম্মাহর এক ও অবিচ্ছিন্ন শরীরে অনৈক্যের বীজ ঢুকিয়ে দিলো ইকবালের চৈতন্যে তখন নতুন ফুল ফুটেছে। জাতীয়তাবাদের মর্মান্তিক পীড়ন ও অনাচারের দৃশ্য তাঁর দৃষ্টিতে যে অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীর ছবি উন্মোচিত করল তাঁর অন্তলোকে যে পরিবর্তন সাধিত হলো তাই ইকবালের অনাগত কালের চিন্তাকে সুষমামণ্ডিত করল। তিনি মনে করলেন 'ওয়াতান' (স্বদেশ) যেন মানুষের উপাস্য দেবতার স্থান দখল করে আছে অথচ বিশ্বব্যাপী মিল্লাতের নক্ষত্রপুঞ্জের সাথে ব্যক্তিসত্তার মিলে-মিশে এককার হয়ে যাওয়াই বাঞ্চনীয়। তাই ইকবাল তারানায়ে হিন্দ এর পরিবর্তে লিখলেন তারানায়ে মিল্লী। স্বদেশ পূজা ত্যাগ করে তিনি আত্মনিয়োগ করলেন ইসলামী মিল্লাতের বিজয়গাথা রচনায়। তিনি ইসলামী জাতীয়তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে লিখলেন :

چین وعرب همارا هندوستان همارا

مسلم هین هم وطن هین ساراجها همارا

"চীন আমাদের আরব মোদের;
ভারতবর্ষও আমাদেরই দেশ;
আমরা মুসলমান
তাই সমগ্র বিশ্বই আমাদের স্বদেশ।"[৪৩](ভূমিকা)

Dhaka University Institutional Repository

ইকবাল যদিও তাঁর জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণায় কোনো পরিপূর্ণ চিত্র আমাদের দেন নি কিংবা এ প্রসঙ্গে কোনো পূর্ণাঙ্গ লেখনী তিনি রেখে যান নি, কিন্তু তার বিভিন্ন কবিতা এবং বক্তব্য-বিবৃতি ও বিচ্ছিন্ন নিবন্ধ পর্যবেক্ষণ করলে তাঁর জাতীয়তাবাদী ধারণা ও বিশ্বাসের একটি অবকাঠামো নির্মাণ করা সম্ভব।

ইকবালের এই বিশিষ্ট ধারণার একটি সম্যক চিত্র অবগত হতে হলে প্রথমেই আমাদের জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশের দিকে নজর দিতে হবে এবং একই সাথে লক্ষ্য রাখতে হবে আধুনিক রাজনৈতিক চেতনায় এই মৌল দিকটির সাথে ইসলামের সামঞ্জস্যহীনতা কতটুকু। কার্যত ইকবালের চিন্তা ও ভাবনা সমীকৃত হয়েছে ইসলামের অন্তর্লীন বিশ্বাস ও গভীর জীবনবোধের প্রেক্ষিতে। তাই স্বভাবতই ইসলাম ও জাতীয়তাবাদের একটি তুলনামূলক বিবেচনাও ইকবালের চিন্তার স্বরূপটি উন্মোচনে সহায়ক হবে।

মনীষী বার্ট্রান্ড রাসেল স্বদেশপ্রেম তথা জাতীয়তাবাদের উদ্ভবের একটি সুন্দর চিত্র পেশ করেছেন। স্বদেশ প্রেমের জন্ম ইতিহাস বিশ্লেষণ করে তিনি প্রমাণ করেছেন এর বয়স খুব বেশী নয়। জোয়ান অব আর্কের ত্যাগের মধ্য দিয়ে তা সর্বপ্রথম ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত হয়। নেপোলিয়ান তা জার্মানীতে আমদানী করেন। মেটারলিংক তার বীজ ইতালীতে বপন করেন এবং শেক্সপিয়রের মত এমন মধুর ও চিত্তহারী ভাষায় এ বিষ আর কেউ পরিবেশন করতে পারেনি।

জাতীয়তাবাদের সূচনায় থাকে মানুষের আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি ও পরিণতিতে তাই আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠার নিয়ামকে পরিণত হয়। বর্ণ, ভাষা ও গোত্র প্রভৃতি কেন্দ্র করে এই আধিপত্য বিস্তারের প্রতিযোগিতা চলে এবং অবশেষে অপরাপর জাতী-গোষ্ঠীর উপর আপন প্রাধান্য সৃষ্টির মাধ্যমে জুলুম ও শোষণ বিস্তৃত হয়। অন্যের প্রভাব থেকে মুক্ত হবার জন্যে যা জাতীয় চেতনার জাগরণ ঘটায় পরবর্তীকালে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠা লাভের পর নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে অন্যকে মোক্ষণ করবার ধারণা এদেরকে পেয়ে বসে।

উনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয়তাবাদ একটি মন্ত্র শক্তিতে পরিণত হয় এবং ইউরোপীয় জাতি-গোষ্ঠীর কাছে অনেকটা বিশ্বাসের অবয়ব লাভ করে। আধুনিককালেও জাতীয়তাবাদ তার বিস্তর সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও সভ্যতার একটি প্রলম্বিত উপাদান হিসেবে বর্তমান। একটি সুসমন্বিত-সংগঠিত কাঠামো ব্যতিরেকেই জাতীয়তাবাদ মানুষের একটি শক্তিশালী অনুভূতি। অনেকটা ধর্মান্ধতার সাথে যার তুলনা চলে। এই কারণেই জাতীয়তাবাদ কোনো যুক্তি কিংবা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার ধার ধারে না এবং প্রচণ্ড আবেগময়তা যার শরীরকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

অনেকটা ধর্মের মত জাতীয়তাবাদও মানুষের কাছে কিছু আনুগত্য আশা করে, পরিণতিতে ত্যাগ ও উৎসর্গের প্রশ্নটিও জাতীয়তাবাদের সাথে অস্তিত্ব লাভ করে। মানবতার জন্যে জাতীয়তাবাদের সবচেয়ে বড় অবদান, উদ্দেশ্যের সততা, আত্মত্যাগের সীমাহীন অনুভূতির জন্ম, আদর্শ প্রতিষ্ঠায় মানুষের সুপ্ত শক্তিকে নিয়োগ। হ্যারল্ড জে. লাসকীর ভাষায়–

> In so for as we can give to each nation, the power to express itself as a state, it seems to me clear that we liberate a spiritual energy which beyond discussion adds to the happiness of mankind.[৪২(পৃঃ-১২০)]

আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতার প্রগতি ও উন্নয়নে জাতীয়তাবাদ একটি কার্যকর শক্তি হিসেবে কাজ করলেও তার বিপরীতে মানব প্রগতির দুয়ার রুদ্ধকারী শক্তি হিসেবেও এর আবির্ভাব। জাতীয়তাবাদী ধারণার মৌলিকত্ব নিহিত রয়েছে সামরিক বিজয় এবং এক জাতি কর্তৃক অন্য জাতির উপর বিদ্বেষ পোষণে। ভৌগোলিক আগ্রাসনের মধ্যে য়ার গৌরব নিহিত এবং পারস্পরিক খুন ও জখমে যার ইতিহাস কালিমা লিপ্ত। জাতীয়তাবাদের এই অন্ধকার চিত্র উঠে এসেছে ওয়াল্টার লেকারের কলমে–

> Nationalism is distinguised by the over estimation of ones own nation and the denigration of others, the lack of the spirit of self criticism and responsibility, an ambivalent appraisal of the desting of one's nation based on a feeling of inferiority and a general tendency to attribute anything wrong with one's natio to the evil doing of others, who should consequently be fought.[৪২(পৃঃ-১২০)]

বস্তুতঃ ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই মুসলিম দুনিয়ায় পাশ্চাত্যের ধর্মহীন রাজনৈতিক বিশ্বাসসমূহের অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে; যার ফলে মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও নবতর চেতনার জাগরণ ঘটে। তুরস্কে প্রথম ইসলামী খিলাফতের পতন ঘনিয়ে আসে এবং এখানেই পাশ্চাত্যের ধর্মহীন তরঙ্গাভিঘাত ঝড়ের সূচনা করেছিল। তাই তুরস্কের ইসলাম পাবন্দ বুদ্ধিজীবীগণ জাতীয়তাবাদের অনৈসলামী মুখোশ উন্মোচন করেন। তাদের মধ্যে স্থানীয় প্রতিনিধি ছিলেন সিবদেত পাশা, নামিক কামাল এবং জিয়া পাশা। শরীয়াতের সংরক্ষণে তাদের অপরিসীম অবদান তুরস্কের সমাজদেহে আলোড়ন তুললেও পরবর্তীকালে তা জাতীয়তাবাদীদের হাতে বন্দী হয়ে পড়ে। সিবদেত পাশা ১৮৫৬ সালে এক বিবৃতিতে উল্লেখ করেন–

> Today we have lost our sacred national rights which our ancestors gained with their blood. While the Islamic nation used to be the ruling nation, it is bereft of this sacred right. This is a day of tears and mourning for the Muslim brethern.[৪২(পৃঃ-১২২)]

নামিক কামাল সর্বপ্রথম দেশপ্রেম অর্থে ওয়াতান শব্দের সূচনা করেন যা ইকবালের সীমিত অর্থে মিল্লাতের পরিপূরক। একইভাবে জিয়া পাশা ইসলামী ঐক্যের প্রতীক হিসাবে খিলাফতের সংরক্ষণের উপর জোর দেন। রসেন্থাল এ বুদ্ধিজীবীদের আদর্শ ও বিশ্বাসের সমীকরণ করেছেন এভাবে–

> Unity of all Muslims in the Umma or Jamma (community) is understood not only on the international universal level but also within the Muslim Turkish millat on a national level. In this, we undoubtedly see the prevailing political situation. Yet the Islamists who understood this two fold love of religion and of nation as a divine gift opposed nationalism (qaumiyyet) and tribalism (asabiyyet). The Islamists only recognijed one unity, that of all muslims under the shariat.[৪২(পৃঃ-১২২)]

তুরস্কে যখন জাতীয়তাবাদীরা ক্ষমতায় আসে তখন তার সাথে ইসলামী মিল্লাতের স্বপ্নও ধূলিস্যাৎ হয়ে যায়। মোস্তফা কামাল পাশা এ ধূলিসাৎ কর্মে নেতৃত্ব দেন। ইকবাল তাঁর জাভিদ নামায় সাঈদ হালিম পাশার মুখ দিয়ে মোস্তফা কামাল পাশার এ ধর্মহীন রাজনৈতিক বিপ্লবের চিত্র তুলে ধরেছেন–

"নবজীবনের সেতার তুলে এনেছে তুর্কী কামাল
পুরনো মন্দির ধুয়ে মুছে ঝকঝকে
বানানোর কাজে সে ব্যস্ত
সে জানে না পশ্চিমীদের রং ও কলা
কাবার প্রাণশক্তি থেকে বঞ্চিত
তুর্কীদের বাজনায় নেই নতুন কোনো কাফেলার ঘণ্টাধ্বনি
ইউরোপের পুরনো চেহারা ঢাকা পড়েছে
নতুন সাজে মাত্র
তুর্কীদের হৃদয় উত্তাপহীন

অন্তর সঙ্গীত হারা
জরা ও মৃত্যুর পৃথিবীকেই ঘিরে আছে ওরা
যেমন অগ্নিশিখায় জ্বলে মোম
ইউরোপের প্রজ্বলিত শিখা
তেমনি দহন করেছে তুর্কীদের।[৪২](পৃ:-১২৩)

আরমুগানে হিজাজ গ্রন্থে ইকবাল তুর্কীদের সম্পর্কে লিখেছেন–

به ملك خویش عثمانی امیراست
دلش آگاه وچشم اورا بصیر است
نه پنداری که رست از بند افرنگ
هنوز اندر طلسم او اسیر است

"তুর্কী জাতি অর্জন করেছে স্বাধিকার
তাদের অন্তর হয়েছে সচেতন
আর দৃষ্টি সুদূর প্রসারী;
কিন্তু ভেবো না তাদেরকে
পশ্চিমী দাসত্ব থেকে মুক্ত,
এখনো তারা বন্দী তার যাদুজালে।"[৪৩](পৃ:-৭৩)

সমকালে জাতীয়তাবাদের বৈরী বিষে আক্রান্ত হয়ে পৃথিবী ব্যাপী যে পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছিল তা থেকে উপমহাদেশের আকাশও মুক্ত ছিল না। ১৮৫৭ সালে আযাদী আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে ভারতীয় মুসলিম সমাজে নৈরাশ্যের রাহু তার অভিশপ্ত পাখা বিস্তার করে। এমনি দিনে কাওমের ত্রাণকর্তা হিসাবে অবতীর্ণ হন উত্তর ভারতে স্যার সৈয়দ আহমদ খান, মাওলানা শিবলী নোমানী ও আলতাফ হোসেন হালী এবং স্যার সৈয়দ আমীর আলী। এদের অক্লান্ত পরিশ্রমে হতাশাগ্রস্ত মুসলিম প্রাণে জাগরণের ঢেউ প্রবাহিত হতে শুরু করে।

এ শতকের সূচনাতে উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গের ভূমিকা, জনতার উদ্বেল জাগরণীতে মুখর হয়ে উঠেছে আরো দু'জন ক্ষুরধার ব্যক্তিত্বের প্রাণস্পর্শে; এরা হলেন মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ও আল্লামা ইকবাল। আশ্বর্যের ব্যাপার হলো, এই মাওলানা আযাদ জীবনের প্রারম্ভে ছিলেন ইসলামী আন্তর্জাতিকতাবাদের সফরসঙ্গী কিন্তু পরবর্তীকালে তাকেই দেখা গিয়েছিল জাতীয়তাবাদের মুখপাত্র হিসেবে। অন্যদিকে একজন জাতীয়তাবাদী থেকে ইকবালের রূপান্তর ঘটেছিল ইসলামী আদর্শের পুনর্জীবনবাহী হিসেবে।

ইকবালের চিন্তার দিগন্তে জাতীয়তাবাদের বিকৃতি ধরা পড়েছিল দু'টি দিক থেকে; রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উভয় প্রান্ত থেকেই তিনি এর বিচ্যুতিসমূহ নির্দেশ করেছিলেন। উপমহাদেশে তিনিই একমাত্র ব্যক্তিত্ব যিনি আদর্শ হিসেবে জাতীয়তাবাদের নিরীক্ষণ করেছেন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে। সূচনাতে জাতীয়তাবাদ তাকে প্রলুব্ধ করেছিল কিন্তু ইউরোপ পর্যটনের পর তাঁর মানসিকতায় জাতীয়তাবাদ যে কালিমার ছাপ রেখে যায় তা তাঁকে এর দিগন্ত থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিতে বাধ্য করে। তাঁর গোচরীভূত হয়, ইউরোপীয় জাতিসমূহ তাদের ভৌগোলিক স্বার্থ রক্ষার খাতিরে কি ধ্বংসলীলায় মেতে উঠেছে। বিশ্বযুদ্ধের যন্ত্রণাকাতর চিত্র তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তিনি অবলোকন করেন জাতীয় গৌরব অক্ষুন্ন রাখার খাতিরে মানবতার জমিন কেমন রক্তরঞ্জিত হয়ে উঠেছে। স্থানিক অখন্ডতা অপরাপর মানুষের প্রতি কেমন ছড়িয়ে চলেছে ঘৃণা ও বিদ্বেষ।

Dhaka University Institutional Repository

এ সময় ইউরোপীয় সাম্রাজ্রবাদী শক্তি মধ্যপ্রাচ্যে এবং উত্তর আফ্রিকার মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে তার আগ্রাসী থাবা বিস্তার করে এবং উসমানী খিলাফতের শক্তিকেন্দ্রগুলো একে একে কেড়ে নিতে শুরু করে। উপরন্তু মুসলিম আদর্শের নির্জীবন ও পশ্চিমী জাতীয়তাবাদী ধারণার অনুপ্রবেশের ফলে খেলাফতের অবশিষ্ট অংশটুকুও দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে সেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতীয়তা ভিত্তিক রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটানো হয়। বহু বছর পর ইকবাল এ ঘটনার ইঙ্গিত দিয়ে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন–

> Very early from the writing of the European scholars I had come to know that the besic scheme of western Imperialism was to dismember the unity of the Muslim world by popularizing territorial nationalism among its various components.[৪২(পৃ:-১২৫)]

ইকবালের সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তাবাদ বিরোধী মানসিকতা নির্মাণে উপরোক্ত ঘটনা প্রবাহ একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল এবং এ পর্যায়ে তিনি মুসলিম ভ্রাতৃত্ব ও প্যান ইসলামী ঐক্যমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে কবিতার কারুকাজ গড়ে তুলেছেন। বাঙ্গ-ই-দারার দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিতাগুলো যেন মুসলিম ঐতিহ্যের এক স্মৃতি ভারাক্রান্ত নষ্টালজিয়া, সাথে সাথে মুসলিম পুনর্জীবনের গৌরব গীতিকাও বটে। এ প্রসঙ্গে ইকবালের জাজিরা-ই-সিসিলী বা সিসিলী দ্বীপ কবিতাটির উল্লেখ করা যেতে পারে; যেখানে মুসলিম ঐতিহ্যের গৌরবময় চিত্রপটে বর্তমানের ভগ্নদশায় তার বেদনা মথিত হয়ে উঠেছে। ইউরোপ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ইকবাল নিশ্চিত হয়েছেন, জাতিয়তাবাদ–

> Poisonous for the Modern Civilization of man; and it is particularly so in the case of Muslims because it is contrary to the fundamentals of their faith.[৪২(পৃ:-১২৫)]

এখান থেকে ইকবালের কবিতা কর্ম ইসলামের প্রাণশক্তি ধারণ করেছে এবং জাতীয়তাবাদের বৈরী প্রাণকে ক্ষত-বিক্ষত করতে শুরু করেছে। তার কবিতায় উঠে এসেছে আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ ও বিকৃত স্বাদেশিকতার অনিষ্টকর দিকসমূহ যা ইসলামের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যাহত করে এবং সকল সুস্থ মানসিকতার বিপর্যয় ঘটায়। বর্তমান রাজনীতির ধ্বংসলীলা, বিচ্ছিন্নতা ও রক্তপাতের মূলে রয়েছে এই মনোভাব। এই বিচ্ছিন্নতা, দলীয় অনৈক্য ও আঞ্চলিকতা, ইকবালের ধারণায় যার ভাল দিকটি হলো আপতত: অস্থায়ী রাজনৈতিক সংহতি; কিন্তু বিপরীতে রয়েছে এক অন্তহীন রাজনৈতিক বিরোধ, দুর্নীতি ও ধ্বংসমালা যা স্থায়ীরূপেই বিদ্যমান। ইকবাল বলেন–

اقوام جهان مین هی رقابت تواسی سی
تسخیر هی مقصود تجارت تواسی سی
خالی هی صداقت سی سیاست تواسی سی
کمزور کا گهر هوتا هی غارت تواسی سی
اقوام مین مخلوق خدا بٹتی هی اسی سی
قومیت اسلام کی جرکتی هی اسی سی

"এরই ফলে সৃষ্টি হয় দ্বন্দ্ব
বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে
বিশ্বজয়ই লক্ষ্য হয়ে উঠে
ব্যবসা বাণিজ্যের;
এরই ফলে রাজনীতি হয়
ন্যায়নীতির সম্পর্ক বর্জিত,

দুর্বলের সংসার হয় বিপর্যস্ত
এরই প্রভাবে।
জাতীয়তাবাদ বিচ্ছিন্ন করে দেয়
মানব ঐক্যের বন্ধন,
ইসলামী কাওমিয়াতের
বন্ধন হয় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন।[৪৩](পৃ:-৪৬)

ইকবাল কাব্যে এক দিকে যেমন প্রকট হয়ে উঠেছে ইউরোপের উগ্র জাতীয়তাবাদের তীব্র প্রতিবাদ এবং এর প্রতি অপরিসীম ঘৃণা, তেমনি অপর দিকে রয়েছে ইসলামী জাতীয়তার প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাস এবং এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। 'রমুজে বেখুদী' গ্রন্থে তিনি বলেন–

قلب ما از هند و روم و شام نیست
مرزو بوم او بجز اسلام نیست
مسلم استی دل باقلیمی مند
گم مشو اندر جهان چون وچند
دل بدست آور که پنهائی دل
من شود گم ابن سرائی آت گل
از رسالت درجهان تکوین ما
از رسالت دین ما ایمان ما

"অন্তর আমাদের যুক্ত নয়
সিরিয়া, তুরষ্ক বা ভারতের সাথে
জন্মভূমি তার আর কোথাও নয়
ইসলাম ছাড়া;
মুসলিম তুমি–
আবদ্ধ করো না তোমার অন্তর
কোনো দেশের বন্ধনে,
হারিয়ে ফেলো না তোমার আপনাকে
বিরোধের বিশ্বে;
জয় কর অন্তর,
কারণ তার বিপুল প্রসারের মাঝে
আত্মবিলুপ্ত হতে পারে
জল ও কর্দমের সমগ্র পান্থ নিবাস।
নবুয়তের ভিত্তিতে কায়েম হয়েছে
আমার অস্তিত্ব দুনিয়ার বুকে,
নবুয়তের ভিতরেই নিহিত রয়েছে
আমার দ্বীন ও ঈমান।[৪৩](পৃ:-৪৭)
(রমুযে বেখুদী: পৃ: ১২৯-১৩০)

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান স্বদেশিকতাবাদকে সমাজ সংস্থার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছে; এটিই তাদের দ্বীন, এটিই তাদের ঈমান। তারা নিজেদের দেশকে বসিয়েছে ঠিক আল্লাহর স্থানে। দেশরক্ষার জন্যে জান-মাল, দ্বীন-ধর্ম ও নৈতিক মূল্যমান– এক কথায় সব কিছু বিসর্জন দিতেও তারা প্রস্তুত। আল্লামা ইকবাল এ ধরনের

স্বদেশিকতায় আদৌ বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি একে ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত এক মতাদর্শ আর ধর্মের পরিভাষায় একে একটি 'নবসৃষ্ট দেবতা' বলে অভিহিত করেছেন। একে চূর্ণ–বিচূর্ণ করতে না পারলে দ্বীন ও ধর্মের ধ্বংস অনিবার্য বলে তিনি মত প্রকাশ করেছেন।

اس دور مین مئی اورهی جام اورهی جم اور
ساقی نی بناکی روش لطف وکرم اور
مسلم نی بهی تعمیر کیا اپنا حرم اور
تهذیب کی ازرنی ترشوائی صنم اور
ان تازه خداؤن مین براست سی وطن هی
جوپیراهن اس کاهی وه مذهب کا کفن هی
یه بت که تراشیده تهذیب نوی هی
غارت گر کاشانه دین نبوی هی
بازو ترا توحید کی قوت سی قوی هی
اسلام ترا دیس هی تو مصطفوی هی
نظاره دیرینه زمانی کو دکهادی
ای مصطفوی خاك مین اس بت کو ملادی

এ যুগের সুরা, পানপাত্র, সুরাপায়ী
সব কিছুই নতুন,
সাকী উদ্ভাবন করেছে প্রেম ও জ্বালার নতুন ধরন।
মুসলিম তৈরী করেছে
নতুন হেরেম
সভ্যতার মূর্তি নির্মাতা গড়ে তুলেছে নতুন মূর্তি।
এসব নব সৃষ্টি উপাস্যের মধ্যে
সবার বড় ওয়াতান-
তার যা দেহাবরণ,
তা হচ্ছে ধর্মের কাফন।
যে মূর্তি গড়ে তুলেছে এ নতুন সভ্যতা,
ধ্বংস করেছে সে 'দ্বীনে নববীর' আগার।
বাহু তোমার বলিষ্ঠ তাওহীদের শক্তিতে,
ইসলাম তোমার দেশ।
আর তুমি হচ্ছো মুস্তাফার অনুসারী।
হে মুস্তফার অনুসারী!
চিরন্তন দৃষ্টিভঙ্গি এনে দাও
এ নতুন যুগের চোখে,
এ মূর্তির আবর্জনা মিলিয়ে দাও
মাটির সাথে।[৪৩](পৃ:-৪১,৪২)
(বাঙ্গে দারা, পৃ: ১৭৩)

ইকবাল স্বদেশিকতাবাদের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর মতে এটি মানুষের মধ্যে এক কৃত্রিম ব্যবধান সৃষ্টি করে বলে এর এক নাম 'মূর্তিপূজা'। ইকবাল বলেন, মানুষ মূর্তি রচনা ও মূর্তি পূজায় এমনই অভ্যস্ত হয়ে

পড়েছে যে, এর একটি চূর্ণ হলে নতুন আর একটি রচনা করে ও ঐটির পূজায় নতুন উদ্যমে লিপ্ত হয়। নিত্য নতুন মূর্তি রচনা ও মূর্তি পূজার এ ধারা আদিকাল হতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত একই ধারায় চলে আসছে। কবি বলেন–

فکر انسان بت پرستی بت گری
هر زمان در جستجوئی پیکری
باز طرح آذری انداخت است
تازه تر پروردگاری ساخت است
کاید از خون اندر طرب
نام او رنگ است وهم ملك و نسب
ادمیت کشته شد چون گوسفند
پیش پائی این بت نا ارجمند

মূতি নির্মাণ আর পূজা পর্বন গোড়া তেকেই মানুষের স্বভাব
সন্ধান করে তারা কালে নব নব মূর্তির
ধরেছে তারা এখন আবার আযরের পথ,
দাঁড় করেছে আবার নবতর খোদা্
নর্তন করছে আনন্দে তারা রক্তপাত করে;
তাদের খোদাসমূহের নাম হলো বর্ণ, দেশ আর বংশ।
বলি দেয়া হচ্ছে মানবতা অশুভ মূর্তির পদ্বতলে
ভেড়া বকরির মত।[২](পৃ:-৭০,৭১)
(আসরারে খুদী, রুমূযে বেখুদী, পৃ: ১৬৩)

ইকবাল বলেন, এ মূর্তিগুলোর বাহ্যিক রূপ ও আকার আকৃতিতে কিছুটা বৈষম্য থাকলেও মূলত এদের মধ্যে কোনোই পার্থক্য নেই। অতএব মানবতার মুক্তির অভিযানে যেখানে অসংখ্য বিগ্রহ চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হয়েছে, সেখানে স্বদেশিকতার এই নবতর বিগ্রহকেও অনতিবিলম্বে চূর্ণ করা মানবতার মুক্তির জন্যে অপরিহার্য। তিনি বলেন–

ای که خور دستی زمینائی خلیل
گرمی خونت زصهبائی خلیل
برسراین باطل حق پیرهن
تیغ لاموجود الا هو بزن

"পান করেছো তুমি খলিলের জাম থেকে,
তপ্ত হয়েছে তোমার শোনিত
তারই সুরা রসে;
আঘাত করো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুর তরবারি দ্বারা
অসত্যের মস্তকে।[৪৩](পৃ:-৪৩)

ইকবাল স্বদেশিকতা ও সংকীর্ণ অঞ্চলভিত্তিক জাতীয়তার দাসত্ব হতে মুক্তি লাভের জন্যে বিশ্বমানবকে উদাও আহ্বান জানিয়েছেন। ইকবাল ঘোষণা করেছেন :

یهی مقصود فطرت هی ، یهی رمز مسلمانی
اخوت کی جهان گیری محبت کی فراوانی

Dhaka University Institutional Repository

بتان **رنگ و** خون کوتور کر ملت مین گم هوجا

نه تورانی هی باقی نه ایرانی، نه افغانی-

ভ্রাতৃত্বের বিশ্ব-ব্যাপকতা, প্রেম প্রাচুর্য
এই হচ্ছে প্রকৃতির চাহিদা
আর মুসলমানীর মূলতত্ত্ব।
বর্ণ ও রক্তের গড়া মূর্তিকে বিচূর্ণ কর;
আত্মবিলোপ কর মিল্লাতের মাঝে,
তোমার পরিচয় হবে না
তুরানী, ইরানী বা আফগানী বলে।[৪৩](পৃ:-৪৩)

তাইতো ইতিহাস খ্যাত ব্যক্তিত্ব তারিক ইবনে যিয়াদ স্পেন উপকূলে পৌঁছে নিজেদের সব পোত জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন যেন কারো মনে দেশে ফেরার চিন্তা না জাগে। বস্তুত তিনি এ কাজটি করে দেশ-চিন্তা ও দেশ-পূজার মূলে আঘাত হেনেছিলেন। ইকবাল 'আল মুল্‌কু লিল্লাহ' শীর্ষক কবিতায় বলেন :

طارق چو بر کناره اندلس **سفینه سوخت**

گفتند کار تو به نگاه خرد **خطاست**

خندید و دست خویش به شمشیر برد **وگفت**

هرملک ملک ماست که ملک خدائی ماست

জ্বালিয়ে দিলেন তারিক সবগুলো পোত স্পেন উপকূলে,
বললো লোকেরা এ কাজ ভ্রান্ত বুদ্ধিমানের চোখে।
হেসে ধরলেন তরবারি হাতে, আর উঠলেন বলে তিনি
প্রতিটি দেশ, আমাদের দেশ, আমাদের আল্লাহর দেশ।[২](পৃ:-৭৩)
(পায়ামে মাশরিক, পৃ: ১৫০।)

অন্যত্র ইকবাল বলেন :

مؤمنان راگفت ان سلطان دین ص

مسجد من این همه روئی زمین

الامان از گردش نه اسمان

مسجد مؤمن بدست دیگران

মুমিনদের বললেন, সেই দীনের সুলতান (সা:)
'জগত বক্ষ জোড়া আমার মসজিদ।'
রাখতে পারে না ধরে আমাদের, নভোমন্ডলের আবর্তন
মুমিনের মসজিদ যখন রয়েছে অন্যদের অধিকারে।[২](পৃ:-৭৩)
(পাস্ চে বায়াদ কারদ, পৃ: ২৫)

মুসলিম জাতীয়তাবাদের ভিত্তি দেশ না হলেও ইকবাল স্বদেশ প্রেম বিরোধী ছিলেন না। তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের জন্মভূমি কাশমীর প্রসঙ্গে একাধিক কবিতা লিখেছেন। দেশপ্রেম একটি স্বভাবজাত বস্তু। তাই

মানুষ জন্মভূমিকে ভাল না বেসে পারে না। তবে মনে রাখতে হবে, মুসলমান দেশের বান্দা নয়, আদর্শের বান্দা। আল্লাহর খিলাফত প্রতিষ্ঠা করাই মুসলমানের আদর্শ। মুসলমান আদর্শের জন্যে স্বদেশ ত্যাগ করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। আল্লাহর আদেশ রয়েছে : اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيْهَا –"পৃথিবী কি এমন প্রশস্ত ছিল না, যেখানে তোমরা হিজরত করতে।"(আল কুআন, সূরা নিসা, আয়াত ৯৭)

নবীজী (সা:) এই আদেশ পালন এবং একটি মুসলিম তথা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নিজ জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। এই ত্যাগের উদ্দেশ্য ছিল বৃহত্তর অঙ্গনে ইসলামী আদর্শের প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠা। ইকবাল নবীজীর হিজরতের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেন :

عقده قوميت مسلم كشود
از وطن اقائی **ما هجرت نمود**
حكمتش يک ملت گيتی نورد
براساس كلمه تعمير كرد
هجرت ائين حيات مسلم ست
اين ز اسباب ثبات مسلم است

ত্যাগ করেন দেশ আমাদের মনিব (নবীজী),
করেছেন মুসলিম জাতীয়তাবাদ-সমস্যার সমাধান।
ছিল উদ্দেশ্য তাঁর, এক বিশ্বজোড়া মিল্লাত গঠন,
রাখেন ভিত্তি এর, কালেমায়ে তাওহীদের উপর।
হিজরত মুসলিম জীবনের আইন,
এ হলো মুসলিমের প্রতিষ্ঠা লাভের কারণ।[২](পৃ:-৭৪)
(আসরার ও রুমূয, পৃ: ১৩১)

ইকবালের দৃষ্টিতে জাতীয়তা ও স্বদেশিকতা ইসলামের বিশ্বব্যাপক ও আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ১৯৩৮ সালে এক প্রবন্ধে তিনি স্বদেশিকতার দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে স্পষ্ট ভাষায় একে ইসলাম পরিপন্থী বলে ঘোষণা করেছেন :

زمانه كی سياسی **لريجر مين** وطن كامفهوم محض جغرافيائی نهين بلكه وطن، ايک اصول هی هيئت اجتماعيه انسانيه كا اوداسی اعتبارسی يه ايک سياسی تصورهی، چونكه اسلام بهی هيئت اجتماعيه انسانيه كا **ايك قانون هی** اسلئی **جب لفظ وطن كو ايك سياسی تصور پر استعمال كيا جاءی** تو وه اسلام سی متصادم هو تاهی -

"আধুনিক যুগের সাহিত্যে 'ওয়াতান' (স্বদেশ) নিছক কোনো ভৌগোলিক অর্থেরই ধারক নয়; ওয়াতান হচ্ছে মানবীয় সমাজ সংগঠনের একটি বিশেষ আদর্শ এবং এই হিসেবে এটি একটি রাজনৈতিক মতাদর্শও বটে। যেহেতু ইসলামও মানবীয় সমাজ সংগঠনেরই একটি বিধান, তাই ওয়াতান শব্দটি রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসেবে ব্যবহৃত হলে তা নিশ্চিতরূপে ইসলামের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।"[৪৩](পৃ:-৫১)

ইকবালের দৃষ্টিতে ইসলাম উন্মোচিত হয়েছিল এক পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে এবং এ ব্যবস্থার অনুসারীদেরকে তাই কুরআনী জীবন বিধানের আলোকে উম্মাহ বলতে তিনি অধিকতর আগ্রহী ছিলেন। কারণ উম্মাহর মধ্যে বিধৃত হয়েছে এক বিশ্বাসী চেতনায় সংঘবদ্ধ জাতি। পাশ্চাত্য জাতীয়তার ভিত্তি যখন ভূ-খন্ডগত

সীমানা কিংবা বর্ণ ও গোত্র; মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তি তেমনি ধর্ম। ইকবাল মিল্লাত শব্দ ব্যবহার করেছেন দেশপ্রেম অর্থে। তাঁর কাছে স্বদেশিকতার মূল্য ছিল। যে বিচিত্র সংস্কৃতির আচ্ছাদনে তিনি লালিত কিংবা যে আবহাওয়ায় তিনি পরিপুষ্ট সেই বিশেষ স্থানটিকে প্রীতির চোখে দেখা তাঁর নীতির স্বপক্ষে কর্ম হিসেবেই বিবেচিত হত; কিন্তু স্বদেশিকতার নামে কোনো অবিবেচক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড কিংবা স্থিতিহীন মূল্যবোধ চাপিয়ে দেয়ার পক্রিয়া তার কাছে ইসলামের আন্তর্জাতিক রীতি বিরুদ্ধই মনে হতো।

বস্তুত আদর্শিক দিক দিয়ে ইকবাল একজন জাতীয়তাবাদী ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, বিশ্বের সব মুসলমানের নিজেদের একই সম্প্রদায়ের লোক মনে করা উচিত। তিনি বার বার তাঁর সময়কার মুসলমানদের মধ্যকার নানা ধরনের বিভাজনে হতাশা ব্যক্ত করেছেন, তবে তিনি ভৌগলিক কিংবা বর্ণবাদী জাতীয়তাবাদের কছে নিজেকে সমর্পণ করেন নি। তাঁর এ অবস্থান সম্পর্কে জাভিদ ইকবাল বলেন,

> Iqbal asserted, Islam is hostile to nationalism when nationalism isolated itself from Islam and as a Political creed based exclusively on race, color language or territory puts forth rival claims in opposition to those of Islam.[৫৮(পৃঃ-২১)]

ইকবাল ইসলামের আন্তর্জাতিকতার দিকটি তুলে ধরেন। তিনি বলেন,

> Islam is neither nationalism nor imperialism but a 'common wealth of nations' which accepts the social diversity and the ever changing geographical demarcations only for facility of reference and not for limiting horizon of its member.[৫৮(পৃঃ-২১)]

ইউরোপীয় জগতে উগ্র স্বদেশিকতা কিংবা জাতীয়তাবাদ যে পারস্পরিক ঘৃণা, বিদ্বেষ ও অনৈক্যের বীজ উপ্ত করেছে ইকবাল তার বিরুদ্ধে হুশিয়ার করেছেন এবং ইসলাম জগতে এ মনোভাবের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র ধিক্কার জানিয়েছেন। প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ ড. নিকলসনের কাছে পাঠানো এক চিঠিতে তিনি এর বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়েছেন–

> Since I find that the idea of nationality based or race or territory is making headway in the world of Islam and since I fear that the Muslims, losing sight of their own ideal of a universal humanity, are being lured by the idea of a territorial nationality. I feel it is my duty as a Muslim and lover of all mankind, to remind them of their true function is the evolution of mankind. Tribal or national organizations on the lines of race or territory are only temporary phases in the unfoldment and upbringing of collective life and as such I have no quarrel with them; but I condemn them in the strongest possible terms when they are regarded as the ulitimate expression of the life of mankind.[৪২(পৃঃ-১২৯)]

একই চিঠিতে তিনি নিজেকে বিশ্বমানবতার বন্ধু হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কারণ, তিনি যে ইসলামী ঐক্যের ভিত্তি গড়ে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন তাকে অনেকেই উগ্র স্বধর্মপ্রীতি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু ইকবাল মনে করতেন ইসলামী সমাজ পুনর্গঠনের যে প্রক্রিয়া তা পৃথিবী থেকে বর্ণ, গোত্র ও জাতীয়তার বিলোপ ঘটাবে এবং ইসলাম এক সর্বমানবিক ঐশী সমতা বিধান করতে সমর্থ হবে। তিনি বুঝতে চেয়েছেন ইসলাম তার কাছে নিছক ধর্মের চেয়ে আদর্শের নমুনা হিসেবেই মঞ্জুরিত হয়েছে। কবি তাঁর জাভিদনামায় পাশ্চাত্যের এই অনৈক্যের মন্ত্র বিলোপ করে মুসলমানদেরকে এক বিশ্ব পর্যটকের আসনে সমুন্নত করেছেন–

পশ্চিমীরা ইসলামী দুনিয়ায়
জাতিপ্রেমের ঘোড়া হাঁকিয়েছে
হায়! জাতির দেবতা পৃথিবীতে এনেছে

হিংসা ও বৈরিতার রাহু
মুসলিম তুমি মুক্ত হও স্থানের আকর্ষণ থেকে
তুমি আটক নও সিরিয়া, প্যালেস্টাইন
কিংবা ইরাকে।[৪২](পৃ:-১২৯)

ইকবালের জীবদ্দশায় লীগ অব নেশনস আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে হঠাৎ আলোর ঝলকানীর মতো আবির্ভূত হয়েছিল। ইকবাল সুপরিজ্ঞাত ছিলেন পাশ্চাত্যের জাতিসমূহ যতই একত্রিত হবার মহৎ মন্ত্রে উজ্জীবিত হোক না কেন লীগ অব নেশনসের নৈতিক ভিত্তি বলতে কিছু নেই। সুতরাং সর্বজাতির ঐক্যের ধারণা শুধু পাশ্চাত্যের ফাঁকা বুলি মাত্র। এই কবিতায় তিনি উল্লেখ করেছেন–

বিশ্ব জাতিপুঞ্জ এখন ঝড় ও বজ্রে দুলছে
ওর কানে পৌঁছিয়েছে মৃত্যুর পরওয়ানা
যদিও খ্রীস্টান জগৎ অগ্রিম
উঠে পড়ে লেগেছে এরই জন্যে।[৪২](পৃ:-১৩০)
(যরবে কালীম)

ইকবাল জাতিসংঘকে পরিষ্কার ভাষায় 'কাফনচোর' আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর একান্ত বিশ্বাস, এখানেও ঠিক ইউরোপীয় জাতিসমূহের স্বভাবসিদ্ধ বিশ্বজয়ের চির পুরাতন কুটিল ষড়যন্ত্রই কাজ করতেছে। এখানেও সর্বজাতি সম্মেলনেই প্রধান– 'মানব সম্মেলনের' কোনো গুরুত্ব বা মর্যাদাই নেই। লীগ তার অস্থায়ী জীবনে দুর্বল জাতিদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে মোটেই সমর্থ হয় নাই এবং নিরস্ত্রীকরণ (Disarmament) প্রচেষ্টা রিমজে মেয়রের কথানুযায়ী (Armament) সশস্ত্রীকরণে পরিণত হয়েছে। ফলে পৃথিবীর উপর দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রলয়ংকর তাণ্ডবনৃত্য ঘটে গেল। আর লীগ জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে বাধ্য হলো। কবি বলেন–

بیچاری کئی روزسی دم نور رمی صی
درھی خبر بدنه میری منه سی نکل جائی
تقدیر تو مبرم نظر أتی ھی ولیکن
پیر ان کایساکی دعاھی نل جائی
কিছুকাল ধরে বেচারার
নাভিশ্বাস উঠে গেছে
ভয় হয়, আমারই মুখ থেকে
বেরিয়ে না পড়ে দুঃসংবাদ!
নিয়তি তার মনে হয়
অবধারিত,
যদিও গীর্জার যাজকরা
করে চলেছে তার শুভ কামনা।[৪৩](পৃ:-৪৮,৪৯)

ইকবাল ছিলেন বিশ্বপ্রেমিক; জাতীয়তাবাদের মানবতা সংহারী চিত্র তাকে পীড়িত করেছিল। দেশ, কাল ও পাত্রের বিভাজন মুছে দিয়ে তিনি সার্বজনীন মানবতাবাদী ইসলামের বিভূতি অঙ্গে মেখেছিলেন। তিনি মুসলমানের আন্তর্জাতিক চরিত্র চিত্রায়িত করেছেন তাঁর রমূযে বেখুদী নামক কাব্য গ্রন্থে এভাবে–

অন্তরে ঐক্য মিল্লাতকে আনে অস্তিত্বে;
এই সিনা প্রদীপ্ত সেই একক অগ্নিশিখায়;
জাতির থাকবে ধারণার ঐক্য,
একই উদ্দেশ্যের প্রবাহ থাকবে তার অন্তরে;
মনোভাবের ঐক্য
অনুপ্রাণিত করবে তার সত্তাকে;
তার ভালো মন্দের থাকবে একই নিদর্শন;
কি নির্বুদ্ধিতা দেশের সাথে মিল্লাতকে
অভিন্ন করা।
কি বোকামী আবহাওয়া, আর কর্দমের
পূজা?
বংশ গৌরবে স্ফীত হওয়া বোকামী
কারণ তার অধিপত্য শুধু দেহের উপর
আর দেহ হচ্ছে নশ্বর।
মুসলিম মিল্লাতের আছে সম্পূর্ণ আলাদা ভিত্তি
যে ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে
আমাদের অন্তরের তীর্থভূমিতে।[৪২](পৃ:-১৩১)

ইকবাল ও গণতন্ত্র :

পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের বিশ্লেষণ ও বিবেচনায় ইকবাল কুরআনী জীবন-বিধানকে আদর্শ হিসেবে সামনে রেখেছেন। তাই স্বভাবত ইকবালের গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে পর্যবেক্ষণ করতে হলে আমাদের পূর্বাহ্নেই পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ও ইসলামে এর উপযোগিতার একটি তুলনামুলক মূল্যায়ন প্রয়োজন।

ইসলামে আধুনিক কালের কোনো বিধিবদ্ধ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার উপস্থিতি নেই; বরং এর রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কার্যক্রমে বিজ্ঞজরনর পরামর্শ ভিত্তিক অংশ গ্রহণের চেতনাই প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে আইন প্রণয়নের যে বিধান রয়েছে এবং জনতার সার্বিক অংশ গ্রহণের মধ্যে এ পদ্ধতির কার্যকারিতা ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে- ইসলামে তার স্বীকৃতি নেই। এখানে আইন প্রণয়নের অধিকার একমাত্র আল্লাহ তা'আলার। তাঁর নাযিলকৃত বাণী যা কুরআনুল হাকীমে সংবিধিবদ্ধ রয়েছে, আর এটিই মুসলিম জাতির অপরিবর্তনীয় আইন হিসেবে গৃহীত। রাসূলে করীম (সা:) এর পূত জীবনাদর্শ ও কর্ম-পদ্ধতি যা হাদীস শরীফে বিধৃত হয়েছে তা এ ঐশী আইনের বুনিয়াদকেই মজবুত করেছে।

গণতন্ত্রে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার একটি ছক বাঁধা উপযোগিতা বর্তমান। আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এই গণতান্ত্রিক সাম্যাবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সকলের সমানাধিকারকে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, কিন্তু আইনের একটি সীমাবদ্ধতা আছে এবং এর উর্ধ্বে সাম্যাবস্থার এই ধারণা অনেকটা মরীচিকা সদৃশ।

পক্ষান্তরে ইসলামে এ ধারণা নৈতিকতাজাত এবং ঐশী প্রত্যাদেশ পুষ্ট। আল্লাহর সার্বভৌমত্বের সাথে তাঁর বিশ্বজনীনতা ও সর্বশক্তিমানত্বের যে ধারণা তাই বিশ্বাসীদের সমতা বিধান করেছে এবং মানুষে মানুষে পার্থক্যের জংলী ধারণার অবসান ঘটিয়েছে। ইসলামে সাম্যের উপলব্ধি ভ্রাতৃত্বের নৈতিকবোধে দীপ্ত এবং তা

উম্মাহর একজন পূর্ণাঙ্গ সদস্য হিসেবে। তাওহীদের মূলমন্ত্র ও নবী মুহাম্মদ (সা:)-এর জীবনাদর্শের প্রেক্ষিতে এ ভ্রাতৃত্বের জাগরণ সম্ভব হয়েছে। আল্লাহর কাছে গোত্রীয় প্রাধান্য অথবা বর্ণাশ্রমের কোনো আধিপত্য নেই; সেই শ্রেষ্ঠ যে বেশী তাকওয়াবান।[3]

ইসলামে স্বাধীনতার ধারণাও আল্লাহর সার্বভৌমত্বের নীতিমালার মধ্যে আশ্রিত। ইসলামের কালিমায় ঘোষিত হয়েছে– আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। এ প্রেক্ষিতে একজন বিশ্বাসীর পক্ষে আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো নির্দেশের আনুগত্য করা সম্ভব নয়। কেবলমাত্র শরীয়াতের রীতির মধ্যে থেকেই এ স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার রয়েছে। কিন্তু গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় আইনগত সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের দানব এ প্রক্রিয়াকে অকার্যকর করেছে এবং নৈতিকতার কোনো বাঁধন না থাকায় এখানে স্বাধীনতা অনাচারে পরিণত হয়েছে।

ইকবাল এমনি ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক চেতনার মৌলকেন্দ্র থেকে গণতন্ত্রের নিরীক্ষণ চালিয়েছেন এবং উল্লেখ করেছেন পাশ্চাত্যের এ উপকরণ বিশ্ব মানবতার উপর জুলুমের দানবকে তার আগ্রাসী হাত বিস্তারের সুযোগ করে দিয়েছে। বস্তুবাদী সভ্যতার এ হলো এক নবতর আত্মপ্রবঞ্চনা।

পাশ্চাত্যের বস্তুবাদীদের ধারণা, গণতন্ত্রকে তারা একটি সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে পরিণত করেছে এবং পরিণতিতে এটি এখন তাদের ঐতিহ্যে অবয়ব লাভ করেছে। কিন্তু ইকবাল দেখেছেন এই ঐতিহ্যের ধারক পেশাদার রাজনীতিবিদদের চিত্র, যাদের কারণে নিরীহ জনতার বুক চিরে হাহাকার ধ্বনি শোনা যায়। রাজনীতি ও আদর্শের নামে তারা মানবতাকে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী কায়দায় চালনা করে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যবহারও করে। ইকবাল তাঁর এক কবিতায় উল্লেখ করেছেন–

গণতন্ত্র হচ্ছে এক ধরনের পদ্ধতি
যাতে রাজনীতিবিদদের লেবাসে বাস করে
শয়তানী আত্মা
তাই দুনিয়ার বুকে শয়তানের প্রয়োজন
অনেক আগেই ফুরিয়েছে।[৪২](পৃ:-১০৯)
(বাল-ই-জিব্রিল)

ইকবাল আর এক কবিতায় পশ্চিমী গণতন্ত্রের মুখোশ উন্মোচন করেছেন এভাবে–

"এই কি সেই পশ্চিমী সভ্যতা
যা গণতন্ত্রের আওতায় জুলুমের দৈত্যকে
শৃঙ্খলমুক্ত করেছে
বিশ্বাস করো আমার কাছে এক খন্ড পোড়াজমি
পশ্চিমের ঐ কুঞ্জকাননের চেয়ে ঢের ভালো
ওরা যে নাগরিক রাতের মাহফিল সাজিয়েছে
তা বিস্তীর্ণ নীরবতার কাছেও হার মেনেছে
প্রাচ্যের এই ফকীরের বাণী কেউ যেন পৌঁছে দেয়

[3] إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ "তোমাদের মধ্য হতে সেই আল্লাহর কাছে অধিকতর সম্মানিত, যে অধিকতর আল্লাহভীরু' -আল-কুরআন, সূরা আল হুজুরাত, আয়াত-১৩।

ওদের কানে
গণতন্ত্র হচ্ছে এক কোষমুক্ত তরবারী
যার ধারে লুকিয়ে আছে ওদেরই মৃত্যুর পরওয়ানা।[৪২(পৃঃ-১০৯)]
(যবূর-ই-আজম)

ইকবাল গণতন্ত্রকে জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের সারিতে স্থান দিয়েছেন এবং বলেছেন, এই তিন উপাদান মানবতার ঐক্য ও প্রাণ হরণ করে নিয়েছে। মৃত্যুর কিছুকাল আগে (১জানুয়ারী, ১৯৩৮) লাহোর বেতার থেকে দেয়া নববর্ষের এক বাণীতে তিনি উল্লেখ করেন সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বের মূল্যবোধ গণতন্ত্রের আওতায় কখনো পরিচ্ছন্ন অবয়ব ধারণ করতে পারে না, প্রকারান্তরে তা এক কদর্য বিকৃতির স্বীকার হয়–

> So long as this so called democracy, this accursed nationalism and this imperialism are not shattered, so long as men do not demonstrate by their actions that they believe that the whole world is a family of God, so long as distinctions of race, colour and geographical nationalities are not wiped out completely, they will never be able to lead a happy and contented life and the beautiful ideals of liberty, equality, fraternity will never materialize.[৪২(পৃঃ-১১০)]

ইকবাল পশ্চিমী গণতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ উভয়কেই চিহ্নিত করেছেন এক বৈরী চেতনার প্রেক্ষাপট হিসেবে; কারণ প্রকৃতপক্ষে উভয়ই নাস্তিক্যবাদের আগাছাই বৃদ্ধি করছে। তিনি বলেন–

উভয়ই (পশ্চিমী গণতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ)
আল্লাহর থেকে গেছে দূরে সরে,
মানুষকে দিয়েছে ধোঁকা
মানবতা গুঁড়িয়ে যাচ্ছে তাদের যাঁতাতলে।
কেউ কেড়ে নেয় শরীর থেকে জীবন
আর কেউ হাত থেকে রুটি।[৪২(পৃঃ-১১০)]

ইকবাল তাঁর কবিতায় গণতন্ত্রের সমালোচনা করেছেন এভাবে- মূর্খ জনগণ এ পদ্ধতির আওতায় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে কিন্তু এর জটিলতা বুঝতে পারে না–

জনগণের স্মৃতিশক্তি হলো নিম্ন পর্যায়ের
আর মূর্খতার লেবাস গায়ে দিয়ে ঘোরা
তার অভ্যাস
রাজনীতি কত মুখর
কিন্তু হায়!
তার জটিলতা বোঝা তাদের অসাধ্য
জনতার নদীতে যদি ওঠে মুক্তবুদ্ধির ঢেউ
তারা বয়ে আনবে বিপর্যয়
আর সুবুদ্ধিকে যদি করো পণ্য
মুক্তবুদ্ধি হবে তোমার
পশু তৈরির কারখানা।[৪২(পৃঃ-১১০)]
(যরবে কালীম)

গণতন্ত্রের লাগামহীন চিন্তার স্বাধীনতা বিপজ্জনক পরিণতি ডেকে আনতে পারে। তিনি যখন বলেন–

কাওম হলো এক সাজানো বাগান
প্রত্যেক সদস্য যার একটি ফুলের তরু
কেউ যদি সুবুদ্ধির সীমা অতিক্রম করে
সে বাগান হবে ঝড় ও বজ্রে লণ্ডভণ্ড
আল্লাহর নিয়ামতে তুমি শুকরিয়া
আদায় করো
কারণ তা আলোকিত করেছে পৃথিবীকে
মুক্তবুদ্ধি হলো শয়তানের আবিষ্কার
মানুষকে যা নিক্ষেপ করেছে অন্ধকার আবর্তে।[৪২](পৃ:-১১১)
(বাল-ই-জিব্রীল)

ইকবাল তাই হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন উদার নৈতিক চিন্তার বাধনহারা অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে। কারণ এ প্রক্রিয়া ইসলামী চিন্তার সংহতিকে দুর্বল করে দিতে পারে যা উম্মাহর অস্তিত্বের প্রতি ঘাতক হয়ে দেখা দিবে। তিনি তাঁর সুপ্রসিদ্ধ মাদ্রাজ বক্তৃতায় এহেন দুদৈবের বিস্তৃত চিত্র এঁকেছেন–

> We heartily welcome the liberal movement in modern Islam; but it must also be admited that the appearance of liberal ideas in Islam constitutes also the most critical moment in the history of Islam. Liberalism has a tendency to act as a force of disintegration. Further, our religious and political performs in their zeal for liberalism may overstep the proper limits of reform in the absence of a check on their youthful fervour.[৪২](পৃ:-১১১)

ইকবাল বিশ্বাস করতেন, জনগণের স্মৃতিশক্তি কম আর মূর্খতার ভাগ অনেক বেশী। সুতরাং তার মতে, জনতার কাছ থেকে প্রত্যাশার কিছু নেই; সকলের উচিত একজন প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের নেতৃত্ব গ্রহণ করা–

متاع معنی بیگانه از دون فطرتان جوئی
زموران شوحنی طبع سلیمانی نمی اید
گریز از طرز جمهوری غلام پخته کار لی شو
که از مغز دوصدخر فکر انسانی نمی اید
"সন্ধান করছো অজানা ভাবসম্পদ
নীচস্বভাব মানুষের কাছে
সম্ভব নয় সোলায়মানের মহত্ত্ব প্রকাশ
পিপীলিকার পক্ষে।
বর্জন কর গণতন্ত্র আর আনুগত্য কর
জ্ঞানবুদ্ধ কর্মীর;
দুশো গর্দভের মস্তক
জন্ম দিতে পারে না
একটি মাত্র মানুষের জ্ঞান।[৪৩](পৃ:-৫৩)
(পায়ামে মাশরিক)

গণতন্ত্রের প্রতি তার অনীহার আর একটি প্রধান কারণ হলো এর নৈতিক সীমাবদ্ধতা। গণতন্ত্র চর্চার নামে এবং জনগণের আইন প্রণয়নের অন্তরালে অনেক নীতিহীন, মূল্যবোধ বর্জিত জীবনাচরণও আইনসিদ্ধ করা হয়। ফলে গণতন্ত্র হয়ে ওঠে দুর্বীনিত ও উদ্ধত। তার ভাষায়–

> Democracy has a tendency to foster the spirit of legality. This is not in itself bad; but unfortunatly it tends to displace the purely moral standpoent and to make the illegal and the wrong identical in meaning.[৪২(পৃ:-১১২)]

গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় ত্রুটি এই যে, এটি মানুষকে গণনা করতে জানে বটে, কিন্তু তার বুদ্ধিবৃত্তি ও মস্তিষ্কের ওজন করতে এটি মোটেই প্রস্তুত নয়। অথচ এই 'ওজন করা' ছাড়া সম্মিলিত সমাজ ব্যবস্থায় সুবিচার ও সুশৃঙ্খলা স্থাপিত করা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। 'জরবে কালীম' গ্রন্থ এ সম্পর্কে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন :

اس راز کو ایک مرد فرنگی نی کیا فاش !
هر چند که دانا اسی کهولا نهین کرتی
جمهوریت ایک طرز حکومت هی که جس مین
بندون کو گنا کرتی هین تولا نهین کرتی

ফাঁস করে দিয়েছেন জনৈক ইউরোপীয় লোক এ রহস্য,
খোলাখুলি বলেননি যদিও তা তথাকার অন্যান্য বুদ্ধিমান :
গণতান্ত্রিক সরকার পদ্ধতিতে গণনা করা হয় লোকদের,
কিন্তু হয় না তাদের মূল্যায়ন।[২(পৃ:-৬৮)]
(যরবে কালীম, পৃ: ১৫০)

গণতন্ত্রের সমালোচনায় ইকবাল মুখর, কারণ এ পদ্ধতি মানবতাকে অনৈক্য ও দৃষ্টিহীনতার মধ্যে ঠেলে দেয় এবং জাতি স্বার্থ ও দলাদলির পৈশাচিক অন্ধকারে হারিয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে তাঁর এ বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য–

> Democracy means rows. It anybody thinks that approach to democracy means sailing into a kind of lotus land he can not have read a word of history. The truth is exactly the opposite, Democracy lets loose all sorts of aspirations and grievances which were suppressed or unrealized under autocracy, it arouses hopes and ambitions often quite unpractical and relies not on authority but on argument or controversy from the platform, in the press, in Parliament, gradully to educate people to the acceptance of a solution which may not be ideal but which is the only practical one in the circumstances of the time.[৪২(পৃ:-১১২)]

একই অনুভূতি বিধৃত হয়েছে তাঁর আর একটি কবিতায় যেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন–

"জনতার হাতে যদি অর্পিত হয়ে সার্বভৌমত্ব
জীবন দুলে উঠবে বজ্র ও বাষ্পে
ইনসানের দিল থেকে রহম যাবে উঠে
হামদর্দী পরিণত হবে শুকনো কাঠে।[৪২(পৃ:-১১৩)]
(পায়াম-ই-মাশরিক)

ইকবালের বিবেচনায় পশ্চিমী গণতন্ত্র রাজনীতি থেকে ধর্মকে পৃথক করে শোষণের মন্ত্রকে উজ্জীবিত করেছে। সরকার হয়েছে জুলুমবাজীর বাহন। খিযর-ই-রাহ কবিতায় ইকবাল এক নাটকীয় প্রেক্ষাপট সৃষ্টি করে আধুনিক দুনিয়ার সমস্যাগুলো বিবৃত করেছেন।

هی وهی ساز کهن مغرب کاجمهوری نظام
جس کی پردلی مین نهین غیر از نوائی قیصری
دیو استبداد جمهوری قبا مین پائی کوب
تو سمجهتاهی یه ازادی کی نیلم پری

পশ্চিমী গণতন্ত্রের সেই প্রাচীন ভেরী
ধ্বনিত হয়ে যাতে
সাম্রাজ্যবাদের সুর,
স্বৈরাচার দৈত্যের তাণ্ডবনৃত চলছে
গণতন্ত্রের ছদ্মাবেশে,
তাকেই তুমি মনে কর
আযাদীর নীলপরি।[৪৩](পৃ:-৫৫)
(বাঙ্গ-ই-দারা)

কবির আরমুগান-ই-হিজায তাঁর পরিণত জীবনের অন্তর্দৃষ্টির ফল। ইকবালের অসামান্য প্রতিভা এ কাব্যে যেন উজ্জ্বল আলোকে মূর্ত হয়ে উঠেছে। অত্যন্ত সফলতার সাথে তিনি এ কাব্যাংশে পশ্চিমী গণতন্ত্রের কপট চেহারা তুলে ধরেছেন। ইবলিস কি মজলিস-ই-শুরা বা শয়তানের পরামর্শ পরিষদ নামের কবিতায় তিনি দেখিয়েছেন, আধুনিক মানুষের পরিণতি নিয়ে শয়তানের উপদেষ্টাদের মধ্যে বিতর্ক এবং এক পর্যায়ে দ্বিতীয় উপদেষ্টা পরিষদে প্রশ্ন রাখে জনগণের সার্বভৌমত্ব কি মানবতার জন্যে আশীর্বাদ না অভিশাপ হয়ে দেখা দেবে? তারা কি পৃথিবীর এ সাম্প্রতিক পরিবর্তনের প্রতি নজর দিয়েছে? প্রথম উপদেষ্টা তার প্রত্যুত্তরে কোনো প্রকার বিস্ময় প্রকাশ না করে বলে, এতে চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই যেহেতু আধুনিক মানুষ গণতন্ত্রের লেবাসে রাজতন্ত্রকেই পুনর্বাসিত করেছে। প্রথম উপদেষ্টার ভাষ্য ছিল এ রকম–

জানি তাহা সখা; কিন্তু আমার বিশ্বজ্ঞানের বিজ্ঞতাতে
বলিতেছি এটি বহু পুরাতন, বিপদ কিছুই নাহিক তাতে
আমরাই আজ বাদশাহীকে যে সাজিয়েছি গণ-পোশাক সাজে
যখন দেখেছি আত্মবোধন কিছুটা জেগেছে মানুষ মাঝে।
রাজ্য-শাসনরীতির তত্ত্ব গুরুতর এক হেয়ালি যার-
রাজা ও নেতার সংজ্ঞার মাঝে খুঁজে পাবে নাকো অর্থ তার
গণপরিষদ কিংবা তখত একই চিত্রের দুইটি দিক,
অপরের জমি প্রতি যার চোখ, সেই রাজা নাম যাহাই নিক।
তুমি কি দেখনি কি রূপ ধরেছে পশ্চিমে গণতন্ত্র রাজে?
মুখেতে সদাই স্ফুরিছে হাস্য, অন্তরে তার চেঙ্গিস রাজে।[৪২](পৃ:-১১৫)
(আরমুগানে হিযায)

গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর এ বৈরাগ্যের অন্যতম আরো একটি কারণ হলো গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুঁজিবাদীরা সাধারণ মানুষের শোষণকারীতে পরিণত হয় এবং জনতা অনেক ক্ষেত্রেই দুঃখ ও বেদনার দুর্দৈবে নিক্ষিপ্ত হয়। যেমন ইকবালের মত এ ডি. লিন্ডসে বলেছেন–

> Ignorant masses become puppets in the hands of clever politicians and in a situation like this power is concentraled into the hands of a group of persons who conveniently exploit the masses.[৪২(পৃঃ-১১৫)]

ইকবালের এ দৃষ্টিভঙ্গি কোনো নিরালম্ব চিন্তার অংশীদার নয়। গণতন্ত্রের এ সীমাবদ্ধতা ও দৃষ্টিহীনতার বিরুদ্ধে অনেকেই সোচ্চার হয়েছেন এবং এর প্রতিষ্ঠিত দুর্বলতার বিরুদ্ধেও আওয়াজ তুলেছেন। প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী উইলিয়াম র‍্যালফ ইঞ্জ গণতন্ত্রের এ দুর্বলতার দিকে এভাবে ইঙ্গিত করেছেন–

> Democracy is a fair weather political ereed. It works modertely well where a nations is fundamentally united- but it can not deal with anti social conspiracies. In practice, where a country is eithere engaged in a serious war or in danger of revolution, democratic institutions are suspended.[৪২(পৃঃ-১১৩)]

ইকবালের দৃষ্টিতে পশ্চিমী গনতন্ত্র মানবতার কল্যাণে উপযোগী হতে পারে না। কারণ মূর্খ জনতার কাছ থেকে প্রাপ্তির কিছু থাকে না। ইকবালের এই চিন্তার অংশীদার হয়েছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্কামপিটার ও আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক পূরোধা হ্যারল্ড লাস্কী। তিনি বলেন–

> A legislative assembly is neither a collection of specialists nor a body of statesman. It is an average sample of ordinary men, deflected now this way, now that, by a drift of public opinion.[৪২(পৃঃ-১১৩)]

ইকবালের এ পর্যবেক্ষণ এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর ধারণা কোনো রাজনৈতিক পদ্ধতিই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না যতক্ষণ না তার শরীরে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ ক্রিয়াশীল হবে। তিনি দৃঢ়তার সাথে এ মত প্রকাশ করেন, একমাত্র ইসলামের মধ্যেই এই নৈতিক উপকরণ কার্যত বর্তমান যা মানবতাকে সকল প্রকার দুর্বীনিত আচরণের উর্ধ্বে রাখতে পারে। ১৯১৭ সালের ২৮ জুলাই নিউ এরা পত্রিকায় ইকবাল তাঁর এ মতামতের মূল্যায়ন করেছেন এভাবে–

> The Democracy of Europe- over shadowed by socialistic agitation and anarchical fear originated meinly in the economic regeneration of European societies. Neitzche, however abhors this rule of the herd and hopeless of the plebian, he bases all higher culture on the cultivation and growth of an Aristocracy of Superman. But is the plebian so absolutely hopeless? The Democracy of Islam did not grow out of the extension of Economic opportunity, it is a spiritual principle based on the assumption that every human being is a centre of latent power the possibilities of which can be developed by cultivating a certain type of character, out of the plebian material, Islam has formed men of the noblest type of life and power. Is not then the Democracy of early Islam an experimental refutation of the ideas of Nietzsche.[৪২(পৃঃ-১১৫)]

ইকবাল মনে করেন ইসলাম বর্তমান শতকের জটিল সমস্যারাজির অভ্রান্ত পরিত্রাণকারী। তা মানবতার মর্যাদাকে সুউচ্চ করেছে এবং শাসন রীতি পদ্ধতিতে আধ্যাত্মিক প্রেরণার জন্ম দিয়ে একটি প্রাণপূর্ণ নিষ্কলুষ সামাজিক প্রগতিকে নিশ্চিত করেছে। ইকবাল মনে করেন, মুসলিম জনতার অনুভূতির জাগরণ ও মুক্তি যা

কেবল আধ্যাত্মিক নীতিমালাকে প্রাত্যহিক জীবনে সুচারুরূপে বাস্তবায়নের মাধ্যমে কার্যকর করা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে ইকবাল উল্লেখ করেন–

> Let the Muslim of today appreciate his position reconstruct his social life in the light of ultimate principles, and evolve out of the hither to partially revealed purpose of Islam, that spiritual democracy which is the ultimate aim of Islam.[৪২(পৃঃ-১১৬)]

ইসলামী শাসননীতির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য যা ইকবালকে অনুপ্রাণিত করেছে তা হলো আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ধারণা, যা মানব চরিত্রকে নির্ভীক ও অকুতোভয় করে তোলে। ন্যায়ের সমর্থন ও অন্যায়ের প্রতিরোধের মধ্যে যে ইসলামী জিন্দেগীর সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে তা এই খোদায়ী সার্বভৌমত্বের তুরুছায়ায় বর্ধিত হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে যে কেউ সামাজিক নেতৃত্বকে প্রশ্ন করতে পারে; অবশ্যই তা ঐশী নীতিমালার পরিকল্পনাধীন হতে হবে। ইকবালের ধারণা, ইসলামে বিধৃত এই নীতিমালা পাশ্চাত্যের তথাকথিত উদারনৈতিক গণতন্ত্রের চেয়ে উত্তম, কারণ পশ্চিমী গণতন্ত্র প্রচারণা ও দলাদলির গহীন অন্ধকারে ডুবে আছে এবং গণঅধিকার ও গণসম্মান-নিরাপত্তার ঐতিহ্য শুধুমাত্র কাগুজে বস্তুতে পরিণত হয়েছে। ফলে পশ্চিমী গণতন্ত্রে প্রদত্ত স্বাধীনতা হলো জনগণের জন্যে এক প্রহেলিকা। ইকবালের বিবেচনায় তাই একমাত্র খোদা প্রদত্ত পদ্ধতি ও শৃঙ্খলা ব্যতীত যে কোনো ধরনের মানব রচিত নীতিমালা স্বাধীনতা ও প্রগতির নিয়ামক হতে পারে না। ইসলামের এই মৌলিকত্বই একজন মুসলমানকে নির্ভীক ও সংগ্রামী চেতনার অধিকারী করে তোলে। ইকবাল বলেন–

> The cultural proposition which regulates the structure of Islam then, is that there is fear in nature and the object of Islam is to free man from fear, this view of the universe indicates also the Islamic view of the metephysical nature of man. If fear is the force which dominates man and counteracts his ethical progress man must be regarded as a unit of force, an energy a will, a germ of infinite power, the gradual unfolding of which must be the object of all human activity.[৪২(পৃঃ-১১৬,১১৭)]

ইকবালের মনসপটে ছিল এক রৌদ্রকরোজ্জ্বল আলোকদীপ্ত ইসলামী খিলাফতের স্বপ্ন। আল্লাহর রাসূল (সা:) এবং তাঁর পুন্য খলিফা চতুষ্টয়ের জীবদ্দশায় সে সম্ভাবনা একবার মূর্ত হয়ে উঠেছিল এবং প্রচণ্ড অমিততেজ ও বলিষ্ঠতা নিয়ে পৃথিবীর সকল কল্যাণকামিতাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। ইকবাল আধুনিক কালেও এই সুসমন্বিত সমাজ ব্যবস্তার নবরূপায়ণ কামনা করেছেন এবং বস্তুবাদী সভ্যতার বিপরীতে অনাগতকালের ইসলামের প্রাণ চেতনাকে ধারণ করেছেন। তাঁর গোচরীভূত ছিল, ইসলামী খিলাফত উমাইয়া, আব্বাসীয় ও পরবর্তীকালে মুসলিম শাসকদের হাতে যা কদর্যরূপ পেয়েছিল এবং খিলফাত তার মৌলিক চরিত্র হারিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা:)-এর পূত জীবনাদর্শ থেকে পরবর্তীকালের মুসলমানরা কোনো প্রেরণা সৃষ্টিকারী উপমাই উপস্থাপন করতে পারেনি। কিন্তু ইকবাল নৈরাশ্যবাদী ছিলেন না। জীবনের গহীন অন্ধকারেও নতুন দিনের স্বপ্ন গীতিকা তার কবিতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। বেদনার 'অশ্রুভেজা' পথ ছেড়ে তাঁর মুসাফির ভবিষ্যৎ মানবতার চিত্রপটে এক কল্যাণ সূর্যকে স্বাগত জানিয়েছে। ইসলামী খিলাফতের জাগরণ ও অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে ইকবাল মানুষের সেই বিরামহীন সফলতা ও অগ্রযাত্রার পথ উন্মোচন করেছেন। তিনি বিশ্বমানবতাকে গণতন্ত্রের ফাঁকি ও প্রতারণা থেকে হুঁশিয়ার করে, প্রেম, ভালোবাসা, জনসেবা, সুদৃঢ় ঈমান ও পরিপূর্ণ বিশ্বাস দিয়ে বিশ্বজয় করার 'সবক' শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেন–

Dhaka University Institutional Repository

ولایت پادشاهی هو , علم اشیاکی جهانگیری
یه سب کیاهین فقط ایک نقطه ایمان کی تفسیرین
یقین محکم, عمل پیهم, محیت فاتح عالم
جهاد زندگانی مین یه هین مردون کی شمشیرین
"বাদশাহীর ঐশ্বর্য আর বস্তুবিজ্ঞানের ব্যাপ্তি–
সব কিছুই হচ্ছে ঈমানের বাস্তব অভিব্যক্তি।
সুদৃঢ় প্রত্যয়, অবিরাম কর্মচঞ্চলতা
আর বিশ্বজয়ী প্রেম
এই হচ্ছে শানিত কৃপাণ
জীবনের সংগ্রামক্ষেত্রে।[৪৩](পৃ:-৫৭)

ইকবাল ও কমিউনিজম :

পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র এক হিসেবে নিছক অর্থনৈতিক ব্যাপার হলেও রাজনীতির সাথে এর নিবিড় ও নিকটতম সম্পর্ক বিদ্যমান। এইজন্যে ইকবালের রাজনৈতিক দর্শন আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিও নিরীক্ষণ একান্ত অপরিহার্য।

আধুনিককালের কমিউনিজম এক বিপ্লবী শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী ব্যবস্থাপনায় যে জুলুম ও বেইনসাফীর পাহাড় উদগত হয়েছে এবং সাধারণ মানুষের রক্ত ও ঘামে এক শ্রেণীর মানুষের হাতে জমে উঠেছে বিত্তের অথৈ মেলা, তার বিপরীতে কমিউনিজম যে শ্রেণিহীন সাম্যবাদী সমাজের পোষকতা করেছে তা দেশে দেশে দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের পর কমিউনিজম বিশ্ব রাজনীতির এক নবতর শক্তি হিসেবে বিবেচিত হয় এবং পুঁজিবাদী দেশগুলোর কাছে আতঙ্ক ও বিভীষিকার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

কমিউনিজমের মৌলিক চেতনাটি সম্প্রসারিত হয়েছিল এভাবে : সকল সম্পত্তির ব্যক্তিগত কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক অধিকার বিলোপ করে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব গ্রহণ এবং রাষ্ট্রীয় পরিচালনাধীন দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের সম্প্রসারণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা। রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রয়োগ করে অর্থনীতির ক্ষেত্রে সামাজিক বৈষম্যের অবসান এবং সম্পদের সমবন্টনের মাধ্যমে সামাজিক কল্যাণ ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা। সকলের প্রয়োজনের দিক লক্ষ্য রেখে তা পরিপূরণ করা এবং শ্রমের সমবিভাজনের মাধ্যমে একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের উত্তরণ ঘটানো।

কমিউনিজমের এ ধারণা মূলত মার্কস ও এঙ্গেলসের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রভাবিত। তাদের দৃষ্টিতে মানব সভ্যতা একটি ক্রমাগত শ্রেণী সংঘাত এবং জালিম ও মজলুমের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের পরিণতি। এ দ্বন্দ্ব নিশ্চিতভাবেই অর্থনৈতিক বৈষম্যজনিত। আশ্চর্যের ব্যাপার হল এই কমিউনিজম একটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা হিসেবে বিকাশ লাভ করলেও পরবর্তীকালে মার্কস এর একটি দার্শনিক রূপরেখা দেয়ার চেষ্টা করেন এবং একই প্রেক্ষাপটে তিনি সমকালের প্রতিষ্ঠিত নিয়মনীতি, মূল্যবোধ, সামাজিক সংস্কার সর্বোপরি মানুষের ধর্ম ও জীবন বিশ্বাসের যে চিরায়ত ফলগুধারা তার বুকে ছুরি চালিয়ে দেন। মার্কস মনে করতেন ধর্ম হলো সকল সামাজিক অনগ্রসরতার কার্যকারণ। দেশে দেশে যে শোষণ ও নির্যাতন বর্তমান তা ধর্মের ছদ্মাবরণে চলে আসছে এবং ধর্মকে নির্যাতক তার জুলুমের হাতিয়ারে পরিণত করেছে। মার্কস আরো মনে করতেন, ধর্ম হলো

জনগণের আফিম– Religion is the sigh of the oppressed creature the sentiment of a heartless world, the soul of soulless conditions. It is the opium of the people.[৪২(পৃ:-১৩৩)]

সুতরাং ধর্মের কোনো উপযোগিতাকে কমিউনিজম স্বীকৃতি দেয়নি এবং এর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যমানকেও সে প্রত্যাখ্যান করেছে। মার্কসের ধারণা ছিল, মানুষের বস্তুগত প্রয়োজন পরিপূরণের মধ্যে তার সকল ইচ্ছা ও অনুভবের কার্যকরী বিকাশ ঘটবে। একই কারণে তিনি ধর্মের বিনাশ সাধনের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন– The abolition of the religion, as the illusory happiness of men is a demand for their real happiness.[৪২(পৃ:-১৩৪)]

অতি অনিবার্যভাবেই ইকবালের পক্ষে তাই ধর্মহীনতার এ বিপজ্জনক দানবকে অভিনন্দন জানানো সম্ভব হয়নি। কারণ, ধর্ম এ যাবৎকালের মানব সভ্যতার বিকাশে নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে এবং মানব প্রগতি ও সমৃদ্ধির মূলে ধর্মের রয়েছে প্রভূত অবদান। সাম্প্রতিককালে কমিউনিজমের এ ধর্মহীন আয়োজন তাই ইকবাল অনাকাঙ্ক্ষিত হিসেবে চিত্রিত করেছেন।

ইকবাল মনে করেন, কমিউনিজম যতই মানুষের অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা দিক না কেন এবং মানবতার জন্য যত কল্যাণকর কার্যক্রমই হাজির করুক না কেন এর অন্তর্গত নাস্তির ধারণা সকল প্রচেষ্টাকেই ব্যর্থ করে দিয়েছে। কমিউনিজম বস্তুতান্ত্রিক সমতার বিধান করতে পারলেও মানুষের মানবিক মর্যাদার উন্নয়ন ও বিকাশে কার্যকর কোনো উপযোগিতা সৃষ্টি করতে পারেনি। ইকবাল বলেন–

غریبان گم کرده اند افلاک را
درشکم جویند جان پاک را
دین ان پیغمبر حق ناشناس
برمساوات شکم دارد اساس
দরিদ্র হারিয়ে ফেলেছে তার
জীবনের লক্ষ্য,
পবিত্র জীবনের সন্ধান করে সে
উদরের মাঝে।
সত্যদৃষ্টিহীন এই 'পয়গম্বরের' জীবন বিধান
কায়েম করেছে তার বুনিয়াদ
জঠর সাম্যের উপর।[৪৩(পৃ:-৬০)]
(জাভিদ নামা)

ইকবালের কমিউনিজম প্রীতিহীনতার আর একটি কারণ হলো, এ ব্যবস্থা মানব জীবনের একটি বিশেষ প্রয়োজনকেই অন্যান্য প্রয়োজনের উপরে আধিপত্য দিয়ে জীবনের নেতিবাচক মূল্যায়নের সূচনা করেছে। তিনি দেখেছেন কমিউনিজম যাজকতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের অবসান ঘটালেও ধর্মের মহাজৈবনিক ও শাশ্বত লক্ষ্যকে খতম করবার কথা বলেছে। ইকবাল বিশ্বাস করতেন ধর্মের বিলোপ ঘটলে জীবনের মহৎ মূল্যমান সমূহও অন্তর্নিহিত হয়।

ইকবাল মনে করতেন, মানুষের মানবিক চাহিদা পূরণের সাথে ইসলাম জাগতিক প্রয়োজন পরিপূরণের নিশ্চয়তা দিয়েছে; কিন্তু কমিউনিজম জীবনের এই দ্বৈত সত্তার সমন্বয় সাধনে ব্যর্থ হয়েছে। ইকবাল তার পাস চে বয়াদ কারদ গ্রন্থে কমিউনিজমের এই অন্তর্গত চিত্র উপস্থাপন করেছেন–

"তুমি রাজতন্ত্রের অস্থিমজ্জা ধ্বংস করেছ
চার্চও খোদার প্রজ্জ্বলিত মহিমার বিরুদ্ধে
নেজাবাজি করে।
কিন্তু এ পথ হচ্ছে বাষ্প ও বিজলীতে ঢাকা
এখানে জীবনের স্বচ্ছতোয়া ঝর্ণাধারা।
হারিয়ে যায় অন্ধকার গলিতে
এতে আছে শুধু বিয়োজন।
সংযোজন ও বিয়োজন এ দুয়ে মিলে
জীবনের সুর মেলে ডানা
তাকে বাদ দিলেই জীবনের দৃষ্টি প্রদীপ
যায় নিভে।[৪২](পৃ:-১৪১)
(পাস্ চে বয়াদ কারদ)

কমিউনিজমের নেতিবাচক দিক ও মার্কসের বস্তুবাদী নাস্তিক্যবাদের বিরুদ্ধে তিনি সর্বতোভাবে সোচ্চার ছিলেন। ইকবাল মনে করতেন, মার্কসীয় চিন্তা ও দর্শন পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যে এক চরম আঘাত হিসেবে এসেছে। ইকবাল তাঁর 'ইবলিস কি মজলিস-ই-শুরা' কবিতায় মার্কসকে চিত্রিত করেছেন এক পথপ্রদর্শক কালিম হিসেবে অথচ তার হাতে নেই আলো; তিনি ক্রুশ নেই এমন যীশুখ্রীষ্ট, ধর্মগুরু তিনি নন; কিন্তু তার আছে গ্রন্থ। তারই আহ্বানে ক্রীতদাসেরা পরাজিত করেছে প্রভুর দলকে এবং পূর্ব ও পশ্চিমে নব চেতনার আলো জ্বলে উঠেছে–

"জ্যোতিহীন এক মুসা সে যেন গো, ক্রুশহীন যেন ঈসা সে নবী
রসূল যদিও নাই, তবু তার কেতাবে যে আছে প্রতীতি ছবি।
কি বলিব সেই অবিশ্বাসীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন সে তীর
পূর্বে পশ্চিমে আনিয়াছে আজ কেয়ামত এক চিরস্থির।
মানব স্বভাবে আর কিবা তুমি গভীর ওলট-পালট চাও
গোলামেরা মিলি কাটিয়া দিতেছে মনিবের তাঁবুতন্ত্রী তাও।"[৪২](পৃ:-১৩৮)
(আরমুগান-ই-হিজায, অনুবাদ মনির উদ্দীন ইউসুফ)

অর্থনৈতিক কার্যক্রমের উপর যতক্ষণ পর্যন্ত চরিত্র ও ধর্মের নিয়ন্ত্রণ কায়েম না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা বল্গাহীন, উদ্দাম ও উচ্ছৃংখল হতে বাধ্য। সে কার্যক্রম পুঁজিবাদী নীতি অনুসারেই হোক আর কমিউনিজমের আদর্শেই হোক, তাতে কিছুমাত্র পার্থক্য সূচিত হয় না। ধর্ম ও চরিত্রের দৌলতেই মানবমনের মালিন্য ও কলুষতা দূর হয়ে তা স্বচ্ছ ও নির্মল হয় এবং মানুষ পাশবিকতার নিম্নতম স্তর হতে মনুষ্যত্বের উচ্চতর শিখরে উন্নীত হতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিংশ শতাব্দীর এই বৈজ্ঞানিক যুগেও আল্লাহকে অস্বীকার করা এবং ধর্ম ও চরিত্রকে 'সর্বনাশা মদের' শামীল মনে করার মতো লজ্জাষ্কর অবৈজ্ঞানিক উক্তিও সম্ভব হচ্ছে এবং প্রকৃতপক্ষে এ অবৈজ্ঞানিক খামখেয়ালীই কমিউনিজমের ভিত্তিমূলকে একেবারে অন্তসারশুন্য করে দিয়েছে। ইকবাল এর অনিবার্য ধ্বংসকারিতা এবং বিলুপ্তি সম্পর্কে কোনোই সন্দেহ পোষণ করেন নি। তিনি বলেন–

مغربی تہذیب اپنی خودکشی کریگی
جوشاخ نازک پہ اشیانہ بنیگانہ پائدا رہو گا
পশ্চিমী সভ্যতার পরিণাম আত্মহত্যা,
দুর্বল শাখার উপর রচিত হয়েছে যে নীড়
স্থায়ী হতে পারে না তা কখনো।[৪৩](পৃ:-৬১)

কমিউনিজমে মানুষের বস্তুগত প্রয়োজন পরিপূরণের মধ্যে সকল কার্যকারণ নিহিত। কারণ তাদের ধারণা, ঔদরিক সমস্যা সমাধানেই মানুষের সকল আকাঙ্ক্ষার নির্বান লাভ ঘটতে পারে। উপরন্তু কমিউনিজমে ধর্মের কোনো অস্তিত্ব স্বীকৃত নয়। যেমন স্বীকৃত নয় বিশ্বস্রষ্টার। মানব সভ্যতা একটি ক্রমাগত বৈরীতা ও পারস্পরিক সংঘর্ষের মধ্যে বিকাশ লাভ করেছে এ হলো কমিউনিজমের মৌল চেতনার অঙ্গীকার।

পক্ষান্তরে ইসলামী আদর্শে মুসলমানদের সকল বস্তুগত উপযোগিতা আল্লাহর ইচ্ছাতে সমর্পিত। এমনকি ইসলামী রাষ্ট্র যা অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচারের অঙ্গীকারাবদ্ধ তাও এই খোদায়ী ইচ্ছার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিয়োজিত। ইসলামের দৃষ্টিতে মানব সভ্যতা একটি ক্রমসম্প্রসারণশীল পল্লবিত তরু যা মানুষের পারস্পরিক মৈত্রী ও কল্যাণময়তার প্রস্রবণে নিষিক্ত।

মুসলমান হলো খোদায়ী রাজত্বের জিম্মাদার। সম্পদের মালিকানা হলো আল্লাহর হাতে। সুতরাং একজন মুসলমান তার ভাগ্যোন্নয়নের জন্যে পরিশ্রম করতে পারে, অর্থ উপার্জন করে তার সৌভাগ্য ফিরিয়ে আনতে পারে; কিন্তু প্রয়োজনের যা অতিরিক্ত তা অপরের জন্যে ছেড়ে দিতে হবে।

ইসলামের দৃষ্টিতে নিখিল পৃথিবীর মালিকানা যেহেতু খোদার এবং তাঁর সৃষ্টি সকল মানুষ সমান। স্বাভাবিকভাবেই সম্পদের অসম বণ্টন এবং গুটি কয়েক মানুষের হাতে সম্পদের গচ্ছিতকরণ হলো মানবতার জন্যে বেইনসাফীর নামান্তর। ইকবাল তাঁর পাস চে বয়াদ কারদ গ্রন্থে পুঁজিবাদীর রক্ত মোক্ষণের বেদনার্ত চিত্র তুলে ধরেছেন এবং কি করে পুঁজিপতি দিনমজুরের ন্যায্য পাওনা আত্মসাৎ করে তারই নমুনা পেশ করেছেন–

দিন মজুরের রুটি ও রুজিতে
পুঁজিপতির জেল্লা বাড়ে
নিজে হারিয়ে যায় দুর্দৈব ও
অন্ধকার নগরীতে
সে তৈরী করে অন্যের প্রাসাদ
কিন্তু নিজের জন্যে নেই মাথা গুঁজাবার মত ঠাঁই।[৪২](পৃ:-১৩৯)

তাই পুঁজিবাদ হলো একজনের গলায় ছুরি চালিয়ে অন্যজনের উপরে ওঠার সিঁড়ি–

পুঁজিবাদ মানবতাকে দিয়েছে একটি জিনিস
তা হলো একজনের বুকে খঞ্জর চালিয়ে
অন্যজনের বৃত্তবান হবার শিক্ষা।[৪২](পৃ:-১৩৯)
(পায়াম-ই-মাশরিক)

সুতরাং পাশ্চাত্য সভ্যতার মর্মস্বরূপে যে পুঁজিবাদ অস্তিত্বলাভ করেছে তার নীতি হলো দীন-মজুরের অস্তিত্ব নিঃশেষ করে দেয়া–

"পাশ্চাত্য সভ্যতার বুক জুড়ে পুঁজিবাদের ঘা
পুঁজিবাদ কি জান? পুঁজিবাদ হলো
দীন মজুরের রক্তমোক্ষণকারী
এ ঘা যদি না শুকায়
বুদ্ধিবৃত্তি হবে বল্গাহারা
সভ্যতা ও ধর্মের সুবেশ যাবে হারিয়ে।[৪২](পৃ:-১৪০)
(পাস্ চে বায়াদ কারদ)

ইকবাল পুরোপুরি সচেতন ছিলেন পুঁজিবাদ মানবতার জন্যে কি বিপর্যয় ও নৈরাজ্যের জন্ম দিয়ে চলেছে। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন–

পুঁজিবাদীর দেহটা প্রজা হিতৈষী
বাদশাহর মতো
কিন্তু অন্তরে কুসিদজীবীর অন্ধকার
হক কথা বলার ভনিতা তার সর্বত্র
কিন্তু হৃদয় পূর্ণ হয়ে আছে মিথ্যার কালিতে।[৪২](পৃ:-১৩৭)
(পাস্ চে বায়াদ কারদ)

ইকবাল মনে করতেন, পাশ্চাত্য সভ্যতার এই পুঁজিবাদী অনাচার মানবতার হৃদয়ে অনবরত রক্তক্ষরণ করে চলেছে তাই এশিয়ার নবজাগ্রত স্বাধীনতাকামী জাতিসমূহের জন্যে এ ব্যবস্থা মোটেই উপযোগী নয়। ১৯৩২ সালের ২১ মে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির বক্তব্যে ইকবালের এ চিন্তারই অনুরণন ঘটেছে–

> This is the inevitable out come of a wholly political civilization which has looked upon man as a thing to be exploited and not as a personality to be developed and enlarged by purely cultural forces. The people of Asia are bound to rise against the acquisitive economy which the west has developed and imposed on the nations of the East. Asia can not comprehend modern western copitalism with its undisciplend individualism. The faith which you represent recognizes the worth of the individual and disciplines him to give away his all to the service of God and man.[৪২](পৃ:-১৪০)

পুঁজিবাদের এই মানবতা বিধ্বংসী চিত্রাবলী যেমন ইকবালকে পীড়া দিয়েছে, তেমনি কমিউনিজমের খোদাদ্রোহী নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বর্জিত কার্যকারণ তাঁকে এর প্রতিও অনাগ্রহী করে তুরেছে। একই সাথে একজন পরিপূর্ণ মুসলমান হিসেবে তিনি বিশ্বাস করতেন আল্লাহর অস্তিত্ব এবং তাঁর সর্বশক্তিমানত্বের ধারণায়। রাসূল (সা:)-এর বিপ্লবী বাণী ও জীবনব্যাপী সাধনার ধারাকে বর্তমান সভ্যতার অন্ধকার বিদূরণে তিনি মোক্ষম উপায় মনে করতেন। তিনি তাঁর জাভিদ নামায় বলেন–

একবার তাকিয়ে দেখ সবুজ বর্ণাবলীর দিকে
কোরআনের মহাজীবন জোৎস্না হয়ে
খেলা করে যেখানে
রসূলের পথ চলে যায় যে
খেজুর ও উটের নগরীতে
ইসলামের আলো থেকে
যদি আহরণ না করতে পারো
জীবনের রোশনাই
তোমাদের সাধনা
তোমাদের পথচলা
একদিন হবে শুধু স্মৃতি
কোরআনের উদ্দেশ্য হলো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র
মুসলমানের কানুন হলো গৌরব মহিমায় দীপ্ত
তোমরা রাজতন্ত্রের নিশান পুড়িয়ে দিয়েছ ঠিক
কিন্তু রাজার আসনটি রেখেছ একই রকম।[৪২](পৃ:-১৪০,১৪১)

জাভিদ নামায় ইকবাল তাই বলশেভিক নেতৃবৃন্দকে খোদাদ্রোহিতা পরিত্যাগের আহ্বান জানিয়েছেন–

ফিরে এস ঐ নাস্তির গিরিকন্দর থেকে
আলো হাওয়া আর সবুজের
খোদায়ী রাজত্বে।[৪২](পৃ:-১৪১,১৪২)

ইকবাল কমিউনিজমের আপতঃ বৈভব ও উজ্জ্বলতায় বিমুগ্ধ না হয়ে ইসলামের শাশ্বত আদর্শের উজ্জীবন ঘটিয়েছেন যাতে মুসলিম মানস কুরআনী আদর্শের গীতিকায় পুনর্জীবিত হয়ে ওঠে। ইকবালের কমিউনিজম ভাবনার একটি সুন্দর চিত্র প্রদান করেছেন মাযহারুদ্দীন সিদ্দিকী–

> All that Iqbal wrote against capitalism might have been written word for word by a communisl poet; So great was his hatred of injustice, slavery and nationalist imperialism. Yet Iqbal was neither a communist nor an atheist. On the other hand he was violently opposed to atheistic communism. How could a poet philosopher, who believed in the worth of human personality, who was so individualistic that he heard the pulsation of egohood, even in life less matter, believe that a totalitarian system out to crush freedeom, individuality, religion and spirituality, could become a source of human welfare or an instrument for the progress of mankind.[৪২](পৃ:-১৪২,১৪৩)

বস্তুত: ইকবাল দ্রষ্টা ধ্যানীর দিব্যচক্ষে মুসলিম মিল্লাতের ভবিষ্যতকে কল্পনা করেছেন। তিনি জানতেন, কমিউনিজমের আলেয়া মুসলিম সমাজের মাযহাবী একতা ও কুরআনী মূল্যাবোধের বিপর্যয় ঘটাবে। তাই তিনি আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানকেই বর্তমান সমস্যার সমাধান কল্পে একমাত্র উত্তম বিবেচনা করেছেন।

ইকবাল ও পাশ্চাত্য সভ্যতা :

সমকালে পাশ্চাত্য সভ্যতা তার অভূতপূর্ব কারিগরী সমৃদ্ধি ও বিকাশের ধারা সৃষ্টি করে বিশ্বের এযাবৎকালের মানবিক প্রগতি ও উন্নয়নকে অস্বীকৃতির চোরাগলিতে নিক্ষেপ করেছে। ইকবাল মানবতার এ বিপর্যয়কে নিরীক্ষণ করেছেন পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্দর মহল থেকে। ইকবাল দর্শনের মৌল চেতনাটি ছিল বিশ্বমানবতার জন্যে গ্রহণযোগ্য একটি পথের নির্দেশ যা সকল মানুষের অন্তরঙ্গ ও বহিরংগের কল্যাণকামিতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে।

ইকবাল পাশ্চাত্য সভ্যতার মর্মমূলে প্রবেশ করেছিলেন; তার শিক্ষা জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অতিবাহিত হয়েছিল ইংল্যাণ্ড ও জার্মানীতে। দর্শনের ছাত্র হিসেবে তিনি পাশ্চাত্য জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রকৃত রূপটি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। ইকবাল অবগত ছিলেন যে, আধুনিক ইউরোপের প্রযুক্তি ও কৌশলগত সমৃদ্ধি যত ব্যাপক হোক না কেন এর নৈতিক ভিত্তি দুর্বল। ইউরোপীয় সভ্যতার যে চাকচিক্য তা নির্মিত হয়েছে ধর্মহীনতার সৌধের উপর। মধ্যযুগে সীজার ও পোপের আধিপত্যের লড়াইয়ে পোপের ক্ষমতা খর্ব করা হলে ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে বিযুক্ত করা হয় এবং মানবতার উপর ধর্মহীনতার নৈরাজ্য চাপিয়ে দেয়া হয়। এই সামাজিক অব্যবস্থার মধ্যে জন্ম নেয় পুঁজিবাদী জুলুম। এ জুলুমের রাষ্ট্রিক পরিণতি হিসেবে আসে জাতীয়তাবাদ বা জাতিতে জাতিতে হানাহানি আর বিপর্যয়ের সূচনা। ইকবাল লক্ষ্য করেছেন, এই ঘোরতর দুদৈবের মধ্যে ত্রাণকারীর ভূমিকায় আসে কমিউনিজম যা কিনা নৈতিকতাহীন এক নতুন রাষ্ট্রিক স্বৈরাচারের জন্ম দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

ইকবাল পাশ্চাত্যের শরণাপন্ন হয়েছেন; কিন্তু এর অন্ধ অনুকরণ করেননি। পাশ্চাত্য থেকে তিনি গ্রহণ করেছেন ঠিক ততটুকুই যতটুকুকে তিনি বিবেচনা করেছেন উত্তম বলে। ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গির জয়গান কিংবা বৈধতা প্রমাণ নয়, বরং কুরআনের শিক্ষার সাথে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংগতি প্রমাণই ছিল ইকবালের লক্ষ্য।

তিনি যে জীবনদর্শনের সমর্থন ও প্রচার করেছেন তা পাশ্চাত্যের বস্তুবাদ ও প্রাচ্যের আধ্যাত্মবাদ, এ দুয়ের সংযোগ ও সমন্বয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর মতে এ সমন্বয়ধর্মী দর্শন ইসলামের মূল ধারণা ও দর্শনের সাথে সংগতিপূর্ণ। পাশ্চাত্যে অনুসৃত বস্তুবাদ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ বিবর্জিত। এজন্যেই তা মানুষের সার্বিক কল্যাণের পক্ষে আসহায়ক। মানুষের মনের বিকাশ ও সমৃদ্ধির সম্ভাবনা এত বিপুল যে একে নিছক জড়বস্তুর সংকীর্ণ সীমাবন্ধনে বন্ধি করে রাখা যায় না। মনের অভ্যন্তরে মানুষের সত্তার যে গভীরতার দিকটি রয়েছে তাই তার অনন্ত আনন্দ ও অনুপ্রেরণার উৎস; এবং এ কারণেই মানুষ দায়িত্ব বোধ করে সেই সত্তাকে সংহত ও সংগঠিত করার। মানব সত্তার এ অভ্যন্তরীণ দিকটিকে অগ্রাহ্য করার কারণেই পাশ্চাত্য সমাজ বিভক্ত হয়ে পড়েছে এমন সব বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন জাতিতে যারা শুধু তাদের শ্রমজীবী মানুষকেই শোষণ করেনি, একই সাথে এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণকে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের শিকারে পরিণত করতে উদ্যত হয়েছে। উগ্র-বস্তুবাদ প্রভাবিত এবং অপরকে শোষণের জন্যে উদ্যত এই ক্ষতিকর একপেশে দৃষ্টিভঙ্গিই পাশ্চাত্যকে ঠেলে দিয়েছে নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে।

অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, প্রাচ্যের ইহলোক বিমুখ ও পরলোকমুখী আধ্যাত্মবাদ সমর্থনযোগ্য। পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি যেমন একপেশে ও অহিতকর, তেমনি প্রাচ্যের আধ্যাত্মবাদী ভাবধারাও নিষ্প্রাণ ও স্থবির। ইকবালের মতে, আত্মাবিহীন নির্জলা বস্তুবাদ কিংবা নিষ্প্রাণ নিশ্চল আধ্যাত্মবাদ নয়, বরং এ দুয়ের সংযোগ ও সমন্বয়ের মধ্যেই নিহিত সার্থক জীবনদর্শনের চাবিকাঠি। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বেশিরভাগই ফলপ্রসূ ও কল্যাণকর; আর এজন্যেই প্রাচ্যকে গ্রহণ করতে হবে পাশ্চাত্যের সেই আশীর্বাদকে। তবে তা করতে গিয়ে এ গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রাচ্য যেন পাশ্চাত্যের ন্যায় বস্তুশক্তিকে উপায়ের পরিবর্তে লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ না করে। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানসমূহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে বিপুল শক্তি অর্জন করেছে, সেই শক্তিকে আজ আমাদের ব্যবহার করতে হবে যথার্থ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক লক্ষ্য অর্জনের কাজে।

ইকবাল পাশ্চাত্য সভ্যতার মৌলিক দুর্বলতাটি ধরতে পেরেছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন কেমন করে মানুষের মানবিক বৃত্তির শুভ জাগরণকে পাশ্চাত্য সভ্যতা অশুভ বৃত্তির দানবীয় ধাক্কায় ঠেকিয়ে দিচ্ছে। যদিও আপাতদৃষ্টিতে পাশ্চাত্যের আলো ঝলোমল চিত্র দেখে বিমুগ্ধতার অঞ্জন বুলিয়ে যায় কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে সভ্যতার বুকে জুড়ে ব্যর্থতার কান্নাই তীব্রতর হয়ে ওঠে। বিজলী বাতি পশ্চিমীদের নৈশকালীন অন্ধকার দূর করেছে ঠিক, কিন্তু চিন্তার দিগন্তকে যেমনি অস্বচ্ছতা থেকে মুক্ত করতে পারেনি তেমনি পারেনি তাতে স্বর্গীয় আভা যুক্ত করতে। ইকবাল তাঁর বহু নন্দিত লেনিন কবিতায় পরলোকগত এই বলশেভিকের জবানীতে ইউরোপের বিরুদ্ধে ছুটিয়েছেন ক্রুদ্ধ শ্লেষাত্মক ধিক্কার–

য়ুরোপে আলো, জ্ঞান এবং শিল্প দেখো আজ অপর্যাপ্ত।
তার প্রমাণও দেয়া হয়েছে সাথে সাথে–
স্থাপত্য চাও তো দেখো ব্যাংকগুলির দিকে
ধনিকের সৌধগুলি চার্চের চেয়ে ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন,
বাণিজ্য নিশ্চয় আছে, বস্তুত সেটা জুয়া খেলা,
একজনের লাভে হাজার জনের মৃত্যু।
যে মহাজাতি হারালো ভগবানের প্রসাদ,
চরম তার উৎকর্ষ ইলেকট্রিসিটি এবং স্টীম।

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষণ স্পষ্ট, তদবীর নামক দাবা খেলিয়ে
করল বাজীমাত তদবীর দাবাড়ুকে।
সরাই রক্ষকেরাও বসে ভাবছে ভাগ্যের কথা।
রাত্রে পথের লোকের মুখে দেখছ স্বাস্থ্যের রক্তিম আভা
তার কারণ ওদের শারাবানান, অথবা কসমেটিক।[৪২](পৃ:-১৪৫,১৪৬)

ইকবাল তাঁর পাস চে বয়াদ কারদ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ইউরোপীয় সভ্যতার দুষ্টক্ষত ভয়াবহ চিত্র। তিনি বলেন, ইউরোপীয়রা নতুন করে কাবার প্রাঙ্গনে লাত ও উজ্জার মূর্তিকে উন্মোচন করেছে। তারা মানবতার হৃদয়কে করেছে মসীলিপ্ত এবং আত্মাকে মৃতবৎ। সভ্যতারূপী এ ডাকাতই মানুষকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে পঙ্গু বানিয়েছে–

ইউরোপীয়দের ঘাড়ে সওয়ার হয়েছে নাস্তিকতার দানব
খোদামত্ত পুরুষের সাথে চলছে যার লড়াই
এ দানব প্রসব করে নতুন লাত ও উজ্জা
তারই উৎপাতে হৃদয়ের চোখ হয়েছে অন্ধ
আত্মা এখন ধূসর
ট্যুলিপ গোলাপও কেঁদে বলছে আমার জীবনের
সে অন্তরঙ্গতা গেল কোথায়? [৪২](পৃ:-১৪৭)

পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ত:স্বরপে যে বস্তুবাদী কারুকীর্তি ডানা মেলেছে তার পরিণতিতে চার্চের মহিমা হয়েছে ভূলুণ্ঠিত। ধর্মের নৈতিক ও কল্যাণ বন্ধন বঞ্চিত যে সমাজ ব্যবস্থা, সেখানে উপ্ত হয়েছে জড়বাদী উপাচার। দরিদ্র ও বেকারত্বের পাশাপাশি যৌন উচ্ছৃংখলতা ও মদ্যপান যেমন বিস্তৃত হয়েছে তেমনি সামাজিক জুলুম ও বেইনসাফীর দিগন্ত হয়েছে প্রসারিত। পশ্চিমের বস্তুবাদী নৈরাজ্যের একটি সুন্দর চিত্র ইকবাল তাঁর নন্দিত মাদ্রাজ বক্তৃতায় তুলে ধরেন এভাবে-

..... Wholly shadowed by the result of his intellectual activity, the modern man has ceased to live soulfully i.e. from within. It the domain of thought he is living in open conflict with himself; and in the domain of political life he is living in open conflict with others. He finds himself unable to control his ruthless egoism and his infinite gold hunger which is gradually killing all higher straiving and bringing nothing but life weariness. Absorbed in the 'fact' that is to say, the optically present source of sensation, he is entirely cut off from the unplumbed depths of his own being. In the wake of his systematic materialism has at last come that paralysis of energy which huxley opprehended and deplored.[৪২](পৃ:-১৪৮)

ইকবালের ধারনা, বণিক সভ্যতার প্রাণ লুকিয়ে আছে ইহুদী মেধা ও মননের সৌকর্যে। পশ্চিমীদের চিন্তা ও দর্শনের মৌল কাঠামোর যেমন নিয়ন্ত্রণ করছে অভিশপ্ত ইহুদিরা তেমনি ওদের বনিক চরিত্রের বিকাশের পথ ধরে বর্তমান ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী মুখোশপ্রাপ্তির পেছনে ইহুদী কূটনীতিও কার্যকর রয়েছে। ইকবাল জানতেন, কুরআনের বর্ণনা অনুসারে এবং ইতিহাসের সূত্র সন্ধান করলে ইহুদীদের কদর্য চরিত্রই বেরিয়ে আসবে। আল্লাহর নির্দেশকে লঙ্ঘন করে ইহুদীরা বারবার লাঞ্ছিত ও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। সেই নির্দেশ অমান্যকারীরাই এখন খ্রীস্টীয় সাম্রাজ্যের মন্ত্রণাদাতা হিসেবে অভিষিক্ত হয়েছে। ইহুদী চিন্তা ও কপটতার মহামারীতে সুবুদ্ধি এবং ধর্মও আক্রান্ত হতে শুরু করেছে–

Dhaka University Institutional Repository

ইউরোপীয়রা শুরু করেছে নতুন ব্যবসা
মানবতা হচ্ছে তার পণ্য
ব্যাঙ্কের যত ঝকমারি দেখছ
এ হলো ইহুদী আবিষ্কার।
হৃদয় থেকে শাদা গোলাপেরা শুকিয়ে যাচ্ছে
পৃথিবীতে যতদিন এ পদ্ধতি থাকছে
জ্ঞান, ধর্ম ও সংস্কৃতি স্বপ্নাচ্ছন্নই রয়ে যাবে।[৪২(পৃ:-১৪৭)]

পশ্চিমী সভ্যতার আলো ঝলোমল চিত্রাবলী তবে কি প্রহেলিকা? ইকবালের বিশ্বাস, ইউরোপিয়ানদের চাকচিক্য ও জাঁকজমক ঠিকই আছে; কিন্তু তাতে নেই হয়ত মূসার স্বর্গীয় জ্যেতি। সেখানে অনুপস্থিত ইব্রাহীম খলিলের (আ:) স্পর্শ যার কারণে আগুন পরিণত হত ফুলের সৌরভে। বৈজ্ঞানিক প্রগতি ইউরোপে বর্তমান; কিন্তু মানবিক বিকাশের ধারা স্তব্ধ। এমনকি আধুনিককালের যে বহুল আলোচিত বিপ্লবী দার্শনিক তাঁরাও জ্ঞাত নয় এর পরিণতি কোথায় এবং এই শৃঙ্খল মুক্তির উপায় কি–

ইউরোপের শ্বেত প্রদীপের দিকে একবার তাকাও
সিকান্দারের আরশির চেয়ে মদের সুরাহী
ওদের বেশী রোশনাই।
সাকীর তনুকা ঝলসে ওঠে শরাবীর চোখে
কিন্তু হায়!
মুসা কালিমের দীপ্তি থেকে তারা বঞ্চিত।
কোথায় পাবে তারা খলিলের উত্তাপ?
জড়তার মাঝে আচ্ছন্ন যে জ্ঞান
মহব্বতের মন্ত্রশক্তি সেখানে বিলুপ্ত;
পশ্চিমের দিগন্ত অস্থির নিঃশ্বাসে পূর্ণ
ওদের চিন্তায় নেই স্থিরতার লক্ষণ
জ্ঞানের দিক পালেরা এখন পোষণ করছে
অধৈর্য আত্মা।[৪২(পৃ:-১৪৮)]

ইকবাল তাই মুসলিম সমাজকে বণিক সভ্যতার ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধের দিকে ইঙ্গিত করে স্বীয় ঐতিহ্যতরুর সংলগ্ন হবার জন্যে আহ্বান জানিয়েছেন। ইকবাল দেখেছেন, মূল্যবোধের বিপর্যয় হেতু ইউরোপীয় রাষ্ট্রশক্তিসমূহ কেমন মানবতা বিধ্বংসী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে এবং তার অনিবার্য ফলাফল কদর্য মানবিকতার আকৃতিতে প্রাচ্যের দেশগুলোকেও গ্রাস করে চলেছে। তিনি তার এক সুপ্রসিদ্ধ কবিতায় পাশ্চাত্যের নগরবাসীদের এই সতর্কবাণী শুনিয়েছেন, ভঙ্গুর শাখায় বাঁধা নীড় কখনো স্থায়ী হতে পারে না–

হে পাশ্চাত্যবাসী
আল্লাহর পৃথিবী একটি দোকানঘর নয়।
আর তোমরা যাকে সত্যিকারের স্বর্ণমুদ্রা মনে করেছ
তা মেকী বলেই প্রমাণিত হবে।
তোমাদের নিজেদের খঞ্জরের উপরই
আপতিত হবে তোমাদের সভ্যতা।
ভঙ্গুর বৃক্ষশাখায় নির্মিত কুলায়
ভেঙ্গে পড়বে আজ নয় আগামীকাল
কখনো এ স্থায়ী হবার নয়।[৪২(পৃ:-১৪৫)]

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাণ পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ তার অস্থির পীড়নে মানবতা জর্জরিত। পুঁজিবাদের দংশনে যেমন সামাজিক জুলুম হয়েছে বর্ধিত তেমনি সমাজবাদের বিনিময়ে পৃথিবী লাভ করেছে খোদাহীনতার দৌরাত্ম। এমনি যে ইউরোপীয় সভ্যতা, তার অন্ধ অনুকরণ ভারতীয় মুসলমানদের জন্যে হবে আত্মঘাতী। ইকবাল মনে করেন, মুসলিম তরুণদের ইউরোপীয় চিন্তা ও দর্শনের প্রকৃত স্বরূপ আঁচ না করেই তার পেছনে ছোটা নিরর্থক–

তোমার সোফা ইউরোপের, তোমার গালিচা ইরানের
তরুনদের মধ্যে যখন আমি এসব বিলাসিতা
প্রত্যক্ষ করি তখন অশ্রু হয়ে ঝরে আমার রুধির।
পদ আর পদবির কি মূল্য- খসরুর জাঁকজমকেরই বা কি দাম
যখন হায়দারের মতো বীরদর্পে বিশ্বের মোকাবিলা করনা,
বা সালামানের মতো জগতকে তুচ্ছজ্ঞানে করো না ত্যাগ,
চাকচিক্যময় আধুনিক বিশ্বে যে তুষ্টি খুঁজে পাওয়া যায় না
তা হচ্ছে অকৃত্রিম ঈমানদারের গৌরব, আর সেই বিশ্বাসের
উপর প্রতিষ্ঠিত।[৪২](পৃ:-১৪৯)

মুসলিম তরুণদের ইউরোপীয় চিন্তা ও দর্শনে ভারাক্রান্ত হওয়ার শিক্ষা ব্যবস্থাকে তিনি তাদের নৈতিক বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে দায়ী করেছেন। ইকবাল উল্লেখ করেন, আধুনিক তরুণদের অন্তরে ধর্মানুরাগ নেই। তাদের আছে ক্ষুরধার জবান কিন্তু চোখে অনুতাপের তথা খোদাভীরুতার অশ্রু নেই। ইকবাল প্রশ্ন করেন, যে সভ্যতার নিজের বিপর্যয় ঠেকানোর মতই শক্তি নেই, কি করে সে অন্যের বিপদ হরণ করবে। আশ্চর্য! যার নিজের নেই আলো সে কি করে অন্যকে পথ দেখাবে–

চোখ ঝলসানো সূর্যকর যাদের ঘুম বাঙ্গাতে পারে না
কিংবা যাদের দৃষ্টি প্রদীপ হয়েছে নিষ্প্রভ
কি করে পারস্য হেজায আহরণ করবে
ওদের কাছে জীবনের রং
যারা নিজেরাই মৃত্যুর পরোয়ানা হাতে নিয়েছে
তারা কি করে দেখাবে অন্যে বাঁচাবার আশা।[৪২](পৃ:-১৪৯)

ইকবাল তাই প্রাচ্যের আধুনিকায়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার। কারণ, বণিক সভ্যতা প্রাচ্যের নৈতিক রীতি বন্ধনকেই কেটে ফেলতে উদ্যত। এক কবিতায় তিনি উল্লেখ করেছেন, ইউরোপীয়রা সর্বদাই প্রাচ্যের অধীবাসীদেরকে বক্র দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে। প্রাচ্যের কল্যাণ ও সুমতি আচরণের বিনিময়ে তারা তাদের দিয়েছে বরং বিদ্বেষেরই মর্মপীড়া। যেমনি সিরিয়া তাদের দিয়েছে খ্রীস্টের নৈতিক ও শাশ্বত জীবন ব্যবস্থা, প্রকারান্তরে ইউরোপীয়রা সিরীয়দের শিখিয়েছে মদ, জুয়া আর বারবণিতার কদর্য ব্যবসা–

সিরিয়ার ধুলিকণায় অনুরণিত হয়েছে খ্রীস্টের বীণা
ফিরিঙ্গিরা পেলো সেই আলো
খোদায়ী পুরুষ তাদের শিখালেন মুহব্বতের মন্ত্র
কিন্তু য়ুরোপীয়রা সিরীয়দের কি দিলো
আশ্চর্য!
মদ, জুয়া আর পতিতাবৃত্তি।[৪২](পৃ:-১৪৯)

সুতরাং প্রাচ্যের আধুনিকায়নের তাগাদা নিরর্থক। কারণ, এর অর্থ হলো পশ্চিমী জীবন দর্শনের কাছে প্রাচ্যের অধিবাসীদের বিক্রি হয়ে যাওয়া–

আমার হৃদয় কম্পিত হয়
যখন শুনি প্রাচ্যের আধুনিক সজ্জার কথা
কিন্তু এ হলো ইউরোপীয় নগ্নিকার উন্মাতাল অনুকরণ।[৪২](পৃ:-১৫০)

মূলত: ইকবালের মনোভাবনায় ক্রিয়া করেছিল এক বিশ্বাসী জীবনের সংহত চিত্র; এই বিশ্বাসের আলোকে তিনি জীবনের প্রতিটি কেন্দ্রে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার অস্বচ্ছ ও নৈতিকতা বর্জিত ঘৃণিত রূপটিকে তাই তিনি জীবন বিকাশের প্রতিবন্ধক বিবেচনা করেছিলেন। তার অর্থ এই নয়, ইউরোপীয়দের সকল কর্মকাণ্ডকেই তিনি পরিহার করেছিলেন। বরং পাশ্চাত্যের অসাধারণ কারিগরি সমৃদ্ধি তাকে মুগ্ধ করেছিল এবং তিনি এর সফলতাকে প্রাচ্যের অধিবাসীদেরও কাজে লাগানোর উপদেশ দিয়েছিলেন। কারণ মানব প্রগতির সহায়ক যে কোনো উপকরণ তা যে জ্ঞানেরই হোক না কেন, আহরণ করবার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। পশ্চিমী সভ্যতার যা কিছু কল্যাণকর তা গ্রহণ করবার কথাও কবি একস্থানে উল্লেখ করেছেন–

পাশ্চাত্যের শক্তি নিহিত রয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞানে
তোমার পাগড়ী তো জ্ঞান আহরণের পথে কোনো বাধা নয়।[৪২](পৃ:-১৫০)

পাশ্চাত্যের প্রতি তাঁর ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছিল মূলত এর নৈতিকতা বিবর্জিত জীবনাচারণের জন্যে, যে আচরণ মানব সমৃদ্ধি ও মানব উন্নয়নের ধারাকেই শুধু ব্যাহত করে। খোদায়ী বিধানের কার্যকারিতাকে দূরে সরিয়ে মানব মস্তিষ্ক প্রসূত চিন্তা-ভাবনা ও মতাদর্শের আধিপত্যই পাশ্চাত্যের বিশৃংখল সমাজ ব্যবস্থার জন্যে দায়ী বলে তিনি মনে করতেন। ইকবালের বিশ্ববীণায় শাশ্বত সুরের এই আনন্দলহরী তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছে।

বস্তুত ইকবালের মধ্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের একটি সুষম সংমিশ্রণ দেখা যায়। জ্ঞান ও ধর্ম সম্পর্কে অভিজ্ঞতা (Knowledge and Religious experience) সম্পর্কে বক্তৃতায় ইকবাল বলেছিলেন : আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, ইসলামী দুনিয়া আধ্যাত্মিকভাবে বিপুল দ্রুতগতিতে পশ্চিমের দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে। এই গতির মধ্যে কোনো ভ্রান্ত নেই, কারণ মরণশীলতার দিক থেকে ইউরোপীয় কৃষ্টি ইসলামী তমদ্দুনের কয়েকটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভাবধারার অধিকতর উন্নত বিকাশ মাত্র। আমাদের একমাত্র ভয় হয় এই যে, ইউরোপীয় কৃষ্টির বাহ্যিক চাকচিক্য আমাদের গতি রুদ্ধ করতে পারে এবং সেই কৃষ্টির যথার্থ অন্তলোকে পৌঁছুতে অকৃতকার্য হতে পারে। তাঁর নিজের সমাধান ছিল–

প্রতীচ্যে মনন- শক্তি জীবনের উৎস
প্রাচ্যে প্রেমই জীবনের মূল
প্রেমের ভিতর দিয়েই মনীষা
পরিচিত হয় বাস্তবের সঙ্গে।
মনীষা প্রেমের সৃষ্টিকে দান করে স্থায়িত্ব।
জাগো, এক নতুন পৃথিবীর ভিত্তি স্থাপন করো।[৪](পৃ:-৫৩)

অধ্যায়-দুই

ইকবালের সমাজ ও রাষ্ট্রদর্শন

ইকবাল : ব্যক্তি ও সমাজ ঃ

ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক কি, কি এই সম্পর্কের স্বরূপ ও ধরন, মানব সমাজের এটি এক চিরন্তন ও মৌলিক প্রশ্ন। ব্যক্তি নিজের স্বতন্ত্র সত্তাকে সমাজ গর্ভে বিলীন করে দিবে নাকি নিজের স্বাতন্ত্র্য পূর্ণরূপে বজায় রাখবে ও এটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্ট করবে? ব্যক্তি ও সমাজের স্বার্থ ও উদ্দেশ্যে কি কোন চিরন্তন বৈষম্য রয়েছে, না এই দু'টির মধ্যে কোনরূপ সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব? ইকবাল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে মানব প্রকৃতির এই গভীর রহস্যপূর্ণ সমস্যার সঠিক সমাধান উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি বলেন, যে সমাজে স্বতন্ত্র ব্যক্তি সত্তা আত্মসংরক্ষণ, লালন-পালন ও ক্রমবিকাশের সুযোগ লাভ করতে পারে এবং সেই সাথে সমাজ জীবন যাপন ও সামগ্রিক উন্নতি বিধান প্রচেষ্টা অব্যাহতভাবে চলতে থাকে, বস্তুত তাই স্বভাব-নিয়মের সাথে সামঞ্জস্যশীল সমাজ। কেননা স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তার সমাহার ছাড়া যেমন সমাজ গড়ে উঠতে পারে না। তেমনি খুদী বা ব্যক্তিসত্তাও পূর্ণতা লাভ করতে পারে না সমাজ সম্পর্ক ব্যতিরেকে। কাফেলার প্রতিটি যাত্রী সকলের সাথে প্রতিপদে তাল রক্ষা করে অগ্রসর হয়, আবার একই সাথে সবার মাঝে স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা অক্ষুন্ন রেখেও সে পথ চলে। মানব জাতির এ বিরাট কাফেলার অবস্থাও এর চেয়ে ভিন্ন কিছু নয়। ইকবাল বলেন–

فردقائم ربط ملت سی هی، تنهاکچه نهین
موج هی دریا مین, اوربیرون دریا کچه نهین

ব্যক্তি বাঁচে জাতির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে,
একা সে কিছুই নয়,
যেমন তরঙ্গ বাঁচে সাগরে,
এর বাইরে তা কিছুই নয়। [২](পৃ:-৭৬)
(ইকবাল, বাঙ্গে দারা, পৃ:-২১০)

বলার অপেক্ষা রাখে না, স্বয়ং সম্পূর্ণ ও স্থায়ী সমাজ ব্যবস্থার জন্যে ব্যক্তি ও সমাজ তথা ব্যষ্টি জীবন ও সমষ্টি জীবন উভয়েরই প্রয়োজন রয়েছে। ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবন উভয়ের জন্যেই সুনির্দিষ্ট জীবন-পদ্ধতি থাকতে হবে। ব্যক্তি জীবনকে যেমন সমাজজীবনে লয় করে দেয়া যায় না, তেমনি তাকে এমন এখতিয়ারও দেয়া যায় না, যা সমাজ জীবনের জন্যে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াতে পারে। ব্যক্তি জীবনের উন্নতি অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু তা চরম ও পরম উদ্দেশ্য হতে পারে না। ইকবালের মতে, ব্যক্তিকে অবশ্যই সমাজ জীবনে নৈতিক মূল্যমানের অধীন থাকতে হবে। অন্যথায় কোন তমদ্দুনই গড়ে উঠা সম্ভব নয়। এজন্যে উদ্দেশ্য সাধনে ব্যক্তির নিযুক্ত হওয়া সর্বতোভাবে বাঞ্চনীয়। একথা অনস্বীকার্য যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই বিশ্বে ব্যক্তির আত্মসচেতনতার মধ্যেই সর্বোচ্চ মূল্যমান নিহিত; কিন্তু ইকবালের মতে এই চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ ততক্ষণ পর্যন্ত হতে পারে না, যতক্ষণ না ব্যক্তি স্বত:প্রবৃত্ত হয়ে নিজেকে জাতি ও সমষ্টির সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত করে দেয় এবং জীবনের ক্রমবিকাশ লাভের লক্ষ্যকে নিজের স্বতন্ত্র সত্তা দ্বারা পূর্ণতা দান করে।

فردرا ربط جماعت رحمت است
جوهر اوراکمال از ملت است
تا توانی باجماعت یارباش

Dhaka University Institutional Repository

رونق هنگامه احرار باش
فرد می گیرد زملت احترام
ملت از افراد می یا بد نظام
সমাজের সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক
রহমতের প্রতীক,
ব্যক্তি প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হয়
সমাজের সাহচর্যে,
জীবন যাপন কর তুমি সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে,
তুমি হও স্বাধীন সমাজের আলোক মশাল!
ব্যক্তি অর্জন করে গুরুত্ব সমাজ থেকে,
সমাজ লাভ করে তার সংহতি
ব্যক্তির ভিতর দিয়ে। [৪৩](পৃ:-৩১)

ইকবাল যদিও আত্মসচেতনতা ও মুক্তি-আদর্শের অগ্রদূত, কিন্তু অন্যান্য ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী (Individulist) দার্শনিকদের ন্যায় তিনি নিজের মতাদর্শের স্বাভাবিক সীমা কখনই লংঘন করেন নি। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রবাদের (Individualism) এক প্রান্ত হচ্ছে সামাজিক ও রাজনৈতিক নৈরাজ্য। নিট্‌শের আত্মদর্শনে সুবিচার ও সাম্যের নৈতিক মূল্যমান এবং রাষ্ট্র ও সমাজের সকল প্রকার দায়িত্বকে মনে করা হয়েছে প্রতারণা। নিট্‌শের এই নৈরাজ্যবাদ (Anarcism) তাঁর জীবন দর্শনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদে বিশ্বাসীরা চরম ও নিরংকুশ স্বাধীনতার দাবিদার হয়ে থাকে।

ইকবালও 'খুদীর' বিকাশ লাভের জন্যে ব্যক্তিগত আযাদীকে অপরিহার্য মনে করেন। কিন্তু সেই সাথে তিনি স্বীকার করেন সামাজিক নিয়ম-শৃংখলা ও সাম্যের প্রয়োজনীয়তা। কেননা, তাঁর মতে ব্যক্তির অন্তর্নিহিত যোগ্যতা ও প্রতিভা বিকাশলাভ করা এতদ্ব্যতীত কোন ভাবেই সম্ভব নয়।

ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ ও সামাজিক নিয়ম-শৃংখলা বাহ্যদৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী হলেও উভয়ের মূল ভাবধারার প্রতি লক্ষ্য রেখে বিচার ও যাচাই করলে তাতে কোনরূপ বৈষম্য ও অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হবে না। ইউরোপের বর্তমান সভ্যতার এই দু'টি দিকের মধ্যে প্রচন্ড সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়েছে। এক দিকে গণতন্ত্র ব্যক্তিকে নিরংকুশ স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও যোগ্যতা প্রয়োগের অবাধ ও অপ্রতিরোধ্য সুযোগদানের পক্ষপাতী। অপরদিকে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা মানব জীবনকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে ব্যক্তির স্বতন্ত্র সত্তাকে সমাজ সমুদ্রের অতল গর্ভে বিলীন করে দিতে বদ্ধ পরিকর। প্রথম উল্লেখিত মতবাদের পরিণাম পুঁজিবাদী সমাজ ও সভ্যতা। এটি ব্যক্তিকে যথেচ্ছ সুযোগ ও স্বাধীনতা দেয়, অর্থনীতির ক্ষেত্রে ব্যক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ও সম্পদ উৎপাদনের সকল পথ ও পন্থাকে সার্বিক সামাজিক প্রতিবন্ধকতা হতে মুক্ত রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এর ফলেই টোটালিটারিয়ান (Totalitarian) রাষ্ট্র ব্যবস্থার অভ্যুত্থান হয়েছে। সেখানে ব্যক্তিকে সমাজ স্বার্থের বেদীমূলে বলিদান করা হয়েছে।

কিন্তু যেভাবে নিছক ব্যক্তিসত্তার বিশ্লেষণ করা যায় না, তেমনিভাবে ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে সমাজ সম্পর্কে ধারণা করাও সম্ভব নয়। জীবনের যেমন ব্যক্তিগত দিক রয়েছে, তেমনি রয়েছে এর সামাজিক ও সামগ্রিক দিক। ইকবাল তাঁর জীবন দর্শনের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সামাজিক নিয়ম-শৃংখলার পারস্পরিক বৈষম্য দূরীভুত করেছেন। তিনি ব্যক্তিকে সমাজ তথা জাতির জন্যে এবং সমাজ ও জাতিকে ব্যক্তির জন্যে অপরিহার্য বলে ঘোষণা করেছেন।

درجماعت فردرا بینم ما

ازچمن اورا چوگل چنیم ما
فطرتش وارفته یکتائی است
حفظ او از انجمن ارائی است
ব্যক্তির বিকাশ আমি দেখেছি
সমাজের মাঝখানে,
বাগিচার বুক থেকে ফুলের মতো
আমি আহরণ করেছি তাকে।
যদিও ব্যক্তি প্রকৃতি
স্বভাবতই স্বাতন্ত্র্য পিয়াসী
তবু তার ব্যক্তিত্ব সংরক্ষিত হয়
সমাজের আবেষ্টনে।[৪৩](পৃ:-৩৩)

বস্তুজগতের অনুপরমানুর ন্যায় সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণও পরস্পর অবিচ্ছেদ্য এক গভীর আধ্যাত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ এবং নৈতিক মূল্যবোধই হচ্ছে এই বন্ধনের ভিত্তি। বস্তু পরমাণুর রাসায়নিক বিশ্লেষণ সম্ভব হলেও মানুষের রাসায়নিক বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ অসম্ভব; মনস্তত্ব ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে এই চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। উচ্চতর সমাজ ব্যবস্থার লক্ষ্য হলো উন্নততর ব্যক্তি গঠন। মানবীয় বিবর্তনের চরম লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের মূল্যমানের সুসামঞ্জস্য সমন্বয় সৃষ্টি করা। এই দিক দিয়ে যে সমাজ সাফল্য লাভ করতে পারবে, প্রকৃতপক্ষে সেই সমাজই সক্ষম হবে জীবনের যাবতীয় সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করতে–

فرد و قوم ائنه یک دیگراند
سلک **و** دوهر کهکشان واختراند
فردتا اندر جماعت گم شود
قطرهء **وسعت طلب قلزم شود**
دردلش ذوق نمود از ملت است
احتساب **کار او از ملت است**
هرکه اب از زمزم ملت نخورد
شعله هائی نغمه در **عودش فسرد**
فرد تنها از مقاصد غافل است
قوتش اشغتگی را مائل **است**
قوم باضبط اشنا گردا ندش
نرم او مثل صبا گردا ندش-
ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পরের দর্পণ স্বরূপ,
যেমন করে সূত্রে গ্রথিত থাকে মুক্তামালা,
তারাকারাজি মিলিত হয়ে যেমন
রচনা করে ছায়াপথ
ব্যক্তি যখন নিজেকে হারিয়ে ফেলে সমাজের মাঝে
ব্যাপ্তি প্রয়াসী বিন্দু পরিণত হয়
মহাসমুদ্রে।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ তাকে অনুপ্রাণিত করে
আত্মবিকাশের আকাঙ্ক্ষায়,
সমাজের মান নিরূপিত হয়
তারই কার্য দ্বারা।
পান করে না যে সমাজের আবে-যমযম,
বীণার তন্ত্রীতে তার সঙ্গীতের অনল শিখা
হয়ে যায় ছাই।
আপনার দ্বারা ব্যক্তি হয় উদাসীন
তার আপন উদ্দেশ্যে,
শক্তি তার হয়ে আসে ঘুমন্ত ;
সমাজ এনে দেয় তাকে আত্মনিষ্ঠা ;
করে তোলে তার গতি ছন্দময়
মৃদু হাওয়ার মত।[৪৩(পৃ:-৩৩,৩৪)]

প্রতিটি মানুষের যেমন ব্যক্তি জীবন আছে, তেমনি আছে তার সমাজ জীবন। সমাজের সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক নির্ণয়ের তাই প্রয়োজন দেখা দিল। রমুয-ই-বেখুদী গ্রন্থ রচনা করে ইকবাল তাঁর এ দর্শনের পূর্ণতা বিধান করলেন। তিনি বলেন ঃ ব্যক্তি যতই শক্তিশালী হোক না কেন, বিচ্ছিন্ন অবস্থায় একা সে কিছুই করতে পারে না। মানুষ সামাজিক জীব, কাজেই সমাজ নিয়েই তাকে বাঁচতে হবে। এখানে ব্যক্তিকে খানিকটা ত্যাগ, সেবা, সহনশীলতা ও সহযোগিতা দেখাতেই হবে। ব্যক্তি ও সমাজ তাই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। ব্যক্তিও সমাজ দ্বারা উপকৃত হয়, সমাজও ব্যক্তি দ্বারা উপকৃত হয়। কতগুলো সুন্দর উপমা দিয়ে তিনি এ সত্যকে অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। সমুদ্রের বুকে থাকলেই তরঙ্গমালা শক্তিমান, কিন্তু সমুদ্রের বাইরে আসলে তরঙ্গের কোনই মূল্য নেই। একটি সুন্দর কবিতার কথাগুলো শৃংখলার সাথে দলবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালেই অপরূপ কাব্য সৌন্দর্য প্রকাশ পায়; কিন্তু প্রতিটি কথা যদি এলোমেলোভাবে মাথা তুলে দাঁড়ায়, তবে তখন না থাকে ছন্দ, না থাকে কাব্য। আকাশের তারারা দল বেঁধে এক লাইনে দাঁড়ায় বলেই সুন্দর ছায়াপথ রচিত হয়। এমনিভাবেই তিনি সমাজের প্রতি ব্যক্তির এবং ব্যক্তির প্রতি সমাজের দায়িত্ব কর্তব্য নির্ণয় করেছেন।

বলা বাহুল্য, এই যে অভিনব জীবন-দর্শন এ নতুন নয়, ইসলামী সত্যের উপরই এর বুনিয়াদ। ইসলামের প্রতি অন্ধ অনুরাগের জন্যেই যে ইকবালের কাব্য ও দর্শন ইসলামাশ্রয়ী হয়েছে তা নয়; বরং তার দার্শনিক মতবাদ কার্যকরী করার পক্ষে ইসলামী জীবন-ধারা ও ইসলামী সমাজ-বিধান সম্পূর্ণ উপযোগী; তাই তিনি ইসলামের মহিমা কীর্তন করেছেন।

ইকবাল : ধর্ম ও রাষ্ট্র :

ইকবাল ইসলাম বিরোধী ধর্মনিরপেক্ষ ও লোকায়ত শাসন পদ্ধতির বিরুদ্ধে দৃঢ় হস্তে লেখনী পরিচালনা করেন। তাঁর দৃষ্টিতে ধর্ম ও রাষ্ট্র দেহ ও আত্মার সমতুল্য। এ দুটির পারস্পরিক নিবিড় সংযোগ জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অপরিহার্য। ইকবালের রাষ্ট্র দর্শনে দেহ ও প্রাণ, জড় ও আত্মা দু'টি অবিচ্ছিন্ন মৌলিক উপাদান। গুলশানে রাজ-ই-জাদীদ কবিতায় তিনি বলেন–

تن و جان را دوتا گفتن کلام است
تن و جان را دوتا دیدن حرام است
کایسا سبحه بطرس شمارد
که با او حاکمی کاری نه دارد
بدن را تا فرنگ ازجان جدا دید

نکاهش کلک ودین را **هم دوتا دید**
به تقلید فرنک از **خود را میدند**
میان ملک و دین ربطی ندیدند
বস্তু ও আত্মার দ্বিধাবিভক্তি আপত্তিকর;
বস্তু ও আত্মাকে ভাগ করা হারাম।
গীর্জা শুধু জপমালা নিয়ে থাকলো বিব্রত,
রাষ্ট্রনীতির সম্পর্ক সে করল অস্বীকার।
পশ্চিমী দর্শন গড়ে উঠলো
বস্তু ও আত্মার দ্বৈতবাদের উপর।
দৃষ্টিতে তার
রাষ্ট্র ও ধর্ম হলো স্বতন্ত্র।
পশ্চিমের অন্ধ অনুকরণে
এই জাতি হলো বিভ্রান্ত
ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক সে হলো বিস্মৃত।[৪৩](পৃ:-৩৫,৩৬)

ইকবালের দৃষ্টিতে দ্বীন ও দুনিয়া, রাষ্ট্র ও নৈতিকতার পূর্ণ সমন্বয়ে, শক্তি ও পরাক্রম এবং ফকীরী ও বাদশাহীর সামঞ্জস্য সাধনেই মানবতার কল্যাণ নিহিত রয়েছে। হযরত জুনাইদের দুনিয়া বিমুখতা ও আর্দশিরের রাষ্ট্র দখল একত্র-সমন্বিত হলে চিন্তা ও কর্মের এমন এক জীবন্ত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠা সম্ভব, যার ফলে মানুষ তার নিয়তিকে পরিপূর্ণতা দান করতে পারে। অন্যথায় মানবতার উত্থান চরমভাবে ব্যর্থ হতে বাধ্য। ইকবালের দৃষ্টিতে আধুনিক সভ্যতা যে রাষ্ট্রনীতি উপস্থাপন করেছে তা একটি বল্গাহীন দৈত্য ছাড়া আর কিছুই নয়। যার উপরই এর করাল দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয়, তাই জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। ইকবাল বলেন–

مری نگاہ مین ہی یہ سیاست لادین
واهر من و دون نهاد مرده ضمیر
ہوئی ہی ترک کایشاسی حاکمی ازاد
فرنگیون کسی سیاست ہی دیوہی زنجیر-
আমার দৃষ্টিতে বর্তমান রাষ্ট্রনীতি
ধর্মের প্রভাবমুক্ত,
শয়তানের ক্রীতদাসী, নীচ প্রকৃতি,
আত্মা তার মৃত।
গীর্জার প্রভাব যখন হল বিবর্জিত
শাসন-ক্ষমতা হল মুক্ত, স্বেচ্ছাচারী
পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রনীতি হল
বল্গাহীন দৈত্যের মতো।[৪৩](পৃ:-৩৬)

'রমূযে বে খুদী' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন–

تاحکومت مسند مذهت گرفت
این شجر درگاشن مغرب گرفت

قصه دین مسیحائی فسرد

شعله وشمع کایسائی فسرد

'রাষ্ট্র যেদিন দখল করল ধর্মের মর্যাদা
ঈসায়ী ধর্মের সেদিন হলো অবসান,
নিভে গেলো গীর্জায় শেষ স্ফুলিঙ্গ।
পাশ্চাত্যের বাগিচায় জন্ম নিল এ বিষবৃক্ষ।[৪৩](পৃ:-৩৭)

'বালে জিবরীল' গ্রন্থে 'দুনিয়া ও সিয়াসত' শীর্ষক যে কবিতা তিনি লিখেছেন তাতে ধর্ম ও রাষ্ট্রের এই সূক্ষ্ম ও জরুরী সম্পর্কের প্রতি তিনি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছেন–

هوئی دین و دولت مین جس دم جدائی

هوس کی امیری هوس کی وزیری

دوئی ملک و دین کی لئی نا مرادی

دوئی چشم تهذیب کی نابصیری

ধর্ম ও রাষ্ট্র যেদিন হলো স্বতন্ত্র
সর্বত্র কায়েম হলো লালসার আধিপত্য।
রাষ্ট্র ও ধর্ম উভয়েই হলো ব্যর্থতার সূচনা।
এই স্বাতন্ত্রই হলো সভ্যতার অদূরদর্শিতার প্রমাণ।[৪৩](পৃ:-৩৭)

এই গ্রন্থেরই আর একটি পংক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য-

جلال پاد شاهی هوکه جمهوری تماشاهو

جدا هو دین سیاست سی تو ره جاتی هی چنگیزی

বাদশাহী-বিক্রম আর গণতন্ত্রের তামাসা,
ধর্ম রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হলে
অবশিষ্ট থাকে শুধু চেংগিজী নীতি।[৪৩](পৃ:-৩৭)

'যরবে কালীম' গ্রন্থের এক কবিতায় ধর্মহীন রাজনীতিকে ইকবাল 'ভূতের কন্যা' ও 'পংকিল মনোবৃত্তির পরিচায়ক' বলে উল্লেখ করেছেন এবং পাশ্চাত্য রাজনীতির কান্ডারীদেরকে শয়তানী প্রথার প্রতিনিধি বলে অভিহিত করেছেন।

ইকবালের মতে ধর্ম ও রাষ্ট্রের এই বিচ্ছিন্নতা ও দ্বৈতবাদ মানবতার পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক। এই ভুল মতাদর্শের গোলকধাঁধাঁ থেকে বিশ্বমানবতাকে মুক্তি দিতে পারে একমাত্র ইসলাম। ইসলাম ধর্ম ও রাষ্ট্রের এ দ্বৈতবাদকে চূর্ণ করে মানব জীবনের স্বাভাবিক একত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে এবং রাষ্ট্রশক্তি ও নৈতিক মূল্যবোধকে পরস্পরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত করে দিয়েছে। নবীজী (সা) কে আল্লাহ তা'আলা ধর্মনীতি ও রাজনীতি উভয়ের সমন্বয় সাধনকারী রূপে পাঠিয়েছেন। তিনি একাধারে ধর্ম-প্রধানও ছিলেন, আবার ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানও ছিলেন। খুলাফায়ে রাশেদীন ও তদ্রুপ ছিলেন। ইকবাল বলেন–

یه اعجازهی ایک صحرا نشین کا

بشیری هی آئینه داری نذیری

Dhaka University Institutional Repository

اسی می حفاظت هی انسانیت کی
که هون ایک جنیدی و اردّشیری!
এ হচ্ছে এক মরুবাসীর কৃতিত্ব
মানবরূপেই তিনি হয়েছেন
মানবতার পথপ্রদর্শক।
তারই আদর্শ হচ্ছে মানবতার রক্ষাকবচ
একই ব্যক্তির মধ্যে হয় শাহী ও দরবেশীর সংমিশ্রণ।[৪৩](পৃ:-৩৮)

ইকবালের মতে ধর্ম ও রাজনীতি দু'টি শক্তি: একটি অপরটির পরিপূরক। তাঁর ভাষায় বলতে গেলে:

این دو قوت حافظ یک دیگراند
کا ئنات زندگی را محوراند
ধর্ম ও রাজনীতি দুটি শক্তি: একটি অপরটির হেফাযতকারী
জীবন-বিশ্বের জন্যে এ দু'টি হলো মেরুকেন্দ্র রেখা স্বরূপ।[২](পৃ:-৬৩)

ইকবাল অন্যত্র বলেন: আল্লাহর ইচ্ছা হলো দিশারীগণ ধর্ম ও রাজনীতি উভয়টারই সমন্বয় করুক, উভয়টার জন্যেই চেষ্টা করুক। দেশ ও শাসন ক্ষমতাকে যদি একটি দেহ ধরে নেয়া হয়, তবে ধর্ম হবে তার জন্যে রূহ তথা আত্মাস্বরূপ। রূহ না থাকলে যেমন কায়া প্রাণহীন হয়ে পড়ে। তেমনি ধর্ম ছাড়া রাজনীতি হবে অর্থহীন, নীতি বিবর্জিত ও কলুসিত। এজন্যে উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক থাকা জরুরী। ইকবালের ভাষায়-

این نکته کشائنده اسرار نهان است
ملک است تن خاکی و دین روح روان است
কথাটি গোপন রহস্য প্রকাশের মতই;
দেশ মাটির কায়া, আর ধর্ম কার্যকর প্রাণ।[২](পৃ:-৬৩)

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে ধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধ বিবর্জিত। আর ইউরোপে এই ধর্ম বিবর্জিত রাজনীতির প্রবর্তক হলেন মেকিয়াভেলী। মেকিয়াভেলী স্পষ্টভাষায় বলেছেন : নাগরিকগণ ইচ্ছা করলে ব্যক্তিগতভাবে কোন ধর্ম ও নৈতিক বিধান পালন ও অনুসরণ করে চলতে পারে; কিন্তু রাষ্ট্রকে এর উর্ধ্বে থাকতে হবে। রাষ্ট্রকে সুদৃঢ় ও স্থায়ী থাকার এবং উত্তরোত্তর শক্তি ও প্রতিপত্তি পরিবর্ধনের জন্যে প্রতিনিয়ত চেষ্টানুবতী থাকতে হবে। সে জন্যে রাষ্ট্রকে যে কোন পন্থা ও উপায় অবলম্বন করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠত হওয়া চলবে ন। অবশ্য রাজনৈতিক স্বার্থোদ্ধারের জন্যে ধর্ম ও নৈতিকতার দোহাই দেয়া যদি কিছুমাত্র উপকারী হয়, তবে তা করতেও কোন বাধা থাকতে পারে না। বস্তুত এই ধোঁকাবাজী, প্রতারণা ও সুযোগ সন্ধানী কর্মপন্থাকেই ইকবাল 'মেকিয়াভেলীর রাষ্ট্রনীতি' বলে অভিহিত করেছেন। আল্লামা ইকবাল এই ফরাসী দার্শনিককে সম্পূর্ণরূপে বাতিল পন্থী বলে আখ্যা দিয়েছেন:

آن فلا رنساوئی باطل پرست
سرمه دیده او مردم شکست
نسخه بهر شهنشاهان نوشت
ودکل ما دانه پیگار کشت

فطرت او سوئی ظلمت برده رخت
حق ز تیغ خانه او لخت لخت
সেই ফ্লোরেন্সবাসী অসত্য পূজারী
অন্ধ করেছে মানব আঁখি
তার অঞ্জল স্পর্শে।
লিখেছে সে নূতন কানুন
শাসকদের পথ নির্দেশের জন্যে
বপন করেছে সে যুদ্ধের বীজ
আমাদের দেহ মৃত্তিকায়;
প্রকৃতি তার অন্ধকার পথের যাত্রী,
সত্য ও আদর্শ হয়েছে বিচূর্ণ
তার তরবারির আঘাতে।[৪৩(পৃ:-৩৯)]

ইকবাল কোন রাষ্ট্রকেই নৈতিক নিয়ম-বিধান থেকে মুক্ত দেখতে প্রস্তুত নন। তাঁর মতে রাষ্ট্রকে অবশ্যই নৈতিক বিধানের অধীন ও অনুগত হতে হবে। অন্যথায় মানবতার চরম বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। ইকবালের মতে মানবতাকে এই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা। The Reconstruction of Religious Thought in Islam গ্রন্থে ইকবাল বলেন:

> Islam as a polity, is only a practical means of making this principle (of tauhid) a living factor in the intellectual and emotional life of mankind. It demands loyalty to god and not to thrones. And since God is the ultimate spiritual basis of all life, loyalty to god actually amounts to man's loyalty to his own ideal nature.[৪৩(পৃ:-৩৯,৪০)]

এমনকি এক শ্রেণীর আলেম নামধারী লোক যে কেবলমাত্র ধর্মীয় দিকের উপরই গুরুত্বারোপ করেন; কিন্তু ধর্মের ভিত্তিতে গোটা সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না– ইকবাল তাদেরকেও তীব্র ভাষায় বিদ্রুপ করেছেন। 'যরবে কালীম' গ্রন্থের 'হিন্দী ইসলাম' কবিতায় ইকবাল বলেন:

ملاکو جوهی هند مین سجدی کی اجازت
نادان یه سمجهتاهی که اسلام هی آزاد
অনুমতি পায় যদি সেজদার, কোন মোল্লা ভারতে,
মনে করে সেই বোকা- এখানে ইসলাম স্বাধীন।[২(পৃ:-৫৮)]
(যারবে কালীম, পৃ:– ৩০)

ইকবালের কাছে ধর্ম হল সৃষ্টিমুখর, জীবন্ত এবং শক্তিমান এক অস্তিত্ব। মানবতার জন্যে তাঁর ভূমিকা সর্বকল্যাণকর হৃদয়ধর্মী চিত্রপটে আচ্ছাদিত। ইকবাল বিশ্বাস করতেন ধর্ম, বিশেষ করে ইসলাম এক অপূর্ব জীবনী শক্তিতে পরিপূর্ণ। মানব মনের গহীনে মৌলিক চিন্তা ও জীবন বিন্যাসের ভিন্ন ভিন্ন দরজা খুলে যায় এর প্রভাবে। ধর্মান্ধতার জালজয়াচুরি এবং সূফীবাদের ছদ্মাবরণে বৈরাগ্যবাদের অলীক ধূয়া ইকবাল মনে করতেন এ সবের পক্ষবিস্তারের ফলেই ইসলাম তার গতিশীলতা থেকে আজ বঞ্চিত হতে চলেছে। ইকবালের কবিতায় ধর্মব্যবসায়ী ও সংসার বিরাগী উভয়েই সমালোচিত হয়েছে। পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর কাছে লেখা এক চিঠিতে ইকবাল উল্লেখ করেছেন ধর্মান্ধতা, বৈরাগ্যবাদ এবং রাজতন্ত্র এই তিনটি উপজাত ইসলামের জীবনী শক্তি বিধ্বংসের কারণ। ইকবাল ঐ চিঠিতে লিখেছেন–

> The Ulema have always been a source of Great strength to Islam. But during the course of centuries, especially since the destruction of Baghdad, they became extremely conservative and would not allow any freedom of Ijtihade the forming of independent judgment in matters of law. The wahabi movement which was a source of inspiration to the nineteenth century Muslim reforms was really a revolt against the rigidity of the ulema. Thus the first objective of the nineteenth century Muslim reformers was a fresh orientation of the faith and a freedom to reinterpret the law in the light of advancing experience .[৪(পৃঃ-১২১)]

ধর্মান্ধদের প্রতিক্রিয়াশীলতায় ইকবাল ক্ষুদ্ধ। তাঁর কবিতায় ধর্মান্ধতা হলো ধ্বংস ও বিপর্যয়ের উপমা। কবি তাঁর জাভিদনামায় ধর্মান্ধতার যে চিত্র এঁকেছেন তা আজ সারা মুসলিম দুনিয়ার সমস্যার মূল কারণ চিহ্নিত করেছে–

ধর্মান্ধতার চোরাগলিতে
দেখ ঈশ্বরের ধর্মে আজ পৌত্তলিকতার ঘ্রাণ
মুসলিমের হৃদয়ে অবিশ্বাসী মর্মর।
ধর্মগুরুর শরীরে মুঢ়তার দেয়াল
চোখ জুড়ে অন্ধত্বের অজ্ঞান আর
মুখ নি:সৃত বাণী সৃষ্টি ছাড়া বিচিত্রতায় পূর্ণ।[৪(পৃঃ-১২১)]

ধর্মতাত্ত্বিকদের রক্ষণশীল প্রবণতা ইসলামী ঐক্যের বুনিয়াদকে ক্ষয়িষ্ণু এবং নিবীর্য প্রাণ-আত্মায় রূপদান করেছে- এই প্রতীতী ইকবালের কবিতায় মুহুর্মূহু। সাধারণ জনতার উপর ধর্মান্ধতার বিরুপ প্রভাবকে তিনি উম্মার সুলক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করেন নি। উপরন্তু ধর্মতাত্ত্বিকদের এই বৌদ্ধিক বিশ্বাস ও মুখোশী ক্রিয়াকলাপের অন্তরাল থেকে মুক্ত করে ইসলামকে তার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। ইকবাল তাঁর 'আরমুগান-ই- হিজায' গ্রন্থে মোল্লা ও সূফীর কুরআন ও সুন্নাহর স্বকপোল কল্পিত ব্যাখ্যায়নের এক শিল্পিত উপমা পেশ করেছেন-

ঈশ্বর আঁতকে ওঠেন
আঁতকে ওঠেন ফিরিশতা জিবরাইল
এবং প্রেরিত পুরুষ
মোল্লা ও সূফীর দেয়া শ্লোক চর্চায়।
প্রেরিত গ্রন্থ এবং
মহাপুরুষের বাণীর এমনি মনগড়া তরজমা
আর কেউ কখনো শোনেনি।[৪(পৃঃ-১২১)]

সমভাবে সূফীবাদের বৈরাগী চেতনার বিরুদ্ধেও ইকবাল তাঁর নিবিড় বিশ্বাসের মহিমাকে জাগ্রত করেছেন। ইসলামের কল্যাণ আলোকে তিনি জ্বালিয়ে দেখতে চেয়েছেন বিশ্বাসের এই ভিন্ন ভিন্ন উপজাতকে। ৪ অক্টোবর, ১৯৯৫ সালে মুন্সি সিরাজ উদ্দীনের কাছে লেখা চিঠিতে ইকবাল তাঁর মসনবী রচনার কার্যকারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন–

> For centuries Indian Muslims have been subjected to Iranian influences. They are ignorant of the goal and purpose of Islam as it originated in Arabia. Their literary ideals and social objectives are borrowed from Iran. I intend to unmask the real Islam in this Mathnawi which was spread through holy prophet. The Sufis think it is an attack on mysticism. And it is time to some extent .[৪(পৃঃ-১২২)]

১৯ জুলাই, ১৯১৬ সালে মুন্সি সিরাজউদ্দীনের কাছে লেখা আর এক চিঠিতেও তিনি একই অনুভূতির প্রতিধ্বনি করেছেন এবং লিখেছেন ধর্মান্ধতা ও সূফীবাদ কি করে মুসলমানদেরকে কুরআনের অর্থবহ ও সমৃদ্ধশীল জীবনের সবুজাভ প্রাঙ্গন থেকে দূরে সরে রেখেছে। কেননা জীবন সম্পর্কে নৈরাশ্যবাদ লালন করাই হলো তাদের ধর্ম। ইকবাল মনে করতেন ভারতীয় মুসলমানদের আরবী জ্ঞানের অভাবহেতু পবিত্র কুরআনের মর্ম অনুধাবন করা একটু আয়াস সাপেক্ষ এবং সংগত কারণেই ধর্মতাত্ত্বিক ও সূফী প্রদত্ত ব্যাখ্যায়নের উপর তারা অনেকখানি নির্ভরশীল। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষে কানাত (সন্তুষ্টি) এবং তাওয়াক্কুলের (নির্ভরতা) অর্থ উপলব্ধি সহজবোধ্য নয়। এই দুর্বোধ্যতার কারণে শব্দ দু'টির প্রকৃত তাৎপর্য উদ্ধারের পরিবর্তে স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন ধর্মতাত্ত্বিকেরা ভারতীয় ও গ্রীক বিশ্বাসের উল্টাপীঠই প্রদর্শন করেছেন।

ব্যক্তি ও সমাজ বিকাশে ইকবালের খুদী দর্শনঃ

সমকালীন মুসলমানদের করুণ অবস্থা দেখে ব্যথিত বোধ করলেন ইকবাল। এর একটি দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের পথ তিনি অনুসন্ধান করলেন তাঁর চিন্তায় ও রচনায়। তিনি উপলব্ধি করলেন যে, ব্যক্তি হিসেবে যেমন, সমাজের সদস্য হিসেবে ও তেমনি মানুষের পুনর্জাগরণ ও যথার্থ বিকাশ সম্ভব শুধু তার অহং বা আত্মসত্তার বিকাশ দ্বারা। কারণ এই অহং বা আত্মসত্তাই তার গোটা সত্তার কেন্দ্রবিন্দু স্বরূপ। এজন্যেই ইকবাল অগ্রসর হলেন আত্মচেতনার উদ্বোধন এবং সেই সাথে গণজাগরণ সৃষ্টির লক্ষ্যে। তাঁর মতে জীবন যেমন, জগতও তেমনি সচল ও সজীব। মার্কিন দার্শনিক উইলিয়াম জেমস (১৮৪২-১৯১০) এর সুরে সুর মিলিয়ে তিনি বলেন, আমরা যে জগতে বাস করি তা নিশ্চল নয়; বরং গতিশীল। বাস্তব সত্তা সদা নির্মীয়মাণ; এবং সেই সত্তা সম্পর্কিত সত্যকে সংগতিপূর্ণ হতে হবে এর নতুন নতুন অভিব্যক্তির সাথে। বাস্তব সত্তা সম্পর্কিত এই গতিশীল মতবাদ কুরআনের শিক্ষার পরিপন্থী নয়, সেই শিক্ষার সাথে সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ। কুরআনীয় মতে, জগৎ বর্ধনশীল ও বিকাশমান। জগৎ স্থির নয়, আবার পূর্ণও নয়। মানুষ এ জগতের প্রাণ- শক্তি ও প্রধান কর্তা। পরমসত্তার অফুরন্ত সম্ভাবনার বিকাশ প্রক্রিয়ায় মানুষ আল্লাহর সহকর্মী (খলিফা)।[১৩](পৃ:-৩২২)[4]

ইকবাল তাঁর সুবিখ্যাত 'ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুণর্গঠন' শীর্ষক গ্রন্থের 'ইসলামী কাঠামোতে গতিশীলতার নীতি' বক্তৃতায় ইসলামকে একটি জীবন্ত ও সদা বিকাশমান শক্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন যা কিনা এই পৃথিবীর সর্বপরিবর্তনশীল ও বিকাশমান শক্তিসমূহের সাথেই তাল মিলিয়ে চলতে সক্ষম। এই বক্তৃতায় তিনি উল্লেখ করেন, কুরআনীয় ধারনায় জীবন সদা পরিবর্তনশীল। কুরআনের ভাষ্য-

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِم

"আল্লাহ কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না সে নিজেই নিজের অবস্থার পরিবর্তন করে।" (আল-কুরআন, সূরা আর-রাআদ, আয়াত : ১১)

সুতরাং পরিবর্তনটা হচ্ছে নিজের আভ্যন্তরীন ইচ্ছাশক্তির উপর নির্ভরশীল। ইকবালের খুদী প্রচন্ড ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন গতিশীল শক্তি; কিন্তু তা বাঁধনহারা জীবন ধারণার দ্বারা পুষ্ট নয়। কুরআনীয় নীতি-পদ্ধতি ও ব্যবস্থাদির আলোকে জীবন বিকাশের অনুকূল এক কল্যাণকর হাওয়ায় তার বর্ধন।

এই খুদীর তাহলে লক্ষ্য কি? বিশ্বমানবতার জন্যে খুদীর প্রয়োজনীয়তাটাই বা কি? ইউরোপে ইন্ডিভিজুয়ালিজম বলে যে মতবাদের ধারণা প্রচলিত রয়েছে এই খুদীর সাথে তার কোন সামঞ্জস্য আছে কি?

---

4 আল্লাহ তা'আলা কুরআনে হাকীমে ইরশাদ করেন– إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً -"আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি নিযুক্ত করব।" আদম তথা মানুষ সৃষ্টির প্রাককালে আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাদের সম্বোধন করে এই উক্তি করেছিলেন। (আল-কুরআন,সূরা বাকারা,আয়াত-৩০)।

অথবা জীবন সমস্যার সমাধানে কালে কালে দার্শনিকেরা যে আদর্শ-মানবের উপমা হাজির করেছেন তার সাথেই বা ইকবালের সৌসাদৃশ্য কোথায়?

ইন্ডিভিজুয়ালিজমের ধারণা প্রচার করেছিলেন সর্বপ্রথম ফরাসী দার্শনিক রুশো এবং ইংরেজ দার্শনিক জন লক। কালেক্টিভিজমের বিরুদ্ধে এ ছিল এক সুসমন্বিত তীব্র প্রতিবাদ। ইউরোপে মধ্য যুগে পোপের রাজত্বের অবসানের পর রেনেসাঁ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে স্বাধীন মতামত প্রকাশের এ ধারণা তীব্র হয়। ইন্ডিভিজুয়ালিজমের স্বাধীন মতামত প্রকাশের এ ধারনা তীব্র হয়। ইন্ডিভিজুয়ালিজমের এ ধারণার পোষকতাকারী তখন বলতে থাকেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে স্বতন্ত্র শক্তিমান সত্তা রয়েছে তার বিকাশের সুযোগ দিতে হবে এবং প্রত্যেকের স্বাধীন মতামতের মূল্যায়ন করতে হবে। ইন্ডিভিজুয়ালিজমের এ ধারণা স্টুয়ার্ট মিল ও বেন্থামের হাতে আরো সম্প্রসারিত হয়। মানুষের যে ইন্দ্রিয়লব্দ জ্ঞান বাইরের পৃথিবী থেকে আহরিত হয় তা দিয়েই সে তার একটি মানস সত্তা নির্মাণ করে এবং একটি বিশিষ্ট ধারণা ও মতামতের জন্ম দেয়। এ মতামত নির্মাণের সময় সে তার স্বাধীনতা প্রয়োগ করে থাকে। এখানে সে অন্যের দ্বারা প্রতারিত হতে বাধ্য নয়।

কিন্তু ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ কেবল আপন সুখ-স্বাচ্চন্দ্যকেই নিশ্চিত করতে পারে; মিল এই সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের নীতিকেই গ্রহণ করেছিলেন এবং রুশো ও লকের ব্যক্তিক কল্যাণের পরিবর্তে অনেক লোকের কল্যাণের উপর জোর দিয়েছিলেন মাত্র।

ব্যক্তি- স্বাতন্ত্র্যবাদের এমনি উদাহরণ পাওয়া যায় গীথের UBERMENSCH, শপেন হ্যায়ারের GENIUS, মৌলারের KARLMOOR, স্পীনোজার CONSTUS PRESERVANDI, বার্গসঁর ELAN VITAL এবং নীট্‌শের SUPERMAN চিন্তাধারার মধ্যে।

ডারউইনের Theory of Evolution এ বিবর্তনকে যদিও জীবন্ত পৃথিবীর ধর্ম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে ইচ্ছাশক্তির কোন স্থান নেই। এমতামত অনুসারে মানুষের নিয়তির পরিবর্তন নিয়তির উপরই নির্ভরশীল।

ব্যক্তি- স্বাতন্ত্র্যবাদের ইউরোপীয় ধারণা সমূহের সাথে ইকবালের খুদীর সাদৃশ্য বহিরাংগিক; অন্তরংগের দিক দিয়ে পার্থক্যটাই নজরে আসে বেশী। যেমন নীট্‌শের কল্পিত ব্যক্তিমানসের চেয়ে ইকবালের খুদী দর্শন অনেক বেশী উজ্জ্বল। ইকবাল মানব জীবনের তিনটি স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন–

১। ব্যক্তিত্বহীন আত্মচেতনা বর্জিত শুন্য বাল্যাবস্থা;

২। আত্মচেতনায় পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বপূর্ণ মানব অবস্থা; এই অবস্থায় মানুষ কোন বাধাকে মানতে চায়না। নিজের ব্যক্তিত্বকে বিকাশমান করবার জন্যে সে খোদায়ী অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে। নীট্‌শে এ কাজটিই করেছেন।

৩। এ স্তরে মানুষ নিজের মধ্যে খোদার অস্তিত্ব অনুভব করে। স্বীয় বৃত্তিকে মানুষ নিয়ন্ত্রণ করে কল্যাণময় জীবন বিকাশের উপযোগী খোদায়ী নির্দেশের বাস্তবায়নে সে অগ্রসর হয় এবং পৃথিবীতে খোদার প্রতিনিধিত্ব কায়েম করে। দার্শনিক নীট্‌শে এ ধারণার ব্যাপারে সুপরিজ্ঞাত ছিলেন না।

নীটশে মনে করতেন, জ্ঞান আহরণ জীবনের লক্ষ্য নয়; মাধ্যম। জ্ঞান হল জীবনযুদ্ধে টিকে থাকার বর্ম বিশেষ। নীটশের বিশ্বাস ছিল জীবন যুদ্ধে একমাত্র শক্তিশালী ব্যক্তিই টিকে থাকতে পারে। তার Superman বা 'অতিমানব' হিটলার বা মুসোলিনীর নাৎসী ধারা থেকেই অস্তিত্বলাভ করতে পারে বলে মনে হয়। ধর্মের প্রতি তার আস্থা ছিল না। পাশ্চাত্যের সামাজিক অস্থিরতাই তার এই অতিমানব সৃষ্টিতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল।

ইকবালের খুদীর অর্থ ছিল মানবজীবনে খোদায়ী হুকুমের আলোকে ঐশী গুণাবলীর বিকাশ। পক্ষান্তরে নীট্‌শের অতিমানব এক অতিপাষন্ড ধর্মহীন কর্তৃত্ববান ব্যক্তিত্ব− The characteristics of Superman, hardness and strength, pity, humility and justice cripple action .[৪২(পৃঃ-৩৮)]

ইকবালের কথায় নীটশীয় চিন্তার স্বরূপ পরিস্ফুট হয়েছে অধিকতর তীক্ষ্নভাবে− Neitzsche had a glimpse of the ideal but his atheism and aristocratic prejudice marred his whole conception .[৪২(পৃঃ-৩৮)]

ইকবাল মনে করতেন, শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়লব্ধ চেতনা জ্ঞানের সকল উৎস হতে পারে না। বোধির (Intution) অপরিহার্যতাকে তিনি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছেন। ইকবালের খুদীর বিকাশে বোধির তাৎপর্য অপরিসীম। নীটশের কাছে এসবের কোন গুরুত্ব নেই।

বার্গসঁর Elan Vital মতবাদের সাথে ইকবালের মতের কিছুটা মিল লক্ষ্য করা যায়। বার্গসঁর মনে করতেন জীবন এক অনন্ত প্রবাহ যা নিয়ত পরিবর্তনের মধ্যে পরিপূর্ণ অবয়ব লাভ করে− The must significant characteristic of Elan vital is perpetual change .[৪২(পৃঃ-৩৮)]

কারণ− Life is an original impetus; it has within it, the tremendous push, which is destined to carry man to the highest pinnacle of achievements .[৪২(পৃঃ-৩৮)]

বার্গসঁর চিন্তার সমীকরণ করলে দাঁড়ায় -Bergson believes that the fundamental impulse in life is tension and this tension is the momentum behind thought and action.[৪২(পৃঃ-৩৮)]

বার্গসঁর এই বিবর্তনমূলক গতিচিন্তার সাথে ইকবালের ঐক্যটাই বেশী বলে মনে হয়। এখানে লক্ষ্যণীয়, যেসব নেতিবাচক চিন্তাধারা বিবর্তনের সম্ভাবনাকে ঋণাত্মক বলে উড়িয়ে দিয়েছে ইকবাল তার ঘোর বিরোধী। বার্গসঁর, ডারউইন ও ল্যামার্কের জীবজগতের বিবর্তনের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বলেছেন, তারা বিবর্তন ও ক্রমবিকাশের বহিরাংগিক চিত্রটি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, কিন্তু এর পশ্চাতে যে বিপুল প্রাণবান শক্তি বর্তমান, যার ধর্মই হচ্ছে নিত্য নতুন নব নব সৃষ্টি করে চলা তার প্রতি তাদের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই।

কালকে তাই বার্গসঁ বলেছেন বিশ্বসত্তা। কারণ কাল অখন্ড এবং নিয়ত গতিশীল; কালের নেই কোন স্থিতি। পৃথিবীতে স্থিতিশীল বলেও কিছু নেই। কালের ধর্ম গতিশীলতা হলেও তাতে কোন লক্ষ্য নিবদ্ধ নেই; কারণ কাল বা বিশ্বসত্তা সম্মুখে ছুটে চলেছে ঠিক, কিন্তু কোন আদর্শের বাস্তবায়নে তার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। বার্গসঁর এ গতিশীলতার ধারণার সাথে ইকবাল ঐক্যমত পোষণ করলেও তিনি বার্গসঁ প্রদত্ত কালের লক্ষ্যহীন যাত্রার ধারণার সাথে একমত হতে পারেন নি। ইকবাল মনে করেন, পৃথিবীতে কোন কিছুই তাৎপর্যহীন ঘটনা নয়, ক্ষুদ্র কণিকার মধ্যেও বিরাট অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে। ক্রমবিকাশের ধারার পরিণতি হচ্ছে মানব সৃষ্টি ও তার মাধ্যমে জীবনের মহৎ মূল্যমানের অনুসন্ধান করা। বিশ্ব প্রকৃতিতে মানব সৃষ্টি এক বিরাট ঘটনা। কুরআনের ভাষানুযায়ী মানুষ হলো পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা। খলীফার দায়িত্ব হলো পৃথিবীতে আল্লাহর রাজত্ব কায়েম করা। সুতরাং আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠাকল্পেই এই ক্রমবিকাশের গতিশীল ধারা এগিয়ে চলেছে এবং তা মানুষের মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হবে।

ইকবালের চিন্তার মৌল কাঠামোটি গড়ে উঠেছে আত্মস্বরূপ উন্মোচনের মধ্যে বিশ্ব পরিচয় লাভে। ইকবালের ধারনায় এ আত্ম পরিচয় লাভ সম্ভব কুরআনী ব্যবস্থা সমূহের সুষ্ঠ প্রতিপালনের মধ্যে। ইকবালের 'আসরার-ই-খুদী' যা তাঁর জীবন দর্শনের চিত্ররূপময় কারুকাজ তা মূলত কুরআনুল হাকীম হতেই উৎসারিত।

উপমহাদেশে যে ধারণা ছিল মানবতার নির্জীবনের জন্যে ক্রিয়াশীল, জ্ঞানকে যেখানে মনে করা হতো কায়া। মানুষকে তার তাকদীরের উপর নির্ভর করে বানানো হয়েছিল কর্মস্পৃহাচ্যুৎ, সেখানে ইকবাল আনলেন জাগরণের বাণী, কর্মের বাণী, উন্মুখর প্রত্যয়ের বাণী-

দুর্বার তরংগ এক বয়ে গেল তীর তীব্র বেগে
বলে গেল: আমি আছি যে মুহূর্তে আমি গতিমান
যখন হারাই গতি সে মুহূর্তে আমি আর নাই।[৪২(পৃ:-৪১)]

ইকবাল তাঁর 'আসরার-ই-খুদীর' ভূমিকায় খুদীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। উদূর্তে খুদীর শাব্দিক অর্থ করলে দাঁড়ায় স্বার্থপরতা; কিন্তু ইকবাল এটিকে ব্যবহার করেছেন আত্মচৈতন্য, আত্মবিকাশ, আত্মোপলব্ধি অর্থে। জীবনের উদ্দেশ্য হলো একে এমনভাবে শিক্ষিত ও পরিশীলত করে তোলা যে, মানুষ হিসেবে যেসব গুনাবলীর বিকাশ হওয়া উচিত সেসবের পরিপূর্ণতা যেন অর্জিত হয়।

ইকবাল তাঁর 'ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন' বক্তৃতামালার চতুর্থ বক্তৃতায় খুদীর বিশেষ বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন প্রত্যেকটি খুদী একটি একক ও অবিভাজ্য সত্তা- আমার অনুভূতি, আমার ঘৃণা ও ভালোবাসা, বিচার ও মনোভঙ্গি একান্তভাবে আমার নিজস্ব।

এই আমি'র স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে যেয়ে ইকবাল ইসলামী দার্শনিক ইমাম গাযযালী, কান্ট, লায়ার্ড, উইলিয়াম জেমস প্রমুখের ধারণাবলীর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, আমার প্রকৃত ব্যক্তিত্ব বস্তু নয়; কর্ম। এমন কতগুলো কর্মপরম্পরা যা একে অপরের সাথে যুক্ত এবং একটি নির্দেশমূলক উদ্দেশ্যের একত্বে পরস্পর গ্রথিত।

কবির 'আসরার-ই-খুদী' হলো তাঁর দর্শনচিন্তার সুবিন্যস্ত গীতিমালা। এখানে তিনি খুদীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, জীবনের সৌকর্য ও প্রকৃত গুরুত্ব ফুটে ওঠে খুদীর শক্তির মধ্যে। দৃঢ় ইচ্ছা ও প্রবল প্রত্যয় হলো পরিবর্তন ও সৃষ্টির একমাত্র কার্যকারণ। জিন্দেগীর কামিয়াবীও আসে এ পথ ধরে। তাহলেই বিশ্বপৃথিবীর উপর মানব আধিপত্য সংহত হতে পারে। ইকবাল দর্শনের মৌল দিকটি সম্প্রসারিত হয়েছে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ক্রমাগত আলোকরশ্মি বেয়ে। স্থিতি ইকবালেল মতে মানুষের দৈহিক ও আত্মিক মৃত্যু। কিন্তু এই পরিবর্তন সূচিত হয় মানুষের অন্তর্নিহিত আকাঙ্খার মধ্যে এবং এ আকাঙ্ক্ষার মধ্যে উপ্ত হয় মানুষের ভবিষ্যৎ নির্মাণের সাধনা। ইকবালের এ পরিবর্তনমূলক জীবন চেতনার উৎস হচ্ছে কুরআনুল হাকীম। সুতরাং খুদীর বিকাশ ও উন্নয়ন - আত্মপ্রত্যয়, আত্ম-আকাঙ্খা ও আত্মচৈতন্য জাগরণের উপর নির্ভরশীল। ইকবালের এ ধারণা ব্যক্ত হয়েছে তার সুবিখ্যাত মাদ্রাজ বক্তৃতায়–

> If man does not take initiative, if he does not evolve the inner richness of being, if he ceases to feel the inward push of advancing life, then the spirit within him turns into stone and he is reduced to the level of dead matter .[৪২(পৃ:-৪২)]

ইকবালের মতে, জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য ফুটে ওঠে এ সৃষ্টিশীল গীতিকার মধ্যে যা কিনা নিরন্তর সংগ্রাম ও প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে কামিয়াবী অর্জন করে–

> He can not live a life to forget life, Action, movement, restlessness, love and a courageous sense of the importance of the self are the qualities which are required of one acting against the environments:[৪২(পৃ:-৪৩)]

ইকবালের খুদী চেতনার বিকাশে যে উন্মুখর সংগ্রাম তার আলেখ্য নির্মাণ করেছেন প্রখ্যাত প্রাচ্য তত্ত্ববিদ আর, এ নিকলসন–

> For Iqbal, self conscionsness, individuality is all. He never tries of preaching the gospel of self knowledge, self affirmation and self development. The paith of life is action, its end is spiritual and moral power which grow from obedience and self control.[৪২(পৃ:-৪৩)]

এ সম্পর্কে তাঁর নিজেরই উচ্চারণ–

প্রত্যেক বস্তুই আত্মবিকাশের জন্যে উন্মুখ
প্রতি অনু মহত্ত্ব লাভের প্রয়াসী;
জীবন এই গতিবেগ ব্যতীত সূচনা করে মৃত্যুর:
ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা দ্বারা মানব হয় খোদায়ী গুণসম্পন্ন।
সত্তার শক্তিতে সম্প পরিণহ হয় পর্বতে,
সত্তার দুর্বলতা
পর্বতকে পরিণত করে সম্পকণায়।
কেবল তুমিই বাস্তব এ ধরিত্রীর বুকে
আর সবকিছু মরীচিকা।[৪২(পৃ:-৪৩)]
(বালে জিব্রীল, অনুবাদ– সৈয়দ আবদুল মান্নান)

খুদীর পূর্ণ পরিণতি অর্জনের গতিপথ তাই মানব জীবনে আদিগন্ত ও বহু বিস্তৃত। মানবের বিকাশ ও পূর্ণতা প্রাপ্তি অর্জনে ইকবাল সে পথের চিত্র সপ্রকাশ অবলোকন করেছেন। কবি আসরার-ই-খুদীর বিভিন্ন স্থানে এ নিয়ে আলোচনার অবতারণা করেছেন এবং পূর্ণতর উদ্ঘাটন করেছেন। যেমন–

বিশ্ব জীবন যতো বেশি করে আসে
আত্মশক্তি থেকে
জীবন ততোই এই শক্তির সাথে রাখে সামঞ্জস্য;
একটি জলবিন্দু যখন লাভ করে আত্মার শিক্ষা
তার অন্তরে,
সে তার মূল্যহীন সত্তাকে করে তোলে একটি মুক্তা।
....
তৃণ যখন পেলো তার আত্মার ভিতরে
বর্ধণের শক্তি
তার আকাঙ্ক্ষা বিদীর্ন করে দিলো বাগিচার বুক
....
যেহেতু বিশ্ব রয়েছে দৃঢ়রূপে স্থিত
তার স্থাপন ভিত্তিতে
বন্দী চন্দ্র ঘুরে চলে তার চারদিকে
নিরবচ্ছিন্ন গতিতে।
সূর্যের সত্তা বলিষ্ঠতর
পৃথিবীর চেয়ে
বিশ্ব তাই আপন ভোলা
সূর্যের আখির আলোয়।
জীবন যখন শক্তি সঞ্চয় করে

আত্মা থেকে
জীবন তটিনী বিস্তার লাভ করে
সমুদ্রের মহত্ত্বে।[৪২](পৃ:-৪৩,৪৪)

ব্যক্তিত্ব বা খুদী হচ্ছে, ইকবালের কথায় একটি অবিরাম গতিশীল অবস্থা যা সৃষ্টিমূলক ক্রিয়াকলাপ উৎপাদন করে। মানুষ বিশ্ব-অহং (ঐশী শক্তি, যার অপরিহার্য গুণ হচ্ছে সৃষ্টিধর্মিতা) এর কেন্দ্র হওয়ার ফলে তাকে অবশ্যই সৃষ্টিধর্ম শক্তি হতে হবে, আর সৃষ্টিধর্মী কার্যকলাপের প্রকাশ কল্পনা ও চিন্তার মধ্যে সৃষ্টি একটি ঐশী ক্রিয়া; এবং মানুষ তার চিন্তার শক্তির জন্যে তার স্রষ্টার সাথে সামীপ্য ও সাদ্বুজ্র উপভোগ করে। মানুষ কেবলমাত্র তার চিন্তার দ্বারা এমন রাজ্য এবং এমন চিরন্তন সৌন্দর্যের জগৎ সৃষ্টি করে যা বস্তুময় বিশ্ব অপেক্ষা অধিকতর স্থায়ী হয়। চিন্তাই হচ্ছে সেই ক্রিয়া যা মানুষকে অমর করে। "নব নব জগৎ, যা মাটির পৃথিবীর মত নশ্বর এবং ক্ষণস্থায়ী নয়, তা সমরই, অভিনব চিন্তার দ্বারাই সৃষ্টি।"[১১](পৃ:-২২)

কিন্তু গতির নিয়মের পরিপ্রেক্ষিতে নিশ্চল এবং বৈচিত্রহীন চিন্তা প্রায় জীবন সম্পর্কে হতাশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে পর্যবসিত হয়। ব্যক্তিত্ব বা খুদী সংরক্ষণের জন্যে প্রাণরত ও পরিণত চিন্তা অপরিহার্য। মানবিক অহং (খুদী) এর চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে অমরত্ব, যার অর্জন চিন্তা এবং ক্রিয়ার অভিনবত্ব (নুদরাত ফিকর ও আমল) এর উপর নির্ভরশীল। আসরারে খুদীর মুখবন্ধে বিষয়টি তিনি আরো পরিষ্কার রূপে বিবৃত করেছেনঃ "ব্যক্তিগত অমরত্ব একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষা। এই জীবনে আমাদের চিন্তা ক্রিয়ার এমন ধারা অবলম্বনের উপর এটা নির্ভর করে, যার প্রবণ হবে একটি সংঘাতের অবস্থাকে বজায় রখে চলা.....? এভাবে আমাদের কার্যকলাপ একটি সংঘাতের অবস্থাকে বজায় রেখে যদি পরিচালিত হয়, তাহলে মৃত্যুর আঘাতে তা ব্যাহত হওয়া সম্ভব নয়।"[১১](পৃ:-২৩)

কিন্তু চিন্তা ও কাজের অভিনবত্ব নিজে থেকেই একটি শক্তি নয়, আমাদের চিন্তা ও কার্যকলাপকে উদ্দীপিত করার উপযোগী প্রেরণা বা শক্তি হচ্ছে আকাঙ্ক্ষা। সন্ধানের মধ্যেই জীবন নিহিত। আর মূল আকাঙ্ক্ষার মধ্যে লুকায়িত আকাঙ্ক্ষা খুদীকে চিরন্তন উচ্ছ্বাসের মধ্যে রেখে দেয়;

খুদীর সমুদ্রে এ হচ্ছে একটি অশান্ত তরঙ্গ।[১১](পৃ:-২৩)
(আসরারে খুদীর নিকলসন কৃত অনুবাদ থেকে)

বিষয়টি ইকবাল বার বার জোর দিয়ে বলেছেন:

একটি স্ফুলিঙ্গের মধ্যে আমি নক্ষত্রকে যাঞা করি,
আর একটি নক্ষত্রের মধ্যে যাত্রা করি একটি সূয্যকে;
আমার ভ্রমণের কোন গন্তব্য সীমা নেই,
নেই কোন বিশ্রাম-স্থল।[১১](পৃ:-২৩)
(পায়াম-ই-মাশরিক, কিয়েরনান কৃত অনুবাদ থেকে)

প্রাণবন্ত, ফলপ্রসূ এবং মহৎ হওয়ার জন্যে আকাঙ্ক্ষাকে অবশ্যই পরিবর্তনশীল ও বহুবিচিত্র হতে হবে। প্রাচীন ও জীর্ণ আকাঙ্ক্ষা হতাশার কাছে আত্মসমর্পণ করে অথবা কাতরতায় পর্যবসিত হয়:

প্রাচীন সৌন্দর্য এবং জীর্ণ আকাঙ্ক্ষা থেকে দূরে সরে যাও!
হীন উত্তরাধিকারকে পরিহার কর:
লালন কর একটি নবীন বাসনাকে।[১১](পৃ:-২৩)
(যবুর-ই-আযম)

আকাঙ্ক্ষাকে কেবল বহুবিচিত্র ও প্রাণবন্ত হলেই চলবেনা, তাকে উদ্দেশ্যমুখীও হতে হবে। লক্ষ্যহীন আকাঙ্ক্ষা সেই বিদ্যুৎ প্রভার মতো যা কোন অগ্নিস্ফূলিঙ্গ না জ্বেলেই অদৃশ্য হয়ে যায়। কোন উদ্দেশ্য এবং আদর্শ বিহীন জীবন কষ্টকর বোঝাস্বরূপ হয়ে ওঠে। উইলসন নাইট যথার্থই বলেছেন: "উদ্দেশ্যবোধহীন মানুষের কাছে সৃষ্টিধর্মী কাজের কোন সম্ভাবনাই নেই; তার কাছে তার কোন অর্থও নেই।" আত্মহত্যা ছাড়া খুদী কিছুতেই নিজেকে সংরক্ষণ করতে পারে না এবং আমাদের অন্তর যদি কোন আদর্শ ও মহৎ উদ্দেশ্য দ্বারা আলোকিত না হয় তাহলে পৃথিবীর কোন জিনিসেরই কোন আকর্ষণ থাকতে পারে না। আবার কথায় কথায় বলতে হয়:

জীবন-রহস্যের সঙ্গে অপরিচিত হে উদাসীন, ওঠ,
আদর্শের সুরার উন্মাদনায় নিজকে জাগ্রত কর,
সেই আদর্শ বা উষাবিকাশের মতো প্রভাময়,
বা আল্লাহ ছাড়া আর সবকিছুকে জ্বালিয়ে দেওয়া আগুনের মতো
যে আদর্শ আকাশের চেয়েও উঁচু
মানুষের অনতির জয়কারী, আকর্ষণকারী, মুগ্ধকারী,
প্রাচীন মিথ্যা-বিধ্বংসী আদর্শ,
আন্দোলনকারী শক্তিতে পূর্ণ, শেষ প্রলয় দিনের মূর্ত রূপ।
আমরা আদর্শ গঠন করে নিয়েই বাঁচি,
আমরা আকাঙ্ক্ষার সূর্যালোকে উদ্ভাসিত হই।[১১](পৃ:-২৩,২৪)
(নিকলসনের অনুবাদ থেকে)

আসরারে খুদীতে বিষয়টিকে আরো ব্যাখ্যা করা হয়েছে:

জীবন হচ্ছে অগ্রমুখী, সমন্বয়কারী গতি।
আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ সৃষ্টির দ্বারা এ তার গতিপথের
--------সকল বাধা অপসারণ করে।[১১](পৃ:-২৪)

অতএব জীবন হচ্ছে একটি সংঘাতময় অবস্থা, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ সৃষ্টি করে চলার একটি চিরন্তন ধারা: আর মৃত্যু হচ্ছে নিশ্চলতা ও জড়তা এবং উদ্দেশ্য– শূন্য জীবনের একটি অবস্থা।

মৃত্যুকে আমি ভয় করি: এ হচ্ছে সেই জড়তা
যা তার অগ্নিশিখার কিছুই আলোকিত করে না।[১১](পৃ:-২৪)
(যবুর-ই-আযম)

তাঁর মতে সংগ্রামই হলো জীবন, সংগ্রামের মধ্যেই আসে পরিণতি। প্রাণের আবেগ-উচ্ছ্বাসের কিংবা আশার আকাশে উড্ডয়নের নামই জীবন। সুতরাং নিরাপদ নীড় সন্ধান জীবনের স্বভাববিরুদ্ধ। এক জায়গায় তিনি বলেন–

শর গ্রহণযোগ্য বুক থাকলে এ দুনিয়াতে বাজ পাখীর মতো মর আর বাঁচ
জীবনের রীতি নীতিই বা কি?
মুহূর্তের সিংহজীবন শতযুগের ছাগজীবনের চেয়ে অধিক মূল্যবান।
তুমি জীবন্ত! তাই আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ হও!
যে জগত তোমার অনুকূল হয় না, তাকে চুরমার করে দাও
সৃষ্টিশীল হও, দিগ্বিজয়ী হও,
তোমরা পছন্দ মতো জগত সৃষ্টি করো।
সত্য পুরুষ! তীক্ষ্ম তরবারীর মতো হও!
তুমি নিজেই তোমার জগতের অদৃষ্ট হও।[৪২](পৃ:-৪৭)

সংগ্রাম ছাড়া জীবনের মহৎ লক্ষ্যসমূহ অর্জিত হয় না এবং যে ব্যক্তির সামনে আশা-আকাঙ্ক্ষার উজ্জ্বল দিপমালা মনোরম আলো ছড়ায় না সে জীবিত নয়, সে জীবনমৃত। দৃষ্টিতে যার আদিগন্ত প্রসারতা ডানা মেলে অন্তরে সামুদ্রিক স্বপ্ন বিচরণ করে, বাসনা যার নীহারিকার কক্ষপথ অতিক্রম করে, সেই বিকশিত মানবের জয়গানে মুখরিত ইকবাল দর্শন–

হে বাজপাখী! তুমি পুষ্পকাননে নীড় প্রস্তুত করেছ,
এতেই তো আমি শঙ্কিত।
কেননা, বাগানের স্নিগ্ধ সমীরণ প্রবাহ তোমার উড্ডয়ন শক্তি
হ্রাস করে দেবে।
তুমি ধূলিকণা হয়ে আছ, এহেন আরাম আয়েশ তোমার নয়
প্রভাত সমীরণের সাথে মিশে যাও, পথপ্রান্তে বসে থেকোনা
নীহারিকার কক্ষপথ অতিক্রম করে যাও,
এমনকি আকাশের নীল ছাউনিটাও পার হয়ে যাও।
মনযিলে বসে থাকলে মনের মৃত্যু হয়– হোকনা সে মনযিল
চন্দ্রলোক।[৪২](পৃ:-৪৮)

কার্যত মানব প্রজাতি সৃষ্টিশীল নিরন্তর প্রবাহমান সত্তা। এ পৃথিবীতে মানব বৃক্ষ তার অস্তিত্ব ও সৃষ্টিশীলতাকে উর্বর জমিনে প্রস্ফূটনে সক্রিয়। আর তাই মানব প্রতি মুহূর্তে ভিন্ন ভিন্ন বাস্তবতার সম্মুখীন এবং নিজ দায়িত্বে নিজেকে রূপান্তরে ক্রিয়াশীল। ইকবাল বলেন:

اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندون مین ھی
سرّ ادم ھی ضمیر کن فکان ھی زندگی
নিজের দুনিয়া নিজেই সৃষ্টি কর, যদি তুমি হও জীবন্ত,
এখানেই রয়েছে মানব জীবন রহস্য, সৃষ্টির মধ্যেই রয়েছে জীবন।[২](পৃ:-৫৪)
(বাঙ্গে দারা, পৃ:-২৯৩)

যেহেতু খুদীর পূর্ণতা থেকেই সত্যিকার জীবন উৎসারিত, এজন্যে কঠোরতা, শক্তি-সামর্থ্য এবং দৃঢ়তা জীবনের অপরিহার্য উপাদানের শামিল। স্বতন্ত্রভাবে ব্যক্তি যতই সংগ্রাম সহিষ্ণুতা ও দুঃখ-দুর্ভোগ সহ্য করতে অভ্যস্থ হবে, তার মধ্যে খুদী ততোই পূর্ণতা লাভ করবে। কিন্তু খুদীর অক্ষয় ও স্থায়ী হওয়ার জন্যে উদ্দেশ্য, আদর্শ ও লক্ষ্য সুস্পষ্ট হওয়া অপরিহার্য। কারণ ক্রমাগত নিরবচ্ছিন্ন ও অশান্ত অনুসন্ধানেই প্রকৃত জীবন নিহিত। আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামন ও চেষ্টা-সাধণারই নাম সফল জীবন। যতদিন না মানুষের মনে আশা ও উদ্দেশ্য লাভ করার একটা দূরন্ত উন্মাদনা জেগে ওঠে, ততোদিন তার জীবন কিছুতেই পূর্ণ পরিণত ও সুসংগঠিত হতে পারে না। আসরারে খুদীতে ইকবাল বলেন:

زندگی درجستجو پوشیده است
اصل او در آرزو پو شیده است
دل سوز ارزو گیرد حیات
غیر میرد چو او گیرد حیات
چو رز تخلیق تمنا باز ماند
شهپرش بشکست و از پرواز ماند-
চাওয়ার মাঝেই মানুষের জীবন,

উৎসমূল তার লুকায়িত আকাঙ্ক্ষার ভিতরে।
অন্তর আহরণ করে তার জীবন
এই আকাঙ্ক্ষার অগ্নি থেকে,
যখন সে পায় জীবন,
তখনই মৃত্যু হয় সব কিছুর
যা অসত্য।
যখন তার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টিতে
সে হয় বিরত,
ভগ্ন হয়ে যায় তার পক্ষ
করতে পারে না সে উত্থান।[৪৩](পৃ:-৮১)
(আসরারে খুদী)

ইকবালের দৃষ্টিতে খুদীর অস্তিত্ব বা প্রাণশক্তি মূলত ইচ্ছাময়। ইচ্ছা ও কর্মবিমুখ মানুষ জীবন বিবর্জিত ও নিষ্প্রাণ। প্রচেষ্টা ও ইচ্ছার দিকে মানুষ যতোই অগ্রসর হবে জীবনের পথে সে ততোই উন্নতি লাভ করবে। ইচ্ছার ক্রমবর্ধমান সম্প্রসারণশীলতার ফলেই খুদী শক্তিশালী ব্যক্তিত্বরূপ লাভ করে।

ইকবালের মতে, মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত তার অস্তিত্বের গুরুত্ব অনুধাবন করতে না পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত স্বীকায়তার বিকাশ ঘটবে না। ইকবাল এ প্রসঙ্গে বলেন– মানুষের আত্মবিশ্বাস ও ব্যক্তিত্বের প্রশ্নে দ্বিধা বা হীনমন্যতার কোন অবকাশ নেই। কেননা মহান আল্লাহই মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন– যা প্রয়োগ করে মানুষ নিজের ব্যক্তিত্ব বিকাশের মাধ্যমে প্রকৃতির প্রতিটি সৃষ্টির উপর কর্তৃত্ব করতে পারে। ইকবাল মানুষের খুদীকে সেই সীমা পর্যন্ত পৌঁছাতে চান যেখানে স্বয়ং খোদা মানুষের ভাগ্য সম্পর্কে বান্দাকে জিজ্ঞেস করবে। কবি বলেন:

خودی کو کر بلند اتنا که هر تقدیر سی پهلی
خدا بندی سی خود پوچهی بتا تیری رضا کیاهی
খুদীকে এত উন্নত কর
যেন প্রতিটি তাকদীরের শুরুতেই
খোদা স্বীয় বান্দাকে জিজ্ঞাসা করেন
বলে তোমার কি অভিপ্রায়। [৯](পৃ:-২১)
(বালে জিব্রীল, পৃ:– ৮১)

ইকবাল অন্যত্র বলেনঃ

تری خودی مین اگر انقلاب **هو پیدا**
عجب نهین هی که یه چار سو بدل جائی
সৃষ্টি হয় যদি বিপ্লব তোমার খুদীতে,
বচিত্র নয়, যদি তাতে বদলে যায় চার দিক।[২](পৃ:-৫৩)
(যরবে কালীম, পৃ: ১৬৭)

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে–ব্যক্তি জীবনের উন্নতির ফলে সমষ্টি জীবনের উন্নতি কিভাবে হতে পারে? দৈনন্দিন জীবনের প্রতি আমরা গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারি যে, দুনিয়ার প্রতিটি বস্তু আত্মবিকাশে মগ্ন। পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের জন্যে সে যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে সমষ্টি জীবনেও উন্নতি সাধিত হয়। ইকবাল বলেন:

Dhaka University Institutional Repository

هر چیزهی محو **خودنمائی**
هر ذره شهید کبریائی
بی ذوق نمود زندگی موت
تعمیر خودی مین هی خدائی
প্রত্যেকটি বস্তু আত্মপ্রকাশে মগ্ন,
প্রত্যেকটি অনু আপন বড়ত্ব প্রতিষ্ঠায় প্রাণান্ত।
আত্মপ্রকাশের চেতনাবিহীন জীবন মৃত্যুরই নামান্তর,
খুদী প্রতিষ্ঠার মধ্যেই রয়েছে খোদায়িত্ব।[২](পৃ:-৭৭)
(বালে জিব্রীল, পৃ: ৭৯)

ইকবাল অন্যত্র বলেন:

وا نمودن **خویش را خودی** خودی است
خفته درهر ذره نیروی **خودی است**
খুদীর চিরন্তন স্বভাব হচ্ছে
পূর্ণ আত্মবিকাশ,
ঘুমন্ত রয়েছে খুদীর অনন্ত শক্তি
প্রতি পরামাণুর বুকে।[৪৩](পৃ:-৮০)

শিশির কণা এবং ফুলের মধ্যে আত্মপ্রকাশের সাধ রয়েছে। ফুল শত পর্দা ফেঁড়ে আপন সাধ মেটাতে চায়। ইকবালের ভাষায় শিশির কণার বক্তব্য:

من از فلک افتاده تو از خاک دمیدی
از ذوق نمود است دمیدی که چکیدی
در شاخ تپیدی
صد پرده درنی
بر خویش رسیدی
অবতীর্ণ হয়েছি আমি আকাশ থেকে
উদগত হয়েছ তুমি (ফুল) মাটি থেকে।
ফোটেছ তুমি ফুল শাখায়,
ফেঁড়ে শত আবরণ;
আত্মপ্রকাশে হয়েছে তুমি সক্ষম।[২](পৃ:-৭৮)
(পায়ামে মাশরিক, পৃ: ১৪০)

মোটকথা, প্রত্যেক কণা-অনুকণা আত্মপ্রকাশে উদগ্রীব। আত্মপ্রকাশের বিষয়ে ইকবাল আরো বলেন:

چه لذت یارب اندر هست وبوداست
دل هر ذره در جوش نمود است
شگافد شاخ را چون غنچه گل

Dhaka University Institutional Repository

تبسم ریز از ذوق وجود است
হে রব! কি যে মজা জীবনের মধ্যে!
আত্মপ্রকাশের চেতনা রয়েছে প্রতিটি
অনুকণার প্রাণে।
ফোটে যখন ফুলের মুকুল গাছের ডাল
ছেদ করে,
আপন ওজুদ লাভ করে তা
হাস্যমুখ হয়ে।[২](পৃ:-৭৮)
(পায়ামে মাশরিক, পৃ: ২১)

প্রতিটি বস্তুর অভ্যন্তরে যতটুকু শক্তি নিহিত রয়েছে, সেই পরিমাণেই তা আত্মপ্রকাশে সক্ষম হয়। ইকবাল বলেন:

چون حیات عالم از روز خودی است
پس بقدر استواری زندگی است
টিকে আছে বিশ্বের জীবন খুদীর জোরেই,
বিশ্ব জীবনের ভিত রচিত হয় খুদীর শক্তিতেই।[২](পৃ:-৭৯)
(আসরার ও রুমূয, পৃ: ১৪)

বিশ্বের যে বস্তু খুদীহারায়, তা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ক্রমান্বয়ে আপন অস্তিত্ব বিনষ্ট করে ফেলে। মৌসুমী বারিবিন্দু যখন খুদী অর্জন করে, তখন তার ওজুদ মুক্তায় পরিণত হয়। বীজ যখন উদগত হওয়ার শক্তি লাভ করে, তখন তা মাটির বক্ষ ছেদ করে বেরিয়ে আসে। কিন্তু পাহাড় যখন আপন শক্তি হারিয়ে ফেলে, তখন তা বালিকণা হয়ে মরুতে পরিণত হয়। জমিন, চাঁদ ও সূর্যের দৃঢ়তা অনুসারেই তাদের শক্তি বিভিন্ন হয়ে থাকে। চাঁদের শক্তি কম বলেই তা পৃথিবীর চারদিকে আবর্তন করে। কিন্তু সূর্য অধিকতর শক্তিশালী বলে তা নিজের জায়গাতেই স্থির থাকে এবং পৃথিবী তার চতুর্দিকে আবর্তন করে। ইকবাল বলেন:

قطره چون حرف خودی از برکند
بستی بی مایه را گوهر کند
کوه چون از خود رود صحرا شود
شکوه سنج جوشش دریا شود
سبزه چون تاب دمید از خویش یافت
همت او سینه گلشن شگافت
چون زمین بر هستئ خود محکم است
ماه پابند طواف پیهم است
هستئ مهر از زمین محکم تراست
پس زمین مسحور چشم خاوراست-
উন্নত করে নেয় বারিবিন্দু যখন নিজ খুদীকে
তখন তার মূল্যহীন অস্তিত্ব পরিণত হয় মুক্তায়।
পাহাড় যখন খুদী হারায়, তখন তা মরুতে পরিণত হয়।
মরু যখন সাগর-তরঙ্গে প্লাবিত হয়,

তখন তা অভিযুক্ত করে সাগরকে।
বীজ যখন উদগত হওয়ার শক্তি পেল,
তখন তার সাহস বাগানের বক্ষ ভেদ করে বেরিয়ে এলো
পৃথিবী তার খুদীকে দৃঢ় করে নিয়েছে,
চাঁদ তাই সদা তার চারদিকে আবর্তন করছে।
সূর্যের অবস্থান অধিকতর দৃঢ় পৃথিবীর চাইতে,
তাই পৃথিবী তার চারদিকে আবর্তন করছে।[২(পৃ:-৭৯,৮০)]
(আসরার ও রুমূয, পৃ:- ১৪-১৫)

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিশ্বের প্রতিটি বস্তুর মধ্যে আত্মপ্রকাশের স্পৃহা রয়েছে এবং সেগুলোর মধ্যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের প্রক্রিয়া চলছে। মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত এবং আল্লাহর খলীফা। তাই স্বভাবতই তার মধ্যে আত্মপ্রকাশের শক্তি রয়েছে অধিকতর। অতএব মানুষের আবশ্য-কর্তব্য হলো খুদী তথা আত্মশক্তিকে উন্নত করা। আত্মশক্তির এই উন্নয়নের উপর নির্ভর করে মানুষের জাগতিক ও রূহানী উন্নতি। এটাই তার জন্যে প্রকৃতিকে বশীভূত করার একমাত্র চাবিকাঠি। আত্মশক্তিকে উন্নত করে মানুষ খোদা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। অর্থাৎ এ জ্ঞানের বলে সে খোদাকেও ভালভাবে চিনতে পারে। ইকবাল বলেন:

تری نگاہ مین ثابت نہین خداکا وجود
مری نگاہ مین ثابت نہین وجود ترا
وجود کیاھی ؟ فقط جوھرخودی کی نمود
کر اپنی فکر کہ جوھرھی بی نمود ترا !
নেই কোনো প্রমাণ খোদার ওজুদের তোমার চোখে,
নেই কোন প্রমাণ তোমার ওজুদের আমার চোখে।
ওজুদ কী? শুধু খুদী-রতনের বিকাশ সাধন,
চিন্তা কর নিজের, হয়নি বিকশিত তোমার খুদী-রতন।[২(পৃ:-৮১)]
(যরবে কালীম, পৃ:- ২৮)

আত্মশক্তির উদ্বোধনের পর সেই শক্তিকে নিয়োজিত করতে হবে সমাজ ও সৃষ্টির উন্নয়ন-কর্মে। খুদী মানে আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা; বেখুদী মানে– আত্মত্যাগ ও বিনয়। খুদী ও বেখুদী পরস্পর সম্পূরক। খুদী ছাড়া বেখুদী ফকিরী ও বিক্ষাবৃত্তির পর্যায়ে পড়ে। আবার বেখুদী ছাড়া খুদী শয়তানীর খুদীতে পরিণত হয়; খুদীর এ শক্তি তখন জোর-জুলুমের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। অন্য কথায় খুদী শক্তির প্রয়োগক্ষেত্র হলো বেখুদী তথা মানবজাতি ও যাবতীয় সৃষ্টি। ইকবালের মতে, সৃষ্টি জগতের মৌলিকত্ব খুদীকে স্বীকৃতি দেয়। সৃষ্টি জগতের অস্তিত্ব খুদীরই পরিণতি। খুদী সৃষ্টির অনু-পরমাণুতেও ক্রিয়াশীল। কবি বলেন:

যা কিছু অস্তিত্বশীল তা খুদীরই নিদর্শন
যা কিছু অবলোকন কর
খুদীর রহস্য থেকেই।[৯(পৃ:-২২)]

কবি এ প্রসঙ্গে আরো বলেন:

In every atom slumbers the might of the self. The mountain, river, waves, grass, candle, earth, sun etc, everything bears that unlimited power.[৯(পৃ:-২২)]

খুদী নিছক প্রকৃতির দান নয়। উপরন্তু এটি অর্জিত হয় মানবের নিরন্তর প্রচেষ্টা, বিরামহীন নিয়মানুবর্তিতা ও চারিত্রিক স্থৈর্যতার মধ্য দিয়ে। খুদী শিক্ষায়নের এই স্তরগুলো হচ্ছে–

১। আনুগত্য

২। আত্মসংযম,

৩। আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব বা নিয়াবতে ইলাহী।

কবি বেলেন:

قطرها دریاست آز ائین وصل
ذرها صحراست از ائین وصل
باطن هر شئیاز آئین قوی
تو چرا غافل از این سامان روی

ছোট ছোট বারিবিন্দু
ঐক্যের নিয়মে হয়ে উঠে মহাসমুদ্র;
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা হয় সাহারা।
আইনের বাধ্যতা
সকলের মধ্যে আনে অপরিমেয় শক্তি,
এই শক্তির উৎসকে
কেন করবে তুমি অবহেলা?[৪৩](পৃ:-৮৪)

আনুগত্যের মমার্থ হলো: ইসলামী জিন্দেগীর সুসমন্বিত অনুশাসনের কাছে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ। এই সমর্পণের মধ্যে মানুষ নিসর্গকে জয় করবে এবং পার্থিব আকর্ষণ শূন্য হতে পারবে। তাঁর ভাষায়–

বশ্যতা অপদার্থ মানুষকে যোগ্যতায় উন্নীত করে
অবাধ্যতা তার অগ্নিকে ভস্মে পরিণত করে।
সূর্য এবং তারকারাজির উপর যিনি আধিপত্য করবেন,
তিনি যেন গ্রহণ করেন কানুনের বন্ধিত্ব।[৪২](পৃ:-৪৯)

আত্মসংযম অর্জিত হয় ভীতিকে জয় করে এবং লালসাকে দূরে নিক্ষেপ করে এবং সর্বশেষ আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব হলো মানুষের বিবর্তনের শেষ পর্যায়। এ স্তরে মানুষ নিজের মধ্যে আল্লাহর গুণরাজিকে অবলোকন করে। মানুষ যখন আল্লাহর প্রতিভূত্ব অর্জন করে তখন সে পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি এবং ক্ষমতাবলে সে সমস্ত পার্থিব জগতের উপর কর্তৃত্ব করবার দাবিদার। তিনি হচ্ছেন পরিপূর্ণ খুদী, মানুষের বিকাশমান জীবনের উন্নতর অভিব্যক্তি। মানবতা বৃক্ষের তিনি হচ্ছেন পরিণত ফল। এই পরিপূর্ণ মানুষকেই ইকবাল আল্লাহর প্রতিনিধি বলে অভিহিত করেছেন। তার প্রশংসায় ইকবালের হৃদয় উচ্ছ্বাসিত। তিনি বলেন:

نائب حق درجهان بودن خوش است
برعناصر حکمران بودن خوش است
نائب حق هم چو جان عالم است
هستی او ظل اسم اعظم است

আল্লাহর প্রতিনিধি হওয়া এই বিপুল বিশ্বের
আর আধিপত্য করা,

তাঁর সৃষ্ট পদার্থের উপর
কতো মধুর আনন্দময়!
আল্লাহর প্রতিনিধি
এই বিপুল বিশ্বের আত্মাস্বরূপ,
আর অস্তিত্ব নেই মহানামের প্রতিবিম্ব।[৪৩(পৃ:-৮৫)]

ইকবাল তাঁর আসরারে খুদীতে কি কি গুণাবলী সমন্বিত হয়ে খুদী তার পরিপূর্ণ চেতনার অগ্নিতে ভাস্বর হয়ে উঠতে পারে তা বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, খুদীর সংহতি আনয়নে প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো হলো–

১। ইশক (প্রেম)
২। ফকর (বস্তুবাদী আকর্ষণের প্রতি অনাগ্রহ) এবং
৩। সাহস ও সৃষ্টিশীল উন্মুখরতা।

ড. শিলা ম্যাকডোনফের ভাষায়: ইকবাল ইশক্‌কে বোঝাতে চেয়েছেন শক্তিধর দুঃসাহসী ক্ষমতার, আল্লাহর নির্দেশের এবং জীবনের স্বাস্থ্য স্পন্দনের প্রতীকরূপে। সৃষ্টির সর্ব-অভিব্যক্তির কার্যকরী জীবনী শক্তি আসে এই ইশক্ থেকে। ইকবালের দৃষ্টিতে এই ইশক্ হলো অনাবিল মানব ব্যক্তিত্বে নিহিত শক্তিমত্তা। অন্যকথায়, যে পর্যন্ত কোন ব্যক্তি আত্মস্বার্থ চিন্তা এবং আত্মচেতনা মূলক আশঙ্কাবলী নিয়ে পঙ্গু থাকবে, সে পর্যন্ত সে কোন সৎকর্ম সাধন করতে পারবে না। সৃষ্টিধর্মী মানুষ হলো আত্মচেতনা মুক্ত মানুষ। সে নিজ পরিধির বাইরের সত্যকে গ্রহণে সক্ষম এবং সেই বহিরাগত সত্যের চ্যালেঞ্জ বীরদর্পে সাড়া দেয়। ইশক্ হলো পঙ্গুত্ব সৃষ্টিকারী শঙ্কা ও অস্থির আত্মচেতনার বিপরীত। ইকবাল বলেন:

ইশক হলো জিব্রাঈলের নিঃশ্বাস, মুহাম্মদের প্রত্যয়পুষ্ট হৃদয়।
ইশক হলো আল্লাহর দূত, আল্লাহর বাক্য,
আমাদের মরণশীল কর্দমও জ্বলে ওঠে ইশক এর উন্মাদনায়
ইশক হলো নতুন নিংড়ানো সুরা, রাজন্যদের সুরা পাত্র
ইশক হলো জীবনের উষ্ণতা।[৪২(পৃ:-৫০)]

ইকবালের বিবেচনায় খুদীর অনির্বাণ ও শাশ্বত চিত্র উন্মোচিত হয় প্রেমের অগ্নিস্পর্শে। প্রেম হচ্ছে এক জীবন্ত কুসুম যা হৃদয়ের জোয়ারে তুফান হানে কিন্তু মানুষকে দেয় অমরত্ব। এটি মানবীয় আবেগকে পরিশীলিত করে উন্নততর জীবন গীতিকার মালা গাঁথে। প্রেমের গভীরতা যত ব্যাপক হবে জীবনের উদ্দেশ্য তত পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। ইকবালের কথায়–

ইশক ফকীরকে পরিণত করে বাদশাহে।[৪২(পৃ:-৫০)]

প্রেম হলো জীবনের শিখা। যে ব্যক্তি প্রেমে পরিণতি লাভ করে তার সম্মুখ থেকে সকল বাধা-বিঘ্ন সরে যেতে থাকে, পার্থিব শক্তিসমূহ তার আয়ত্ত্বাধীন থাকে এবং অস্তিত্বের রহস্যাবলী তার সামনে উন্মোচিত হয়। তার নিকট প্রেম হলো এমন একটি অস্তিত্ব যা বিশ্বজগতের মূলীভূত সব কার্যকারণকে প্রকাশিত করে, যেটা স্বাভাবিক যুক্তির আশ্রয়ে সম্ভব নয়। প্রাচ্যবিদ নিকলসনের কাছে লেখা এক চিঠিতে তিনি ইশকের গুরুত্ব বিবৃত করেছেন–

> This word is used in a very wide sense and means a desire to assimilate, to absorb, Its highest form is the creation of values and ideals and the endeavour to realize them, love individualizes the lover as well as the beloved.[৪২(পৃ:-৪৯)]

তাঁর নিজের ভাষায়–

সেই উজ্জ্বল বিন্দু– যার নাম হলো খুদী
এই হলো আমাদের ধূলি দেহাভ্যন্তরের প্রাণ স্ফূলিঙ্গ।
প্রেমের দ্বারা খুদী আরও শক্তিমান হয়,
জীবন্তর হয়, উজ্জ্বলতর হয়, জ্বলন্ততর হয়।
প্রেম থেকেই আসে এর অস্তিত্বের উজ্জ্বলতা,
এবং এর অজ্ঞাত সম্ভাবনাবলীর বিকাশ।
প্রেম ভীত নয় তলোয়ার বা খঞ্জরের সামনে,
প্রেম সৃষ্ট নয় আব-খাক-রাত-এ।
প্রেমই পৃথিবীতে আনে যুদ্ধ ও শান্তি
প্রেমই হলো আব-ই-হায়াত,
প্রেমই হলো মৃত্যুর ঝকমকে তলোয়ার।[৪২(পৃ:-৫০)]

দ্বিতীয় উপকরণ হলো ফকর যা খুদীর বলিষ্ঠতা আনয়ন করে। ইকবালের নিকট ফকর হচ্ছে প্রত্যেক সৎকর্মের পশ্চাতে গতিদীপ্ত এক গৌরবময় শক্তি। সচরাচর উর্দূ কিংবা ফার্সি ভাষায় ফকরকে চিহ্নিত করা হয় এভাবে– জাগতিক আকাঙ্ক্ষা, ঐশ্বর্য কিংবা বস্তুনিচয়ের জাগরণ, পুঞ্জিভূত করণ ইত্যাদি। ইকবাল প্রচলিত অর্থকে অস্বীকার করে শব্দটির নতুন তাৎপর্য আরোপ করেছেন। পার্থিব ঐশ্বর্যকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিন্তু সূফীদের মত জীবন বিমুখ ধারণাকেও গ্রহণ করেননি। জাগতিক বস্তু সমাহারকে প্রত্যাখ্যান নয় বরং এর আকর্ষণকে জয় করবার কথা বলেছেন তিনি। তার ধারণা মানুষ যখন বিশ্বজয়ের ধারণায় উন্মত্ত তখনও তাকে পার্থিব সম্পদের প্রতি অনাগ্রহের পাশাপাশি তার উপর আধিপত্য বিস্তার করবার ক্ষমতা থাকতে হবে। তাহলে জড় সম্পদের দাস হয়ে আত্মার বন্ধিত্ব ডেকে না এনে সে এর ক্রমসম্প্রসারণশীলতাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং মানুষকে শোষণের যন্ত্রের উপকরণ না বানিয়ে মানবতার এক শান্তি সুখের নীড় নির্মাণ করবে। সে নিজে হবে মানবতার খেদমতগার। এ অবস্থায় ফকর তার কাছে সুদৃঢ় কর্মের মতো প্রতিভাত হবে। প্রতি পদক্ষেপে দুর্নীতি, লালসা ও মিথ্যা মোহ থেকে তাকে দূরে সরিয়ে রাখবে। ক্ষমতার অধিকারী মানুষকে নিবৃত করবে ঔদ্ধত্য ও মদমত্ততা থেকে। পরাধীনতার জিন্দেগী যারা নির্বাহ করছে তাদেরকে রক্ষা করবে অসৎবৃত্তি, পলায়নী চরিত্র ও প্রলোভন থেকে। কেননা, আগ্রাসী ও শাসক সম্প্রদায় শাসিত জাতির চরিত্র-বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করে ফেলে। ইকবাল ফকরকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিভিন্ন ধর্মের সন্যাসকে উপমা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন, যেহেতু এগুলো মানুষের মধ্যে পলায়নী মনোবৃত্তির জন্ম দেয়–

জড় বিশ্ব থেকে অপসারণ
লক্ষ্য নয় সত্যিকার সন্যাসের;
লক্ষ্য তার বিজয়
কর্দম ও আলোর সকল সত্তার উপর।
বর্জন করি আমি তোমাদের এ ফকর,
হে কঠোরব্রতী তাপস!
তোমাদের এ ফকর
আর কিছু নয় দারিদ্র ও দুঃখ ছাড়া।
যে জাতি হারিয়ে ফেলে
তাইমুরের শৌর্য সম্পদ
সমভাবে অযোগ্য তারা
ফকর ও সাম্রাজ্যের।[৪২(পৃ:-৫১)]
(বালে জিব্রীল, অনুবাদ সৈয়দ আব্দুল মান্নান)

ইসলামের ইতিহাসে ফকরের প্রচুর উদাহরণ রয়েছে যা পার্থিব প্রলোভন, কল্যাণহীনতা ও দুর্নীতিবাজ জীবন বিলাস থেকে মুক্ত–

এক জাতীয় ফকর
শিক্ষা দেয় ধূর্ততা শিকারীকে;
অপর জাতীয় ফকর
প্রকাশ করে আধিপত্যের রহস্য;
এক ফকর জাতিকে করে দেয় অবনমিত ও অধ:পতিত,
আর এক ফকর
মৃত্তিকাকে দান করে সুবর্ণের প্রকৃতি।
হোসায়েনের স্বভাবসুলভ ফকর
উৎসমুখ আত্মিক ঐশ্বর্যের;
হোসায়েনের এই ঐশ্বর্য
মুসলিমের উত্তরাধিকার।[৪২(পৃ:-৫২)]
(বালে জিব্রীল, অনুবাদ সৈয়দ আব্দুল মান্নান)

সুতরাং ইকবালের মতামত লক্ষ্যণীয়–

ফকীর যার ফকর হোতে চায়
আলীর ফকরের তুল্য
শ্রেষ্ঠ সে দারা ও সিকান্দার অপেক্ষা।[৪২(পৃ:-৫২)]

এই জাতীয় ফকর তৈরি করে চারিত্রিক স্থৈর্য্য ও দৃঢ় মনোবল। ব্যক্তির মধ্যে জন্ম দেয় কর্মোন্মাদনা ও বিশুদ্ধ ভাবনার। এই সকল মানুষের চরিত্র কালিমার উর্ধ্বে থাকে এবং ফকরের গুণে সে সকল মানবিক গুণাবলীতে শক্তিমান হয়ে ওঠে–

জ্ঞানের লক্ষ্য হচ্ছে বুদ্ধির বিশুদ্ধতা
ফকরের লক্ষ্য বিশুদ্ধতা অন্তর ও দৃষ্টির,
আত্মার অসি যখন শানিত হয়
ফকরের শান পাথরে
একটি মাত্র সৈনিকের শক্তি
অর্জন করে বল একটি বাহিনীর।[৪২(পৃ:-৫২)]
(বালে জিব্রীল, অনুবাদ সৈয়দ আব্দুল মান্নান)

ফকর হচ্ছে ঐশ্বর্যশালী ও শক্তিমানের গৌরব রক্ষার বাহন, তেমনি ঐশ্বর্য ও শক্তি যখন নৈতিক অধঃপতনের জন্ম দেয় তার থেকে মুক্তিরও রক্ষা কবচ হিসেবে কাজ করে–

যদি তুমি হও দুনিয়ার অধিপতিদের অন্যতম
ভুলে যেয়োনা ফকরের মহীমা,
বহু মানুষ–
যারা উপলব্ধি করে সত্যকে
আর রয়েছে যাদের দৃষ্টিভঙ্গি
তারাও দুর্নীতিগ্রস্ত হয় ঐশ্বর্যের আতিশয্যে;
ঐশ্বর্যের আতিশয্য
হরণ করে করুণা অন্তর থেকে

Dhaka University Institutional Repository

আর এনে দেয় অহংকার
বিনয়ের পরিবর্তে।[৪২(পৃ:-৫২)]
(জাভিদনামা, অনুবাদ সৈয়দ আবদুল মান্নান)

তৃতীয় উপাদান হলো সাহস বা জন্ম দেয় বিরামহীন সৃষ্টিশীলতার। প্রকৃতিকে বশে আনবার এ হলো শাণিত অস্ত্র। ইকবালের আত্মচেতনাপূর্ণ মানুষ সাহসী জীবনের প্রত্যয়ে দীপ্ত। কিন্তু এই প্রত্যয় আল্লাহর ইচ্ছার কাছে সমর্পিত। ইকবালের বিবেচনায় মানুষের জীবনের এই সাহসী কার্যকরণ অবশ্যই শরীয়াতের আওতাধীন থেকে নিয়ামনুবর্তিতার কঠোর অনুশাসন ও স্তরগুলো অতিক্রম করে অগ্রসর হতে হবে কিংবা এটি হবে ভোগ ও শক্তিমত্তার দাবা খেলা। সুতরাং ইকবালের খুদী যে শক্তির সে পরিপূর্ণ হবে তার উৎসমূল শরীয়াতের দোর গোড়া স্পর্শ করবে। ইকবালের ভাষায়–

সাহসী জিন্দেগীর অর্থ হলো
সর্ব অবস্থায় হককে বুলন্দ করা।[৪২(পৃ:-৫৩)]
(বালে জিব্রীল)

এমননিভাবে ইশক, ফকর ও সাহসী জীবনের সমন্বয়ে খুদী হয়ে উঠবে সমৃদ্ধশালী, কর্মমুখর। এই সমৃদ্ধিশীলতা যদি না থাকে তবে হবে খুদীর মৃত্যু। মানুষের মধ্যে যে স্বর্গীয় দীপ্তির জাগরণ ঘটে তা এই খুদীর সমৃদ্ধিশীলতার জন্যেই।

খুদী হলো তাই মানুষের জীবনের কর্মোদ্দীপনা, সাহস ও শক্তির বীনা। এ হলো জীবন বিহীন অকর্মন্য পৃথিবীর সঞ্জীবন সুরা। পক্ষান্তরে দারিদ্র, ভীতি এবং দাসত্ব হলো খুদীর ঘাতক যা কিনা জীবনে পরাজয়ী মনোবৃত্তির জাগরণ ঘটায় এবং পরিণতিতে জাতীয় বিপর্যয়েরও সূচনা করে। তিনি এক কবিতায় (মারগ-ই-খুদী-আমির মৃত্যু) উল্লেখ করেছেন প্রাচ ও প্রাতীচ্যের অধঃপতনের পশ্চাতে একমাত্র করণ হলো খুদীর মৃত্যু–

আমির মৃত্যুতে হোল অন্ধকার পাশ্চাত্য হৃদয়,
আমির মৃত্যুতে সারা প্রাচ্যদেহ কুষ্ঠব্যাধিময়।
আমির মৃত্যুতে আত্মা আরবের নিস্তেজ শীতল,
ইরাক ও আজমের পক্ষাঘাত সে মৃত্যুর ফল।
ভারতের পাখা আজ ছিন্ন ভিন্ন আমির মৃত্যুতে,
পিঞ্জরে সে সুখী, তাই মুক্ত নীড় দেখে না উঁচুতে।
কাবার সর্দার হায় আমির মৃত্যুতে হোল খাক,
বেচা কেনা করে খায় মুসলিমের মাহাত্ম্য পোশাক।[৪২(পৃ:-৫৩)]
(যরবে কালীম)

পার্থিব জগতের শক্তি সমূহকে নিজের কর্তৃত্বে এনে তার উপর আপন মহিমার অনুপম স্বাক্ষর রাখবার মতো জাগ্রত মানবের উজ্জীবন কামনা করেছিলেন ইকবাল, যার খুদী হবে শক্তিমান, মহিমান্বিত ও আল্লাহকে উদ্দেশ্য করেই শোনাতে পারবে স্বীয় অস্তিত্বের গান। ইকবাল এই গৌরবদীপ্ত মানবের অভিনন্দন বাণী রচনা করেন এভাবে–

توشب آفریدی چراغ آفریدم
سفال افریدی ایاغ آفریدم
بیابان وکهسار و راغ افریدی
خیابان و گلزار و باغ آفریدم
তুমি তৈরি করেছ রাত্রি, আমিতো

Dhaka University Institutional Repository

জ্বেলেছি আলোক
মাটি তোমার, তাই দিয়ে রচলাম
পান পাত্র।
তোমার ছিল মরুভূমি, পর্বত অরণ্য,
আমার হল তৈরি ফুলের কানন,
গোলাপ, ফুলের বাগান।[৪২](পৃ:-৫৪)
(পায়ামে মাশরিক, পৃ:- ১৩২)

জাভীদনামায় ইকবাল 'নেদায়ে জামাল' কবিতায় বলেছেন–

زنده ؟ مشتاق شوخلاق شو- همچوما گیرنده آفاق شو!
درشکن آنرا که ناید سازگار – از ضمیر خود دگرعالم بیار!
بنده آزاد را آید گران – زیستن اندر جهان دیگران!
هرکه او را قوت تخلیق نیست – پیش ماجز کافرو زندیق نیست!
তুমি কি জীবিত? তবে হও উদ্যমী, সৃষ্টিকারী,
লাভ কর আমার (খোদার) মত বিশ্বব্যাপকতা।
হবে না তা পছন্দ তোমার, ভেঙ্গে দাও বর্তমান দুনিয়া,
সৃষ্টি কর আরেকটি জাহান, তোমার নিজের মন মত।
হবে না মনপুত স্বাধীন বান্দার, বেঁচে থাকা অন্যের জাহানে,
সৃষ্টি শক্তি নেই যার, কাফের বই কিছু নয় সে আমার চোখে।[২](পৃ:-৩৬)
(জাভিদনামা, পৃ:- ২২৪-২২৫)

মানুষ আল্লাহর সাথে সৃষ্টির কাজে অংশগ্রহণ করে সমাজ ও পৃথিবীর উন্নতি সাধন করবে এটাই আল্লাহর ভাষ্য,[5] ইকবালের প্রত্যাশা। ইকবাল খুদী বা ব্যক্তির বিকাশ মানুষের চলিষ্ণু জীবনের জন্যে কামনা করেছেন। খুদীর এই গতিময়তা তাকে স্রষ্টার নিকটবর্তী করে। কিন্তু সমাজ ছাড়া যেমন ব্যক্তির অস্তিত্ব অচিন্তনীয়, তেমনিভাবে সুষ্ঠু ও কল্যাণকর সমাজব্যবস্থা ব্যতীত পূর্ণ পরিণত ব্যক্তির উজ্জীবনও সম্ভব নয়। একটি আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্যে যে ধরনের নাগরিক বা ব্যক্তিত্ববান মানুষ দরকার খুদীই পারে সে ধরনের ব্যক্তিত্ববান মানুষ উপহার দিতে। বস্তুত, তিনি মনে করতেন রাজনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদির মূল গ্রোথিত রয়েছে মানুষের আত্মিক জীবনের গভীরে। খুদী যেমন ব্যক্তির বিকাশের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক বিকাশে গরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রখে, তেমনি প্রত্যাদেশভিত্তিক একটি সুন্দর ও কল্যাণমূলক সমাজব্যবস্থা কিংবা রাষ্ট্রব্যবস্থা খুদীর সর্বাঙ্গীন বিকাশে ভূমিকা রাখতে পারে। এটি সেই মাত্রার বিকাশ যা ব্যক্তিকে স্রষ্টার একান্ত সানিধ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে, অর্থাৎ খুদীর ধারণার সাথে আদর্শ সমাজের সম্পর্ক পরিপূরক।

ব্যক্তির সমবায়েই সামাজিক কাঠামো সংগঠতি এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই এক একটি ভিন্ন সত্তা। সৌরমণ্ডলে যেমন নিজ কক্ষ পথে আবর্তনশীল প্রত্যেকটি গ্রহ এক একটি পৃথক ক্ষদ্রকার সৌর সংস্থা স্থাপন করে গতির

---

5 لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ "তোমরা ধাপে ধাপে উন্নতিলাভ করে যাবে।" (আল-কুরআন, সূরা: আল ইনশিকাক, আয়াত : ১৯), নবীজী বলেন مَنْ اِسْتَوٰى يَوْمَاهُ فَهُوَ مَغْبُوْنٌ -"যে ব্যক্তি তার দুই দিন একই অবস্থায় কাটিয়ে দিয়েছে, অথচ কোন উন্নতি করেনি; সে ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।" (আল-হাদীস, কাশফুল খিফা, আজলানী, ২য় খন্ড, পৃ:- ৩২৩)

নিয়মে তাদের চলমান রাখে এবং প্রত্যেকের মধ্যাকর্ষণের টান গতিবেগের সাম্য রক্ষা করে, তেমনি মানব সমাজেও এ উপপাদ্য প্রস্ফুটিত। ইকবালের খুদী দর্শনের মৌলিক অভিব্যক্তি মূলত এটাই। অর্থাৎ ব্যক্তি একটি স্বতন্ত্র সৃষ্টিশীল ও বিকাশমান সত্তা। আর এই ব্যক্তিত্ব হলো সংঘাতময় সত্তা। সংঘাতময় তাই সে গতিশীল, আর গতিশীল বলেই সে রূপান্তরশীল–

সমস্ত জীবন ভ্রাম্যমান
সকল বস্তু গতিমান
চাঁদ তারা এবং আকাশ
ও সমুদ্রের সকল প্রাণীই
সঞ্চরণশীল।[৮](পৃ:-৬৪)
(বালে জিব্রীল)

এভাবে একটি জৈবিক-যান্ত্রিক সমাজ-শৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, যাকে বলা হয় জাতি বা উম্মাহ। এ হচ্ছে বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য; যে ঐক্য অস্তিত্বের তুলাদণ্ডের ভারসাম্য রক্ষা করে। বিশ্ব ব্যবস্থায় এই ঐক্যের উপলব্ধি আল্লাহর একত্বের উপলব্ধি ছাড়া সম্ভব নয়। ইকবাল বলেন: সংস্কৃতি তাওহীদের (আল্লাহর একত্বের) আদর্শের মধ্যে বিশ্ব-ঐক্যের একটি ভিত্তি লক্ষ্য করে। রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম মানুষের বুদ্ধি ও আবেগ-সম্পন্ন জীবনে সে আদর্শকে একটি প্রাণবন্ত বিষয়রূপে প্রতিষ্ঠিত করার একটি বাস্তব পন্থা মাত্র।

ঐক্যের আদর্শ অর্জনের ফলে সমাজ একটি রাষ্ট্রীয় সংস্থায় পরিবর্তিত হয়, যার প্রত্যেকটি ব্যক্তি (তার স্বাতন্ত্র্যকে না হারিয়ে) একটি অখণ্ড সত্তারূপে পরিণত সমষ্টির সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়। এভাবে একটি অভিনব সমাজের জন্ম হয়– ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সাথে সমষ্টিগত দায়িত্ব যার জীবনের বিধান। আর এ সমাজের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে এমন একটি আদর্শ অবস্থার সৃষ্টি, যা গোপন জিনিসের মতো আল্লাহর অন্তরে লুকায়িত এবং যা প্রকাশিত হলে তা পৃথিবীতে হবে আল্লাহর পদক্ষেপ এবং পরিণামে যা নিয়ে আসবে মানবতার মুক্তি।

ইকবালের ইনসান-ই-কামিল ঃ

ইকবাল দর্শনের যে উন্মুখর চেতনা তার সম্পূর্ণ অবয়ব তাঁরই পরিকল্পিত ইনসান-ই-কামিলের মধ্যে অস্তিত্ব লাভ করেছে। এক দুর্জয় মহাসামুদ্রিক বলিষ্ঠতাকে লালন করে ইকবাল তার অভূতপূর্ব জীবন দর্শনের চিত্রাবলী বিশ্বমানবতার সামনে উপস্থাপন করেছেন। সংশয়-সংক্ষুব্ধ এবং নৈরাজ্য কবলিত পৃথিবীতে ইকবালের ইনসান-ই-কামিল হচ্ছে এক কল্যাণ সূর্যের স্পন্দন। ইকবালের পরিপূর্ণ মানবের ধারণার উৎস হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। কেননা ইসলাম বিশ্বাস করে মানুষের মধ্যে রয়েছে অপরিসীম সৃষ্টিশীলতা, অগ্রসরমান জীবন চেতনা এবং সীমাহীন কল্যাণ ভাবনা। মানুষ হচ্ছে আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি, তারই মধ্যে রূপ লাভ করেছে বুদ্ধিবৃত্তি ও আধ্যাত্মিকতার নীলা পাথর। আল্লাহ তাই তাকে মনোনীত করেছেন পৃথিবীতে তাঁর খলিফা হিসেবে। মানুষের এই খেলাফত প্রাপ্তির মধ্যে যে মহান দায়িত্ব ও অভূতপূর্ণ সম্মান নির্ধারিত হয়েছে ইকবালের ইনসান-ই-কামিল হচ্ছে তারই সমন্বয়। তাঁর এক কবিতায় তিনি বলেছেন–

মুমিনের রহস্য হচ্ছে শোন
যদিও তাকে মনে হয় নিছক কুরআনের হেফাজতকারী
কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সেই হচ্ছে জীবন্ত কুরআন।[৪২](পৃ:-৫৫)

পরিপূর্ণ মানবের ধারণা মুসলিম দার্শনিকদের চিন্তা জগতে নিবেদিত চন্দ্রের কিরণচ্ছাটার মতো সর্বদা জ্বলজ্বল করেছে। এদের মধ্যে আব্দুল করীম আল জিল্লী এবং মহিউদ্দীন ইবনুল আরাবীর অভূতপূর্ব ও চিত্তাকর্ষক ধারণাসমূহ মুসলিম দর্শনকে গৌরবোজ্বল স্থানে উন্নীত করেছে। জিল্লী ও আরাবী উভয়ই ছিলেন

সর্বেশ্বরবাদী চিন্তায় বিশ্বাসী। জিল্লী তার গ্রন্থ 'আল ইনসান আল কামিল ফি মাআরফাতিল আওয়াখির ওয়াল আওয়ায়েল'- এ এই ধারণা বিবৃত করেছেন যে, মানুষ হচ্ছে এক নিজস্ব সত্তা এবং প্রকৃতিগতভাবে সে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ও বিশ্বজগতের মূর্তিমান প্রতিচ্ছবি। সে হচ্ছে বিশ্বস্রষ্টা ও পার্থিব জগতের মধ্যে যোগাযোগের একমাত্র বন্ধন। ইউসুফ হুসায়েন খান, জিল্লীর এ ধারণাকে ব্যক্ত করেছেন এভাবে–

> Man is an entity by himself and is a manifestation of both God and universe. Man is the main objective behind the creation of the entire universe, because no other creation has the requisite qualities to mirror the truly divine characteristics. The Holy prophet is the supreme example of the perfect man and anybody treading the path of life in the light of his character is sure to achieve the highest ideal which life is capable of bestowing upon man.[৪২(পৃঃ-৫৫)]

একইভাবে মহিউদ্দীন ইবনুল আরাবীও বিশ্বাস করেন মানুষের মধ্যে স্রষ্টার অনুভূতিই তাকে পরিপূর্ণ মানবে রূপান্তরিত করতে পারে। সমভাবে পরিপূর্ণ মানুষের মধ্যে খোদা তাঁর শ্রেষ্ঠত্বও অনুধাবন করেন। এ.ই. আফিফী, ইবনুল আরাবীর দর্শনের এমনিতর পরিচয় দিয়েছেন–

> Ibn-i-Arabi's Pantheism is not a materilistic view of reality. The external world of Sensible objects is but a fleeting shadow of the Real (AL-Haqq), God. It is a form of a cosmism which denies that the phenomenal has being or meaning apart from and independently of God. It is not that cold blooded pantheism in which the name of God is mentioned for sheer courtsey, or, at the most for logical necessity or consistency. On the contrary, it is the sort of pantheism in which God swallows up every thing and the so called other than God is reduced to nothing. God alone is the all embracing and eternal reality.[৪২(পৃঃ-৫৬)]

ইবনুল আরাবী রাসূল (সা.) কে পরিপূর্ণ মানব হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু তাঁর ধারণায় রাসূল (সা.) জাগ্রত হয়েছেন এভাবে–

> The entity Mohammad combining in itself both the spirit of Muhammad and Muhammad the man, is for Ibn-Arabi the link between the eternal and the temporal, the real and the phenomenal. While Muhammad the man was born, was active and died in time, the spirit of Muhammad exists in all eternity.[৪২(পৃঃ-৫৬)]

উপমহাদেশে যখন মধ্যযুগীয় হাবভাবের চূড়ান্ত অন্ধতা বিদ্যমান ছিল ও সবেমাত্র পশ্চিমী সভ্যতার সূচনা হয়েছিল, সে সময়েই ইকবাল এলেন একদিকে অন্ধতা ও অন্যদিকে চোখ ঝলসানো সভ্যতার মাঝমাঝি এক বলিষ্ঠ ও প্রতিশ্রুতিশীল জীবনাদর্শন নিয়ে- যা মানুষকে তার ব্যক্তিত্ব ও মানবতাকে বিসর্জন না দিয়ে সমাজের দিকে দৃষ্টি দিতে শেখাল। ইসলামের মধ্যযুগীয় ব্যাখ্যার জায়গায় কুরআনিক ইসলামের মারফত মানব সমাজ পরিচালনার কথা তিনি সাবলীল ভঙ্গিতে তাঁর কবিতার পরতে পরতে মিশিয়ে দিলেন। তাঁর আধ্যাত্মিক মুর্শিদ হচ্ছেন মওলানা জালাল উদ্দিন রুমী। কিন্তু ইকবাল মধ্যযুগের সুফিবাদের সুপ্তি ও হতাশার বাণীকে সমালোচনার কষাঘাতে জর্জরিত করলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জার্মান দার্শনিক নীট্‌শে এবং ফরাসী দার্শনিক বার্গসঁ কিছুটা নতুন কথা শুনাইলেন। নীট্‌শে বললেন, এই জগৎ মৃত্যুর সাথেই বিলীন হয়ে যাবে না। মানুষ বারে বারে এখানে ফিরে

আসবে (eternal recurrence) এবং সাধারণ মানুষ না হয়ে superman বা অতি মানব হওয়ার সাধনা করাই হবে আমাদের লক্ষ্য। সাধারণ মানুষকে তিনি ঘৃণার চোখে দেখতেন। খৃস্টান ধর্মের প্রচলিত বিশ্বাস, সংস্কার ও নীতিজ্ঞানকেও তিনি আঘাত করলেন। ইশ্বর বলে কেউ নেই। এই মানুষ Superman বা নবঈশ্বর রূপে জন্ম লাভ করবে– ইত্যাদি নানা ধরনের অদ্ভূত কথা তিনি বললেন। কিন্তু তার এ মতবাদ ইউরোপ গ্রহণ করল না। গ্রীক মতবাদকেই সৃষ্টিজগৎ প্রাধান্য দিল। Panthestic Idealism ইউরোপের মন-মস্তিস্ককে আচ্ছন্ন করে রাখল।

প্রাচ্য দেশেও একই অভিশাপ নেমে আসল। ভারতীয় ঋষিরা মানুষের সাথে ঈশ্বর এবং জগতের সম্বন্ধ কী, তা নির্ণয় করতে গিয়ে একই মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদ প্রচার করলেন। ভারতীয় মায়া, শুধু মরীচিকা, এর কিছুই বাস্তব নয়, নিত্য নয়, এই মতই প্রাচ্য দেশে শিকড় গেড়ে বসেছিল। একমাত্র বেদান্ত দর্শনই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেছিল। কিন্তু সে স্বীকৃতিও গ্রীক দর্শন থেকে ভিন্ন নয়। একমেবাদ্বিতীয়ম' অর্থাৎ একছাড়া দুই নাই- এই হলো বেদান্ত দর্শনের সারকথা। এর নাম অদ্বৈতবাদ। বলা বাহুল্য, এই অদ্বৈতবাদ কিন্তু তাওহীদ বা একত্ববাদ নয়। এক ছাড়া দুই নাই– এর অর্থ এই নয় যে, এক আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই নাই। বরং এর অর্থ সবকিছুই আল্লাহময়। গ্রহ নক্ষত্র, মানুষ, পশু-পাখী, তৃণলতা, পাহাড়-পর্বত সবই এই একের প্রকাশ, অথবা সেই একেরই অংশ। অদ্বৈতমতে স্রষ্টা ও সৃষ্টি স্বতন্ত্র নয়; স্রষ্টা ও সৃষ্টি এক ও অভিন্ন। 'জীবই শিব', 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' (এই আত্মাই বহ্ম)', অহং ব্রহ্মস্মি (আমিই ব্রহ্ম), সোহ্হং (সেই আমি) এই হলো বেদান্ত মত। শঙ্কচার্যের হাতে এই মত একটি বিশিষ্ট দার্শনিক ভঙ্গি লাভ করেছিল।

বৌদ্ধদের 'নির্বাণ'ও অনুরূপ প্রেরণা থেকেই উৎসারিত। জীবন ও জগতকে তারা স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে দেখেনি। বরং বুদ্ধের সংশয়বাদ বা নিরীশ্বরবাদ মানব-মনে আরো গভীর নিরাশার রেখাপাত করল। অনিশ্চিত মহাশূন্যে বিলিন হয়ে যাওয়াই ছিল বৌদ্ধ ধর্মের জীবন-দর্শন।

বস্তুত: কি গ্রীক কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ– কোন দর্শনই জীবন জগত কিংবা ঈশ্বর প্রসঙ্গে পরিচ্ছন্ন কোন ধারণা দিতে পারেনি। মানবাত্মার চিরমৃত্যুর কথাই তারা প্রচার করেছে। মানব জীবনকে তারা মূর্তিমান অভিশাপ বলে মনে করতো। জীবনের অভিশাপ থেকে কি করে মুক্তি লাভ করা যায়, এই ছিল তাদের প্রধান চিন্তা। ফলে মানুষ নিষ্ক্রিয়, উদাসীন ও সন্ন্যাসী সেজেছে। জীবন সংগ্রামে নেমে সকল বাধা জয় করে সামনে অগ্রসর হওয়ার উদ্যমতাকে নিঃশেষ করেছে। জীবন-প্রদীপকে চিরতরে নির্বাপিত করে দেয়াই ছিল তাদের জীবন-ধর্ম।

সেমিটিক কালচারের ধারক-বাহক মুসলমানদের মধ্যেও একই বিভ্রান্তি দেখা দিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) যেখানে আল্লাহ, মানুষ এবং জগতের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করে মানুষকে সব গৌরব ও নব-মহিমা দান করলেন এবং নিষ্ক্রিয় ভাবালুতা বর্জন করে জীবনকে সংগ্রাম-মুখর করে তুললেন, সেখানে তার ইন্তিকালের মাত্র তিনশত বছরের মধ্যেই মুসলমানদের একটি বিশিষ্ট দল গ্রীক এবং ভারতীয় দর্শনের প্রভাবে একই অদ্বৈতবাদের মোহজালে জড়িয়ে পড়লেন। জন্নান মিসরী, বায়েজিদ বুস্তামী ও অন্যান্য সাধকেরা শীঘ্রই একটি নতুন মতবাদ প্রচার করলেন। তার নাম হলো সূফী মতবাদ। সূফীবাদও অদ্বৈতবাদের নব সংস্করণ মাত্র। এজগতের সবকিছু অলীক ও অসার, একমাত্র আল্লাহই নিত্য বস্তু; তাঁর মধ্যে লয়প্রাপ্ত হওয়াই আমাদের একমাত্র কাম্য ও লক্ষ্য, স্রষ্টা ও সৃষ্টি অভিন্ন একথাই সূফীরা প্রচার করলেন।

এয়োদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে স্পেনদেশীয় ইবনে আরাবী এই সূফীমতকে একটা বিশিষ্ট দার্শনিক রূপ দান করলেন। এর নাম দিলেন 'ওয়াহদাতুল-অজুদ' বা Sufistic pentheism । প্লেটোর মায়াবাদ, শঙ্করের অদ্বৈতবাদ এবং ইবনে আরাবীর সূফীবাদ মূলত এক ও অভিন্ন। তিনটি মতেই দেখা যায় জীবনের অস্বীকার, কর্মসন্যাস, স্রষ্টা ও সৃষ্টির অভিন্নতা এবং পরম সত্ত্বার মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দেবার সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা।

বৈদান্তিকেরা যেমন বললেন: 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বা 'সেহ্হং', সূফীসাধক মনসুর হাল্লাজ তেমনি বললেন,'আনাল হক' অর্থাৎ আমিই আল্লাহ।

অবশ্য সপ্তদশ শতাব্দীতে মুজাদ্দিদ আলফ্-সানি এসে ইবনে আরাবির এই মতবাদকে খন্ডন করলেন এবং বললেন যে, সাধানার এই চরম স্তর নয়, এর পরও আরো দুটি স্তর আছে। শেষ স্তরে পৌঁছলে দেখা যাবে: স্রষ্টা ও সৃষ্টি এক নয়। কিন্তু তিনি হলেন ধর্ম বা শরীয়াতের দিক দিয়ে সংস্কারক। দর্শনের দিক দিয়ে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এই প্যানথিজমকে খণ্ডন করার গুরুদায়িত্ব সঞ্চিত হয়েছিল দার্শনিক কবি ইকবালের জন্যে। তিনি প্রচার করলেন এক নতুন দর্শন, তাকে বলা যায় আত্মার দর্শন (Egoism)। মানুষের আত্মা যে প্রতিবিম্বের মত আল্লাহর অস্তিত্বে মিলিয়ে যায় না, তার যে ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য আছে, মৃত্যুর পরেও যে সে অনন্ত জীবনে বেঁচে থাকবে– এই কথাই তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন, মানুষের মধ্যে অসীম শক্তি ও সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে; সাধনা দ্বারা সেই শক্তি ও সম্ভাবনার পূর্ণ জাগরণ আনতে পারলেই কেবল এই মানুষ আল্লাহর খলিফার গৌরবময় আসন লাভ করতে পারে। এই পূর্ণ মানুষকে ইকবাল Superman (অতিমানব) না বলে বলেছেন 'মারদ-ই-মুমিন' বা 'ইনসান-ই-কামিল'। ইকবালের দর্শন তাই আত্মশক্তির দর্শন। তাঁর মতে, ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশের সাধনা প্রত্যেক অনুপরমাণুর মধ্যেও চলছে। প্রত্যেকেই শক্তির সাধক। প্রত্যেকেই বলতে চায়: 'আমি আছি'। ইকবাল তাই কি সুন্দরই না বলেছেন: Only that truly exists which can sy `I am', It is the degree of the intuition of `I am ness' that determines the place of a thing in the scale of being.[১০(পৃ:-৪৪)]

অর্থাৎ সেই সত্যিকারভাবে বেঁচে থাকে যে বলতে পারে 'আমি আছি।' এই 'আমি আছি'– চেতনার কম বেশিতেই প্রত্যেক জিনিসের অস্তিত্ব বা মূল্য পরিমিত হয়।

খুদীকে মহানির্বাণের (ফানা-ফিল্লার) পথে টেনে নেয়ার সাধনা তাই ইকবালের নয়। তাঁর সাধনা বাকা-বিল্লাহর সাধনা, অর্থাৎ আল্লাহর অস্তিত্বের ছায়ায় অনন্ত জীবন বেঁচে থাকার সাধনা। বলা বাহুল্য, এটিই খাঁটি ইসলামী দর্শন। ইসলামের কোথাও নেই যে, পুন্যাত্মারা গিয়ে আল্লাহর মধ্যে লয়প্রাপ্ত হবে। অথবা পাপীদের আত্মাগুলোকে আল্লাহ দোজখের আগুনে পুড়ে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবেন। পুন্যত্মারা তো অনন্তকাল বেহেশতে বাস করবেই,(আসহাবুল জান্নাতি ওয়াহুম ফিহা খালিদুন), পাপীরাও অন্তকাল দোজখে বাস করবে (আসহাবুন নার ওয়াহুম ফিহা খালিদুন)। দোজখ যদি অনন্ত প্রসারী নাও হয়, তবুও নির্দিষ্ট মেয়াদের পর পাপীরা বেহেশতে উন্নীত হবে এবং তথায় কাল বাস করবে। কাজেই যে কোন অবস্থায় আত্মার অমরত্ব ইসলামে সুনির্দিষ্ট হয়ে আছে।

মূলত: আল্লাহ, মানুষ এবং জগতের মধ্যে কার কি সম্পর্ক এবং কার কি কর্তব্য, তার মীমাংসাই ইকবাল দর্শনের মূল সুর। জগতজোড়া মহামৃত্যুর ক্রন্দনের মধ্যে তিনি গেয়েছেন অমর জীবনের গান; নিরাশার অন্ধকারে তিনি এনেছেন নব-প্রভাতের আলো। এতদিন মানুষ জীবন হতে মৃত্যুর দিকে তাকিয়ে ছিল, এবার মানুষ মৃত্যু হতে মহাজীবনের পানে দৃষ্টি ফিরালো। এতদিনকার অজ্ঞাত জীবন ও জগতের প্রতি তার মমত্ব ও আকর্ষণ আসলো। নতুন মূল্যবোধ নিয়ে সে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হলো। এটিই ইকবালের জীবন-দর্শনের বৈশিষ্ট্য।

ইকবাল বলেন: আল্লাহ আমাদের স্রষ্টা, আমরা তাঁরই সৃষ্টি। কিন্তু সৃষ্টি করার পর থেকে তিনি আর আমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চান না; তাঁর স্নেহছায়ায় আমাদেরক চিরকাল বাঁচিয়ে রাখতে চান। এটা তার প্রেম-সুন্দর রূপ। মানুষেরও তাই কর্তব্য স্রষ্টার সাথে যোগাযোগ রেখে চলা– স্রষ্টাকে ভালবেসে তাঁর কাছে নতি স্বীকার করে তাঁর শক্তিতে শক্তিমান হয়ে খুদীকে বলিষ্ঠ করে তোলা। ইকবাল বলেন: শক্তি অর্জন হবে আল্লাহর ভিতর নিজেকে বিলীন করে না দিয়ে নিজের মধ্যে আল্লাহকে আয়ত্ত করার মাধ্যমে– Instead of absorbing yourself unto God, absorb God unto yourself.[১০(পৃ:-৪৫)]

অন্যত্র তিনি বলেছেন:

Abandon theyself and flee to God
Being strengthened by God, return to theyself.

অর্থাৎ: নিজেকে ছেড়ে আল্লাহর নিকট ছুটে যাও তাঁর শক্তিতে শক্তিমান হয়ে পুনরায় নিজের মধ্যে ফিরে এসো।[১০](পৃ:-৪৫)

এখানে মি'রাজের প্রতি ইঙ্গিত আছে। মি'রাজ-রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে তার মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দেননি বরং সেখান হতে প্রচুর শক্তি সঞ্চয় করে আবার তিনি জগতে ফিরে আসেন এবং অধিকতর উৎসাহ-উদ্দীপনায় কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। আমাদেরও ঠিক তেমনই করতে হবে। স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে আল্লাহর সাথে মিলিত হতে হবে। নবীজী বলেন: - تَخَلَّقُوْا بِاَخْلاَقِ اللهِ -"নিজেকে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত কর।"(আল-হাদীস)[২](পৃ:-৩৩)

মানুষের অস্তিত্বের প্রয়োজন না থাকলে নবীজি মানুষকে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হওয়ার নির্দেশ দিতেন না। আর কুরআনে হাকীমও নির্দেশ করতনা صَبِيغَةَ اللهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً তোমরা আল্লাহর রঙ্গে রঞ্জিত হত্ত! আর আল্লাহর রঙ্গের চেয়ে উত্তম কি আছে? (আল কুরআন)। অতএব মানুষের কর্তব্য হলো– সাধ্যমত চেষ্টা করে আল্লাহর গুণাবলীর অধিকারী হওয়া। এ গুণার্জনের মধ্যদিয়েই মানুষ আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে। সাগরের তলদেশে ঝিনুকের মধ্যে যে মুক্তা সৃষ্টি হয়, তার সত্তা অথৈ সাগরের অতল গভীরেও অটুট থাকে। ঠিক তেমনি মানুষ যদি আল্লাহর সত্তায় মিলিত হয়, তবে নিজের খুদী বজায় রেখেই মিলিত হবে। লোহা আগুনের মধ্যে বেশি দগ্ধ হলে মনে হয় যেন লোহাই আগুনে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ঐ লোহাকে আগুন থেকে বের করলে তা পূর্ববৎ কঠিন পদার্থের রূপ পরিগ্রহ করে। ঠিক তেমনি আল্লাহর সাথে মানুষকে মিলিত হতে হলে আগুনে প্রবিষ্ট লোহার আগুনের মত নিজ অস্তিত্বকে বজায় রেখেই মিলিত হবে। ইকবাল বলেন:

خودی اندر خودی گنجد محال است !
خودی را عین خود بودن کمال است !
এক খুদীর মধ্যে অপর খুদীর লয় প্রাপ্তি অসম্ভব।
খুদীর হুবহু অস্তিত্ব বজায় রাখাই হবে তার পূর্ণতা সাধন।[২](পৃ:-৩৩)
(যবূরে আযম, পৃ– ২২২)

অন্যত্র ইকবাল বলেন:

وصال ما وصال اندر فراق است
کشود این گره غیر از نظر نیست
گهر گم گشته آغوش دریااست
ولیکن آب بحر آب گهر نیست
'বিচ্ছেদের মধ্যেই রয়েছে আল্লাহর সাথে আমাদের মিলন,
চিন্তা ছাড়া এ সমস্যার সমাধান নেই।
হারিয়ে গেছে মুক্তা সাগর-কোলে,
কিন্তু মুক্তার পানি, সাগরের পানি নয়।[২](পৃ:-৩৪)
(আরমুগানে হেজায, পৃ:- ১৭৪)

অতএব আল্লাহর সাথে আমাদের সহযোগিতাও করতে হবে, আপনার স্বাতন্ত্র্যও বজায় রাখতে হবে। এই স্বাতন্ত্র্য প্রেমে মধুর হবে, অনুগত্যে মহীয়ান হবে। প্রেম ও আনুগত্যের মধ্যদিয়ে মানুষ পদ-গৌরব লাভ করবে, আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে। এভাবে সে মারদে-মুমিনে উত্তীর্ণ হয়। আর মারদে-মুমিনের দরজায় পৌঁছলে মানুষের মর্যাদা হয় অপূর্ব-মহীয়ান। ইবনুল আরাবীর সর্বেশ্বরবাদী চিন্তার সাথে ইকবালের এখানেই পার্থক্য। রাসূল (সা.) কে তিনি মূর্ত করেছেন এক শক্তিমান সৎকর্মশীল ও অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসেবে। তাঁর কল্পিত পরিপূর্ণ মানব হচ্ছে এক মুমিন যে তার আপন ভাগ্য নিয়ন্ত্রক এবং পরিপূর্ণতার শীর্ষে পৌঁছানোর চেষ্টায় অবিরত মগ্ন। তিনি তাঁর এক কবিতায় মুমিনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেন–

هاته هی الله کابنده مؤمن کاهاته

غالب و کار آفرین کار کشا کار ساز-

.....

.....

মোমিনের হস্ত
সেতো আল্লাহরই হস্ত
আধিপত্যশীল, সম্পদশালী, সৃষ্টিধর্মী,
সাফল্য আনয়নকারী;
মৃত্তিকা থেকে জাত
তবু সে জ্যোতির্ময় প্রকৃতিতে,
সৃষ্টি সে স্রষ্টার গুণে সমৃদ্ধ।
উদাসীন তার অন্তর
উভয় বিশ্বের সম্পদে;
আকাঙ্ক্ষা তার অতি অল্প,
কিন্তু উদ্দেশ্য তার বিরাট,
পথ তার মহিমাময়,
আর দৃষ্টি মুগ্ধকর,
বাক্যে সে মৃদু আর উষ্ণ অনুসন্ধানে,
অন্তর ও মন তার
যেমন বিশুদ্ধ সংগ্রামে
তেমনই শান্তিতে।[৪২](পৃ:-৫৬,৫৭)

(বালে জিব্রীল, পৃষ্ঠা- ১৩২, অনুবাদ সৈয়দ আব্দুল মান্নান)

ইকবাল মুমিনের জীবনকে বিবেচনা করেছেন গতিশীল ও কর্মপ্রবণতার আলোকোজ্জ্বল রশ্মি হিসেবে। কর্মবিমুখ, নিশ্চল এবং সংগ্রামহীন জীবন তার কাছে অর্থহীন। এই কর্মশীলতার প্রকৃতি হবে সৃষ্টিধর্মী ও মৌলিক। কারণ মানুষের সৃষ্টিশীল চেতনা তাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং অসম্পূর্ণ বিশ্বকে সমৃদ্ধশালী করে তোলে। প্রকৃত মুমিন তার জীবন নির্বাহ করে পারিপার্শ্বিকতার সাথে সংযোগ রেখে এবং স্বীয় উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে তাকে দেয় নবতর গতিশীল রূপ। আসরার-ই-খুদী কাব্যে কবি হযরত আলীর (রা.) নামসমূহের প্রকৃত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে তিনি ইনসান-ই-কামিলের সক্রিয় গুণরাজির একটি রেখা চিত্র অংকন করেছেন–

এই বিশ্বের বুকে যে কেহ হতে পারে বু তোরাব,
ইঙ্গিতে তার সূর্য উদিত হয়
পশ্চিম গগন থেকে;

আত্মজ্ঞান দ্বারা
তিনি কর্ম করে যান আল্লাহর হস্তের,
আর আল্লাহর হস্ত হয়েই
শাসন চালিয়ে যান সকলের উপর
যদি তুমি পান কর স্বচ্ছ সুরা
তোমার আপন দ্রাক্ষা থেকে,
তোমায় প্রভুত্ব করতেই হবে
তোমার আপন মৃত্তিকার উপর।
কমনীয় তুমি গোলাবের মতো,
কঠিন হয়ে ওঠ প্রস্তরের ন্যায়,
যেন তুমি হতে পার জান্নাতের প্রাচীর ভিত্তি।
তোমার কর্দমকে পরিণত কর একটি মানবে,
তোমার মানবকে পরিণত কর বিশ্বে।
যদি তুমি নির্মাণ না কর প্রাচীর অথবা দ্বার
অপর কেহ নির্মাণ করবে ইষ্টক
তোমার মৃত্তিকা থেকে।
জাগ্রত হও, সৃষ্টি কর নতুন জগত
আবৃত কর আপনাকে অনল শিখায়
হয়ে ওঠ ইবরাহীমের মতো।
এই বিশ্বের সাথে তাল রেখে চলা-
যে ভালবাসেনা তোমার সংকল্পকে–
সে শুধু নিক্ষেপ করা বর্ম
সমর ক্ষেত্রের মধ্যে।
সবল চরিত্র মানব–
যে প্রভু তার আপনার,
লাভ করে সৌভাগ্য অপরিমান।
যদি বিশ্ব না মেনে নেয় তার খেয়াল,
সে পরীক্ষা করবে যুদ্ধের দুর্ঘটনাকে
স্বর্গের সাথে।
তার আপন শক্তিতে
সে সৃষ্টি করবে একট নবীন বিশ্ব
যা' চলবে তার খুশিতে।
যে বেঁচে থাকতে পারে না এই বিশ্বের বুকে
মানুষের মতো,
তার বীরের মতো মৃত্যুবরণই শ্রেয়।
জীবনের কাছে একটি মাত্র নিয়ম
জীবন শক্তির প্রকাশ–
আর তার মূল উৎস বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা।
জীবন বীজ আর ক্ষমতা তার ফসল,
ক্ষমতা বুঝিয়ে দেয় সত্য মিথ্যার রহস্য।
ওগো অসাবধান যারা তোমাদের প্রতি পদ ও বিশ্বাসে
বিশ্বাস কর নিজেদেরকে
উভয় বিশ্বের সেরা বলে।[৪২](পৃ:-৫৭,৫৮)

দ্বিতীয়ত মুমিনের কর্তব্য হচ্ছে প্রকৃতির অনন্ত শক্তিকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে স্বীয় মেধা ও মননকে ব্যবহার করা। নিজের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ছাড়া প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিকতার কাছে সে করুণার পাত্রে পরিণত হবে। বুদ্ধিবৃত্তি মানুষকে সাহস যোগায় ঠিক, কিন্তু মানবতার বৃত্তের কল্যাণে একে নিয়োজিত করা যাবে তখন, যখন তা নিয়ন্ত্রিত হবে প্রেম দ্বরা। ইকবালের ধারণায় উজ্জীবিত এই প্রেম কোন মানসিক আবেগ নয়। এ হলো এক সক্রিয় শক্তি যা মানবীয় প্রচেষ্টাকে অধিকতর গতিবান করে তোলে; মানব ব্যক্তিত্বকে উন্নীত করে সীমাহীন মর্যাদার আসনে। এ অবস্থায় মুমিন যুক্ত হয় খোদার সাথে একই সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টায়। প্রকৃত মুমিন জীবন ধারণ করে আল্লাহরই জন্য। আল্লাহর ইচ্ছাকে বুলন্দ করবার জন্যে নিজে জীবনবাজি রাখে এবং এমনিভাবে নিজেকে তৈরি করে আল্লাহর খলিফা হিসেবে। পৃথিবীতে স্রষ্টার প্রতিনিধি হিসেবে মুমিনকে তাই নানা ধরনের জিহাদে শামিল হতে হয়। এই জিহাদ স্বীয় প্রবৃত্তির বিরুদ্ধেও হতে পারে কিংবা বহির্জগতের নানা ধরনের অন্যায়, অবিচার ও বেইনসাফীর বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার মত প্রয়োজনীয়তাও দেখা দিতে পারে। এই ধরনের জিহাদ স্বাভাবিকভাবে মুমিনকে করে তোলে আরও সমৃদ্ধ, অধিকতর আত্মপ্রত্যয়ী ও সংগ্রামী। এর ফলে বর্ধিত হয় তার অন্তর্সম্পদ যা কিনা তাকে সকল দুর্নীতি ও অকল্যাণকে বর্জন করতে অনুপ্রাণিত করে এবং সকল সামাজিক দুর্দৈবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার শক্তি যোগায়। এমনিভাবে মুমিন তার সকল আস্থা ও সৃষ্টিশীল জীবন বিন্যাসের একটি অংশে পরিণত হয়–

‘বান্দায়ে হক’ নির্ভরশীল হয় না
অবস্থার কাছে,
জীবন নয় ঘণ্টা দোলকের আবর্তন।
মুসলিম যদি তুমি
শিক্ষা কর আত্মনির্ভরতা
হও তুমি অবিমিশ্র আশীর্বাদ
বিশ্বের সকল জাতির কাছে;
সন্ধান করোনা তোমার জীবিকা
নীচমনার হাত থেকে।
ইউসুফের মত তুমি;
সুলভ করো না আপনাকে।
হেলায় উপেক্ষা কর তুমি
কায়-কাউসের সাম্রাজ্য
কুরবান কর তোমার শির,
তবু কুরবান করোনা তোমার সম্মান।
সেই মানুষই তুলানাহীন–
যে জানতে শেখে তার আপনাকে,
সেই কাওমই সত্যিকার কাওম
যে আপোষ করেনা অপরের সাথে।
শিক্ষা কর মোস্তফার বাণীর তাৎপর্য
বর্জন কর সকল আরাধ্য
এক আল্লাহ ছাড়া।[৪২(পৃ:-৫৯)]

ইকবাল অন্যত্র মুমিনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেন, মুমিন বন্ধুদের মাঝে রেশমের মত কোমল হয়, কিন্তু যুদ্ধের সময় স্টীল লোহার মতো শক্ত হয়। মুমিন কখনো শিশির ফোটার মত স্নিগ্ধ হয়, আবার কখনো ঝঞ্জা বায়ুর আকার ধারণ করে:

هو حلقه یاران تو بریشم کی طرح نرم

رزم حق و باطل هو تو فولادهی مومن!

স্নিগ্ধ হয় মুমিন বন্ধু-সভায় রেশমের ন্যায়

পরিণত হয় স্টীল লোহায়, সত্য-অসত্যের রণে।[২](পৃ:-১০২)

(আরমুগানে হেজায, পৃ:- ২৫৩)

جس سی جگر لاله هین بهندک هو وه شبنم

دریاؤن کی دل جس سی دهل جائین وه طوفان!

মুমিন শিশির ফোটার মতো, যা জুড়ায় লালা ফুলের প্রাণ,

নেয় আবার তা ঝড়ের রূপ: কেঁপে উঠে যাতে দরিয়ার দিল।[২](পৃ:-১০২)

(যরবে কালীম, পৃ:- ৪১)

মুমিন অসত্যের সামনে তলোয়ার এবং সত্য রক্ষায় ঢালরূপ হয়ে থাকে। মুমিন মাহফিলে মন-মোহনিয়া সুরে গান গেয়ে সভাস্থ সকলের মনে আনন্দ দেয়, আবার যুদ্ধের ময়দানে লোহা গলানো তলোয়ারের রূপ পরিগ্রহ করে;

اگرهو جنگ توشیران غاب سی بره کر

اگر هو صلح تو رعنا غزال تاتاری

হিংস্র হয় যুদ্ধের সময়-বন-সিংহের চাইতেও

কোমল হয় তাতারী হরিণের মতো সন্ধির সময়ে।[২](পৃ:-১০৩)

(যরবে কালীম, পৃ:- ১৭৪)

অন্যত্র কবি বলেন:

پیش باطل تیغ و پیش حق سپر

امر و نهی او عیاد خیر و شر

ساز او در بزم هاخاطر نواز

سوز او در رزم ها آهن گداز

در گلستان باعنادل هم صفیر

در بیابان جره باز صید گیر

মুমিন হয় তরবারি অসত্যের সামনে,

সত্যের সামনে হয় ঢাল,

আদেশ-নিষেধ তার ভাল-মন্দের প্রতীক।

জুড়ায় মন সভায় তার গানের সুর,

ধারণ করে লোহা গলানো তরবারির আকার

তার মনের উত্তাপ, যুদ্ধের সময়ে।

গায় গান মুমিন বাগানে, বুলবুলের সমস্বরে

শিকারীর রূপ নেয় সে, নব বাজ পাখির বনে।[২](পৃ:-১৯২)

(আসরার ও রুমূয, পৃ:- ১৯২)

অন্যত্র ইকবাল বলেন:

مصاف زندگی مین سیرت فولاد پیداکر
شبستان محبت مین حریر و پرنیان هوجا
گذر جابن کی سیل تندر و گوه و بیابان سی
گلستان راه مین آئی تو جوئی نغمه خوان هوجا-
হও জীবন যুদ্ধে ইস্পাত কঠিন,
হও ভালোবাসায় রেশম ও মখমলের ন্যায় কোমল।
বয়ে যাও বেগবান ঢলের ন্যায়–
পাহাড় আর মরু মাড়িয়া,
পড়ে যদি বাগান পথমাঝে
রূপ নাও গায়ক-সুলভ ঝরনার।[২(পৃ:-১২১)]
(বাঙ্গে দারা, পৃ:- ৩১২)

সাহস হলো পরিপূর্ণ মানবের জীবন চর্চার আবশ্যকীয় উপাদান। উপরন্তু ভীতি তার কাছে মানব জীবনের পরিশীলতা ও পরিচ্ছন্নতা আনয়নের বিরুদ্ধে এক চরম প্রতিবন্ধকতা। প্রেম যেমন আত্মাকে পরিচ্ছন্ন ও সাহসী করে, ভীতি তেমিন আত্মাকে করে অবদমিত। এই আত্মা তখন মানব চরিত্রের কলঙ্ক হিসেবে বিবেচিত হয়। আল্লাহর ভীতি ব্যতীত অপর সব রকমের ভীতি যাবতীয় খারাবীর জন্ম দেয়। ইকবাল মনে করেন, একমাত্র তাওহীদে বিশ্বাসই পারে মানুষকে ভীতিমুক্ত জীবন নির্বাহে উৎসাহ যোগাতে। তাওহীদ হচ্ছে এক সুদৃঢ় কর্ম যা মুমিনকে সকল প্রতিকূলতার মুখে দাঁড়ানোর অনুপ্রেরণা যোগায়–

প্রেম দগ্ধ করে দিক সকল ভীতি
ভয় কর কেবল আল্লাহকে
আর বেঁচে থাক সিংহের মতো;
আল্লাহর ভীতি ঈমানের প্রারম্ভ
আর অপরের ভীতি হচ্ছে
অবগুণ্ঠিত পৌওলিকতা;
মুক্ত কর নিজেকে
অপরের ভীতি থেকে
তুমি এক ঘুমন্ত শক্তি;
জাগ্রত করে তোল আপনাকে।[৪২(পৃ:-৫৯,৬০)]
(অনুবাদ, সেয়দ আবদুল মান্নান)

তাওহীদ তথা এক আল্লাহর ভীতিই কেবল মানুষকে বিশ্বজগতের যাবতীয় শক্তিকে নির্ভয়ে উপেক্ষা করার শক্তি যোগায়। নিস্তার দেয় মানুষকে, এক আল্লাহর সিজদা, গায়রুল্লাহর, হাজার সিজদা থেকে। ইকবাল বলেন:

یه ایک سجده جسی تو گران سمجهتا هں
هزار سجده سی دیتاهی آدمی کو نجات
মনে করছ কঠিন তুমি যে-এক সেজদাকে
দেবে তা নিস্তার তোমায়, হাজার সেজদা থেকে।[২(পৃ:-৯১)]
(যরবে কালীম, পৃ:- ৩২)

Dhaka University Institutional Repository

وهی سجده هی لائق اهتمام

که هو **جس** سی هر سجده تجه پرحرام

ঐ সেজদাই কেবল গুরুত্বের অধিকারী,

করে দেয় যা হারাম, সকল সেজদা তথা মিনতিকে।[২(পৃ:-৯১)]

(বালে জিব্রীল, পৃ:- ১৭৩)

এ জন্যে তাওহীদের মর্ম উপলব্ধী করতে হবে। ইকবাল বলেন:

تانه رمز لا اله اید بدست

بند غیر الله را نتوان شکست

পারবে না বুঝতে যতক্ষণ লা-ইলাহার মর্মবাণী,

পারবে না ভাঙ্গতে ততক্ষণ গায়রুল্লাহর বন্ধন।[২(পৃ:-৯০)]

(পাস্ চে বায়াদ কারদ, পৃ:-১৯)

ইকবাল তাই তাঁর কল্পিত পূর্ণমানবকে অভয় ও চিন্তাহীনতা শিক্ষা দিয়ে বলেন:

ای که در زندان غم باشی اسیر

از نبی ص تعلیم لاتحزن بگیر

این سبق صدیق رض وا صدّیق کرد

سرخوش از پیمانه تحقیق کرد

گرخدا داری زغم آزاد شو

از خیال بیش وکم آزاد **شو**

.....

.....

ওগো যারা আছ বন্দী

ভীতির জিন্দান খানায়

শিখে নাও মহানবীর নির্দেশ:

ভীত হয়ো না।

যদি তুমি ঈমান রাখ আল্লাহতে

মুক্ত কর আপনাকে সকল ভীতি থেকে

আর লাভ ক্ষতির সকল আশঙ্কা থেকে;

গায়রুল্লাহর ভীতি

পশ্চাৎমুখী করে কর্মকে

সেই তো দস্যু-

রাহাজানি করে জীবনের কাফেলাকে;

যখন তার বীজ রোপিত হয়

তোমার ক্ষেত্রে,

জীবন হয় পশ্চাৎমুখী আত্মবিকাশ থেকে;

যে কেহ উপলব্ধি করেছে মুস্তফার শিক্ষা
দেখেছে পৌত্তলিকতা বিরাজমান
ভীতির বুকে।[৪২](পৃ:-৬০)

মুমিন বান্দাকে জালিম শাসকের শক্তি-সামর্থ্যও প্রভাবিত বা ভীত সন্ত্রস্ত করতে পারে না। ইকবাল বলেন:

بنده مؤمن کادل بیم وریاسی پاک هی
قوت فرما نروا کی سامنی بیاک هی
মুমিন বান্দার মন ভয় ও প্রদর্শনীর ভাব-মুক্ত।
শাসকের শক্তির সামনে সে নির্ভীক।[২](পৃ:-১১৩)
(বাঙ্গে দারা, পৃ:- ৪৩)

ইকবাল অন্যত্র বলেন:

آئین جوان مردان حق گوئی وبیباکی
الله کی شیرون کو اتی نهین روباهی!
বীরের স্বাভাব হক কথা বলা, নির্ভীক হওয়া,
জানেনা আল্লাহর সিংহরা শিয়ালের প্রতারণা।[২](পৃ:-১১৩)
(বালে জিব্রীল, পৃ:- ৮৩)

বরং বান্দায় হক যখন সাহস নিয়ে সামনে এগিয়ে যায়, তখন ফেরাউনী শক্তি পরাভূত হয় আর মূসার দল বিজয়ী হয়। ইকবাল বলেন:

چون کلیمی سوئی فرعونی رود
قلب او از لاتخف محکم شود
কোন মূসা যখন কোন ফিরাউনের দিকে যায়,
তার মন তখন লা তাখাফ' এর মর্মে দৃঢ় হয়।[২](পৃ:-১২৫)
(আসারার ও রুমূয়, পৃ:-১০৯)

আল্লাহর পথের পথিকের আকাঙ্ক্ষার কোন শেষ নেই। সে হবে উচ্চাভিলাষী। একটি লক্ষ্যে পৌঁছামাত্রই সেই অপর একটি লক্ষ্যবস্তু স্থির করে নেয়। তার লক্ষ্যবস্তু বার বার দূরে সরে যায়। তথাপি সে নতুন নতুন আইডিয়্যাল স্থির করে নেয় এবং এমনি করে সে এক উন্নতির পর অধিকতর উন্নতির পথে ধাবিত হয়। উচ্চাভিলাষী কোন মনজিলে থামলেও পরক্ষণেই সে বুঝতে পারে যে, বিরতির চাইতে অনর্গল সফরের মধ্যেই বেশি আনন্দ রয়েছে। ইকবাল বলেন:

تو ره نورد شوق هی منزل نه کر قبول
لیلی بهی هم نشین هو **تو** محمل نه کر قبول!
ای جوئی اب بره کی هو دریائی تند و **تیز**!
ساحل تجهی عطا هو توساحل نه کر قبول!
ইশকের পথের পথিক তুমি,থামবে না কোন মনজিলে
বসে যদি লায়লীও পাজরে তোমার,নেবে না কভু তোমার জিনে।
হে ঝরনা! আগে চল, হয়ে যা উতলা নদী,
কূলে নিতে চাইলে কেউ, করবে না তা কবুল।[২](পৃ:-১০৫)
(যরবে কালীম, পৃ:- ৭১)

মুমিনের লক্ষ্য হলো কেবল আল্লাহর দীদার। সে বেহেশতে যেয়েও থাকে উদ্বিগ্ন, তাই হূরও অভিযোগ তোলে। কবি বলেন:

کہتی ہین فرشتی کہ دلاویزہی مومن
حورون کو شکایت ہی کم آمیزہی مومن
ফেরেশতা বলে: মুমিন-চরিত্র হৃদয়গ্রাহী,
হূরেরা করে অভিযোগ; মুমিন কম মিশুক।[২](পৃ:-১৬৫)
(যরবে কালীম, পৃ:- ৪১)

মুমিন মাটির মানুষ কিন্তু তার উদ্দেশ্য হয় আকাশ-চুম্বী। চামচিকা আর কবুতরের উপর তার নজর পড়ে না। ফেরেশতাদের ছাড়িয়ে যায় তার অগ্রগামী নজর। ইকবাল বলেন:

افلاک سی ہی اس کی حریفا نہ کشا کش
خاکی ہی مگر خاک سی آزادہی مؤمن!
جچتی نہین کنجشک وحمام اس کی نظرمین
جبریل وسرافیل کاصیادہی مومن!
থাকে আকাশের সাথে তার বৈরী টানাপড়েন,
মাটির তৈরি সে, কিন্তু থাকে মাটি থেকে আযাদ।
পড়ে না তার নজর চামচিকা আর কবুতর গায়ে
জিব্রাঈল আর ইস্রাফীল তার নগ্ন শিকার।[২](পৃ:-১৬৪)
(যরবে কালীম, পৃ:- ৪১)

ইকবালের পরিকল্পিত পরিপূর্ণ মানবের অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো পরমত সহিষ্ণুতা। কারণ, অনেকের মধ্যে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে হলে যদি পরমতসহিষ্ণুতা না থাকে তাহলে এক অনিবার্য সংঘর্ষের পথে সবাই এগিয়ে যাবে এবং আত্মবিকাশের ধারণা পরিণত হবে নিছক প্রহেলিকায়। ইকবাল বলেন: কর্মপ্রবণ আত্মার নীতি হচ্ছে নিজস্ব আত্মমর্যাদাবোধ ও অপরের মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাপোষণ। ইকবাল মনে করেন, মুমিন পোষিত এ সহিষ্ণুতার ধারণা একান্তই ধর্মীয়। কোন প্রত্যয়হীন মূল্যবোধ থেকে এর জন্ম লাভ সম্ভব নয়–

ادمیت احترام ادمی
باخبر شو از مقام ادمی
حرف بد را برلب اوردن خطاست
کافر و مومن همه خلق خداست
بنده حق از خدا گیرد طریق
می شود بر کافر و مومن شفیق
کفر و دین را کیر در پنهائی دل
دل اگر بگریزد از دل وائی دل
گرچه دل زندانی آب وگل است
این همه آفاق آفاق دل است!
ধর্ম হচ্ছে চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা

পূর্ণতা লাভের জন্য;
আরম্ভ তার ভক্তিতে
আর সমাপ্তি প্রেমে।
কঠোর বাক্য উচ্চারণ পাপ,
কারণ কাফের ও মোমেন
উভয়ই হচ্ছে খালকে খোদা।
আদমিয়াত কি?
মানবের প্রতি শ্রদ্ধা
শিক্ষা করো উপলব্ধি করতে
মানবের মর্যাদা
প্রেমিক মানুষ শিখে নেয় আল্লাহর পথ,
সম উদার সে
মোমেন ও কাফেরের কাছে;
গ্রহণ করো কুফর ও দীনকে
সমভাবে তোমার অন্তরে।
যদি অন্তরই দূরে সরে যায় অন্তর থেকে,
অভিশাপে পূর্ণ হয় মানব অন্তর
অন্তর নিঃসন্দেহে কারাবন্দী
জল ও কর্দমের কয়েদ খানায়
কিন্তু সমগ্র বিশ্ব জগতে রয়েছে
অন্তরের আধিপত্য।[৪২/২(পৃ:-৬১/১২৭,১২৮)]

ইকবাল 'ফকর' কে মুমিনের আরেকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। 'ফকর হচ্ছে সেই গুণ যা মুমিনকে জড় বিশ্ব জয় করতে উৎসাহ যোগাবে, কিন্তু নিজে পরিণত হবে না জড় বিশ্বের দাসে। তাঁর দৃষ্টিতে মানুষ আত্মসচেতন এবং স্বাধীন ইচ্ছা শক্তির অধিকারী, মানুষ দৃষ্টিসম্পন্ন এবং তার সবচেয়ে বড় শত্রু হলো অন্যের প্রতি অনুগত হওয়া। ইকবালের দৃষ্টিতে মানুষের নিকৃষ্টতম বৈশিষ্ট্য হলো লাঞ্ছনা বরণ এবং দাসত্ব। এই ঘৃণ্য চরিত্রটিকে তিনি কবিতার অলংকারে এভাবে চিহ্নিত করেছেন:

آدم از بی بصری بندئی ادم کرد
گوهری داشت ولی نزد قبا دو جم کرد
یعنی از خوی غلامی زسگان خوار تراست
من ندیدم کی سگی پیش گرسرخم کرد
মানুষ দৃষ্টিহীনতার কারণেই মানুষের গোলামী করেছে
অমূল্য রত্ন ছিল তার, রাজা-বাদশাহর পায়ে উজাড় করেছে।
দাসত্বের অভ্যাসে কুকুরদের চেয়েও নিকৃষ্ট সে
আমি তো দেখিনি, কোন কুকুর অন্য কুকুরের সম্মুখে
মাথা নত করেছে।[৭]

ইকবালের মতে, মুমিন একমাত্র আল্লাহর সামনে এবং সত্য ও ইনসাফের সামনে মাথানত করবে– আর কারো সামনে নয়। মূলতঃ ইকবালের ইনসান-ই-কামিল হচ্ছে সেই মহাশক্তিমান মানব যে সমস্ত শক্তিকে সংহত ও কেন্দ্রীভূত করে আল্লাহর রাজ্যের প্রতিনিধিতে পরিণত হবে। পারিপার্শ্বিকতার সাথে সংযোগ রক্ষা

করে সে তার ব্যক্তিত্বকে প্রচণ্ড গতিবান করে তুলবে এবং জড় বিশ্ব তার আয়াত্তাধীনে পরিণত হবে। যেমনটি কুরআনের ঘোষণা:

- وَسَخَّرَ لَكُمْ مَافِى السَّموتِ وَمَا فِىْ الاَرْضِ جَمِيْعًا مِنْهُ

'আল্লাহ আকাশ-জমিনের সবকিছুকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন নিজ অনুগ্রহে।' (আল-কুরআন, সূরা আল-জাসিয়াহ্, আয়াত : ১৩)

এ অবস্থায় একজন বিজয়ীর ভূমিকায় দাঁড়িয়েও তার চারিত্রিক স্খলন ঘটবে না কিংবা কোন প্রলোভন তার উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করবে না। কেননা তার নৈতিকতা স্বপ্নাতীত উচ্চতায় পৌঁছে গেছে। তার মর্যাদাই তাকে আল্লাহর ক্রমসম্প্রসারিত জীবন চেতনার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। সে তখন শুধু সহিষ্ণুতার আদর্শ অনুসরণে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখবে না; অন্যের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্যে যে কোন আত্মত্যাগ স্বীকারেরও অঙ্গীকার করবে। যে সব কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী মানবতার বিপর্যয়কে প্রকট করে তোলে তার বিরুদ্ধেও ইনসান-ই-কামিল হবে সোচ্চার। ইকবালের কাছে এই পরিপূর্ণ মানব এমন এক মুমিন যার সাথে একজন কাফেরের পার্থক্যও। তা হলো সে তার সমগ্র শক্তির বিকাশে পরিপূর্ণতা অর্জন করেছে কিনা; যদি করে তবে ঐশী ইচ্ছার পূর্ণতা সাধনে কতখানি খরচ করেছে–

মুসলিম যদি হয় কাফের,
তার না হয় শাহী, না হয় ফকিরী;
যদি সে হয় সত্যিকার মোমেন,
ফকির হয়েও সে করে যায় শাহী কর্তব্য
সৈনিক যদি হয় কাফের
ভরসা করে সে শমশেরের উপর;
আর সে যদি হয় মোমেন
সে লড়াই করে যায় তেগ্ ব্যতীত।
মুসলিম যদি হয় ঈমান বর্জিত,
সে তখন তকদীরের দাস;
যখন সে মোমেন
সে পরিণত হয় তকদীরে ইলাহীতে।[৪২](পৃ:-৬১,৬২)

কবি তাঁর 'যারবে কালীমে' কাফির ও মুমিনের পার্থক্যকে আশ্চর্য সুন্দর দীপ্তিতে রঙিন করে তুলেছেন–

كافركي يه پهچان كه آفاق مين گم هى
مومن كى يه پهچان كه گم اس مين هين آفاق!
কাফেরের পরিচয়: সে হারিয়ে ফেলে
আপনাকে বিশ্বের বুকে,
আর বিশ্বজগত যায় হারিয়ে
মোমেনের মাঝে।[৪২](পৃ:-৬২)
(যরবে কালীম, পৃ:- ৩৯)

বস্তুত: রাসূলুল্লাহই (সা.) ইকবালের ইনসান-ই-কামিল। পৃথিবীতে এমন কোন মানব নাই যার সাথে এই সর্বোত্তম ব্যক্তিত্বের তুলনা হতে পারে- যার ব্যক্তিত্ব সর্বোচ্চ সীমা লাভ করেছে। এই উত্তুঙ্গ ব্যক্তিত্বের প্রতি তিনি সর্বদা নজর রেখেছেন। তাঁর অবিসম্বাদিত সম্পূর্ণ এবং গতিময় ব্যক্তিত্বই ইকবালের পরিপূর্ণ মানবের প্রতিচ্ছবি এবং পূর্ণতা বিধানকারী অমীয় সত্ত্বা।

ইজতিহাদ ও ইকবাল:

ইসলামী শরীয়ায় ইজতিহাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশ– যার অর্থ বুদ্ধির সাহায্যে মুক্তির প্রয়োগ। শরীয়ার উৎস রাসূল (সা.)-এর উপর নাযিলকৃত পবিত্র কুরআনের স্থান মানবীয় যুক্তির উর্ধ্বে, কিন্তু একথাও স্বীকার করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে তাত্ত্বিক ও প্রয়োগিক ক্ষেত্রে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমৃদ্ধিতে এবং মানবীয় সমস্যার উপযোগী সমাধানে ইজতিহাদের গুরুত্ব সমধিক। ইজতিহাদ প্রয়োগিক ও কার্যকারী উপমা ইসলামী শরীয়ার পরিপন্থী নয়; উপরন্তু জীবন বিন্যাসের আধুনিকায়ন ও সম্মুখগতির সাথে শরীয়ার সামঞ্জস্যপূর্ণ ও কল্যাণকর সহাবস্থান নির্মাণ করা।

ইসলামী শরীয়ার দৃষ্টিতে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ইজতিহাদ হচ্ছে কুরআন ও হাদিস সমর্থিত একটি উল্লেখযোগ্য উপায় বা পদ্ধতি। আইন ও বিচার ব্যবস্থাপনায় স্বাধীনভাবে যুক্তি প্রয়োগের সিদ্ধান্তকে পবিত্র কুরআনে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে এভাবে:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ-

'আর যখন তাদের কাছে পৌঁছে কোন সংবাদ, শন্তি সংক্রান্ত কিংবা ভয়ের, তখন তারা সেগুলোকে রটিয়ে দেয়। আর যদি সেগুলো পৌঁছে দিত রাসূল পর্যন্ত কিংবা তাদের শাসকদের পর্যন্ত, তখন অনুসন্ধান করে দেখা যেত সেসব বিষয়, যা তাতে রয়েছে অনুসন্ধান করার মত।' (আল কুরআন, সূরা আল-নিসা, আয়াত : ৮৩)

এ আয়াত দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, তারা যদি গভীর মনোযোগের সাথে কুরআনের প্রতি লক্ষ্য করে,তাহলে তারা এর অর্থ ও বিষয়বস্তুর মাঝে কোন পার্থক্য খুঁজে পাবে না। আর এ বিষয়টি কেবল চিন্তা গবেষণার মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। এ পর্যায়ে হযরত রাসূল (সা.) বর্ণিত একটি বিখ্যাত হাদীসের উল্লেখ করা যায়, যেখানে ইজতিহাদের সুনির্দিষ্ট উপযোগিতার নির্দেশ রয়েছে–

ইয়েমেনে নিযুক্ত গভর্ণর মুয়াজ বিন জাবাল (রা.) কে রাসূল (সা.) একাবর প্রশ্ন করলেন: বিচার পরিচালনায় সে কি উপায় অবলম্বন করবে।

তিনি উত্তর দিলেন: পবিত্র কুরআন নির্ধারিত পথে। রাসূল (সা.) পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন: যদি তুমি কুরআন শরীফে কোন নির্দেশ না পাও তাহলে কি করবে? তিনি উত্তর দিলেন: সুন্নাহ বা হাদীসকে ব্যবহার করব। আবার প্রশ্ন করা হলো: যদি সুন্নাহ-হাদীসেও এমন কোন সূত্রের সন্ধান না পাও তখন কি করবে? তিনি জবাব দিলেন: আমি আমার নিজস্ব বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করব। এ কথা শুনে রাসূল (সা.) হাত উঁচু করলেন এবং বললেন: সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি তাঁর নবীকে ইচ্ছানুসারে পথনির্দেশ করে থাকেন। (আল হাদীস)

এ কথা সত্য, ইসলামী ইতিহাসের সূচনালগ্নেই হযরত রাসূল (সা.)-এর কৃতবিদ্য সাহাবীগণ ইজতিহাদের চর্চা শুরু করেছিলেন, যেখানে কুরআন ও হাদিসের সুনির্দিষ্ট সমাধান সূত্র প্রাপ্তি অসম্ভব হয়ে উঠত। হযরত আবু বকর, উমর এবং আলী (রা.) সকলেই ইজতিহাদের কম-বেশি চর্চা করতেন, যেখানে তাদের অনুরূপ সমাধান প্রত্যাশা কুরআন ও হাদীসের ক্ষেত্রে কঠিন ছিল।

জিরী দ্বিতীয় শতক ছিল ইসলামী শরীয়ার যুগান্তর ও বৈপ্লবিক কর্মসূচি প্রবর্তনার কাল। ফিকহ শাস্ত্রের বিকাশ ও প্রসারের এই উর্বর সময়ে প্রকৃত পক্ষে ইজতিহাদের দরজা উন্মুক্ত হয়। ইসলামী শরীয়ার অধীন চারটি মাযহাব ইজতিহাদের গতি-প্রকৃতি ও সম্ভাবনা নিয়ে বিপুল গবেষণা ও অনুশীলন চালায় এবং এটিকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তিতে দাঁড় করিয়ে দেয়।

ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফী এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) প্রতিষ্ঠিত চারটি মাযহাব ইসলামের পরবর্তী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও শাসনপ্রণালীর জীবনবাদী ও বলিষ্ঠ ভূমিকা আরোপের

ক্ষেত্রে ইজতিহাদের বিন্যাস ও চর্চার প্রতি গুরুত্বারোপ করে এবং জীবন সমস্যার সমাধানে এটিকে একটি অতি আবশ্যিক উপকরণ হিসেবে চিহ্নিত করে।

ফিকহ শাস্ত্রের শুরুলগ্ন থেকেই প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও মেদাসম্পন্ন যে কোনো ফকীহ ইজতিহাদের চর্চা ও অনুশীলন করতেন এবং শরীয়া নির্ধারিত কোন মৌলিক বিষয়কে কেন্দ্র করে স্বাধীনভাবে যুক্তি ও বুদ্ধি প্রয়োগে সিদ্ধান্ত আরোপের সর্বমুখী প্রচেষ্টা চালাতেন। হিজরী তৃতীয় শতকে ইজতিহাদের এই অনিরুদ্ধ যাত্রা অচলায়তনের ঘোলা পানিতে আটকা পড়ে এবং ক্রমবর্ধমান বাধা-নিষেধের বেড়াজালে ইজতিহাদ চর্চা প্রায় স্তব্ধ হয়ে যায়। প্রসিদ্ধ চিন্তাবিদ ফজলুর রহমান মনে করেন:

> With the passage of time. however, incrasing restriction were imposed and towards the close of the third century of Hijra, the four sunnite schools of jurisprudence were regarded as fully developed with the result that the gates of further Ijtihad ware closed.[৪(পৃঃ-১১৭)]

পরবর্তী সময়ে স্বাধীন চিন্তার এই গতিশীল ধারা নিশ্চল হয়ে যাওয়ার কারণে মুজতাহিদের পরিবর্তে শুধু এক দল মুকাল্লিদের (পূর্বসূরীদের চিন্তাধারা অপরিবর্তনশীল এই মতের প্রবক্তা) আগমন ঘটে। ইজতিহাদের দরজা এমনিভাবে রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে ইসলামী চিন্তার জগতে এবং মনীষার ক্ষেত্রে নৈরাশ্য ও বন্ধ্যাত্তের সূচনা হয় এবং মুসলিম সমাজ জীবনে জড়তার অপছায়া মুদ্রিত হয়ে যায়। ইকবাল মনে করেন, তিনটি কারণে ইজতিহাদ অনুশীলন রুদ্ধ হয়ে যায়–

প্রথমত: মুক্তবুদ্ধির হঠাৎ স্ফীতি ও প্রসারের প্রেক্ষিতে ফকীহবৃন্দ মনে করেন যুক্তির সীমাহীন প্রয়োগ ইসলামের সামাজিক কাঠামোকে বিঘ্নিত করতে পারে।

দ্বিতীয়ত: সূফীবাদের উত্থান উম্মাহর শরীরে নৈরাশ্য ও বিপর্যয়ের সূচনা করে যা ইসলামের প্রগতিশীল জীবনবীক্ষা মেঘাচ্ছন্ন করে দেয়।

তৃতীয়ত: মঙ্গল দস্যুতার প্রেক্ষিতে বাগদাদের বিপর্যয়ের ফলে মুসলিম চিন্তা ও বিশ্বাসের কেন্দ্র সম্পূর্ণরূপে অচল হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে–

> For the fear of further disintegration which in only natural in such a period of political decay, the conservative thinkers of Islam focussed all thier efforts on the one point of preserving a uniform social life for the people by a jealous excusion of all innovations in the law of sharia as expounded by the early doctors of Islam.[৪(পৃঃ-১২৭)]

দীর্ঘ শূন্যতা এবং বন্ধ্যাত্বের পর ইমাম ইবনে তাইমিয়ার (মৃতু-৭২৮ হি.) আবির্ভাবের মাধ্যমে ইজতিহাদের চর্চা পুনর্জীবন লাভ করে। তিনি বিশেষ কোন মাযহাবের অনুসারী হতে অস্বীকৃতি জানান এবং নিজেকে একজন মুজতাহিদ হিসেবে দাবি করেন। প্রতিটি সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তিনি ইসলামের বুনিয়াদী উৎসের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং বলেন: যদি শরীয়াকে মানবকল্যাণমুখী প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা দিতে হয়– তাহলে অবশ্যই স্বাধীন চিন্তা ও মনীষা নির্গমনের দরজাকে খোলা রাখতে হবে। তাঁর মৃত্যুর পর প্রায় অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত মুসলিম দুনিয়ায় একজন মুজতাহিদের শূন্যতা প্রকট আকার ধারণ করে। ঠিক এমন সময়ে (অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে) শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) সূচিত আন্দোলন চিন্তা ও মনীষার জাগরণের ক্ষেত্রে মুসলিম সমাজ জীবনে আলো হতে আঁধারের যাত্রীর ঠিকানা নির্দেশ করে। ধারণা করা হয়, মহাকবি ইকবাল শাহ ওয়ালী উল্লাহর জীবন দর্শন ও প্রগতিশীল বিশ্ববিক্ষার দ্বারা বিপুলভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

শাহ ওয়ালী উল্লাহর চিন্তা ও মনীষা উপমহাদেশের মুসলমানদের জীবনে ক্রিয়া করেছিল এবং বাদশাহ আলমগীরের ইন্তিকালের পর ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে স্থবিরতার সূচনা হয়েছিল– এই ত্যাগী পুরুষের বিপুল কর্মস্রোতের সামনে তা খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়েছিল।

রাজনৈতিক নেতৃত্বের জড়তা ও অদূরদর্শিতার কারণে মুসলিম সংস্কৃতি ও আদর্শিক প্রেক্ষিত যখন বিপন্ন সময়ের চোরাগলিতে হাবুডুবু খাচ্ছে শাহ ওয়ালী উল্লাহ তখন ইসলামী জীবন দর্শনের নতুন ব্যাখ্যা ও পাদটিকা সম্বলিত উদ্দীপ্ত ও কর্মমুখর প্রস্তাবনা পেশ করলেন। শাহ ওয়ালী উল্লাহ ছিলেন বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী। যে যুগে তিনি তাঁর কর্মসূচি প্রণয়ন করেছিলেন, সেই সময়ে ভারতীয় মুসলমানরা ছিল মধ্যযুগীয় অন্ধকারে নিমজ্জিত এবং তিনি তাদেরকে আধুনিকতার আলোয় অভিনন্দন জানালেন।

স্যার সৈয়দ আহমদের সংস্কার আন্দোলন, আল্লামা শিবলীর বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ, দারুণ নদওয়ার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কর্মস্রোত এবং ইকবালের সৃষ্টি বৈচিত্র ও মুসলিম দুনিয়ার সমস্যার প্রতি রেখাপাত– এ সবই কোন না কোনভাবে শাহ ওয়ালী-উল্লাহর স্মৃতি ও কর্মের বীণায় উজ্জীবিত।

এই কৃতবিদ্য মহাপুরুষদের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান হচ্ছে ইজতিহাদী কর্মসূচির পুনর্জীবন এবং ধর্মতাত্বিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের দীপ্ত আওয়াজ তোলা। ইকবালের সাথে তাঁর সাদৃশ্য এখানে। ইকবাল নিজেও ছিলেন ইজতিহাদের প্রবক্তা এবং ধর্মতাত্বিকদের বাড়াবাড়ির কঠিন এবং নির্মোহ সমালোচক।

ইকবালের ছিল কুরআনী জ্ঞানের দীপ্ত পটভূমি। কুরআনী আদর্শের শাশ্বত উপলব্ধি ও ব্যাখ্যায়নেও ছিল তাঁর সমান আস্থা। কিন্তু তিনি নিজে কখনও পণ্ডিত অথবা শাস্ত্র বিশারাদ হিসেবে দাবি করেননি। ধর্মীয় ব্যাপারে তিনি সর্বদা আলেমদের সাথে পরামর্শ করে কাজ করতেন এবং প্রয়োজনে তাদের উপদেশ গ্রহণ করতেন। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ এবং দারুন নদওয়ার সম্মানিত সদস্য সৈয়দ সুলায়মান নদভী ছিলেন কবির বন্ধু ও পরামর্শদাতা, যাঁর প্রতি ছিল তাঁর সুউচ্চ ধারণা।

এ কথা স্বীকৃত, ইকবাল যত বেশি করে পাশ্চাত্যের জীবন ধারণার অপরিনামদর্শী দিকগুলোর সাথে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন, ততবেশি তিনি ইসলামের সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। আধুনিক পৃথিবীর নীতিহীন অনাচার ও ক্ষয়িষ্ণু মূল্যমানের বিপরীতে তিনি বিশ্বাস ও বাস্তব কর্মপন্থার উপমা হিসেবে ইসলামকেই একমাত্র অভ্রান্ত পরিত্রাণকারী হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন।

মুসিলম ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন ও রাজনীতির বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যাপক তত্ত্ব ও অনুসন্ধান চালিয়ে ইকবালের এ বিশ্বাস জন্মেছিল যে, বর্তমান মুসলিম দুনিয়ার বাস্তবতার সাথে প্রাথমিক যুগের ইসলামের গৌরব মহিমার কোন সাদৃশ্য নেই। তাঁর চেতনায় এ সত্য বড় বেশি করে দেখা দিল মুসলিম দুনিয়া আজ আত্মঃকলহ ও সংকীর্ণতার বিষবাষ্পে জর্জরিত। বিশ্বাসীদের যে সম্প্রদায় একদিন সমগ্র বিশ্বসমাজকে নাড়া দিয়েছিল, মহামুক্তি ও গৌরবের মঞ্জিলে নেতৃত্ব দিয়েছিল– তারা আজ প্রতিক্রিয়াশীলতার খপ্পরে বাঁধা পড়েছে। এমনি যে ধর্ম যা ছিল মূলত সহজ-সরল, সীরাতে মুস্তাকীম ছিল যার লক্ষ্য তা আজ সংশয়, ক্ষুব্ধ, ব্যাকুল, পথনির্দেশের অপেক্ষায় মুমূর্ষু প্রাণ নিয়ে ধুঁকছে। ইজতিহাদের সৃষ্টি বৈচিত্র্য, যুক্তি ও মননের সৌকর্য এবং সর্বপ্রকার জীবনবীক্ষা থেকে এই মানব ধর্ম আজ বঞ্চিত। পাশ্চাত্যের প্রতিক্রিয়ায় মুসলিম শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবীরা আজ তাদের গলগ্রহের শিকার, অন্যদিকে সাধারণ জনতা সংকীর্ণচেতা অনুদার ধর্মতাত্ত্বিকদের ভূইফোঁড় ব্যাখ্যা ও জীবন-ভাবনার প্রেক্ষিতে এই ধর্মের, এই বিশ্বাসের প্রতি একপ্রকার ক্ষোভ ও বিদ্বেষভাব উদগীরণ করে চলেছে। ইকবাল তাঁর 'ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন' পুস্তকে এটিকে de-Islamigation– অনৈসলামীকরণ প্রক্রিয়া হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

ইকবাল মনে করতেন মুসলমানদের নৈতিক বিশ্বাসে জ্বালা ও ক্ষয়ের যে কার্যকরণ ঘটেছে, ইসলামের সুপরিমিত মূল্যবোধে মুসলমানদের যে অ-স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসহীনতা দেখা দিয়েছে এবং পশ্চিমী জীবনমান ও মূল্যবোধের প্রতি অন্ধত্বের যে অনুকারী চরিত্র গড়ে উঠেছে তার অপনোদন সাপেক্ষেই এই অবস্থায় অবসান সম্ভব। ইকবালের এই বিশ্বাস বরাবরের মতোই গভীর ছিল বিশ্বাশ্রিত সত্য ও বৈশ্বিক জীবনের প্রেক্ষিতে ইসলামের সন্ধানী আলোকমালা চিরদিনের, চিরমানুষের কল্যাণ সম্ভাবনায় উজ্জ্বল ও সমান কার্যক্ষম। তাহলে সেই ইসলামের আলোকময়, বর্ণময় মেঘহীন আকাশের একহারা চেহারা কোথায় মিলবে? ইকবাল নিজেই প্রশ্ন করেছেন এবং উত্তরও তৈরি করেছেন নিজে: What then is the principle of movement in the strueture of Islam.

এর একমাত্র উত্তর হচ্ছে ইজতিহাদ। ১৮ মার্চ, ১৯২৬ সালে লেখা সৈয়দ সুলায়মান নদভীর কাছে প্রেরিত এক চিঠিতে ইকবাল মুসলিম উম্মার নৈরাজ্য ও সংকটের উল্লেখ করে বলেছেন, বিশ শতকের ইসলামের চেহারা কেবল মার্টিন লুথারের উত্থানকালীন সময়ে খ্রীস্টজগতের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। বর্তমানকালে এই ধরনের কোন বৈপ্লবিক কর্মসূচি সম্পর্কে মুসলিম জনতা সম্পূর্ণ অনবহিত, কেননা যোগ্যতম নেতৃত্বের সংকট তাদের অত্যন্ত প্রকট। ইকবাল তাই জমিয়ত-উল-উলামার মাধ্যমে সৈয়দ সুলায়মান নদভীকে এই ধরনের কোন কর্মসূচি কিংবা বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব দেয়ার আহবান জানান।

ইকবাল ছিলেন নিয়ত আশাবাদী। স্বপ্ন ও সম্ভাবনার প্রত্যয় নির্মাণ করাই ছিল তার কাজ। বেদনা কিংবা মূঢ়তার দেয়াল কোন কিছুই তাকে আটকে রাখতে পারেনি। সুলায়মান নদভীর কাছে লেখা চিঠিতে ইকবালের স্বপ্ন দেখা ভবিষ্যৎ ইসলামের সেই চেহারাই ফুটে উঠেছে: সে সুপ্রসন্ন সময় অতি নিকটে যখন এ অঞ্চলের মুসলমানগণ শত শত বছরের গোলামীর জিঞ্জির থেকে মুক্তি লাভ করবে। নিরন্ধ অন্ধকারে জ্বলে উঠবে তাদের আশার আলো। পৃথিবীর সব শক্তির উপর চ্যালেঞ্জ করে একটি অনন্য আদর্শ মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। সে চ্যালেঞ্জ প্রতিযোগিতায় ইসলামী আদর্শই বিজয়ী হবে।

ইকবাল চেয়েছিলেন ইজতিহাদের মাধ্যমে ইসলামের গতিশীলতার পুনর্জীবন। পাশাপাশি এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উম্মাহর শরীরে যে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হয়েছে তার যথাযথ বিদূরণ। ইজতিহাদ চর্চার ক্ষেত্রে ইকবালের উদ্দেশ এত মহৎ ও অভিনন্দনযোগ্য ছিল যে, সুলায়মান নদভীর কাছে প্রেরিত চিঠির প্রতিটি ছত্রই তার দিবাস্বাক্ষর।

ইজতিহাদের অত্যাবশ্যকীয় দিকগুলো ঐ সব আহকামের উপর প্রতিষ্ঠিত যা সম্মানিত মানবজাতির উন্নতি ও কল্যাণের জন্যে আল-কুরআনে মওজুদ আছে। মানুষের কল্যাণের জন্যে আল-কুরআনের নীতির উপর আনুগত্য ইবাদাত, পারস্পরিক উঠাবসা ইত্যাদির নিয়ম প্রতিষ্ঠিত। মুসলিম জাতির জন্যে এসব ইসলামী নিয়ম-নীতি চালু থাকবে। কুরআনের এসব বিষয়ের উপর আলোচনা করা যাবে। কিন্তু ফেৎনা-ফাসাদের জন্ম দেয়া যাবে না। যে কোনো ফেৎনাই মুসলিম জাতির জন্যে নিষিদ্ধ।

এরপর ইকবাল বলেন, যে ব্যক্তি আল-কুরআনের নিয়ম-নীতির উপর মানুষের নির্ভেজাল কল্যাণের জন্যে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও খেয়াল এবং বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ইজতিহাদ করবে সেই প্রকৃত অর্থে ইসলামের খাদেম। ইজতিহাদ অনুশীলনের এই পর্যায়ে ইকবাল মুজতাহিদের চারিত্র্যলক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য বিবৃত করেছেন এবং ইজতিহাদের প্রকৃতি নিয়েও আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, তাকওয়া বা খোদাভীতি হবে মুজতাহিদের আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য- যার প্রভাব সরাসরি মানবমুক্তির নির্ণায়ক বলে বিবেচিত হবে। ইজতিহাদের প্রকৃতি প্রসঙ্গে কবি তিন ধরণের ইজতিহাদের উল্লেখ করেছেন।[৪২](পৃ:-১২৩)

১। মুজতাগিদে মুতলাক : গবেষণাগারে বন্দী অবস্থায় নয়, স্বাধীন এবং মুক্ত চিন্তার প্রত্যয়াধীন থেকে এই জাতিয় মুজতাহিদরা ইজতিহাদ চর্চা করেন। কোন প্রভাববিস্তারকারী অপশক্তি তাদেরকে ইসলামের মৌল

কাঠামো থেকে অপসরাতি করতে পারে না কিংবা মানব সংগঠনে ইজতিহাদের কল্যাণ ভূমিকা পালন থেকেও বিরত রাখতে পারে না তাদের। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এ ধরনের মুক্তাবস্থায় ইজতিহাদ করেছেন।

২। মুজতাহিদে মুনতাসিব : গবেষণাগারে বন্দী অবস্থায় এ জাতীয় মুজতাহিদ ইজতিহাদ চর্চা করেন।

৩। এ জাতীয় মুজতাহিদরা ইজতিহাদের মাধ্যমে নির্বাক বিষয় সমূহের সমাধান দেন, অর্থাৎ যে সব বিষয়ে ইমামরা নীরবতা পালন করেছেন সেসব বিষয়েই তারা মতামত ব্যক্ত করেন।

ইকবাল স্বাধীন মুক্তাবস্তায় ইজতিহাদ চর্চার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন এবং এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু হানিফার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন ইসলামী শরীয়ায় তার বিপুল পাণ্ডিত্বের সমকক্ষ আর কেউ ছিল না। সাধারণ দৃষ্টিতে ইজতিহাদ চর্চার ক্ষেত্রে তিনি যদি কোন সময় হাদিসের উপমা গ্রহণ না করে থাকেন তাতে অপরাধের কি আছে। কেননা, তার ইজতিহাদ অনুশীলনের ক্ষেত্রে এমন কোন দৃষ্টরুন্ত নেই যা কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিকোণ বহির্ভূত।

ইকবাল আরো উল্লেখ করেছেন, ইমাম আবু হানীফা পবিত্র কুরআন ও হাদিসের দৃষ্টিকোণ থেকে ইজতিহাদ করেছেন। কোথাও হাদীস বর্ণনাকারীদের মতামতের গুরুত্ব দিয়েছেন, আবার কোথাও তিনি মওজু হাদীসের উপরও আলোচনা করেছেন। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে ইমাম আবু হানীফা ফিকহ, উসূলে ফিকহ, ইজমা, কিয়াস, তাফসীর, উসূলে তফসীর থেকে ইজতিহাদ লব্ধ বিপুল মতবাদ মুসলমানদের জন্যে রেখে গেছেন। তিনি বাস্তব কর্মপন্থার সাথে অভিজ্ঞতার আলোকে ইজতিহাদ অনুশীলনের মাধ্যমে সমাধান সূত্র আবিষ্কার করেছেন। ইমাম আবু হানীফার দৃষ্টান্ত দেয়ার অর্থ হচ্ছে তিনি ইজতিহাদের বুনিয়াদী নিয়মের আয়ত্তাধীন থেকে স্বাধীন মুক্ত অভিজ্ঞতার প্রচ্ছায়ায় ইসলামের কর্মবাদ ও গতিশীলতাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। কবিও মনে করেন বর্তমান ইসলামী সমাজদেহে যে পচন রোগের সূচনা হয়েছে ইমামে আজমের অনুসরণে ইজতিহাদ চর্চার পথ ধরে মুসলমানরা তার অবসান ঘটাক। ইকবাল মুসলিম উম্মাহর সামাজিক ও তামদ্দুনিক পুনগর্ঠনের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে গেছেন এবং আগামী দিনের সকল বাস্তবতা ও জীবন সমস্যার মুখোমুখী হবার জন্যে ইসলামকে সর্বদিক থেকে প্রস্তুত করে তুলেছেন। ইজতিহাদের পুনগর্ঠনিক প্রক্রিয়ায় তিনি এতখানি সম্পৃক্ত ছিলেন যে, বিশিষ্ট আলেম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) কে লাহোরে আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন যেন যুগ-জিজ্ঞাসার যে কোন জওয়াব উভয়ে একত্রে বসে প্রণয়ন করতে পারেন।

জীবদ্দশায় ইকবাল একবার ইজতিহাদের উপর লাহোর ইসলামীয়া কলেজে আলোচনা রেখেছিলেন এবং Islam as I understand it শিরোনামে বিষয়বস্তুর উপর একটি গবেষণা গ্রন্থ প্রণয়ন করতে চেয়েছিলেন, যদিও পেশাগত ব্যস্ততা, সাহিত্য সৃষ্টি এবং অসুস্থতা সব মিলিয়ে এমনি ধারা প্রতিবন্ধকতার কারণে তার স্বপ্ন আর কখনো বাস্তবায়িত হয়নি। পায়ামে মাশরিকে ইজতিহাদের স্বপক্ষে ইকবালের একটি কবিতাংশ রয়েছে যা মূলত হযরত রাসূল (সা.) এর একটি হাদীসের অনুসৃতি বলে মনে হয়। হাদিসটি এরকম– নিজের চেষ্টা ও বাস্তব কর্মপন্থার ওপর নিয়োজিত থেকে যে ব্যক্তি (মুজতাহিদ) কোন সমাধান সূত্র উদ্ভাবন করবে– সে একটি পুরষ্কার পাবে, এমনকি যদি সে সত্যের নিকটবর্তী নাও হয়।[৪২(পৃ:-১২৩)]

ইকবাল লিখেছেন:

ব্যক্তির ইচ্ছা ও কর্মধারার মধ্যে মূর্ত হয়
তার ভবিষ্যৎ
ব্যর্থ জীবনের দায়ভার বহন হল পাপ
ব্যক্তির প্রাণাবেগে যদি রূপ নেয় সৃষ্টির
কোন বুনিয়াদ
কি আসে যায় তখন পাপ আর পুণ্যের
ফেনিল স্রোতে।[৪২(পৃ:-১২৪)]

অন্য এক (ইজতিহাদ নামক) কবিতায় তিনি ইজতিহাদের স্বরূপ বর্ণনা করেছেন, যা মুসলমানরা পরাধীনতার সময় অবলম্বন করেছিল। তিনি বলেন:

هند مین حکمت دین کوئی کهان سی سکیهی
نه کهین لذت کردار نه افکار عمیق
حلقه شوق مین وه جرائت اندیشه کهان
اه ! محکومی و تقلید و زوال تحقیق!
خود بدلتی نهین قران کو بدل دیتی هین
هوی کس درجه فقیهان حرم بی توفیق
ان غلامون کایه مسلک هی که ناقص هی کتاب
که سکهاتی نهین مومن کو غلامی کی طریق

কোথা হতে কেউ শিখবে ভারতে দিনের তত্বকথা
নেই কোথাও কর্মপ্রেরণা, নেই চিন্তার গভীরতা।
সুফীদের মাহফিলে কোথায় সেই
চিন্তা-ভাবনার সাহসিকতা!
আহা পরাধীনতা! অন্ধ অনুকরণ আর গবেষণার পতন!
বদলে না নিজে, বদলে দেয় কুরআন,
দিনের ফকীহগণ কতটুকু হয়েছেন তওফীকহীন!
এ পরাধীনদের না কি এই ধারণা:
অঙ্গহীন এই কুরআন,
কারণ তা শেখায় না মুমিনদের পরাধীনতার পথ।[২](পৃ:-১৪৯)
(যরবে কালীম ; পৃ:- ১৪)

কিন্তু এ কথা সত্য যে, ইকবালের মনীষা ও বৌদ্ধিক চিন্তার ক্ষেত্রে ইজতিহাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলেও সুবিন্যস্তভাবে তিনি বিষয়বস্তু সম্পর্কিত তেমন কিছুই রচনা করে যেতে পারেননি। যদিও মুসিলম দুনিয়ার বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী তাঁর উদ্যোগ ও ভূমিকাকে অভিনন্দিত করেছেন বিপুলভাবে। ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ইকবাল যে বাণী বহন করে নিয়ে এসেছিলেন সময়কালে অনেক মুসলিম বুদ্ধিজীবীও তার মতামতের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। মোহাম্মদ আবদুহু (১৮৪৯-১৯০৫), মোহাম্মদ রশীদ রিজা (১৮৫৬-১৯৩৫), এবং মোহাম্মদ কুর্দআলী (১৮৭৬-১৯৫৩) এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। যাদের প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ নিয়োজিত হয়েছিল কিভাবে ইসলামী শরীয়াকে নবতর আঙ্গিকে ও প্রকরণে আধুনিক মুসলমানের জীবনে অধিকতর গ্রহণযোগ্য করে তোলা যায়।

গিব তার Studies on the civilization of Islam গ্রন্থে মোহাম্মদ আবদুহুর বিশাল কর্মকাণ্ডের প্রতি আলোকপাত করেছেন–

> He combined in himself as none of his predeessors had done for many centuries, the Muslims and the rationalist; the aim which he set before his eyes was to restate the truths of Islam in terms of modern thought and to recharge the moral, social and intellectual life of Egypt with fresh energy, derived not from vain efforts to uproot the past, still less from attempts to restore the past but by fully accepting the past as the foundation of national life and thought, and building upon it by the aid of the vivifying elements in the rationalistic and progressive culture of the west.[৪২](পৃ:-১২৫)

মোহাম্মদ রশীদ রিজা বর্তমানকালে মুসলমানদের জড়তা ও কর্মহীনতার সমালোচনা করেছেন এবং বলেছেন: এর ফলে উম্মাহর শরীরে যুক্তিহীনতা ও নির্বুদ্ধিতার পরগাছা শিকড় গেড়ে বসেছে। তাই স্থবিরতার শিকল ভাঙ্গার গান তার কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়েছে:

> With Muslims, detrminism has come to stay and has grodually suppressed action. Faith has deteriorated into negation of reason. They call indolence trust in god and search for truth herersy. For them this is religion and one who holds different views is exposed to abuse. Unquestioning acceptance of verything old is the heart of wisodom.[৪২(পৃ:-১২৫)]

ইকবালের আর একজন সমসাময়িক বুদ্ধিজীবী মোহাম্মদ কুর্দ আলী ছিলেন দামেস্কের আরব একাডেমীর সভাপতি ও প্রধান কর্মকর্তা। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত চরনাবলী সমসাময়িক মুসলিম ইতিহাসে তুমুল আলোড়নের জন্ম দিয়েছে এবং প্রাচ্যবিদ Grunebaum-এর মতে ইসলাম ও মুসলমান বিষয়ক তাঁর নিবন্ধসমূহ অসাধারণ প্রজ্ঞা ও মনীষারই উদাহরণ। ইকবালের মতো তারও বিশ্বাস, ইজতিহাদের দরজা রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনা ইসলামী ইতিহাসে এক বেদনাদায়ক অধ্যায় এবং ওলামাদের অযৌক্তিক কর্মকাণ্ড শরীয়ার গতিশলতার পরিবর্তে স্থবিরতাকেই আমদানি করেছে। কুর্দ আলী মনে করেন, তুরস্ক ও মিসরে পাশ্চাত্য আইন গ্রহণের মূলে রয়েছে যুগ সমস্যার মুখোমুখী দাঁড়িয়ে ওলামাদের প্রয়োজনীয় সমাধান দিতে অস্বীকৃতি ও ব্যর্থতা। প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মোহাম্মদ আসাদ উল্লেখ করেছেন কুরআনে বর্ণিত নাসা-স এর মর্মবাণী হল ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের আধুনিক উপযোগিতাকে স্বীকৃতি প্রদান। কেননা শরীয়ার ক্ষেত্রে সরকার-প্রশাসন, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী কর্মসূচি এবং অর্থনৈতিক বিধি-বিধান সুবিন্যস্তভাবে আত্মীকরণ সম্ভব নয়। শুধুমাত্র মূল নীতিকে সামনে রেখে এমনকি এ ধরনের কোন ইঙ্গিতের উপস্থিতি ব্যতিরেকেও যুগ ও পরিবেশের চাহিদা পূরণার্থে ইজতিহাদের গুরুত্ব সমধিক।

তার ভাষ্য এরকম:

> And this is where Ijtihadi Lgislation rightfully comes in. To be more precise, the ligitimate fild of community's law making activity comprises (a) details in cases and situations where the sharia provides a general principle and details with regard to matters which are mubah, that is, not covered by sharia laws at all. It is this method that the Quran had referred to in the words- For every one of you we have ordained a divine law and an open road. Thus while the Divine law (sharia) outlines the area within which Muslim life may develop, the law giver has conceded to us within this area an open road (Minhaj) for tempora legislation which would cover contingeneies deliberatly left untouched by the nasus of the Quran and Sunnah.[৪২(পৃ:-১২৬)]

এই ইজতিহাদ শরীয়ার মৌলিক লক্ষ্যের সাথে যেমন সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে তেমনি ইসলামের সামাজিক কাঠামোকে গতিশীল করবার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বলা আবশ্যক, ইজতিহাদ হচ্ছে ব্যক্তিগত পর্যায়ের ব্যাখ্যামূলক একটি অনুশীলন– যার প্রয়োজনীয়তা শুধু একটি বিশেষ সময়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং অতিক্রান্ত সময়ের অবসানে নতুন যুগ ও পরিবেশের ক্ষেত্রে ঐ বিশেষ ইজতিহাদের উপযোগিতা নাও থাকতে পারে।

মোহাম্মদ আসাদ বলেন–

> Thus Ijtihad can amount to no more than a temporal changeable law, subject to the authority of the irrevocable, unchangeable sharia, which is selfevident in the nasus of Quran and Sunnah.[৪২(পৃ:-১২৬)]

১৮ নভেম্বর, ১৯২১ সালে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের বার্ষিক সম্মেলনে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ বর্তমান মুসলিম দুনিয়ার দুর্দৈব ও অসংগতি কাটানোর লক্ষ্যে ৪টি সুপারিশ পেশ করেন–

(1) That in the Muslim Sharia there is no distinction between this world and the next.

(2) That the Muslims can deserve the title of best community (khayr-al-uman) only if they follow the Quran and the Sunnah.

(3) That the Islamic Sharia is the last and most perfect of all revealed laws.

(4) That the decline of Islam has been due to the decline and suspension of Ijtihad and pre occupation not with the essentials but with the externals and minutiac of religion. [৪২](১২৬,১২৭)

ইকবালের সমসাময়িক মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও ইসলামী চিন্তাবিদের এই বিশ্লেষণাত্মক মন্তব্য থেকে ইজতিহাদের পক্ষে একটি সাধারণ ঐকমত্য লক্ষ্য করা যায় যে, দ্রুত ধাবমান বিশ্বের উপযোগিতা পূরণে ইসলামী আদর্শের নতুন ব্যাখ্যায়ন অতীব প্রয়োজনীয়। এক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীদের জন্যে যা প্রয়োজন তা হলো একটি সংহত প্রক্রিয়ার (Stability) মাধ্যমে অভিযোজিত (Adaptability) পদ্ধতির উদ্ভাবন, কেননা শুধুমাত্র সংহত বিশ্বাস মুসলমানদের প্রগতিশীল সামাজিক ও রাজনৈতিক নির্দেশনা দিতে অপারগ। ১৯৫৮ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত InternationaL IsLamic colloquium-এ বুদ্ধিজীবীদের এই মতামতই প্রতিফলিত হয়েছে–

The Problem of Ijtihad and legislation that confronts present day Muslims in not an isolated phenomenon in the history and typology of law; it is a manifestation of the wider problem of combining stability with adaptability. [৪২](পৃ:-১২৭)

ইকবালের ধারণা, দৃঢ় কোন বন্ধনীর সাহায্যে মানব জীবন সচল রাখা যায় না। অবশ্যই জীবনের গতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে শাশ্বত মূল্যবোধের পাশাপাশি পরিবর্তনশীলতার দুয়ার উন্মোচন করতে হবে, অন্যথায় মানব জীবন পরিণত হবে স্রোতহীন নদীতে। ইকবাল উল্লেখ করেছেন, মানব জীবনের সেই পরিবর্তনশীলতাকে ইসলাম মুক্ত প্রসারী দৃষ্টিতে গ্রহণ করেছে–

The Ultimate spiritual basis of all life as concieved by Islam is eternal end reveals itself in variety and change. A society based on such a conception of reality must reconcile in its life the categories of permanence and change. It must possess eternal principles to regulate its collective life; for the eternal gives us a foot hold in the world of perpetual change. [৪২](পৃ:-১২৮)

ইকবাল তাঁর জীবদ্দশায় তুরস্কের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পরিবর্তনকে গভীরভাবে নজরে রেখেছিলেন এবং সে দেশের পরীক্ষামূলক আধুনিকায়নের পুরোপুরি সমর্থন না যোগালেও তিনি একটি ব্যাপারে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তা হলো খেলাফতের প্রাতিষ্ঠানিকতা প্রসঙ্গে তুরস্কের Grand national Assembly প্রদত্ত ইজতিহাদের বৈধতা সূত্র। তিনি হয়ত মনে করেছিলেন, মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে ইজতিহাদ প্রণয়নে আইন সভার এমনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকতে পারে। পরবর্তীতে সামষ্টিক ইজতিহাদের এই প্রক্রিয়াটি ১৯৫৮ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিতব্য International Islamic colloquium কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এখানে আরো সুপারিশ করা হয় ইজতিহাদ চর্চার জন্যে মুসলিম দুনিয়ার প্রথিতযশা বুদ্ধিজীবী সমন্বয়ে একটি একাডেমীর প্রতিষ্ঠা– যার কাজ হবে আধুনিক সময়ের উপযোগিতাকে সামনে রেখে ইসলামী শরীয়ার যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান।

ইকবালের রচনাবলী ও বক্তৃতা, বিবৃতি থেকে এটি স্পষ্ট হয়েছে যে, ইসলামের গতিশীলতার প্রেক্ষিতে তাকলীদের কোন স্থান নেই। ইসলামের গতিশীল চারিত্র্য অক্ষুন্ন রাখতে চাই ইজতিহাদ। কেননা এ পথ ধরেই মুসলিম চিন্তার সার্বজনীনতা পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। যদিও ইকবাল সম্পূর্ণরূপে সচেতন ছিলেন পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের কদর্য উপজাত হিসেবে আমাদের মধ্যে যে দাস্য মনোবৃত্তি রয়ে গেছে ইসলামের ক্ষেত্রে তা

কালান্তক হয়ে দেখা দিতে পারে। কেননা, এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের দ্রুত পাশ্চাত্যকরণের ফলে বৈদেশী চিন্তা ও চেতনার আমদানী ঘটতে পারে ইজতিহাদের পথ ধরে। ইকবাল তাঁর যারবে কালীমে এই অনুকারী চরিত্রের নগ্নিকা চিত্র তুলে ধরেছেন–

পারস্য ও হিন্দুস্তানের সংগীতে নেই
জীবনের ঝংকার
পাশ্চাত্যের পাপের আস্বাদনে
সে গীতিকা আজ কম্পমান
হস্তচ্যুৎ হয়েছে তাদের প্রাচ্যের গর্ভে
লুকানো যত শক্তি।[৪২](পৃ:-১২৮)

আধুনিকতার ছত্রছায়ায় পাশ্চাত্য প্রভাবিত হওয়ার যে মনোভঙ্গি তা হলো তাকলীদের এক অন্ধকার চিত্র এবং এ প্রক্রিয়াকে ইজতিহাদ আখ্যা দেয়া ইসলামী আদর্শের জন্যে ক্ষতিকর। কেননা ইকবাল মনে করেন : Mental subservience to the West is an antithesis of Ijtihad.

ইকবাল আরো বিশ্বাস করেন, ইজতিহাদ হলো পরিবর্তনশীলতা ও সৃষ্টিশীলতার নামান্তর। প্রগতিশীলতার বাহক এবং শ্বাসত মূল্যবোধ ও দ্রুত ধাবমান বিশ্বেরই সংযোজনী রেখা।

ইকবালের আদর্শ সমাজ :

ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধারার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি একটি জীবন্ত ও সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ আদর্শ সমাজ সৃষ্টির স্বপ্ন দেখেছেন। তাঁর পরিকল্পিত সমাজ হবে অধুনা প্রচলিত সকল আইন-কানুন, চিন্তা-পদ্ধতি এবং বর্তমানের সর্বাধিক প্রচলিত আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কর্মধারা হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক অপূর্ব ও অতুলনীয় সত্তার সমন্বয়। এর প্রতিটি ব্যক্তি হবে অতি মানুষ– আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের গুনে গুনান্বিত। এই নতুন সমাজ হবে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব এবং ঐক্যের বাস্তব প্রতীক; আধুনিক স্থুল বস্তুবাদ ও বুদ্ধিবাদের দুর্জয় প্রভাবে সৃষ্ট সকল দোষ-ত্রুটি হতে এটি হবে চিরবিমুক্ত। ইকবালের মতে, এই জীবন প্রতিভাসম্পন্ন ও বিপুল কর্মপ্রেরণাশীল সমাজ এমন একটা আদর্শ ও নীতির উপর ভর করে মাথা উঁচু করবে, যে আদর্শের দৃষ্টিকোণ পাশ্চাত্য জাতির মতো সংকীর্ণ, ক্ষুদ্র ও নীচ হবে না; বরং তার দর্শন ও চিন্তাধারা হবে মানুষ ও জড়জগতের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সর্বাধিক মানবোচিত, দিগন্তপ্রসারী, সর্বব্যাপক এবং সর্বাধিক আধ্যাত্মিক। বর্তমান সময়ে পৃথিবীতে যতগুলো সামাজিক ও রাজনৈতিক নীতিপদ্ধতি বিদ্যমান তন্মধ্যে ইসলামই হচ্ছে ইকবালের দৃষ্টিতে চরম লক্ষ্যবস্তু ও পরিকল্পিত সমাজের পূর্ণ সাফল্যের একমাত্র পন্থা।

ইকবাল বলেন, তাঁর এই পরিকল্পনা করো অন্ধ অনুসরণ কিংবা ভক্তির আতিশয্যের ফল নয়; বরং তিনি প্রকৃতপক্ষে ইসলামী শাসনপদ্ধতিতে বিবর্তনশীল অনন্ত সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করে তাঁর পরিকল্পিত জীবন্ত ও পূর্ণ সমাজ সংগঠনের জন্যে দুনিয়ার অগণিত রীতি-পদ্ধতির মধ্যে একমাত্র ইসলামকেই বুনিয়াদ স্বরূপ ধরে নিতে বাধ্য হয়েছেন। ইকবাল তাঁর সকল গ্রন্থের মধ্যেই ইসলামী মিল্লাতকে তাঁর নিজস্ব বিশেষ দৃষ্টিকোণে দেখার প্রয়াস পেয়েছেন এবং স্থানে স্থানে এই বিশেষ সমাজকে 'ভাবীকালের সর্বোত্তম মানবসংঘ' বলে অভিহিত করেছেন।

ইকবালের এই সমাজ বিশ্বাসীদের (মুমিন) নিয়ে গঠিত এবং তাদের বিশ্বাসের ভিত্তি হচ্ছে তাওহীদ। আল্লাহ্‌র একত্ব ও সার্বভৌমত্বকে কেন্দ্র করে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা তার লক্ষ্য। আল্লাহ্‌র একত্বের ধারণার মধ্যে বিশ্বাসীদের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাওহীদ থেকে পাওয়া মানবিক স্বাধীনতা, সাম্য, সংহতি হল এ রাষ্ট্রের ভিত্তি। তিনি তাঁর 'রমূযে বেখুদী' গ্রন্থে বলেন–

جوهرما بامقامی بسته نیست

بادۀ تندش بجامی بسته نیست
هندی وچینی سفال جام ماست
رومی وسامی گل اندام ماست
قلب ما از هند و روم شام نیست
مرزو بوم او بجز **اسلام نیست**
عقیدۀ قومیت مسام کشود
از وطن آقائی ماهجرت نمود
حکمتش یک ملت گیتی نورد
براساس کامه توحید کرد
প্রতিভা আমাদের সীমাবদ্ধ নয় স্থান গন্ডিতে,
তার সূরারস কোন বিশেষ পাত্রে বন্ধী নয়।
ভারত ও চীনের মৃত্তিকায়
তৈরী আমাদের পানপাত্র;
সৃষ্ট হয়েছে আমাদের দেহ
তুরস্ক ও সিরিয়ার মাটি থেকে।
অন্তর আমাদের যুক্ত নয়
সিরিয়া, তুরস্ক বা ভারতের সাথে;
জন্মভূমি তার আর কোথাও নয়
ইসলাম ছাড়া।
মহানবী হিজরত করলেন জন্মভূমি থেকে,
এমনি করে তিনি উদ্ঘাটন করলেন
মুসলিম জাতীয়তার তথ্য।
জ্ঞানদীপ্তি তার রচনা করেছে এক বিশ্বজাতি
কালেমায়ে তাওহীদের ভিত্তিতে। [৪৩](পৃ:-৭৬)
(রমূযে-বেখুদী)

ইউরোপে ইকবালের এ অভিমত সাধারণভাবে সমর্থন লাভ করতে পারেনি। কিন্তু ইউরোপেও এমন সব মহাত্মা রয়েছেন, যাঁরা এ ইসলামী মতাদর্শের সততা ও সার্থক সৌন্দর্য স্বীকার করেন। ইসলামী মিল্লাত যেমন কোন ভৌগোলিক সীমারেখা স্বীকার করে নাই, তদ্রুপ কালের মাপকাঠি দিয়েও তার কোন সীমা নির্দেশ করা যায় না।

گرچه قوم بمیرد مثل فرد
از اجل فرمان پذیرد مثل فرد
از اجل این قوم بی پرواستی
استوار از نحن نزلناستی
ماکه توحید خدا **راحجتیم**
حافظ زمزکتاب وحکمتیم
যদিও সামজ ব্যক্তির মতো মরণশীল,
যদিও সে সাড়া দেয় মৃত্যুর ডাকে

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তিরই মতো,
তথাপি এ কাওম বিজয়ী মৃত্যুভীতির উপরে,
সুরক্ষিত সে
খোদায়ী বাণীর শক্তি দ্বারা।
তাওহীদের খোদাই হচ্ছে আমাদের দলিল,
রক্ষক আমরা খোদায়ী রহস্য ও বিজ্ঞানের। [৪৩(পৃ:-৭৭)]

অন্য জায়গায় ইকবাল বলেন–

در جهان بانگ اذان بودست و هست
ملت اسلامیان بودست و هست
عشق آئین حیات عالم است
امتزاج سالمات عالم است
عشق از سوز دل مازنده است
از شرار لا اله پائنده است
گرچه مثل غنچه دلگیرم ما
گلستان میسرد اگر میرم ما

চিরদিন জেগে উঠেছে আর আজো উঠছে
আযান ধ্বনি পৃথিবীর বুকে,
ইসলামী মিল্লাতের অস্তিত্ব
অতীতেও ছিলো, আজো রয়েছে।
প্রেম হচ্ছে দুনিয়ার জীবন-বিধান,
অণুপরমানুর মিলনকেন্দ্র।
প্রেম সঞ্জীবিত রয়েছে আমাদের মর্মবেদনায়,
স্থায়ী হয়ে আছে তা
লা ইলাহার স্ফুলিং সংস্পর্শে,
যদিও আমরা প্রেম ভারাতুর
কুঁড়ির মতো,
তথাপি মৃত্যু আমাদের
বয়ে আনবে গুলবাগিচার মৃত্যু। [৪৩(পৃ:-৭৭,৭৮)]

ইকবাল অন্যত্র বলেন–

من اول آدم بی رنگ و بوم
پس آنکه هندی و ایرانیم من
قلب ما از هند و روم وشام نیست
مرز و بوم مایجز اسلام نیست
مسلم استی دل به اقلیمی مبند
گم مشو اندر جهان چون و چند
می نگنجد مسلم اندر مرز و بوم

Dhaka University Institutional Repository

دردل او یاوه گردد شام و روم
আমি প্রথমে বর্ণ-গন্ধহীন মানুষ
তারপরে ভারতীয় অথবা ইরানী।
ভারত, রোম ও শামের গড়া নয় আমাদের হৃদয়
আমাদের দেশ ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু নয়।
তুমি মুসলিম এক মহাদেশে অন্তর বেঁধে রেখো না।
আকার-আকৃতির এ বিশ্বের মাঝে হারিয়ে যেও না।
ধারণ করতে পারে না কোন মুসলিমকে দেশের সীমানা।
তার অন্তরে শাম ও রোমের অস্তিত্ব বাতুলতা।[৮](পৃ:-১৩৬)

মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্কের বুনিয়াদ আত্মীয়তা বা গোত্রীয়তা নয়; বরং ঈমানী প্রেরণার মধ্য দিয়ে ইসলামের পারস্পরিক সম্পর্কের সূত্র তৈরী হয়। তাওহীদের ভিত্তিতে বর্ণ, ভাষা, দেশ ও বংশ নির্বিশেষে সকল মুমিন ভাই ভাই। সকল মুসলিম এক জাতি। ইকবাল বলেন–

ملت ماشان ابراهیمی است
شهد ما ایمان ابراهیمی است
گرنسب را جزو ملت کرده
رخنه در کار اخوت کرده
در زمین ما نگیرد ریشه ات
هست نا مسلم هنوز اندیشه ات
আমাদের মিল্লাত ইব্রাহীমের তৈরী একটি মৌচাক,
আমাদের মধু ইব্রাহীম প্রচারিত ঈমান।
মনে কর যদি বংশকে মিল্লাতের অংশ,
ফাটল ধরবে তোমার ভ্রাতৃত্বে।
পারেনা গজাতে জড় তোমার অঙ্কুর, আমাদের জমিনে
রয়েছে অমুসলিম এখনো, তোমার মনন। [২](পৃ:-৮৪,৮৫)
(আসরার ও রুমূয, পৃ:- ১৮৯)

ইকবালের দৃষ্টিতে, উম্মার প্রতিটি সদস্যকে একাত্মতা, সমচিন্তা ও অভিন্ন লক্ষ্যের অভিসারী হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। ভৌগোলিক সীমারেখা গুরুত্বপূর্ণ নয়। তিনি বলেন–

همزبانی خو یش و پیوندیست
مرد با نامحرمان چون بندیست
ای بسا هند و ترک همزبان
ای بسا دو ترک چون بیگا نگان
پس زبان محرمی خود دیگرست
همدلی از همزبانی بهتراست –
মনের মিলই আত্মীয়তার আসল বন্ধন
আত্মীয়ের সাথে মানুষ বন্দীর মতন।

অনেক হিন্দী ও তুর্কি পরস্পরে মনের মানুষ
অথচ দু'জন তুর্কী পরস্পরের অনাত্মীয়,
সুতরাং মনের ভাষা সে ভিন্ন জিনিস।
মনের মিল ভাষার মিলের চেয়ে উত্তম। [৮](পৃ:-১৩৭)

ইসলাম মানুষের কাছে আল্লাহ্‌র আনুগত্য কামনা করে। এমনি একটি দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে তাওহীদের নীতি বিভক্ত বিশ্বে আনতে পারে ঐক্য এবং ইসলামী সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে স্থাপন করে যোগসূত্র। ইকবাল তার রমূযে বেখুদীতে এই নীতির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে–

কি সে বস্তু-
যা প্রবাহিত করে একটি মাত্র শ্বাস
শতেক অন্তরে?
তা হচ্ছে তাওহীদে বিশ্বাসের অন্যতম রহস্য।
ঐক্যবদ্ধ হও
আর তাওহীদকে করে তোল দৃশ্যমান;
রূপায়িত করো তার গোপন রহস্যকে কর্মে;
দীন, হেকমত আর আইন
জেগে ওঠে এরই ভিতর থেকে,
এই হচ্ছে উৎসমুখ
শক্তি, ক্ষমতা আর স্থায়িত্বের;
এরই শক্তি উন্নীত করে মানব প্রকৃতিকে
আর পরিণত করে তাকে
সম্পূর্ণ নতুন সত্তায়;
ভীতি আর সন্দেহের হয় মৃত্যু;
জীবন্ত হয়ে উঠে কর্ম।
চক্ষু দর্শন লাভ করে বিশ্ব আত্মার;
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু–
এই হচ্ছে আমাদের জীবনের মূলধন,
এরই বন্ধন এক করে দেয়
আমাদের বিক্ষিপ্ত চিন্তা রাশিকে। [৪২](পৃ:-৬৩,৬৪)

তাই ইকবাল মুসলমানদেরকে তাওহীদের মর্ম উপলব্ধি করার আহ্বান জানান এবং তাওহীদের শক্তিতে বলিয়ান হওয়ারও উদাত্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন–

زندہ قوت تھی جہان مین یہی توحید کبھی
اج کیاھی ؟ فقط اک مسئلہ علم کلام!
روشن اس ضوسی اگر ظلمت کردار نہ ھو
خود مسلمان سی ھی پوشیدہ مسلمان کامقام!
مین نی ای میر سپہ تیری سپہ دیکھی ھی
قل ھو اللہ کی شمشیرسی خالی ھین نیام!

آه ! اس رازسی واقف هی نه ملا نه فقیهه
وحدت افکار کی بی وحدت کردار هی خام!
قوم کیا چیزهی! قومون کی امامت کیاهی
اس کو کیا سمجهین یه بیچاری دو رکعت کی امام!
ছিল তাওহীদ কোন সময় ধরনীতে এক জীবন্ত শক্তি,
আজ তার অবস্থা কি? শুধু ইলমে কালাম-এর একটি বিষয়!
না হয় উজলা যদি এর আলোকে চরিত্রের আঁধার,
মুসলিমের কাছেই থাকবে অজানা মুসলিমের অবস্থান।
হে দিশারী! দেখেছি আমি তোমার ফৌজ,
খাপ তোমার রয়েছে শুন্য কুলহু আল্লাহ্‌র তরবারী থেকে।
আহ! জানেনা এই তত্ত্ব মোল্লা আর ফকীহ;
মুসলিমের কর্ম-ঐক্য বিনা, চিন্তা-ঐক্যের কোন দাম নেই।
জাতি কি, জাতির নেতৃত্ব কি,
কি বুঝবে এ তত্ত্ব হতভাগা দু'রাকাআতের ইমাম।[২](পৃ:-১৫২,১৫৩)
(যরবে কালীম, পৃ:- ১৮)

আল্লাহ্‌র একত্ব ও সার্বভৌমত্বের নীতির উপর যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত, তিনি বিশ্বাস করেন তার মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে মানবতার সত্যিকার চিত্র। ইসলামী সমাজের অভ্যুত্থান তাই তাঁর কাছে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা নয়। যে সমস্যার কথা বলা হয়েছে তা সকল দেশের, সকল মানুষের সমস্যা এবং যে আদর্শের কথা তিনি বলতে চেয়েছেন তা সমগ্র মানবতার পুনরুজ্জীবনের আদর্শ। ইকবালের কাছে ইসলাম এক নীতি ও আদর্শের প্রতীকে স্থিতি লাভ করেছে; নিছক এর অতীত কীর্তি-কাহিনীর প্রতি বর্ণনা না হয়ে এটি মানব জীবনের এক অর্থপূর্ণ তাৎপর্যের আকারেও তার কাছে অস্তিত্ব লাভ করেছে।

রাসূল (সা.)-এর আধ্যাত্মিক বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ইসলামী সমাজের সংহতির আরেকটি কার্যকর ধারণার উন্মেষ ঘটিয়েছে। রাসূল (সা:)-এর মাধ্যমে পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র বাণী অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাঁরই আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব এবং সাধনাদীপ্ত, কর্মমুখর প্রচেষ্টায় দুনিয়ার তাবৎ মুসলমানেরা একটি কেন্দ্রে মিলিত হয়েছে। রাসূল (সা:)-কে নেতা মেনে যে ঐক্যবদ্ধ ইসলামী সমাজ নির্মাণের ধারণা গড়ে উঠেছে তার প্রকৃত মর্ম নিহিত রয়েছে মানব জাতির জন্যে তাঁর এই বিশিষ্ট বাণীর প্রকৃতিতে। মানবতার জন্যে যেমন তিনি এনেছেন সাম্য, স্বাধীনতা ও সংস্কৃতির ধারণা তেমনি এতদিন যারা ছিল নিগৃহীত, শোষিত এবং অপদস্থ তাদের মুখে তিনি দিয়েছেন ভাষা। বিশৃঙ্খলার মধ্যে তিনি এনেছেন শৃঙ্খলা ও মানব ঐক্যের বার্তা এবং পরিণতিতে সামাজিক সাম্য ও সুবিচার–

আমাদের সংহতি, আমাদের ধর্ম এবং
আমাদের আইন–
সব কিছুরই বুনিয়াদ হচ্ছে রেসালাত।
তাতে সৃষ্টি করে
আমাদের বিভেদের মধ্যে ঐক্য এবং
আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে
এক সুসংঘবদ্ধ সমাজে–
যা দ্বারা আনীত হয়
শান্তির বার্তা বিশ্বের কাছে।
যদি আমরা এই ঐক্য সংস্থাপক,

প্রাণ সঞ্চারী মতবাদকে পরিত্যাগ করি
তা হলেই জাতি হিসেবে হয় আমাদের মৃত্যু;
কারণ এই কেন্দ্রবিন্দুই আমাদেরকে দিয়েছে
বর্হিদৃষ্টি ও উদ্দেশের এক চলিষ্ণু ঐক্য।[৪২(পৃ:-৬৪,৬৫)]

রাজনৈতিক দিক দিয়ে বিচার করলে এই সমাজ বিধান নিশ্চিতভাবেই ভাষা, বর্ণ এবং ভূখন্ড নির্ভর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে অস্বীকার করে। ইসলামের যে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে তা এই সংঘাতময় দেশাত্মবোধ ও ভূখন্ডপ্রীতির পরিপন্থী। ইকবাল মনে করেন, আধুনিক কালের এই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা মানবতার সংহতিকে বিপন্ন করে তুলেছে। তাওহীদ ও রিসালাতকে কেন্দ্র করে এবং নীতি হিসেবে ইসলামী আদর্শের উজ্জীবন ঘটিয়ে যে সমাজের রূপকল্প ইকবাল হাজির করেছেন তা স্বদেশী চারিত্র্য বর্জন করে আন্তর্জাতিক সুষমা লাভ করেছে। ইকবাল এই আন্তর্জাতিক সমাজকে মিল্লাত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। মিল্লাতের এই ধারণার সাথে উনিশ শতকের প্যান ইসলামী ধারণার ঐক্য রয়েছে।

ইকবালের কাছে মিল্লাত হলো বিকশিত ব্যক্তিত্বের একটি কার্যক্ষম সমষ্টি, যা এই সমাজকে দেয় একটি স্বতন্ত্র সত্তা–

> The community is an entity which in all its functions and activities motivated by power and a spirit of triumph. The unity acquired through the mergence of several individuals gives the community a Unique personality of its own. [৪২(পৃ:-৬৫)]

এমনিভাবে ব্যক্তি যখন হারিয়ে যায় মিল্লাতের মধ্যে তখন মানব জীবন অধিকতর গৌরবদীপ্ত হয়ে ওঠে এবং মিল্লাত লাভ করে প্রত্যয়পুষ্ট শক্তিমানের হৃদয়–

> The complete integration of the individual in the community is the crowning glory of human life and power thus constituted is all embracing and provides strength and vigour both to the individual and community. [৪২(পৃ:-৬৫)]

এ সম্পর্কে ইকবাল নিজেই বলেছেন–

জমাআতের মধ্যে সে যখন হারিয়ে যায়,
তখন তার উপমা সেই জল বিন্দুটির সাথে
সে নিজেকে বিকশিত করতে যেয়ে পরিণত হয় সমুদ্রে।
তখন সে অর্জন করে অপরিমেয় শক্তি ও সম্পদ
চিরন্তন প্রথায় সে পরিণত হয়
অতীত ও ভবিষ্যতের দর্পনরূপে;
এবং যা আসবে আর যা গত হয়েছে
তাদের যোগাযোগ সূত্ররূপে
অতএব এর মুহূর্তগুলো যেন অনন্তকাল–
অশেষ এবং পরিমাপের অতীত।
তার অন্তর উদ্বেল হয়ে ওঠে
সমাজ জীবন থেকে আহরিত বিকাশের আনন্দে
এ সমাজবোধ প্রহরা দেয় তার সর্বকর্মকে

নিয়ন্ত্রণ করে সর্বঅনুভূতিকে।
সে বোঝে যে তার দেহ ও অন্তর
ভিতর ও বাহির
সে পেয়েছে সেই সামগ্রিক জীবন বোধ থেকে। [৪২](পৃ:-৬৫,৬৬)
(রমূযে বেখুদী)

ইকবাল মনে করেন, ব্যক্তির মত মিল্লাতকেও একটি সংগ্রামী জীবন নির্বাহ করতে হবে। মিল্লাতের ভাগ্যাকাশেও উদিত হবে ঝঞ্ঝামুখর দিন; কিন্তু তাকে অতিক্রম করাই হলো সত্যিকারের জীবনের লক্ষণ। ব্যক্তির আত্মনের মতো মিল্লাতের আছে একটি আত্মন। এই আত্মন শক্তি, সাহস ও প্রত্যয়ের দীপ্তিতে উজ্জীবিত। ইকবাল তাই মুসলমানদের মিল্লাতের মধ্যে বিলুপ্ত হওয়ার পরামর্শ দেন, কেননা মিল্লাতের আত্মন ব্যতীত রাষ্ট্র ও ধর্ম কোনটাই স্থায়ী হবার নয়।

ইকবাল তাঁর সুবিখ্যাত শিকওয়া কাব্যগ্রন্থে মুসলমানদের গৌরবময় যুগের একটি চিত্র একেছেন এবং উল্লেখ করেছেন, তখন তাদের মধ্যে উদ্দেশের সততা ও প্রত্যয়ের দীপ্তি বর্তমান ছিল। সংগত কারণে সংখ্যয় নগণ্য হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র বাণীকে বহন করবার জন্যে তারা যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত ছিল। হককে বুলন্দ করবার জন্যে তারা রক্ত ঝরাতে কখনো দ্বিধা করেনি।

ইকবাল দু:খ করেছেন আধুনিক কালে মুসলমানরা এই মিল্লাতের ঐক্যকে নি:শেষ করেছে এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা ও কোরবানীর আকাঙ্ক্ষা হারিয়ে ফেলেছে। মিল্লাতের বুনিয়াদকে মজবুত করবার জন্যেই জিহাদের ফয়সালা দেয়া হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সত্য ও ন্যায়ের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে মুসলমানদের উপর জিহাদকে ফরজ করা হয়ছে। ইকবাল বিবেচনা করেছেন, মুসলমানদের উপর আপতিত বর্তমান জিল্লাতির প্রধান কারণ হলো তাদের মিল্লাতের কল্যাণময় বন্ধনের প্রতি অনীহা এবং এই কল্যাণময়তার স্বপক্ষে তাদের ত্যাগ স্বীকারে অনাগ্রহ।

ইকবাল ব্যক্তি ও মিল্লাতের মধ্যেও একটি সম্পর্ক সৃষ্টির কথা বলেছেন। এ সম্পর্কটা রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক জারক রসে মিশ্রিত। তাঁর পরিকল্পিত মিল্লাতের প্রকৃতি হলো যে, এটি নিজেই হবে একটি স্বতন্ত্র ও সংহত অস্তিত্ব, যার নিজের থাকবে যেমন স্বকীয়তা তেমন নিজস্ব আত্মাও। ইকবাল তার রমূযে বেখুদীতে ব্যক্তি ও মিল্লাতের পারস্পরিক ঐক্য ও সম্পর্কের নীতিমালা পেশ করেছেন। এক জায়গায় তিনি বলেছেন–

মিল্লাত হচ্ছে ব্যক্তির জন্যে আশীর্বাদ;
কেননা ব্যক্তির শক্তি দুর্নিবার হয়ে ওঠে
মিল্লাতের মধ্যে।
তেমনি তার হৃদয় ও বুদ্ধি
হয় উদ্বেল
বিকাশের ছোঁয়ায়।
মিল্লাতের সদস্য হিসেবে
ব্যক্তি লাভ করে
ইয্যত,
মিল্লাত অর্জন করে সংহতি।
যখন ব্যক্তি হারিয়ে যায়
মিল্লাতের মধ্যে,
তার জীবন হয়ে ওঠে
অনাবিল আকাশের মতো। [৪২](পৃ:-৬৬,৬৭)

এস.এ.ভি মঈনী তার 'মাকালাতে ইকবাল' গ্রন্থে ইকবালের এ বিশিষ্ট্য চিন্তাকে বিবৃত করেছেন রূপদক্ষ শিল্পীর মতো–

> He explains that in the life of a community, an individual has a transitory existence. His thoughts, hopes, conduct, physical and intellectual powers depend upon the community. He is only a partial manifestation of the collective life of the community-- the community is a separate being and is by no mens merely a collection of individuals. It is much more than that. Its composition is infinite and eternal and carries within itself unborn generations of human beings. [৪২](পৃ:-৬৭)

এমনিভাবে ইকবাল খুদী ও বেখুদীর মধ্যে যে যোগসূত্র রচনা করলেন তার চিত্র উজ্জ্বলতর হয়ে উঠলো। ইকবালের প্রতীতি জন্মালো খুদী যদি অর্জন করে স্বকীয়তা, কর্মদ্যোগ, প্রত্যয় ও বলিষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা, তাহলে বেখুদীর মধ্যে জন্ম লাভ করবে ত্যাগ, তিতিক্ষা ও কোরবানীর দীপ্তি। ব্যক্তির ইচ্ছা তখন বিলুপ্ত হবে সমাজের ইচ্ছার মধ্যে এবং মিল্লাত হয়ে উঠবে কল্যাণের একটি সবুজ শ্যামল প্রান্তর–

> If the self inculcates uniqueness, initiative determination and ambition, selflessness creates a spirit of sacrifice, devotion and mergence of the individual wills into the bigger will of the community for the greater good of all members of the community. This reciprocal association between the individual and community is in the last analysis, according to Iqbal, the secret of success in life. [৪২](পৃ:-৬৭)

পরিণতিতে–

> The self reaches the pinnacle of its glory when it attains maturity in selflessness. When an individual does service to others, he fulfills the main objective of his life. [৪২](পৃ:-৬৭)

ইকবালের নিজের ভাষায়–

মিল্লাত ছাড়া
ব্যক্তির অস্তিত্ব অর্থহীন;
যেমন নদীর বিশালতা ছাড়া
ক্ষুদ্র উর্মির অস্তিত্ব
মূল্যহীন।
যে মুহূর্তে উর্মি বিচ্ছিন হয়
নদীর বুক থেকে।
সে হারিয়ে যায় অনস্তিত্বের
অন্ধকারে।[৪২](পৃ:-৬৭,৬৮)
(বাঙ্গে-দারা)

ইকবালের এই সমাজবিধান, যার মধ্যে রয়েছে মানবের অন্তরাত্মার স্বীকৃতি। নীতি হিসেবে এটি গ্রহণ করেছে ইসলামের কালজয়ী ও সার্বজনীন আদর্শ এবং সমাজের ঐক্য সংস্থাপক ভিত্তি হিসেবে ইসলামের আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ। অন্যান্য সমাজ বিধানের মতো ইকবালের পরিকল্পিত সমাজ সন্যাসবাদী ধারণায় পুষ্ট

নয়। বহির্জগতের প্রতি ইসলামের নেই কোন উদাসীন্য। জড় জগতের প্রতি এই সমাজ সকল দায়িত্বের স্বীকৃতি দেয় এবং সেই সাথে সকল বিঘ্ন মোকাবিলা করার মানসিক প্রস্তুতিও সম্পন্ন করে। এই সমাজ বিধান আধুনিক বিজ্ঞানের গুরুত্বকে উপলব্ধি করে এবং বিজ্ঞানকে হাতিয়ার বানিয়ে বর্হিজগতের উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চালায়।

ইকবাল তাঁর রমূযে বেখুদীতে জাতীয় জীবনের ক্রমসম্প্রসারণশীলতার জন্যে বিজ্ঞানের বিকাশকে একান্ত জরুরী মনে করেছেন। ইকবালের ধারণা, মুসলিম জাতির দুর্ভোগ ও পতনের মূলে রয়েছে বিজ্ঞানের প্রতি তাদের অবহেলা। কারণ, বর্তমানকালে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমৃদ্ধির প্রধান কার্যকারণ হলো বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের প্রতি উদাসীন্যের ফলে তাদের চিন্তার দুয়ার যেমনি হয়েছে অবরুদ্ধ তেমনি পার্থিব উন্নতির পথও হয়েছে কুয়াশাচ্ছন্ন। ইকবাল তাই জাতীয় জীবনের বলিষ্ঠতার জন্যে পাশাপাশি প্রকৃতিক শক্তিকে আয়ত্তে আনবার লক্ষ্যে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিকে অর্জন করবার তাগিদ দিয়েছেনঃ

যে কেহ জয় করে বস্তুর জগতকে,
নির্মাণ করতে পারে সে একটি বিশ্ব
ধূলি মুষ্টি থেকে,
পর্বতমালা ও মরুভূমি, নদ-নদী, সমতল- -
এর সবই হচ্ছে শিক্ষার পন্থা
চক্ষুষ্মান মানুষের কাছে।
তোমরা– যারা হয়ে আছ তন্দ্রাতুর
অহিফেন নেশায়,
ঘৃণাই মনে কর এই কার্যকারণের বিশ্বাসকে।
উদ্দেশ্য তার সম্প্রসারণ মুসলিম আত্মার
আর এক পরীক্ষা
তার লুকায়িত সম্ভাবনার।
জয় করো তাকে,
নইলে সে জয় করবে তোমায়–
যেমন করে মদ্য ধারণ করে সোরাহী;
তোমার বহুমুখী কর্মক্ষমতা
লাভ করবে পূর্ণতা
তার সকল শক্তির উপর কর্তৃত্ব করে।
সেই মানুষই হয়ে উঠে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি
বিধান প্রয়োগ করে সকল বস্তুর উপর।
ডুবাও তোমার হস্ত পর্বত শোণিতে,
আহরণ করো উজ্জ্বল মুক্তারাজি
সমুদ্র বক্ষ থেকে;
সূর্য থেকে গ্রহণ করো
তার অত্যুজ্জ্বল জ্যোতি,
ঝঞ্ঝা থেকে গ্রহণ করো বিদ্যুৎ ঝলক–
যা আলোকিত করে প্রাসাদ বক্ষ।
জ্ঞানকে নিয়োজিত করো তোমার সন্ধানের কাজে
জয় করো বস্তু ও আত্মার বিশ্ব;
যে কেহ শাসনে আনতে পারে

বস্তুর বিশ্বকে,
আরোহী হতে পারে সে
বিদ্যুৎ ও তাপের রথে।[৪২(পৃ:-৬৮,৬৯)]
(জাভিদনামা)

সবশেষে এই সমাজ-বিধান হবে একটি গতিশীল বিধান। এটি হবে সদাজাগ্রত ও পরিবর্তনশীল। ইকবাল মনে করেন, জীবন হচ্ছে গতিমান এবং পরিবর্তন হচ্ছে তার ধর্ম। ইসলামী নীতি অনুসারে সমাজের এই পরিবর্তনশীলতা জীবনের গতিশীল সৃষ্টিধারার জন্যেই অপরিহার্য। ইকবালের এই ধারণা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর জাভিদনামা গ্রন্থে– সেখানে সুলতান টিপু কাবেরী নদীর উদ্দেশ্যে বলেছেন–

তুমি আর আমী জীবন প্রবাহের তরঙ্গ মাত্র;
প্রতি মুহূর্তে
এই বিশ্বে আসে পরিবর্তন- প্রবাহ
জীবনে আসে পরিবর্তন
প্রতি শ্বাস গ্রহণের সাথে
কারণ সে চিরন্তন সন্ধানী নবীন বিশ্বের।
গতি থেকে রচিত হয়
প্রতি সত্তার টানাপোড়েন;
গতি থেকেই আসে
ক্রমবিকাশের এসব আকাঙ্ক্ষা;
পথেরও আছে গতি
পথিকের মতো,
সর্বত্রই রয়েছে গতি স্পষ্ট অথবা প্রকাশমান।
কাফেলা ও উট
মরভূ আর ওয়েসিস–
যা কিছু দেখেছো তুমি,
সবাই অশান্ত চঞ্চল
গতির বেদনায়।[৪২(পৃ:-৬৯,৭০)]
(জাভিদনামা)

সুতরাং ইসলামী সমাজবিধান কাল ও সময়ের বোঝাকে সরিয়ে জীবন সঞ্চারী গতিশীল ধারণাকে প্রয়োগ করবে; অবশ্য তা কুরআনী মূলনীতির আওতাধীনে থেকে। তাহলে সে যেমন বুদ্ধিবৃত্তিগত উদ্যমকে হারিয়ে ফেলবে না, তেমনি প্রাচীন ও কীটদুষ্ট ধারণাকে আঁকড়ে রাখবার মোহকেও বর্জন করতে পারবে। সেই সাথে নতুন কিছু গ্রহণ করবার নিরীক্ষাও তারা চালাতে পারবে। ইকবালের পরিকল্পনা অনুসারে এই সমাজবিধান বাস্তব ও সংস্কৃতির শক্তির উপর যেমন নির্ভর করবে, পাশাপাশি ইসলামী কাঠামোর মধ্য থেকে এর প্রতিটি সদস্যের পক্ষে মুক্তবুদ্ধি চর্চার সুযোগকেও ত্বরান্বিত করবে। মানব সমাজের এই সমৃদ্ধিশীলতা ও চলিষ্ণু গতির মধ্যে উন্মোচিত হবে তখন এক অভূতপূর্ব সাফল্য ও সুস্বাদ।

আদর্শ সমাজের নীতিমালা :

ইকবাল তাঁর রমূযে বেখুদীতে এই পরিকল্পিত আদর্শ সমাজের নীতিমালা পেশ করেছেন এভাবে–

১। এ সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি হবে তাওহীদ (আল্লাহ্‌র একত্ব);

২। এর জীবনায়োজন হবে নবুয়তরূপী ঐশী প্রেরণালব্ধ নেতৃত্বের অধীন,

৩। এর দৈনন্দিন কার্যপরিচালনার জন্যে একটি স্বীকৃত নীতিমালা থাকবে;
৪। এর একটি সার্বজনীন কেন্দ্র থাকবে;
৫। এর এমন একটি সুস্পষ্ট্য উদ্দেশ্য থাকবে যার প্রতি সমগ্র সম্প্রদায় সর্বদা এগিয়ে যেতে সচেষ্ট থাকবে;
৬। এ সমাজকে অবশ্যই প্রাকৃতিক শক্তিগুলোকে আয়ত্বে আনার মত বস্তুগত ও অবস্তুগত ক্ষমতা সম্পন্ন হতে হবে;
৭। এ সমাজ ব্যবস্থার কার্যক্রম এমন হতে হবে, যাতে ব্যক্তির খুদী বা ব্যক্তিত্ব যেভাবে বিকাশ লাভ করে সেভাবে সামাজও সামগ্রিকভাবে বিকাশ লাভ করে
৮। এটি অবশ্যই দেশকে সব ধরনের ধ্বংস ও আগ্রাসন থেকে রক্ষা করবে।
৯। এটি হবে বিশেষ আদর্শের প্রতি সমাজের সদস্যবৃন্দকে পরিচালনে উদ্যম সঞ্চারের জন্যে একটি যথাযোগ্য আদর্শ– যা সাথে সাথে তাদের মধ্যে একাত্ববোধ ও সুসামঞ্জস্য বিধান করবে।[৪২/৭(পৃ:-৬৩/১৯৪)]

নির্বাচন পদ্ধতি :

১৯১০-১১ সালে Hindustan Review নামক পত্রিকার ২২ ও ২৩ নং সংখ্যায় Political Thought in Islam নামে ইকবালের একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়। সেখানে তিনি ইসলামের রাজনৈতিক দর্শনের ধরণ সম্পর্কে আলোকপাত করেন।[৫৯(পৃ:-৫৬,৫৭)]তিনি প্রাথমিক যুগের মুসলিম সাংবিধানিক আইনবেত্তা আল মাওয়ার্দির অনুসরণে তাঁর মত প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি দেখান যে, নির্বাচনের ক্ষেত্রে, তা সে যে কোন ধরণের প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচনই হোক না কেন, মুসলিম কমিউনিটি দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত :

১। নির্বাচক মন্ডলী
২। নির্বাচনে প্রার্থীবৃন্দ।

একজন নির্বাচকের যে সব গুণাবলী থাকা জরুরী বলে তিনি মনে করেন সেগুলো হলো :

(ক) একজন সৎ ও ভালো আদর্শ মানুষ হিসেবে জনশ্রুতি :
(খ) রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি সম্পর্কে স্বচ্ছ ও অনিবার্য জ্ঞান;
(গ) বুদ্ধির প্রখরতা, দুরদর্শিতা ও বিচার শক্তি;

আর যিনি প্রার্থী হবেন তার যে সকল গুনাবলী থাকবে সেগুলো হলো :

(ক) নিষ্কলুষ চরিত্র;
(খ) দীর্ঘদিনের শারীরিক ও মানষিক দুর্বলতা মুক্ত হওয়া;
(গ) প্রয়োজনীয় আইনগত ও ধর্মতাত্ত্বিক জ্ঞান, যাতে বিভিন্ন সমস্যায় সিদ্ধান্ত দিতে পারা যায়;
(ঘ) একজন শাসকের যে ধরনের দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হওয়া উচিৎ সে রকম হওয়া;
(ঙ) সাহস থাকা;
(চ) কুরাইশ বংশের সাথে সম্পর্ক থাকা, (যদিও বর্তমানে সুন্নি আইনবিদরা এটাকে আবশ্যক মনে করেন না);
(ছ) প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া;
(জ) পুরুষ হওয়া (যদিও খারেযীরা মনে করেন যে, মহিলারাও খলিফা হিসেবে নির্বাচিত হতে পারেন)।

যদি কোন প্রার্থী এ সব শর্ত পূরণ করেন তাহলে প্রভাবশালী পরিবারের সদস্য, জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ, সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানগণ একসাথে মিলিত হয়ে তাঁকে খালিফা হিসেবে মনোনয়ন দেবেন। নির্বাচিত খলিফা বিধিমত পাঁচ জনকে বিভিন্ন ভায়গায় নিয়োগ দিতে পারেন– (১) প্রধানমন্ত্রী (২) প্রধান নির্বাহী (প্রদেশগুলোর) (৩) সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানদের (৪) প্রধান বিচারপতি (৫) সর্বোচ্চ আপিল বিভাগ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের সাধারণ তদারকির সাধারণ নিয়ন্ত্রণ প্রধানকে।

ইকবাল এবিষয়টিই দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে, কুরআনে যে মৌলিক নীতি দেয়া হয়েছে তা হলো নির্বাচন নীতি। কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্য, মুসলিম দেশগুলোতে নির্বাচনের এ সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি। মুসলিম দেশের ইসলামী জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিবর্গও এবিষয়টি নিয়ে চিন্তা করেন নি। এমনকি পাশ্চাত্যে নির্বাচন পদ্ধতি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবর্তিত হওয়ার পরও এ বিষয়টি নিয়ে মুসলিম পন্ডিত ব্যক্তিগণের মাঝে তেমন আলোচনার কোন লক্ষ্যণও দেখা যায়নি। তিনি মনে করেন, প্রধানত দুটো কারণে এ ধরনের রাজনৈতিক কর্মকান্ড মুসলিম দেশসমূহে পরিচালিত হতে পারেনি। [৫৯](পৃ:-১৯৬)

(১) ইসলামকে ধর্ম হিসেবে গ্রহণকারী প্রধান দু'টি দল নির্বাচনের এই ধারণার সাথে পারস্য ও মঙ্গোলিয়দের চিন্তার ঐক্য না হওয়া।

(২) প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের জীবন ছিল দেশ জয়ের জীবন। তাঁরা তাদের সব শক্তি নিয়োজিত করেছিলেন রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের দিকে, যার ফলে রাজশক্তি কতিপয় লোকের হাতে কুক্ষিগত হয়ে যায়। গণতন্ত্রায়ন তখন শাসকের কাছে আর ততটা আগ্রহের বিষয় ছিলনা।

সাংবিধানিক সরকার ব্যবস্থা ও ইকবাল :

ইকবাল সাংবিধানিক সরকার ব্যবস্থার ইসলামী ব্যাখ্যা প্রদান করার ব্যাপারেও সচেষ্ট ছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি তুরস্কের খেলাফত ব্যবস্থার অবলুপ্তিতে স্বস্তি প্রকাশ করেন। মুসলিম দেশসমূহে প্রজাতান্ত্রিকরণে যে উন্নয়ন সংঘটিত হয় তাকে তিনি উল্লেখ করেছেন, A return to the original purity of Islam হিসেবে। মুসলিম দেশসমূহে আইনসভা বা বিধানসভা প্রতিষ্ঠা লাভ করায় তিনি সন্তোষপ্রকাশ করেন। তিনি মনে করেন এসব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মুসলিম প্রতিষ্ঠানগুলো আধুনিকতার ধারনার সাথে পরিচিত হতে পারবে। তিনি পাশ্চাত্যকে ভালভাবেই জেনেছিলেন এবং এটা খুব ভালভাবেই উপলব্দি করেছিলেন যে,পাশ্চাত্যকে যদি ভালভাবে জানা না যায়, যদি ইসলামের নৈতিক ও আইনগত দিকের জ্ঞান দ্বারা পশ্চিমা জগতকে প্রতিহত করা না যায় তাহলে মুসলমানদের পক্ষে পাশ্চাত্যের বিপরীতে টিকে থাক সম্ভব হবে না। এজন্যে ইকবাল মিল্লাতে ইসলামীর সংবিধান হিসেবে কুরআনকে গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন :

حفظ قران عظیم آئین تست - حرف حق را فاش گفتن دین تست
مردحق از کس نگیرد رنگ و بو - مردحق زحق پذیرد رنگ وبو
جزحرم منزل ندارد کاروان - غیر حق در دل ندارد کاروان-

তোমার আইন– মহান কুরআনের সংরক্ষণ,
তোমার ধর্ম– সত্য প্রকাশ।
করে না গ্রহণ সৎলোক কারো রংরূপ,
করে গ্রহণ সৎলোক খোদার রংরূপ।
নেই মনযিল আর কোন,
মক্কা ছাড়া মুসলিম কাফেলার,
আল্লাহ্ ছাড়া নেই কিছু মনে এই কাফেলার। [২](পৃ:-২৮)
(জাবীদনামা, পৃ:-৮৫-৮৬)

মুসলমানের জীবন-বিধান আল-কুরআন – যা মানব জীবনের সকল দিক ও শাখাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এটি এমন এক সংবিধান, যার হিক্মত চিরস্থায়ী, এবং আদেশ-নিষেধ হেদায়াতের চাবিকাঠি। এর কোন বিধান প্রকৃতি বিরোধী নয়। এই বিধানের অনুসরণে মানুষ উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করে। ইকবাল বলেন :

ملتی را رفت چون آئین زدست - مثل خاک اجزائی او ازهم شکست
هستئ مسلم ز آئین است وبس - باطن دین نبی ص این است وبس

برگ گل شد چون ز آئین بسته شد - گل ز آئین بسته شد گلدست شد
نغمه از ضبط صدا پیداستی - ضبط چون رفت از صدا غوغاستی
تو همی دانی که آئین تو چیست - زیر گردون سرتمکین تو چیست؟
ان کتاب زنده قران حکیم - حکمت او لایزال است و قدیم
نسخه اسرار تکوین حیات - بی ثبات از قوتش گیرد ثبات

ছুটি যায় যদি কুরআন, মিল্লাতের হাত থেকে,
খসে পড়ে, তার অঙ্গনিচয় মাটির মতন।
নির্ভর করে মুসলিমের ওজুদ এই আইনের উপর,
এটাই স্বরূপ নবীর (সা.) মিল্লাতের, অন্য কিছু নয়।
পাপড়িনিচয় হয়ে যায় ফুল, আইনের অনুগামী হয়ে,
হয়ে যায় ফুলনিচয় ফুলের মালা, নিয়মের অধীন হয়ে।
হলে স্বর নিয়ন্ত্রিত, রূপ নেয় তা গানের,
হারালে নিয়ন্ত্রণ, রূপ নেয় তা শোরগোলের।
তুমি জান কী তোমার আইন?
আকাশ তলে কোথায় তোমার মান-গৌরবের চাবিকাঠি :
এক জিন্দা কিতাব কুরআনে হাকীম,
মহিমা তার চিরস্থায়ী।
আছে এতে জীবন সৃষ্টি রহস্য,
স্থায়িত্ব পায় অস্থায়ী বস্তু কুরআনের শক্তি বলে।[২](পৃ:-২৯,৩০)
(আসরার ও রমূয, পৃ:- ১৩৯-১৪০)

ইকবাল অন্যত্র বলেন :

گرتومی خاهی مسلمان زیستن
نیست ممکن جز بقران زیستن
বাঁচতে চাও যদি মুসলমান হয়ে,
তবে নাই উপায় বাঁচার, কুরআন ব্যতিরেকে।[২](পৃ:-৩০)
(আসরার ও রমূয, পৃ:- ১৪২)

আল্লাহ্ তায়ালা মুসলমানকে কুরআনের বিধান এজন্য দিয়েছেন, যাতে এর অনুসরণ করে সত্যিকার অর্থে তারা খিলাফতের উপযুক্ত হতে পারে। ইকবালের মতে, এই বিধান কঠোরভাবে পালন করতে হবে। কেউ এ বিধানের কোন একটি দিকের বিরোধিতা করলে মুসলিম জাতির উচিত হবে তা আরো কঠোরভাবে পালন করা। তা না হলে, জাতির টিকে থাকাই হবে মুশকিল। ইকবাল বলেন :

ملت از آئین حق گیرد نظام
از تظام محکمی خیزد دوام
ای که باشی حکمت دین را امین
باتو گرئم نکته شرع مبین
چون کسی گردد مزاحم بی سبب
بامسلمان در ادای مستحب
مستحب را فرض گردا نیده اند

Dhaka University Institutional Repository

زندگی را عین قدرت دیده اند

شارع آئین شناس حوب و زشت

بهر تو این نسخه قدرت نوشت

تاشعار مصطفی از دست رفت

قوم را رمز بقا از دست رفت

দৃঢ়তা লাভ করে মিল্লাত, আল্লাহর আইনে,
স্থায়িত্ব লাভ করে তা, দৃঢ় বিধানে।
হে ধর্ম-রহস্যের আমানতদার!
বলবো তোমার কাছে স্বচ্ছ শরার মর্মকথা।
মুখামুখি হলে কেউ, অহেতুক বাধার,কোন মুসলমানের
মুসতাহাব আদায় করতে গিয়ে
তবে করবে আদায় শক্তি প্রয়োগে
মুসতাহাবকে ফরয ভেবে,
কারণ শক্তির নামই জীবন।
আইন ভাল কি মন্দ– জানেন আল্লাহ্ই তা ভালো,
রচিলেন তিনি এই শক্তি-বার্তার কিতাব তোমার তরে।
ছুটে গেলে হাত থেকে নবীজীর নিদর্শন,
ছুটে যাবে সে জাতির বেঁচে থাকার অধিকার।[২](পৃঃ-৩০,৩১)
(আসরার ও রুমুয পৃঃ- ১৪৬-১৪৮)

এই জীবন ব্যবস্থায় নেই কোন শ্রেণী বা বর্ণ বৈষম্য, নেই স্বৈরতন্ত্র কিংবা পুঁজিবাদের স্থান। আছে শুধু সাম্যের জয়গান। ইকবাল বলেন :

دستان کهته شستی باب باب

قکر را روشن کن از ام الکتاب

چیست قران ؟ خواجه را پیغام مرگ

دستگیر بنده بی ساز وبرگ

هیچ خیر از مردک زرکش مجو

لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتَّي تُنْفِقُوْا

ধয়ে মুছে ফেল পুরনো পুঁথির প্রতিটি অধ্যায়,
করে নাও উজালা, তোমার চিন্তাকে, কুরআনের আলোকে।
কুরআন কী? পুঁজিবাদীদের মরণ-বার্তা-বাহক,
অসহায় বান্দার পুরোপুরি সহায়ক।
করোনা আশা কোন মঙ্গলের, অর্থ লোভীর কাছে,
না করলে দান পছন্দসই বস্তু, পাবে না কখনো পূণ্য।[২](পৃঃ-৩১,৩২)
(জাভিদনামা , পৃ: ৮৮-৮৯)

এই মহাসংবিধান অনুসরণ-অনুকরণে মানুষের জীবন হয়ে উঠে উন্নততর-গৌরবময়। ইকবাল বলেন :

رهزنان از حفظ او رهبر شدند

Dhaka University Institutional Repository

از کتابي صاحب دفتر شدند

(আরবের) রাহজান হয়ে গেল রাহবার, কুরআনের মহিমায়;
হয়ে গেল শাসক তারা কুরআনের গরিমায়। [২](পৃ:-৩২)
(আসরার ও রুমূয, পৃ:- ১৪১)

ইকবাল তাঁর জাভিদ নামায় কুরআনের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন :

কোরান কাকে বলে? সে হলো ধনিকের মৃত্যু পরোয়ানা,আর
অন্নহারা যারা, সর্বহারা দাস, কোরান আশ্রয় তার।
আমারা যে যেখানে সকলে একাসনে বসেই রুটিজল খাই
আমরা আদমের বংশধর যারা, সবার এক আত্মাই।
মনের ভিতরে তা পৌঁছে যায় যদি, বদল হয়ে যায় মনে
বদল হলে মনে গোটা এ পৃথিবী সে মাতায় পরিবর্তনে। [৪২](পৃ:-১৭)
(জাভিদনামা)

তিনি ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ যা জীবন ও ধর্মের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে তার সমালোচনা করেন। তবে তিনি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এ সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করেন। এ প্রসঙ্গে জাভিদ ইকবাল বলেন :

> He found on objection to the separation of the department of religion from the other departments of an Islamic state for the purpose of functional efficiency.[৫৮](পৃ:-২১)

তিনি মনে করতেন, যে কোন সংবিধান যদি তা মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে এবং ইসলামের মৌলিক শিক্ষাকে লংঘন না করে তবে তাকে ইসলামিক সংবিধান বলা যেতে পারে। সাংবিধানিক রাজনীতির পক্ষে তাঁর এই যে সদর্থক সম্মতি তা ইসলামিক রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ও সদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে।

সার্বভৌমত্ব ও খিলাফত :

আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতা রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যা না থাকলে একটি রাষ্ট্র পূর্ণতা পায় না। ইকবাল বিশ্ব ব্যবস্থায় প্রচলিত সার্বভৌমত্ব মতবাদটি আলোচনা করেছেন। ইকবালের মতে সমস্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার একমাত্র উৎস স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। সমাজবদ্ধ মানবসমষ্টির কোন ব্যক্তি বা সংখ্যাগুরু দলই সার্বভৌম ও প্রভুত্বের অধিকারী হতে পারেনা। তিনি বলেন–

سروري زيبا فقط اس ذات بی همتا کوهی
حکمران هی بس وهی باقی بتان آزری
সার্বভৌমত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকার
একমাত্র শাহানশাহ তিনি
লা-শরীক আল্লাহ্
আর সব কিছুই আযরের প্রতিমা।[৪৩](পৃ:-৬৮)

ইসলামের রাষ্ট্রীয় মতাদর্শের মূল কথা হলো কর্তৃত্ব, আধিপত্য ও সার্বভৌমত্বের মালিক একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। নিখিল জগতের তিনিই সৃষ্টিকর্তা, পরিচালক, ও প্রকৃত শাসনকর্তা। তবে দুনিয়ার মানব সমাজের শৃংখলা বিধান, সমাজবদ্ধ মানুষকে উত্তরোত্তর প্রগতি ও উন্নতির দিকে পরিচালিত করবার জন্যে তাদের মধ্য

হতে একদল মানুষকে তিনি নেতৃত্ব দান করে থাকেন। তারা আল্লাহরই শাশ্বত ও চিরন্তন বিধান অনুযায়ী মানব জাতিকে মনযিলে মাকসুদের দিকে পরিচালিত করেন। পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমত কায়েম করবার জন্যে মানুষ তাঁর প্রতিনিধি। আল্লাহ্ তাআলার প্রদত্ত এই প্রতিনিধিত্বের অধিকার লাভ করে মানুষ সমগ্র জীব-জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসন অধিকার করেছেন। ঠিক এই মূল দর্শনের উপর ভিত্তি করেই ইকবালের হুকুমত ও খিলাফত সংক্রান্ত যাবতীয় মতবাদ গড়ে উঠেছে এবং তা তাঁর কাব্যের পতায় পাতায় মধুক্ষরা ভাষা ও ছন্দে গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছে। ইকবাল একটি শক্তিশালী সুবিচারপ্রবণ ও ন্যায়নিষ্ট হুকুমত কায়েম করবার জন্যে দৃঢ় ঈমান ও প্রেম অপরিহার্য বলে ঘোষণা করেছেন :

ولایت پادشاهی علم اشیاکی **جها**نگیری
یه سب کیاهی فقط اک نقطه ایمان کی تفسیرین
কর্তৃত্ব, রাজশক্তি আর বস্তুবিজ্ঞানের বাহাদুরী
ঈমানের বাস্তব অভিব্যক্তি মাত্র। [৪৩](পৃ:-৬৯)

হুকুমত ও নেতৃত্ব ইকবালের মতে খিদমত গুজারী অর্থাৎ মানব সেবারই অপর নাম। কিন্তু জীবনের সকল প্রকার কাজের বুনিয়াদ প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত না করলে মানুষের মধ্যে প্রকৃত ও নি:স্বার্থ জনসেবার ভাবধারা জাগিয়ে তোলা আদৌ সম্ভব নয়। অন্য কথায় বৈরাগ্য ও রাজত্ব, দরবেশী ও বাদশাহীর পরস্পর সমন্বয় বিধান একান্তই আবশ্যক। হুকুমতে ইলাহিয়া কায়েম করবার জন্যে তিনি ইশকে মুস্তফা বা নবী প্রেম একান্ত অপরিহার্য বলে মত প্রকাশ করেছেন। কারণ এই প্রেমই জাতির প্রত্যেকটি সদস্যকে এক ও অভিন্ন উদ্দেশ্য প্রনোদিত ও উদ্বুদ্ধ করে একই লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করে এবং জাতির আভ্যন্তরীণ বিরোধ ও বিশৃংখলা দূরীভূত করে জাতিকে অটুট শৃংখলাসূত্রে গ্রোথিত করে দেয়। পায়াম-ই- মাশরিক গ্রন্থে তিনি বলেন :

سروری در دین ماخد**مت است**
عدل فاروقی فقر حیدری
ان مسلمانان که امیری کرده **اند**
درشهنشاهی فقیری کرده اند
هرکه عشق مصطفیا سامان اوست
بحر و بر در گوشه دامان اوست
আমাদের জীবন বিধানে নেতৃত্ব
শুধু মাত্র মানব সেবা,
ফারুকের সুবিচার আর
আলী হায়দারের অনাড়ম্বর জীবন।
নেতৃত্ব করেছে যে মুসলমান,
শাহানশাহীর সাথে করেছে তারা
ফকীরী জীবন যাপন।
জীবন পাথেয় যার মুস্তফার প্রেম,
পূর্ণ অধিপত্য বিরাজিত তার
জলস্থলের উপর।[৪৩](পৃ:-৬৯)
(পায়ামে মাশরিক)

Dhaka University Institutional Repository

আরমুগানে হিজায গ্রন্থ তিনি বলেন :

خلافت برمقام ماگواهی است
حرام است نچه برما پادشاهی است
ملوکیب همه مکراست ونیرنگ
خلافت فقط ناموس اهی الهی **است**
খিলাফত আমাদের দৃষ্টিতে সত্যের প্রতিভূ
হারাম আমাদের কাছে মানব প্রভুত্ব।
সাম্রাজ্যবাদ প্রতারণা সর্বস্ব ও বহুরূপী,
খিলাফতই হচ্ছে একমাত্র প্রতীক
খোদায়ী মর্যাদার।[৪৩](পৃ:-৭০)
(আরমুগানে হিজায)

ইকবাল রাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদকে সম্পূর্ণ হারাম মনে করেন। ইউরোপ রাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের যে পদ্ধতি উপস্থাপন করেছে তা সওদাগরী, নরহত্যা, রক্ত শোষণ ও স্বর্থপরতা ভিন্ন আর কিছুই নয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যে শাসনতন্ত্রের দাসত্বের কাজে নিয়োজিত, তার পরিণাম ইকবালের দৃষ্টিতে বিনাযুদ্ধে নরহত্যা। ফিরিঙ্গী সভ্যতার চরম উদ্দেশ্যও তাই:

ازضعیفان نان ربودن حکمت است
ازتن شان جان ربودن حکمت است
شیوه تهذیب نو **ادم دری است**
پرده ادم دری سودا **گری است**
আজকের বিজ্ঞান হচ্ছে
দুর্বলের মুখের অন্ন ছিনিয়ে নেয়া
নর হত্যাও আজ বিজ্ঞানে শামিল।
মানবদেহকে ছিন্নভিন্ন করাই আজ
নব সভ্যতার বৈশিষ্ট্য,
এই নরহত্যার আড়ালে রয়েছে
সওদাগরীর চক্রান্তজাল।[৪৩](পৃ:-৭০,৭১)

আরমুগানে হিজায গ্রন্থের রুবায়ীতে তিনি ইসলাম ও পাশ্চাত্য শাসনতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য পরিষ্কার করে বলেছেন :

مسلمان فقر و سلطانی بهم کرد
ضمیرش باقی و فانی بهم کرد
ولیکن الا **مان از عصر حاضر**
که سلطانی وشیطانی بهم کرد
মুসলমানদের কাছে রাজশক্তি ও ফকীরী
পরস্পর সংযুক্ত
আত্মা তার স্থায়ী, অথচ ধ্বংসশীল।
পরিত্রাণ চাই আধুনিক কালের প্রভাব থেকে,
রাজশক্তির পশ্চাতে রয়েছে আজ

Dhaka University Institutional Repository

শয়তানী ষড়যন্ত্র। [৪৩(পৃ:-৭১)]
(আরমুগানে হিজায)

ইকবাল মানব জীবনের অপরাপর সকল কাজ কারবারের ভিত্তি যেমন নিছক মানব বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত করার সম্পূর্ণ বিরোধী এবং বুদ্ধিবাদকে (Intellectualism) মানব জগতের জন্যে মারাত্মক ক্ষতিকারক বলে মনে করেন, তেমনি রাষ্ট্রনীতি ও শাসন পদ্ধতিতেও তিনি নিছক মানব বুদ্ধির উপর বুনিয়াদ স্থাপন করতে মোটেই রাজি নন। কারণ, যে আইন-কানুন শুধুমাত্র মানুষের বিকৃত বুদ্ধিসমন্বিত মস্তিষ্ক দ্বারা রচিত হবে, তাতে মানুষের নিষ্ঠুর স্বার্থপরতা ও স্বেচ্ছাচারিতার পূর্ণ ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে থাকবেই। বুদ্ধিবাদী মানুষ কোন সমাজ ব্যবস্থা ও সামাজিক কাজকর্মে সেই সমাজের ভিত্তিকে দৃঢ়তর করার উদ্দেশ্যে অংশগ্রহণ করে না বরং সমাজের মধ্যে প্রবেশ করলে কিভাবে তার ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধার করা যায় সে দিকেই তার লক্ষ্য নিবদ্ধ থাকে। এই কারণেই বুদ্ধিবাদের ভিত্তিতে রচিত আইন-কানুন সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষকে সন্তুষ্ট, নিশ্চিন্ত ও বিপদমুক্ত করতে এবং ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। বরং সংখ্যালঘু দল সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের রচিত আইনের প্রতি সন্তুষ্ট হতে না পেরে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। গণতন্ত্রে যেহেতু একটি সংখ্যালুঘু দলকে অন্যায়ভাবে অন্য একটি সংখ্যাগুরু দলের অধীন করা হয় এবং তাদের দয়া ও অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল করে দেয়, তাই ইকবালের মতে এই আইন রচনা পদ্ধতি বাতিল করে বুদ্ধিবাদের পরিবর্তে অহীর সাহায্যে অবতীর্ণ খোদায়ী আইনের আনুগত্য ও অনুসরণ করা আবশ্যক। অন্য কথায় পূর্ণরূপে ইসলামী হুকুমাত কায়েম করা সকল মানুষের পক্ষে অপরিহার্য কর্তব্য। কারণ আল্লাহ্‌র আইনে সংখ্যালঘু, সংখ্যাগুরু বলতে কিছুই নেই, তাঁর দৃষ্টিতে সকল মানুষই সমশ্রেণী ও সমমর্যাদার দাবিদার। জাভিদ নামায় ইকবাল বলেন :

بندهء حق بی نیاز از هر مقام
نی غلام اورا نه او کس را غلام
وحی حق بینند سود همه
نگاهش سود و بهبود همه
بندهء حق مرد ازاداست و بس
ملک و ائینش خدا داداست و بس
رسم و راه و دین وآئینش زحق
زشت و خوب و تلخ نوشینش زحق

বান্দায়ে হক, নয় কভু স্থান গন্ডিতে সীমাবদ্ধ,
কেহ নয় তার গোলাম,
আর গোলাম নয় সে অপরের।
আল্লাহর অহী মংগলময়
তার দৃষ্টিতে,
সব কিছুই তার চোখে কল্যাণ অভিসারী।
বান্দায়ে হক হচ্ছে আযাদ-স্বাধীন,
রাজ্য ও আইন সবই আল্লাহ্‌র দান।
রীতি ও পন্থা, জীবন-বিধান ও আইন-
সব কিছুরই উৎস এক আল্লাহ।
ভালো ও মন্দ, তিক্ত ও মধুর-
সব কিছুই আগত আল্লাহ্‌র কাছ থেকে।[৪৩(পৃ:-৭২)]
(জাভিদনামা)

'বালে জিবরীল' ও 'যারবে কালীম' গ্রন্থে আল্লামা ইকবাল প্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্র সমূহের প্রতি এজন্য নৈরাশ্যের ভাব প্রকাশ করেছেন যে, তাদের নেতৃবৃন্দ প্রাচ্য সভ্যতার মূল ভাবধারার সন্ধান নিতে আদৌ সক্ষম হন নি। 'যারবে কালীম'– এ কবি বলেন :

میری نواسی گریبان لاله چاک هوا
نسیم صبح چمن کی تلاش مین هی ابھی
میری خودای بھی سزاکی هی مستحق لیکن
زمانه دار و زسن کی تلاش مین هی ابھی

আমার বলিষ্ঠ সুরঝংকার
ফুটিয়ে তুলেছে লালার ফুলদল,
ভোরের মৃদু হাওয়া এখনো ব্যাকুল
বাগিচার সন্ধানে।
খুদী আমার দন্ডের যোগ্য বটে,
কিন্তু সুখ এখনো খঁজে ফিরছে ফাঁসিকাষ্ঠ।[৪৩](পৃ:-৭৩)
(যারবে কালীম)

এই প্রসঙ্গে একথা স্মরণ রাখা দরকার যে, আল্লামা ইকবাল তাঁর বক্তৃতাবলীতে খিলাফত সম্পর্কে তুর্কীদের ইজতিহাদকে সত্য বলে ঘোষণা করেছেন। যদিও এথেকে একথা প্রমাণিত হয় না যে, তুর্কীদের এই ইজতিহাদের মূলে ইসলামী ভাবধারাই আসল পথপ্রদর্শক ছিল কিংবা ইসলামী অনুভূতি লোপ পেয়ে যাওয়ায় তুর্কীদের মধ্যে যে পারিবারিক ও গোত্রভিত্তিক আভিজাত্য জাগ্রত হয়েছিল, তাই তাদেরকে এপথে টেনে নিয়েছে। 'আরমুগানে হিজায' গ্রন্থে তুর্কীদের সম্পর্কে কবি লিখেছেন :

به ملک خویش عتمانی امیراست
دلش آگاه و چشم اورا بصیراست
نه ینداری که رست از بند افرنگ
هنوز اندر طلسم او اسیر است

তুর্কী জাতি অর্জন করেছে স্বাধিকার
তাদের অন্তর হয়েছে সচেতন
আর দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী;
কিন্তু ভেবো না তাদেরকে
পশ্চিমী দাসত্ব থেকে মুক্ত,
এখনো তারা বন্দী তার যাদুজালে।[৪৩](পৃ:-৭৩)
(আরমুগানে হিজায)

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-তিন

ইসলামের সমাজ দর্শন ও ব্যক্তিসত্তা

মানব প্রকৃতি ও সমাজ জীবন ঃ

জীবনের অস্তিত্ব যেখানে, সেখানেই গড়ে ওঠে সমাজ। কারণ সমজাতীয় প্রাণির সমাজের মধ্যেই জীবনের বিকাশ, আর মানুষের উপস্থিতিতেই জীবন হয় প্রবাহমান। সমাজ গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে যখন থেকে জীবনের শুরু সে সময়টা অবিশ্বাস্য রকমের সংক্ষিপ্ত ও সামান্য মিলন বা নৈকট্যের একটি মুহূর্ত মাত্র। তবে পরবর্তী পর্যায়সমূহে মানুষের জীবন অবশ্যই সামাজিক। জীবনের পূর্ণতার মাত্রা, এর চরিত্র, সীমাবদ্ধতা সবকিছুই নির্ধারিত হয় সমাজে। সমাজ আমাদের প্রতিবেশের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ, এটা আমাদের প্রকৃতি। মানুষের প্রকৃতির ভেতরেই রয়েছে সমাজ এবং মানুষের চারপাশেও আছে সমাজ। মানুষ সমাজে জন্মগ্রহণ করে আবার মানুষের মধ্যেই সমাজের প্রয়োজনীয়তাও জন্ম নেয়। অর্থাৎ মানুষের এই সমাজবদ্ধতা কোন আকস্মিক বিষয় নয় বরং এটি কাঙ্ক্ষিত ও অভিপ্রেত। সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস না করলে মানুষ স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে না। কেননা সমাজের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেই মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত গুণাবলির বিকাশ সাধন হয়। আবার সমাজের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পিছনেও মানুষের সচেতন ও সক্রিয় ভূমিকা বিদ্যমান। এ সম্পর্কে ম্যাকাইভারের (R.M. Maciver) উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন–

> It has been contended that wherever there is life, there is society, because life means heredity and so for as we know, can arise only out of and in the presence of other life.[১৪(পৃ:-১)]

সমাজের প্রকাশ ব্যক্তির ব্যাপ্তিতে, স্ব-আরোপিত বন্দীদশা থেকে উত্তরনে, নিজস্ব পরিচিতির বাহনে, বংশ পরম্পরায় ব্যক্তিত্ব বিকাশের মাধ্যমে পূর্ণ বিকশিত মানুষের কর্মক্ষেত্রে। মানুষের প্রকৃতির সংগঠন এবং এই প্রকৃতিরই অমোঘ নিয়মের বিরুদ্ধে মানুষের চেতনার আশ্রয়, মানুষের লালিত প্রথা ও চলমান ঐতিহ্যের ভাণ্ডার, জীবনের অভিজ্ঞতার যোগফল, হাজারো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংঘাতে পূর্ণ পরিমন্ডল এবং একটি সম্প্রদায়ের এই সমাজের পূর্ণ বিকাশ সমাজবিজ্ঞানী গিডিংস (Gddings) বলেন–

> A society is a naturally developing group of conscious being in which conversation passes into definite relationship that in course of time are wrought into complies and enduring organization. [৩৩(পৃ:-৫০)]

ম্যাকাইভার (Maciver) সমাজের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিভিন্ন উক্তি করেছেন। যেমন, সমাজ হলো মনের অবস্থা বা গুণ বিশেষ।[৩৫(পৃ:-৩)] আবার তিনি মনে করেন সমাজ হলো, আমরা যে সব সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে জন্মগ্রহণ করি এবং জীবনধারণ করি তাদের সুসংবদ্ধ রূপ। তিনি সামাজিক সম্পর্কের বিন্যাসকে সামাজিক সম্পর্ক জনিত ব্যবস্থা (A system of social relationship) আখ্যা দিয়েছেন।[১৪(পৃ:-২)]

সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার ও পেজ (R.M. Maciver and C.H. Page) তাদের Society গ্রন্থে বলেছেন–

> Social beings, men, express their nature by creating and recreating an organization which guides and controls their behavior in myriad ways. This organization society, liberates and limits the activities of men, set up standards

for them to follow and maintain .... society is a system usages and procedures of authority and mutual aid, of many gropings and divisions, human behaviour and liberties.[১৪(পৃঃ-৩)]

সমাজবিজ্ঞানি জিসবার্ট (P. Gisbert) উল্লেখ করেছেন–

Society in general consists in the complicated network of social relationship by which every human being is interconnected with his fellowmen. [১৪(পৃঃ-৩)]

অধ্যাপক গিডিংস (F. H. Giddings) অন্যত্র বলেছেন–

Society is a number of like minded individuals who know and enjoy their like mindedness, and therefore able to work together for common ends.[১৪(পৃঃ-৩)]

বস্তুতঃ সমাজবিজ্ঞানে 'সমাজ' নামক প্রাথমিক প্রত্যয়টির একক এবং সবর্জন স্বীকৃত কোন সংজ্ঞা নেই। বিভিন্ন অর্থে এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ব্যাপক অর্থে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের সামাজিক রূপকে সমাজ বলে। সমাজ বলতে কতিপয় অনুভূতিক্ষম একই জাতীয় জীবের সামষ্টিকেও বুঝায়। আবার কখনো বা একই মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের মানসিক ঐক্য ও অনুভূতিকে বুঝায়। সাধারণত দু'টি বৈশিষ্ট্য থাকলে যে কোন জনসমষ্টিকে সমাজ বলা যায়। তা হলো–

(ক) বহুলোকের সংঘবদ্ধভাবে বসবাস।

(খ) এই সংঘবদ্ধতার পিছনে কোন একটি উদ্দেশ্য থাকা। অর্থাৎ যখন বহুলোক একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘবদ্ধ হয়ে বসবাস করে তখনই তাকে সমাজ বলে।

সে যা হোক বিভিন্ন বিজ্ঞানি সমাজের সংজ্ঞায়িত করণে ভিন্ন মত পোখণ করলেও মানুষ যে সামাজিক জীব এ সত্যকে অস্বীকার করেন নি; বরং এই সত্যের উপর ভিত্তি করে সমাজবিজ্ঞানিগণ বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ্যরিস্টটল বলেছেন "যে সমাজে বসবাস করে না, সে হয় পশু, না হয় দেবতা।"[৩৩(পৃঃ-৪৮)]

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও এ্যরিস্টটল থেকে আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানি ও নৃবিজ্ঞানি সকলেই মনে করেন যে, সমাজের উৎপত্তির কারণ মানুষ এবং তার আপন প্রয়োজন মেটানোর অভিন্ন আকাঙ্ক্ষা।

প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানি মন্টেস্কু মনে করেন যে, বন্যজন্তুর আক্রমনের আশঙ্কায় মানুষ একতাবদ্ধ হয়ে বসবাস করে এবং পরে ধাপে ধাপে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক তথা মানুষের সমাজ গড়ে ওঠে।[৩৩(পৃঃ-৪৯)]

সমাজবিজ্ঞানের জনক অগাস্ত কোঁতের মতে, 'মানব সমাজ হঠাৎ একদিনে সৃষ্টি হয়নি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে এবং প্রয়োজন মিটানোর তাগিদে ক্রমবিবর্তনের ধারায় সমাজ নতুন নতুন রূপ ধারণ করে।[৩৩(পৃঃ-৪৯)]

অন্যদিকে, আবার অনেক সমাজবিজ্ঞানিই সমাজের উৎপত্তি ও বিকাশের সাথে ডারউইনের বিবর্তনবাদের মিল খুঁজে পান। যেমন– সমাজবিজ্ঞানি স্পেনসার এবং সামাজিক নৃবিজ্ঞানি মরগান ও টাইলরের বিশ্লেষণে বিবর্তনবাদের প্রভাব লক্ষ্যণীয়।

বস্তুত সমাজবদ্ধভাবে জীবন যাপন করা মানুষের স্বভাবগত ও প্রকৃতিগত ব্যাপার। ইতিহাসে দেখা যায়, যখন সভ্যতা সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপিত হয়নি, তখনো মানুষ পরিবারবদ্ধ হয়ে মিলেমিশে বাস করতো। পরবর্তিতে এই পারিবারিক এককসমূহ গোত্রে এবং গোত্রসমূহ সমাজে পরিণত হয়।

পৃথিবীর প্রথম মানুষ হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করে একাকী জান্নাতে থাকতে দেয়া হয়নি; বরং মা হাওয়া (আ.) কে সৃষ্টি করে তাঁর সাথে একত্রে বসবাস করতে দেয়া হয়েছিল। কুরআনে হাকীমের বর্ণনা–

يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ

"হে আদম! তুমি তোমার জোড়সহ (স্ত্রী) জান্নাতে বসবাস কর।" (আল কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত–৩৫)

আরবি الانسان-এর বাংলা প্রতিশব্দ মানুষ। আর মূলধাতু أُنْسٌ মানে মনের আকর্ষণ, ঝোঁক প্রবণতা ভালবাসা, মেলামেশা। অর্থাৎ মানব স্বভাব হলো অন্য মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকা তথা সমাজবদ্ধভাবে জীবন-যাপন করা। এর দু'টো কারণ দেখা যায়– (১) স্বজাতির পতি স্বাভাবিক আকর্ষণ, (২) জীবন ধারনের জন্যে অন্যের সহযোগিতার প্রয়োজন।[৩০](পৃ:-৪২৯)

স্ব-জাতির প্রতি আকর্ষণের অর্থ হলো, মনস্তাত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ প্রাকৃতিকভাবেই স্ব-জাতির প্রতি বিশেষ অনুরাগের অধিকারী। তার জন্যে সে নিজের মধ্যে গভীর আকর্ষণ উপলব্ধি করে। তার সঙ্গ-সুখে সে আত্মিক ও মানসিক শান্তিলাভ করে, স্ব-জাতির সাথে পূর্ণ সম্পর্কচ্যুতি তার মনে অস্থিরতার সৃষ্টি করে এবং নিরবিচ্ছিন্ন ও দীর্ঘকালীন একাকীত্ব তাকে আতংকিত করে।

সহযোগিতার প্রয়োজনের অর্থ হলো, একদিকে তার একক ও ব্যক্তিগত শক্তি অতিশয় সীমাবদ্ধ। আর অন্যদিকে তার তুলনায় তার পার্থিব প্রয়োজন বিরাট, বিপুল ও অত্যন্ত ব্যাপক। তাই ঐ প্রয়োজন পূরণের ব্যাপারে এই শক্তি কখনো যথেষ্ট হতে পারে না এবং শুধু নিজের ব্যক্তিগত শক্তি বলে সে কোনভাবে এই প্রয়োজন পূর্ণ করতে পারে না। এমনকি যেসব প্রয়োজনকে মৌলিক ও অবশ্যম্ভাবী বলা হয়, সেগুলো পূরণ করাও তার জন্যে ততক্ষণ সম্ভব নয়, যতক্ষণ আরো অনেক লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাকে সাহায্য না করে।

এভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সমাজবদ্ধতা মানুষের প্রাকৃতিক চাহিদা এবং প্রয়োজনও। স্ব-জাতির প্রতি জন্মগত আকর্ষণের কারণে সে অযাচিতভাবেই অন্য মানুষের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং নিজের পার্থিব প্রয়োজনের কারণে তার মুখাপেক্ষীও থাকে। এর অর্থ হলো, সমাজপ্রিয়তার দু'টি শক্তিশালী শিকড় একই সাথে তার স্বভাবের গভীরে প্রোথিত হয়ে গিয়েছে। তাই সমাজ থেকে যদি তাকে কখনো সম্পর্কচ্ছেদ ও অমুখাপেক্ষী অবস্থায় না পাওয়া যায়, তবে তা একান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার। আর মানুষ যতদিন মানুষ হিসেবে অবস্থান করবে ততদিন এটি তার জন্যে স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় বিষয় হিসেবে বিবেচিত হবে। এটি এমন একটি স্বীকৃত সত্য যে, বিদ্যা ও জ্ঞানের কোন কালেও এ সম্পর্কে মতপার্থক্য দেখা যায় না। প্রাচীন কালের প্রখ্যাত গ্রীক পণ্ডিত ও দার্শনিক এরিস্টটল সংজ্ঞা নির্ণয় প্রসঙ্গে বলেন– 'মানুষ জন্মগতভাবেই একটি রাজনৈতিক জীব।'[১৫](পৃ:-১০)

বলাবাহুল্য, রাজনীতি সমাজবদ্ধতার সর্বশেষ আকৃতির দ্বিতীয় নাম। কাজেই 'রাজনৈতিক জীব' শব্দের অর্থ হলো– যে জীবন চূড়ান্ত এবং পূর্ণভাবে সামাজিকতার অনুসারী। অর্থাৎ এরিস্টটলের মতে মানুষের যে বিশেষ গুণ তাকে চতুস্পদ জন্তু থেকে ভিন্ন ও বৈশিষ্ট্যশালী করে তাহলো, তার এই সর্বশেষ স্তরের সমাজপ্রিয়তা। এগুণটি মানুষের মধ্যে না থাকলে মানুষ অন্যান্য জন্তুর মতো কেবল একটি জন্তুতে পরিণত হতো।

মধ্যযুগের প্রখ্যাত পণ্ডিত ও গবেষক আল্লামা ইবনে খালদুন বলেন 'একসাথে মিলেমিশে থাকা মানুষের জন্যে অবশ্যম্ভাবী। এ সত্যটিকেই জ্ঞানী ও পণ্ডিতগণ এভাবে বর্ণনা করে থাকেন যে, জন্মগতভাবেই মানুষ সামাজিক জীব।'[১৫](পৃ:-১০)

বর্তমান যুগের পন্ডিত ও দার্শনিকদের কাছে এটি এমন একটি স্বীকৃত সত্য যে, এ সম্পর্কে কোন প্রকার আলোচনা বা প্রমাণ দেখানোর প্রয়োজনই তাঁরা মনে করেন না।

ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ জীবন ঃ

সমাজবদ্ধতা মানব প্রকৃতির এমন একটি চাহিদা যা থেকে শুধু এই পার্থিব জীবনেরই নয়; বরং আখিরাতের জীবনেও সে পৃথক থাকতে পারে না। জান্নাতেও মানুষ কেবল তখনই মানসিক স্বস্তি ও পূর্ণ আনন্দ উপভোগ করবে যখন সে স্বজাতীয় ব্যক্তিবর্গের সাহচর্য লাভ করবে।[6] তাই ইসলাম সামাজিক বন্ধনের গুরুত্বের প্রতি অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিয়েছে। বরং সমাজত্যাগী জীবন মূলত ইসলামী জীবন নয় বলে কুরআন ঘোষণা দিয়েছে–

وَرَهْبَانِيَّةَن ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ

"আর বৈরাগ্যবাদ, তো তাদেরই আবিষ্কৃত, আমি তো তাদের এ বিধান দেইনি।" (আল কুরআন, সূরা হাদীদ, আয়াত–২৭)।

হাদীস শরীফে কথাটি আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে–

لَارَهْبَانِيَّةَ فِى الاِسْلاَمِ

"ইসলামে বৈরাগ্যবাদ নেই।"(আল হাদীস)

ইসলাম নিঃসন্দেহে ব্যক্তিকে বিশেষ মৌলিক গুরত্ব দিয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক ও মূলবাণী ব্যক্তির উদ্দেশ্যেই। কিন্তু ইসলাম এ কথাও ঘোষণা করেছে, মানুষ যে পথে চললে জীবনের সফলতা লাভ করতে পারে, তা সমাজকে পাশ কাটিয়ে নয়; বরং একটি সুসংগঠিত, সুষ্ঠু সমাজ জীবন-যাপনের মাধ্যমেই তাকে সাফল্যের চূড়ান্ত মনযিলে পৌঁছতে হবে। আল-কুরআনের নির্দেশ হলো :

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوْا

"তোমরা সবাই একত্রিত হয়ে আল্লাহ্‌র রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধারণ কর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" (আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত–১০২)

অপর এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন

وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوْا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

"তোমরা নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না, করলে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। আর তোমরা ধৈর্যধারণ করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।" (আল-কুরআন, সূরা আনফাল, আয়াত–৪৬)

ইসলাম সমাজের সকল মানুষের সাথে সুসম্পর্ক ও সদ্ব্যবহার শিক্ষা দেয়। পবিত্র কুরআনের ভাষায় :

- إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ

"মু'মিনগণ একে অন্যের ভাই"(সূরা হুজরাত, আয়াত–১০)।

রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন–

كُلُّ مُسْلِمٍ اِخْوَةٌ

"প্রত্যেক মুসলিম পরস্পর ভাই ভাই"।(আল হাদীস)

---

6 যেমন আল কুরআনের বর্ণনা اِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِيْنَ "জান্নাতবাসীরা ভাই-বেরাদারের মতো সম্মুখীন হয়ে আসনে বসে থাকবেন।" (সূরা হুজরাত : আয়াত-৪৭) অন্য আয়াতে আসছে– -يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهَا كَأْسًا وَاقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَّتَسَائَلُوْنَ "তারা জান্নাতে শরাবপূর্ণ পাত্র নিয়ে কাড়াকাড়ি করবে ..... এবং পরস্পরের দিকে মুখ করে কথা বলবে।" (সূরা তুর : আয়াত ২৩-২৫)

তিনি আরও বলেছেন:

اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللهِ فَاَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَى اللهِ مَنْ اَحْسَنَ اِلى عِيَالِه

"সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিজন। আল্লাহর কাছে প্রিয় সৃষ্টি হলো, যে তার সৃষ্টির প্রতি সদয় আচরণ করে।"

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন:

لاَتَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ حَتّى تُوْمِنُوْا وَلاَ تُؤْمِنُوْا حَتّى تَحَابُّوْا اَوَلاَ اَدُلُّكُمْ عَلى شَئٍي اِذَا فَعَلْتُمُوْا تَحَابَبْتُمْ اَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ

"তোমরা ঈমান না আনা পর্যন্ত বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। আবার পরস্পরকে ভালবাসতে না পারা পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না। আমি কি তোমাদের এমন একটি বিষয়ের খবর দেব না যা করলে তোমরা পরস্পরকে ভালবাসতে সক্ষম হবে? (তা হলো) তোমরা নিজেদের মধ্যে সালামের ব্যাপক প্রচলন করবে।" (আল হাদীস)

এই হাদীসে দেখা যায় বেহেশতী হওয়ার জন্যে ঈমানদার হওয়া শর্ত, আবার ঈমানদার হওয়ার জন্যে সামাজিক সৌহার্দ্য থাকা অপরিহার্য। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا-

"তোমরা আল্লাহ্র ইবাদাত করবে ও কোন কিছুকে তাঁর সাথে শরীক করবে না এবং পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআলা পছন্দ করেন না দাম্ভিক, অহংকারীকে।" (আল কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত-৩৬)

মুসলিম সমাজের প্রতিটি সদস্যকে একে অন্যের সাথে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) হতে বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার উপর যুলুম করবে না এবং তাকে যালিমের হাতে সোপর্দ করবে না। যে তার ভাইয়ের অভাব পূরণ করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার অভাব পূরণ করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কোন বিপদ দূর করবে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহের মধ্য থেকে কোন বিপদ দূর করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ গোপন করবে আল্লাহ্ তাআলা কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন করবেন।" (বুখারী শরীফ, ২য় খন্ড, পৃ: ৪৬৩)

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত, অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন–

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُوْمِنٍ كُرْبَةٌ مِنْ كَرْبِ الدُّنْيَاءَ نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةٌ مِنَ كُرْبِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَهُ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِىْ الدُّنْيَا وَالاَخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِىْ الدُّنْيَا وَالاَخِرَةِ وَاللهُ عَوْنِ الْعَبْدِ مَادَامَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ اَخِيْهِ-

"যে ব্যক্তি কোন মু'মিনের পার্থিব দুঃখ কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ্ তার কিয়ামতের দুঃখ-কষ্ট দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন সংকটাপন্ন ব্যক্তির সংকট নিরসন করবে, আল্লাহ্ তার দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় সংকট নিরসন করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, আল্লাহ্ দুনিয়া ও আখিরাতে তার

Dhaka University Institutional Repository

দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। আর আল্লাহ্ ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার সাহায্য করে থাকেন যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা নিজ ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকে।" (মুসলিম শরীফ, সূত্র: মিশকাত, পৃ: ৩২)

ইসলামী সমাজের সদস্যরা নিজের জন্যে যা পছন্দ করে অন্যের জন্যেও তাই পছন্দ করে। নবী করীম (সা:) বলেছেন–

لاَيُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّى يُحِبُّ لاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

"কোন লোকই মু'মিন হতে পারবে না যে পর্যন্ত সে তার ভাইয়ের জন্যে তাই পছন্দ করবে যা তার নিজের জন্যে পছন্দ করে।" (বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত, পৃ: ৪২২)

পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করা মুসলিম সমাজের জন্যে চরম ক্ষতিকর। রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন–

لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَثٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارِ

"কোন মুসলমানের জন্যে তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি সাক্ষাৎ পরিত্যাগ করে থাকা হালাল নয়। কেউ যদি তিন দিনের বেশি তার ভাইয়ের সাক্ষাৎ ত্যাগ করে থাকাবস্থায় মারা যায় তবে সে জাহান্নামে যাবে।" (আবু দাউদ, সূত্র: মিশকাত, পৃ: ৪২৮)

অপর এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, 'তোমরা মুসলিমগণকে পারস্পরিক দয়া, ভালবাসা এবং হৃদ্যতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে একটি দেহের ন্যায় দেখতে পাবে। দেহের কোন অঙ্গ যদি পীড়িত হয়ে পড়ে তা হলে অপর অঙ্গগুলোও জ্বর ও নিদ্রাহীনতা সহ তার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকে।' (মিশকাত, ২য় খন্ড, পৃ: ৪২২)

সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্যে প্রতিবেশীর সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে সহাবস্থান করা একান্ত প্রয়োজন। সমাজের লোকেরা পরস্পর প্রতিবেশীর প্রতি সহানুভূতিশীল হবে, একে অন্যের কল্যাণ কামনা করবে, আপদে বিপদে পরস্পর সাহায্য করবে এবং সুখ-দুঃখের ভাগী হবে। কোনভাবেই একে অপরকে কষ্ট দিবে না। রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন–

وَاللهِ لاَيُؤْمِنُ وَاللهِ لاَيُؤْمِنُ وَاللهِ لاَيُؤْمِنُ قِيْلَ مَنْ يَارَسُوْلَ اللهِ قَالَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بِوَائِقِهِ

"আল্লাহর কসম সে ব্যক্তি ঈমানদার নয়, আল্লাহর কসম সে ব্যক্তি ঈমানদার নয়, আল্লাহর কসম সে ব্যক্তি ঈমানদার নয়। প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল (সা:) কে সে ব্যক্তি? জবাবে তিনি বললেন, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকতে পারে না।(আল হাদীস)

একইভাবে একটি সমাজ সুন্দর সুখী হয়ে গড়ে উঠার জন্যে প্রয়োজন ঐ সমাজের ছোটদের প্রতি বড়দের মায়া-মমতা ও স্নেহ-ভালবাসা রাখা এবং ছোটরাও বড়দের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা ও সম্মান করা। মহানবী (সা:) বলেছেন–

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا

"যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না আর আমাদের বড়দের শ্রদ্ধা করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" (তিরমিযী, সূত্র: মেশকাত, পৃ: ৪২৩)

বস্তুত পৃথিবীর মানুষকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করা, মানুষের মঙ্গলের জন্যে ভাল কাজের প্রতিষ্ঠা ও মন্দ কাজের প্রতিরোধ করা, সত্যের সাক্ষ্য দেওয়া আর দুনিয়াতে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানব জাতির সত্যিকার কল্যাণ সাধন করাই ইসলামী সমাজের উদ্দেশ্য। আর ইসলামী সমাজে মানুষের মর্যাদার মানদণ্ড হচ্ছে তাকওয়া।[7] তাকওয়া মূলক কাজে পরস্পর থেকে অগ্রবর্তী হওয়া পরস্পরের সাহায্য সহানুভূতি থাকা সে সমাজের আর একটি বৈশিষ্ট্য।

ইসলাম ও স্বভাবধর্ম ঃ

ইসলাম মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম - দীনে ফিতরাত। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে যে সহজাত প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, তাই হল 'ফিতরাত'। হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে ঃ

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ

"প্রতিটি শিশুই সহজাত প্রকৃতি তথা ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে।"[২৯](পৃ:-৩৫)

ফিতরাত অর্থ প্রকৃতি, তবিয়ত, স্বাভাবিকতা, স্বকীয়তা ও সহজ-সরল পন্থা। ইসলাম ফিতরাতের ধর্ম এর তাৎপর্য হচ্ছে ইসলাম জীবন-বিধান হিসেবে এমন একটি জীবন-ব্যবস্থা, যা মানুষের জন্মগত স্বভাব, প্রকৃতি ও স্বকীয়তাকে পরিপূর্ণভাবে স্বীকৃতি জানিয়ে মানব কল্যাণে নিজের অস্তিত্বকে গড়ে তুলেছে। মানব সৃষ্টি প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا 'আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের হৃদয় গঠন করেছেন।' (আল-কুরআন, সূরা, আশ্‌শামস, আয়াত-৭)

'হৃদয় গঠন অর্থে কুরআন মাজীদে 'তাসবীয়া' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। 'তাসবীয়া'র শাব্দিক অর্থ হলো কোন জিনিসকে সুনিপুনভাবে গঠন করা। অন্য স্থানে এই কথাকে অন্যভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন– ইরশাদ হচ্ছে-

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

'আমি মানবকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে তৈরি করেছি।' (আল কুরআন, সূরা আত-তীন, আয়াত-৪)

এখানে সর্বাঙ্গ সুন্দর অর্থ প্রকাশের জন্যে 'আহসানি তাক্‌বীম' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'তাক্‌বীমের' অর্থ হলো সোজা করা। যখন কোন জিনিসের ভিতরগত অর্থ ও তার গুণাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে এই শব্দ ব্যবহার করা হয় তখন স্বাভাবিকভাবে তার অর্থ হয় ঐ জিনিসটিকে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যের উপযোগী করে তৈরি করা। কাজেই মানুষকে 'আহসানী তাকবীম' রূপে সৃষ্টি করার অর্থ হলো এই যে, তাকে তার সৃজনের উদ্দেশ্যানুযায়ী সর্বোত্তম রূপ দান করা হয়েছে। এই ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষকে 'তাসবীয়া' করা অথবা 'আহসানি তাকবীমে' সৃষ্টি করার সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন এবং যে দায়িত্ব সম্পাদনের জন্যে তাকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন, তার প্রকৃতিকে ঠিক সেই উদ্দেশ্যে ও সেই দায়িত্ব সম্পাদনের যোগ্যতা সম্পন্ন করে সৃষ্টি করেছেন। ঐ উদ্দেশ্য ও কর্তব্য সম্পাদনের জন্যে যেসব শক্তি ও যোগ্যতার প্রয়োজন ছিল এবং যেসব প্রবণতার সংমিশ্রনে তাকে প্রস্তুত করা উচিত ছিল, তার কোন একটি হতে তাকে বঞ্চিত করা হয়নি এবং ঐ শক্তি ও প্রবণতাগুলো ছাড়া অতিরিক্ত কিছু শক্তি ও প্রবণতা তার মধ্যে সৃজন করা হয়নি।

---

7 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ -"তোমাদের মাঝে সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছে অধিক সম্মানিত যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক মুত্তাকী।" (সূরা হুজুরাত : আয়াত-১৩)

এ ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তি অবশ্য বলবে যে, ইসলাম মানব স্বভাবকে সামান্য অবহেলাও করবে না বরং এই প্রকৃতির ওপরই তার ভিত্তি স্থাপিত হবে। তার শিক্ষাবলী হবে এই প্রকৃতির সংক্ষিপ্ত দাবিসমূহের ব্যাপক বর্ণনা এবং এর অপ্রকাশিত অংশসমূহের ব্যাখ্যা। আল্লাহর কিতাব ও রাসূল (সা:) এর বাণী থেকে জানা যায় যে, বুদ্ধিবৃত্তির এ দাবি মিথ্যা নয়। মূলতঃ এ কথাই সত্য যে, ইসলাম মানব প্রকৃতিতে চুল পরিমাণও অবহেলা করে না। অবশ্য তার ভিত্তি এই প্রকৃতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে–

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ -

"তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে দীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর ফিতরাত তথা প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল দীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।" (আল কুরআন, সূরা আর-রূম, আয়াত-৩০)

এটি এই সত্যেরই সুস্পষ্ট ঘোষণা যে, মানুষকে যে স্বভাবের ভিত্তিতে সৃষ্টি করা হয়েছে তারই ওপর ইসলামের বুনিয়াদ রক্ষিত হয়েছে। অন্যদিকে কুরআন মাজীদ নিজেকে তথা ইসলামকে বিভিন্ন স্থানে 'যিকির' 'তাযকিয়া' ও 'যিকরা' বলে উল্লেখ করেছে। এর শাব্দিক অর্থ হয় স্মারক। কুরআন বা ইসলাম শুধুমাত্র এই অর্থে স্মারক হতে পারে যে, তা এমন কোন জিনিস নয়, যা বাহির থেকে এনে মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে এবং যার সাথে সে মোটেই পরিচিত নয় বরং এটি এমন জিনিস যার ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই মানুষের ভেতরে বিদ্যমান। এটি তার স্বভাবের নীরব ধ্বনি। শব্দের ছাঁচে ঢালাই করে তার সামনে রাখা হয়েছে। সে এই নীরব ধ্বনিটি শুনতে পাচ্ছিল না। নিজের ভেতরের সত্যটি বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ্‌র রহমত পুনরায় সেই বিস্মৃত পাঠ তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। ইসলামের এ মর্যাদার কারণে তাকে অস্বীকার করাকে সে 'কুফর' আখ্যা দিয়ে থাকে। কুফরের শাব্দিক অর্থ হলো গোপন করা। অর্থাৎ ইসলামকে অস্বীকার করা যেন যে স্বভাবের ওপর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে তাকে গোপন করা এবং তার উজ্জ্বল চেহারার উপর সত্য বিরোধীতার কালো পর্দায় ঢেকে দেয়ার নামান্তর। নবী করীম (সা:) বলেন–

- مَا مِنْ مُوْلُوْدٍ يُوْلَدُ اِلاَّ عَلَى الْفطْرَةِ الاِسْلاَمِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ

"ইসলামের স্বভাব ছাড়া অন্য কোন স্বভাবের ভিত্তিতে কোন শিশুকে সৃষ্টি করা হয়নি। কিন্তু (অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই হয় যে,) তার পিতা-মাতা থাকে ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান, বা অগ্নিপূজারীতে পরিণত করে।'(বুখারী)[১৫](পৃ:-১৩)

অর্থাৎ একমাত্র ইসলামের সাথে মানব-স্বভাবের সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য আছে। প্রতিটি শিশু বড় হওয়ার পর ইসলামকে গ্রহণ করতো, যদি এ ব্যাপারে বাহির থেকে কোন হস্তক্ষেপ করা না হতো। কিন্তু সাধারণতঃ এই হস্তক্ষেপ হয়েই থাকে। শিশুকে লালন-পালন করার সময় তার পিতা ছোটবেলা থেকেই তার উপর নিজের ধর্মের রং লেপন করতে থাকে। তাই বয়োপ্রাপ্ত হওয়ার সাথেই সে ইয়াহুদী, খ্রিস্টান, অগ্নিপূজারী বা অন্য কোন ধরনের অমুসলিমে পরিণত হয়। নয়তো কোন শিশুর ওপর যদি এ ধরনের কোন হস্তক্ষেপ না হয়, তার পরিবেশের অস্বাভাবিক শক্তি তাকে কোন এক দিকে টেনে নিয়ে না যায় এবং তার মূল স্বভাবকে তার নিজের জন্মগত অবস্থার উপর স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে ঐগুলোর মধ্যে সে শুধুমাত্র ইসলামকেই অবলম্বন করবে। ধর্ম সমূহের মধ্যে ইসলামের ওপর তার দৃষ্টি পড়লেই সে তার দিকে এমনভাবে দৌড়িয়ে যাবে যেমন কোন শিশু হাজারো মহিলার ভিড়ের মধ্যে একমাত্র নিজের মায়ের দিকে দৌড়িয়ে যায়। পিতা-মাতার শিক্ষা ও পরিবেশের প্রভাব যার ওপর পড়েনি, সে ঐ ধর্মগুলোর মধ্যে নিজের জন্যে কোন আকর্ষণ উপলব্ধি করবে না বরং তার সাথে গভীর ভালবাসা ও প্রাণপ্রিয় সম্পর্ক উপলব্ধি করবে। অর্থাৎ তার প্রকৃতি যদি হয় খাঁটি ইস্পাত তাহলে ইসলাম তার জন্যে ভেজাল ও খাঁটিতে ব্যবধান সৃষ্টিকারী চুম্বক লোহা প্রমাণিত হবে।

এই হাদীস ও যুক্তির আলোকে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলাম মূলতঃ স্বভাবের মুখপাত্র এবং ঐ স্বভাবের ওপরই তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাজেই রাসূলুল্লাহ (সা:) নিজেও একথা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন যে,

فِطْرَةَ اللهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا دِيْنُ اللهِ تَعَالى

'যে স্বভাব-বিশিষ্ট করে আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাহলো এই দীন ইসলাম।'(রূহুল মা'আনী, ২১ খন্ড, পৃ: ৪০) [১৫](পৃ:-১৪)

বস্তুতঃ ফিৎরাতের ধর্ম তথা স্বভাব ধর্মই মানব ধর্ম। আর এ মানব ধর্ম হলো ইসলাম। ইসলামই স্থান-কাল-পাত্র ভেদে সব মানুষের সর্বপ্রকার আবেদন পূরণ করতে সক্ষম। পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে মানুষের ব্যক্তি জীবনের ক্ষুদ্রতিক্ষুদ্র কাজ-কর্মের সহজ সরল ও স্বাভাবিক দিক নির্দেশনা যেমন ইসলাম দিয়েছে, তেমনি এতে আছে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তঃরাষ্ট্রিয় তাবৎ সমস্যাবলীর পথ নির্দেশনা। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হচ্ছে :

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ

"এবং আমি আপনার প্রতি এমন কিতাব অবতীর্ণ করেছি যার মধ্যে প্রতিটি বস্তুর স্পষ্ট বর্ণনা বিদ্যমান।" (আল-কুরআন, সূরা নাহল, আয়াত ৮৯)

এতে এ কথা বোঝা যায় যে, মানব জীবনে যা কিছু প্রয়োজন তার সব কিছুর নীতি-নির্ধারণী বিবরণ আল কুরআনে আছে। অন্যকথায়, মানুষের স্রষ্টা হিসেবে মহান আল্লাহ তাআলা মানুষের স্বভাবজাত প্রকৃতি, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং মনে লুকায়িত কামনা-বাসনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল হওয়ার কারণে তিনি মানব জাতির জন্যে যে জীবন-বিধান নবী রাসূলগণের মাধ্যমে প্রদান করেছেন তা মানব জাতির জন্যে এমন এক স্বভাবসিদ্ধ মধ্যম পন্থা যাতে মানুষের প্রকৃতি, আশা-আকাঙ্ক্ষা বা কামনা-বাসনার পূর্ণ স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে সুনিয়ন্ত্রীতভাবে।

বস্তুতঃ আল্লাহ্ তাআলা মানুষের স্রষ্টা ও পালন কর্তা (রব)। তিনি মানুষকে তাঁর 'রব' গুণের খলীফা করেছেন। খলীফার অর্থ প্রতিভূ। আর আল্লাহ্ তা'আলা যে নিয়মে জীবের সৃষ্টি ও পালন করেন, সেই নিয়মে নিজকে এবং আল্লাহর সৃষ্টি অপর জীবকে পালন করার দায়িত্ব অর্পন করে তিনি মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ রূপে সৃষ্টি করেছেন। তাই স্রষ্টা সৃষ্টিকে (মানুষকে) ইহলৌকিক ও পারলৌকিক যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান, নিয়ম-কানুন সম্বলিত দীনে ফিৎরাত বা স্বভাব ধর্ম দিয়ে পাঠিয়েছেন। যা কিনা ভারসাম্যপূর্ণ এবং মানবিক সামর্থ্যের উপযোগী। আল কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে :-

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"আল্লাহ্ কারো উপর এমন কোন দায়িত্ব অর্পণ করেন না যা তার সাধ্যাতীত।" (আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত-২৮৬)

স্বভাব ধর্মের সুস্পষ্ট দাবি ঃ

ইসলাম স্বাভাবিক শক্তি ও প্রবণতাকে দোষণীয় গণ্য করে না। বরং ইসলামের দৃষ্টিতে দোষণীয় হলো এগুলোকে সুদৃষ্টিতে না দেখা, এগুলোকে গ্রহণ না করা এবং এগুলো বাস্তবায়ন করাকে দীনদারীর বিরোধী মনে করা কিংবা এগুলোর অপব্যবহার করা। যে বিজ্ঞ স্রষ্টা মানুষকে ও তার সমস্ত স্বাভাবিক শক্তিকে সৃজন করেছেন তিনিই তাদেরকে এ জীবন ব্যবস্থা প্রদান করেছেন। তাই তাঁর পক্ষে এর মধ্য থেকে কোন একটি শক্তিকে অর্থহীন ও অপ্রয়োজনীয় গণ্য করা সম্ভব নয়। আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা স্বাভাবিক জীবন ব্যবস্থা হবার কারণে মূলগতভাবে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত স্বাভাবিক শক্তি ও প্রবণতাকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে

মানুষকে রাস্তা দেখিয়ে দেয়া, এগুলোর ভুল ব্যবহারে বাধা প্রদান করা এবং নির্ভুল ব্যবহারের পদ্ধতি শিখিয়ে দেয়া। আর সত্যি বলতে কি এটিই তার সর্বোত্তম গুণ এবং এগুণটিই আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থাকে অন্যান্য জীবন ব্যবস্থা থেকে এবং ইসলামকে অনৈসলাম থেকে আলাদা করে।

স্বাভাবিক জীবন ব্যবস্থা হবার কারণে ইসলাম মানুষের প্রতিটি স্বাভাবিক প্রবণতাকে গুরুত্ব প্রদান করে। তাকে মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখে। তার অস্তিত্ব লাভের পেছনে কোন না কোন উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে। এজন্যে তার সঠিক দাবিসমূহ পূর্ণ করার ব্যাপারকে নিজের শিক্ষাব্যবস্থায় অবশ্য স্থান দান করে। এক্ষেত্রে শুধু সামাজিক প্রবৃত্তিকে যা মানব প্রকৃতির সবচাইতে সুস্পষ্ট ও শক্তিশালী প্রবৃত্তি তাকে সে দোষণীয়, বর্জনীয় গণ্য করবে বা এড়িয়ে যাবে, এর কোন কারণ থাকতে পারে না। বরং ইসলাম নিজের অনুসারীদের জন্যে সমাজ জীবনকে এমন এক অনিবার্য উপকরণ মনে করে যে, মানুষকে এ থেকে পৃথক করার পর এ পৃথিবীতে তার জন্যে সত্যিকার অভিবাদন করার মতো আর কিছুই থাকে না। ইসলাম মনে করে যে পথ ব্যক্তি মানুষকে সাফল্যের দ্বারে পৌঁছায় তা সমাজকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যায়নি বরং এটি একটি সংগঠিত সমাজ জীবনের মধ্যখান থেকে বের হয়ে অগ্রসর হয়েছে। তাই এ পথের প্রকৃতি নির্ধারণ করতে গিয়ে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ..... وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا -

"হে ঈমানদারগণ! ..... তোমরা সম্মিলিতভাবে আল্লাহর রজ্জুকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে থেক না।" (আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১০২-১০৩)

বিচ্ছিন্ন হয়ে থেকো না অর্থাৎ 'পরস্পরে সম্পৃক্ত ও সম্পর্কযুক্ত হয়ে থেকো। এই 'বিচ্ছিন্ন হয়ে না থাকা ও পরস্পরে মিলে থাকা কোন্ ধরনের ও কোন্ স্তরের হওয়া উচিত, এর ব্যাখ্যার জন্যে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর বাণীর দিকে লক্ষ্য করা যাক। তিনি বলেন ঃ

- عَلَيْكُمْ بِالْجَمْعَةِ وَاِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةِ-

"তোমাদের জন্যে সংঘবদ্ধতা আবশ্যক, আর ভিন্ন ভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হওয়া থেকে বিরত থাক।"(তিরমিযী শরীফ, ২য় খন্ড, পৃ:- ৪১) [১৫](পৃ:-২২)

অন্য হাদীসে আসছে

- اَمَرَكُمْ بِخَمْسٍ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ-

"আমি তোমাদেরকে পাঁচটি কাজের নির্দেশ দিচ্ছি: ১. সংঘবদ্ধ জীবন যাপন, ২. শ্রবণ (অর্থাৎ উর্ধ্বতনের ন্যায় নির্দেশ শ্রবণ করা), ৩. আনুগত্য স্বীকার (অর্থাৎ তার নির্দেশ মেনে চলা), ৪. হিজরত করা, ৫. আল্লাহর পথে জিহাদ করা।" (আহমদ ও তিরমিযী, মিশকাত, পৃ: ৩২১) [১৫](পৃ:-২২)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) রাসূলুল্লাহ (সা:) থেকে বর্ণনা করেছেন-

لايَحِلُّ لِثَلاَثَةٍ يَكُوْنُوْنَ بِفُلاَةٍ مِنَ الاَرْضِ اِلاَّ امَّرُوْا عَلَيْهِمْ اَحَدَهُمْ-

"কোন জন্যশূন্য এলাকায় তিন ব্যক্তি নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে আমীর হিসেবে গ্রহণ ব্যতিরেকে অবস্থান বৈধ নয়।' (মুনতাকা : পৃ: ৩৩০) [১৫](পৃ:-২৬)

হযরত আবু সাইদ খুদরী (রা:) রাসূলুল্লাহ (সা:) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ

اِذَا خَرَجَ ثَلَثَةٌ فِىْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا اَحَدَهُمْ

"তোমাদের মধ্য থেকে তিনজনও যখন কোন সফরে বের হয়, তখন একজনকে নিজেদের আমীর হিসেবে গ্রহণ করো।" (আবু দাউদ ১ম খন্ড, পৃ: ৩৫১) [১৫](পৃ:-২৬)

হযরত আবু সালাব খাশানী (রা:) বলেন, সফরকালে কোথাও শিবির স্থাপন করলে এদিক ওদিক বিক্ষিপ্ত হয়ে নিজেদের পছন্দমতো স্থান বেছে নেয়া লোকদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা:) একবার এ পরিস্থিতি লক্ষ্য করে সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন :

انْ تَفَرَّقُكُمْ هذه الشِّعَاب وَالاَوْدِيَة انَّهَا ذَالِكُمْ مِنَ الشَّيْطَان

"শুধুমাত্র শয়তানের কারণে তোমরা এভাবে বিচ্ছিন্ন উপত্যকায় ও ময়দানে বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছ।" (আবু দাউদ ১ম খন্ড, পৃ: ৩৫৪) [১৫](পৃ:-২৬)

উপরোক্ত হাদীসগুলো থেকে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী জীবনের সমস্ত দাবি শুধু খিলাফতের বিধান সমূহ বাস্তবায়ন করার পর শেষ হয়ে যায় না বরং এই পরিমণ্ডলের বাইরের সাধারণ জীবনকেও নিজের অন্তর্ভুক্ত করে। এর অর্থ হলো এই যে, ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ জীবনের গুরুত্ব শুধু বেশিই নয়, বরং ব্যাপক এবং সার্বজনীন। এমনকি মানুষের কোন সাধারণ বসতিও এর প্রভাবমুক্ত নয়। আল্লামা শওকানী (রহ.) এ হাদীসগুলোর ব্যাখ্যায় লিখেছেন– "এ হাদীসগুলো এ কথাই প্রমাণ করে যে, তিন জনের বেশি মুসলমান কোথাও অবস্থান করলে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী তাদেরকে নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে আমীর নির্বাচন করতে হবে। কেননা এভাবেই পারস্পারিক মতপার্থক্য থেকে সংরক্ষিত থাকা সম্ভব। ...যদি তিন ব্যক্তি বনের মধ্যে অবস্থান করে অথবা একসাথে সফর করে এবং তাদের জন্য এই নির্দেশ দেয়া হয়, তাহলে যেখানে বিপুল সংখ্যক মুসলমান কোন গ্রাম বা শহরে এক সাথে অবস্থান করে সেখানে তাদের জন্যে অবশ্য এ নির্দেশ কার্যকরী হবে।" (নাইলুল আওতার, ৯ম খন্ড, ১৫৭ পৃ:)[১৫](পৃ:-২৮)

পরিশেষে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ফিৎরাতের ধর্ম তথা স্বভাব ধর্মই মানব ধর্ম আর এ মানব ধর্ম হলো ইসলাম। আর ইসলামের দাবি সমষ্টিবাদ বা সমাজবদ্ধ জীবন। ইসলামের নবী (সা:) বিষয়টি সহজ উপমা দিয়ে আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন–

عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَانَّهَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةِ

"দলবদ্ধতাকে আঁকড়ে ধর, কেননা নেকড়ে বাঘ সেই ছাগলটিকে খেয়ে ফেলে যে দলছাড়া হয়ে দূরে চলে যায়।" (আবু দাউদ)[১৫](পৃ:-৩৯)

অন্যত্র ইরশাদ করেন

الشَّيْطَانُ ذِئْبُ الْاِنسَانِ كَذِئْبِ الْغَنَمِ يَأْخُذُ الشَّاذَةَ وَالْقَاصِيَةَ وَالنَّاصِيَةُ

"ছাগলের জন্যে যেমন নেকড়ে বাঘ হয় তেমনি শয়তান মানুষের জন্যে নেকড়ে বাঘ। এই নেকড়ে বাঘ সেই ছাগলটিকে ধরে যে দলছাড়া হয় ও দূরে চলে যায় অথবা বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন দিকে চলে যায়।" (মুসনাদে আহমদ)[১৫](পৃ:-৩৯,৪০)

অন্য হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে

عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَاِيَّاكُمْ وَالْفِرْقَةِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الاِثْنَيْنِ اَبْعَدُ-

"দলবদ্ধতাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো এবং দল ভাঙ্গার নিকটবর্তীও হইও না। কেননা শয়তান একক ব্যক্তির সঙ্গী হয় আর দুই ব্যক্তি থেকে দূরে সরে যায়।" (তিরমিযী, ২য় খন্ড, কিতাবুল ফিতান) [১৫](পৃ:-৪০)

অর্থাৎ দলের সাথে নিজেকে এজন্যে আঁকড়ে রাখতে হবে যে, শুধু এভাবেই ঈমানী জিন্দেগীর যথাযথ সংরক্ষণ সম্ভবপর। এই দলবদ্ধতার অবর্তমানে মুসলমানদের দীন ও ঈমানের নিরাপত্তা অসম্ভব। কেননা দল

থেকে ভিন্ন হলেই সে শয়তানের কর্তৃত্বাধীন এলাকায় চলে যায়। সেখানে শয়তান তাকে অতি সহজেই শিকার করতে পারে। বিপরীত পক্ষে জাতীয় সমাজ এমন একটি লৌহনির্মিত আশ্রয়স্থল, যার মধ্যে প্রবেশ করে কোন ঈমানদারকে শিকার করা শয়তানের পক্ষে চাট্টিখানি কথা নয়।

সমাজ জীবনের অমূল্য অবদান ঃ

সমাজ মূলত একটি সংগঠন। সমাজ বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত। পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে বসবাস করতে গিয়ে যে সংগঠনের আচরণ বিধি সকলে মেনে চলে বা মেনে চলবে বলে একমত পোষণ করে তাই সমাজ। বলা যায় পারস্পরিক নিবিড় সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে যখন একাধিক ব্যক্তি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় বসবাস করে তখন তাকে সমাজ বলে। সমাজ মানুষের প্রাথমিক সংগঠন। মানব সভ্যতার প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ সমাজবদ্ধ জীব।

সমাজ জীবনের অমূল্য অবদান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে হলে সমাজের বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। সমাজের প্রকৃতি ও বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানীর প্রদত্ত মতামতের প্রতি আলোকপাত করলে এর কতকগুলো স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, যা অপরাপর সংস্থা হতে সমাজকে পৃথক সত্ত্বা দান করেছে। নিচে এর প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো ঃ

১. বিমূর্ত প্রকৃতি (Abstract in Nature) ঃ সমাজের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এর বিমূর্ততা। সমাজ সম্পর্কে মানুষ যতই আলোচনা-পর্যালোচনা, তর্ক-বিতর্ক করুক না কেন বাস্তবে এর কোন বাহ্যিক অবয়ব নেই। সমাজকে দেখা যায় না বা স্পর্শ করা যায় না। কিন্তু এর অস্তিত্ব সর্বত্র বিরাজমান, অর্থাৎ সমাজ হল একটি বিমূর্ত ধারণা যা সামাজিক সম্পর্কের ব্যবস্থাকে বুঝায়। এ প্রসঙ্গে রিটার (F. B. Reuter) তার Hand Book of Sociology বইতে লিখেছেন– Just as life in not a thing but a process of living, so society is not a thing but a process of associating."[১৪ (পৃঃ-৪)]

২. সংঘবদ্ধতা ঃ সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সংঘবদ্ধ জীবন-যাপন। সমাজের সদস্যরা পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে একাত্মতা প্রকাশ করে। বিভিন্ন মানবিক প্রয়োজন পূরণে তারা সমাজের অপরাপর সদস্যদের উপর নির্ভরশীল থাকে। এ নির্ভরশীলতা থেকেই সৃষ্টি হয় সংঘবদ্ধতা।

৩. পারস্পরিক সচেতনতা (Mutual Consciousness) ঃ মানুষের সামাজিক সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো সমাজবদ্ধ মানুষের পারস্পরিক সচেতনতা। সমাজের সদস্যদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক সৃষ্টির স্বার্থে সদস্যদেরকে একে অপরের প্রতি সচেতন হতে হয়। এই সচতেনতা না থাকলে সামাজিক সম্পর্ক তথা সমাজ গড়ে উঠতে পারে না। কেননা প্রাণহীন বস্তুর মধ্যে এই সচেতনতা থাকে না বলে তাদের মধ্যে সমাজ গড়ে উঠে না।

৪. সমরূপতা (Likeness) ঃ সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো সমরূপতা, এটি একই সাথে সমাজ গড়ে উঠার একটি পূর্বশর্তও বটে। একই মানসিকতা সম্পন্ন মানুষের সমন্বয়ে সমাজ গড়ে উঠে। গিডিংস বলেন– Society is a number of liked minded individuals who know and enjoy their like mindedness." [১৪ (পৃঃ-৫)] আদিম সমাজের জাতি সম্পর্কে (kinship) সমরূপতা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। সাম্প্রতিককালের বিশ্ব নাগরিকত্বের ধারণাকেও ভাবিকালের সমাজের সমরূপতার ভিত্তি বলে গণ্য করা যেতে পারে। বস্তুত, বন্ধুত্ব, আন্তরিক সম্পর্ক ও এ ধরনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সমরূপতার ভিত্তিতেই গড়ে উঠে। সমরূপতার অপর নাম সমঝোতা বা অভিন্ন উপলব্ধি।

৫. অভিন্ন উদ্দেশ্য (Similar Aim) ঃ সুনির্দিষ্ট ও অভিন্ন উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে সমাজ। এই উদ্দেশ্যের ভিত্তিতেই বিভিন্ন সমাজের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আবার এই উদ্দেশ্যের পিছনে কোন না কোন স্বার্থ বিদ্যমান থাকে। অভিন্ন স্বার্থ মানুষকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। যেমন বিপদকালে মানুষ অপরের সহযোগিতা প্রত্যাশা করে, অর্থাৎ মানুষ নিরাপত্তা চায়। তাই সমাজ সৃষ্টির পিছনে অভিন্ন উদ্দেশ্য ও স্বার্থের সংশ্লিষ্টতা থাকতে হবে।

৬. পারস্পরিক সহযোগিতা (Mutual co-operation) ঃ পারস্পরিক সহযোগিতা সমাজের ভিত্তি স্বরূপ। সৃষ্টির শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সমাজের বিকাশ ও অগ্রগতির পিছনে মূল ভূমিকা পালন করেছে পারস্পরিক সহযোগিতা। পারস্পরিক সহযোগিতা ব্যতীত সমাজের টিকে থাকা সম্ভব নয়। সমাজের সদস্যদের সহযোগিতা ও সৃজনশীলতার মাধ্যমে সমাজ তথা সভ্যতার অগ্রগতি সাধিত হয় বলে একে অন্যতম প্রভাবশালী উপাদান বলে বিবেচনা করা হয়।

৭. পারস্পরিক নির্ভরশীলতা (Mutual Inter-dependence) ঃ সমাজের কোন মানুষই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। সমাজে বেঁচে থাকার তাগিদে মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের জন্যে মানুষ অপরের উপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতাই সমাজ জীবনের মূলমন্ত্র। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, যৌন চাহিদা, চিত্তবিনোদন, স্নেহ, ভালবাসা ইত্যাদি সকল প্রকার প্রয়োজন পূরণে মানুষ অপরের উপর নির্ভরশীল।

৮. সামাজিক গতিশীলতা (Social mobility) ঃ গতিশীলতা সমাজ জীবনের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। গতিই সমাজ জীবনের প্রাণবায়ু। সৃষ্টির শুরু থেকে এ পর্যন্ত সমাজ কোথাও থেমে থাকে নি বরং যুগের চাহিদা ও প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এগিয়ে চলেছে।

৯. সামাজিক স্থায়িত্ব (Social Stability) ঃ সমাজ একটি স্থায়ী সংগঠন। সমাজ কখনও বিলিন হয়ে যায় না বা কাঠামোগতভাবে পরিবর্তীত হয় না। সমাজ সময়ের প্রেক্ষিতে মূল কাঠামোকে অক্ষুন্ন রেখে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার পরিবর্তন সাধনের মাধমে এগিয়ে যায়।

১০. নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন (Countrolled Life style) ঃ সমাজের মধ্যেই মানুষ নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনের সুযোগ পায়। সমাজ কতগুলো রীতি-নীতি, প্রথা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সভ্যদের আচরণ বঞ্চিত আচরনে প্রবর্তিত করে। ফলে কোন সদস্যই নিজের ইচ্ছামত আচরণ করতে পারে না। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই তাকে জীবনযাপন করতে হয়। সুতরাং বলা যায়, সমাজ নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনের অন্যতম নিয়ামক।

১১. সামাজিক মূল্যবোধ (Social Values) ঃ প্রতিটি সমাজের স্বতন্ত্র্য মূল্যবোধ রয়েছে যার আলোকে সমাজ নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। সমাজের সদস্যদের আদর্শ, রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহার মূলবোধের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। তবে এই মূল্যবোধ স্থায়ী বা অনড় কিছু নয়। সময় ও অবস্থার প্রেক্ষিতে তা পরিবর্তিত হতে পারে।

১২. স্বতন্ত্র্য সংস্কৃতি (Individual Cuture) ঃ প্রতিটি সমাজেরই স্বতন্ত্র্য সংস্কৃতি বিদ্যমান। সংস্কৃতির ভিত্তিতেই একটা সমাজ হতে অন্য সমাজের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের চাল-চলন, আচার ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, সামাজিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির সংগঠিত রূপ। তাই বলা যায় সংস্কৃতিই সমাজকে স্বতন্ত্রতা দান করে।

১৩. সমাজ বিশ্বজনীন (Universality) ঃ সমাজের ব্যাপকতা বিশ্বব্যাপী। মানব সমাজের বহু মানবিক সংস্থা ও সংগঠন রয়েছে কিন্তু কোনটিই সমাজের মত সর্বজনীন স্বীকৃতি পায়নি। মানুষের মধ্যে বৈচিত্র্য ও

বৈশাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও মানুষ সমাজবদ্ধভাবে বাস করে। পৃথিবীর অন্য কোন সংস্থার ক্ষেত্রে এরূপ পরিলক্ষিত হয না। এ প্রসঙ্গে জিনসবার্গ (Moris Ginsberg) মন্তব্য করেছেন– A society is universal and pervasive and has no defined boundry or assignable limits" [১৪] (পৃ:-৫)

বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী পপেনোর মতে "কোন বিশেষ সময়ে এবং স্থানে সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠী হচ্ছে সমাজ।"[১৬] (পৃ:-৩৮) তিনি সমাজের পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন।

১. সমাজের সীমার মধ্যে প্রায় সমস্ত সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া ঘটে থাকে।
২. সমাজের প্রয়োজন মেটানোর জন্যে অর্থনীতিক এবং অন্যান্য সম্পদ কিভাবে সংগ্রহ এবং বিতরন করা হবে তার নিয়ম এবং কৌশল সমাজ প্রতিষ্ঠা করে।
৩. সিদ্ধান্তগ্রহণ এবং দ্বন্দ্ব নিরসনের চূড়ান্তকর্তৃত্ব সমাজের উপর ন্যাস্ত থাকে।
৪. সমাজ হচ্ছে সাধারণতঃ এমন একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান যার প্রতি সদস্যরা অনুগত এবং তাকে রক্ষা করার জন্যে প্রস্তুত থাকে।
৫. সমাজের সদস্যরা বিশেষ এবং দৃষ্টান্তহীন সংস্কৃতির অধিকারী।

প্রখ্যাত নৃবিজ্ঞানী– Hoeble, E. Adamson এবং Thomas Weaver[১৬] (পৃ:-৩৮,৩৯) কিছুটা ভিন্নভাবে সমাজের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন–

১. ভৌগলিকভাবে নির্দেশযোগ্য জনগোষ্ঠী।
২. এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিরাজ করে লক্ষ্যকেন্দ্রিক মিথষ্ক্রিয়াজাত সম্পর্কের জাল।
৩. জনগোষ্ঠীর মধ্যে মিথষ্ক্রিয়া সাংস্কৃতিকভাবে বিন্যাস্ত এবং সীমাবদ্ধ।
৪. এই জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি অন্য সংস্কৃতি থেকে ভিন্ন।
৫. সাধারণ প্রতীক ব্যবস্থা জনগোষ্ঠীর মধ্যে আবেগগত বন্ধন সৃষ্টি করে।

কোঁত যিনি বিজ্ঞানের ইতিহাসের তন্নিষ্ঠ পাঠক ছিলেন, তাঁর কাছে প্রকৃতির সবচেয়ে বিস্ময়কর দৃশ্য ছিল অজস্র স্বতন্ত্র সত্ত্বা বিশিষ্ট মানুষের নিয়মিত এবং অপরিবর্তনীয় একত্রী ভবন, যার নাম সমাজ।[১৬] (পৃ:-৪৪) তার দৃষ্টিতে সমাজ হচ্ছে বিশাল এবং বিস্তৃত সহযোগিতা যার একটি প্রধান ভিত্তি হচ্ছে শ্রম বিভাজন বা কর্মনিয়োগ। সমাজ গড়ে ওঠে ব্যক্তি এবং পরিবারকে কেন্দ্র করে। কিন্তু সমাজের বিজ্ঞানভিত্তিক সংজ্ঞা দিতে গিয়ে কোঁত সমস্ত মানব প্রজাতি এবং বিশেষ করে সমগ্র শ্বেত নর গোষ্ঠীকে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ সমাজ একটি বিকাশমান বা ঐতিহাসিক প্রত্যয়।

কোঁতের উত্তরসূরী এমিল দুর্কিম[১৬] (পৃ:-৪৫) সমাজকে চিহ্নিত করেছেন দু'ভাবে। প্রথমতঃ সমাজ বলতে বোঝায় কমবেশী সংগঠিত বিশ্বাস এবং আবেগের সমগ্রতা যা একটি গোষ্ঠীর সদস্যদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয়তঃ সমাজ হচ্ছে একটি ব্যবস্থা যার মধ্যে বিভিন্ন এবং বিশেষ কর্মিকতা নির্দিষ্ট সম্পর্কসূত্রে গ্রথিত হয়।

সমাজের যে সব বৈশিষ্ট্যের কথা উপরে নির্দেশ করা হয়েছে সেগুলোর পর্যালোচনায় প্রমাণিত, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ও এর বিকাশ সাধনে সমাজের অবদান অনস্বিকার্য। একইভাবে অসামাজিক জীবন মুসলমানের দীন ও ঈমানের বিরাট আপদ সৃষ্টি করে এবং মুসলমানকে শয়তানের সহজ শিকারে পরিণত করে। উপরন্তু সমাজবদ্ধ জীবন তাদেরকে আশার বাণী শোনায়। রাসূল (সা:)-এর বাণী يَدُ اللهَ عَلى الجماعة "দলের ওপর আল্লাহর হাত তথা সাহায্য থাকে।'[১৫] (পৃ:-৪৭) অর্থাৎ সমাজবদ্ধ জীবনেই মুসলমান সত্যিকারভাবে আল্লাহ্‌র দান ও সাহায্য লাভ করার অধিকারী হয়। সমাজবদ্ধ জবিনের মাধ্যমেই মুসলমান তার রবের আনুগত্য ও দাসত্বের হক আদায় করতে সক্ষম হয়। আল্লাহ্ তা'আলাও তাঁর বান্দার নিকট থেকে শুধুমাত্র তাঁর আনুগত্য ও দাসত্বের হক আদায় করতে চান। এটিই তাঁর দাবি এবং এর মধ্যেই তাঁর সন্তুষ্টি নিহিত। কাজেই প্রমাণিত

হলো যে, সঠিক সমাজ জীবনেই দীন ও ঈমানের পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব এবং মুসলমানের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ এরই মধ্যে সংরক্ষিত।

বৈরাগী মহাত্মাদের সমস্যা ঃ

বর্তমান দুনিয়ায় দীন সম্পর্কে তিন প্রকার ধারণা বিদ্যমান আছে– এক হচ্ছে এই যে, এ পৃথিবী মানুষের জন্যে প্রকৃতই একটি বন্দীশালা। তার শরীর তার আত্মার জন্যে একটি খাঁচার ন্যায়। তার মধ্যে যেসব বস্তুসুলভ কামনা-বাসনা পাওয়া যায়, সেসব এ খাঁচারই বন্দী পাখী। মানুষ মুক্তিলাভ তখনই করতে পারে যখন সে এ বন্দীশালার প্রাচীর নিজ হাতে ভেঙ্গে ফেলবে এবং তার আত্মাকে মুক্ত করবে। অর্থাৎ তাকে দুনিয়া পরিহার করতে হবে, লোকালয় থেকে দূরে সরে যেতে হবে এবং কোন নিভৃত স্থানে গিয়ে খোদার সঙ্গে সংযোগ সম্পর্ক রেখে বসে যেতে হবে। আপন কামনা-বাসনা দলিত-মথিত করে তা শেষ করে দেবে। শুধুমাত্র এ অবস্থাতেই তার আত্মার উপর থেকে সে আবরণ উন্মোচন হতে পারে যা খোদার জ্যেতি দর্শনে এবং তাঁর সত্তা পর্যন্ত পৌঁছতে তাকে বিরত রাখে। এ জন্যে মানুষের উচিত সাধনার দ্বারা এ মায়াজাল ছিন্ন করে মুক্ত হওয়া। দ্বীন এবং খোদা পুরস্তির এ এক দৃষ্টিভঙ্গী যাকে বলা হয় 'রাহবানিয়াত' বা বৈরাগ্যবাদ।

দ্বিতীয় ধারণা এই যে, দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং স্বাভাবিক পবৃত্তিকে হত্যা করার প্রয়োজন নেই। বরং দুনিয়ার মধ্যে থেকেই ন্যায়সঙ্গত সীমারেখার ভেতরে নিজের কামনা-বাসনা পূরণ করে খোদার ইবাদাত করা উচিত। বাকী জীবনে সে স্বাধীন। কারণ ইবাদাত ব্যক্তির কাজ; সমাজের নয়। এ জন্যে দ্বীন মানুষ এবং খোদার মধ্যে একটা ব্যক্তিগত (Private) ব্যাপার। তা দুনিয়ার সাধারণ সমস্যাবলী ও কায়কারবারের সাথে কোন সম্পর্ক রাখে না, রাখা উচিতও নয়। এসব পার্থিব ও সামাজিক ব্যাপারে মানুষের এ এখতিয়ার আছে যে, সে খুশীমতো যে কোন পথ বেছে নেবে। জীবনের জন্যে যে বিধান খুশী, তা মেনে নেবে। খোদা এবং মাযহাবের তাতে কোন মাথা ব্যথা নেই।

তৃতীয় ধারণা এই যে, দুনিয়া পরিত্যাগ করার এবং প্রবৃত্তিকে হত্যা করা ও ভুল এবং বন্দেগীকে শুধু ব্যক্তির কাজ ও দ্বীনকে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের ব্যাপার মনে করাও ভুল। সত্য কথা এই যে, মসজিদ হোক অথবা বসবাসের ঘর হোক, ক্ষেত খামার হোক অথবা হাট-বাজার হোক, আর অর্থনৈতিক ক্ষেত্র হোক অথবা রাজনৈতিক ক্ষেত্র এ সমস্ত ক্ষেত্রেই দ্বীনের অবশ্য পালনীয় বিষয়সমূহ (ফারায়েয) এবং দাসত্ব আনুগত্যের দায়িত্ব মানুষকে পালন করতেই হবে। এর কোন একটি ক্ষেত্র থেকে যেমন মানুষ পালায়ন করতে পারে না, তেমনি খেয়াল-খুশী মতোও কিছুই করতে পারে না। এভাবে তাকে যত প্রকারের শক্তি সামর্থ দেয়া হয়েছে, তা সবই ঐ বন্দেগীর কাজের জন্যেই দেয়া হয়েছে। সে জন্যে এসব শক্তির কোন একটিকেও না খর্ব করা যায়, আর না স্বাধীন ছেড়ে দেয়া যায়। সঠিক দ্বীনদারি এবং খোদা পুরস্তি হচ্ছে এই যে, মানুষ তার সমগ্র জীবন ব্যক্তিগত থেকে শুরু করে সামাজিক পর্যন্ত আল্লাহর আদেশের অধীনে যাপন করবে। সে মসজিদে যদি তাঁর ইবাদত করে তো মসজিদের বাইরেও তাকে সেসব কিছুই করতে হবে, যা তিনি করতে আদেশ করেছেন। এভাবে তার পার্থিব জীবনের বিধান পুরোপুরিভাবে তাই হবে যা তার প্রভু পছন্দ করেন।

ইসলামে আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা শুধু একটা বঞ্চিত সত্তার ধারণাই নয়। বরং তার সাথে সাথে তিনি মানুষের শাসক এবং সত্যিকার আইন রচনাকারীও বটে। অতএব মানুষের জন্যে তাঁর কিছু আদেশ নিষেধ ও আইন-কানুন আছে যা মেনে চলা তার উচিত। এ জন্যে মানুষের কাজ শুধু এ নয় যে, সে সংসার ত্যাগ করে শুধু আল্লাহর চিন্তা ও ধ্যানে মশগুল থাকবে। বরং তার কাজ হলো, সে সংসার ক্ষেত্রে প্রবেশ করবে এবং তার প্রভুর নির্দেশাবলী পালন করে একজন অনুগত বান্দা হওয়ার প্রমাণ দিবে।

যে কয়টি স্তম্ভের উপর ইসলামের প্রাসাদ নির্মিত হয়েছে, তার মধ্যে অধিকাংশ নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত- এসব সঠিকভাবে আদায় করার জন্যে কোন না কোন ভাবে সমাজবদ্ধতার প্রয়োজন। বলা বাহুল্য,

একাকী নিভৃতস্থানে বাস করলে সমাজবদ্ধতার কোন সুযোগ থাকে না। কাজেই যেখানে ইসলামের ব্যবহারিক বুনিয়াদগুলো সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয় না, সেখানে গোটা ইসলামের প্রাসাদ কিভাবে নির্মিত হতে পারে?

ইসলামের এ স্তম্ভগুলো ইবাদত হওয়া সত্ত্বেও দ্বীনের বহু সামাজিক মূল্যবোধ ও মিল্লাতের বহু তাৎপর্য এর মধ্যে নিহিত। আর এসব আদায়ের ব্যাপারেও তাগিদ রয়েছে, কেননা ইসলামের এসব ব্যবহারিক বুনিয়াদসমূহের দ্বারা দ্বীন ও খোদাভীরুতার যে মেজাজ-প্রকৃতি প্রকাশ পায়, তা নিভৃত-বাস ও প্রবৃত্তি হত্যার রীতি পদ্ধতির সাথে কিছুতেই খাপ খায় না।

তাছাড়া জীবনের সামাজিক পরিবেশ থেকে পালায়ন করে নিজে নিজে এ নামায রোযা যদি করা হয়, তাহলে এসব ইবাদতের দ্বারা শরীয়ত যে সব উপকারিতা ও তাৎপর্য লাভ করতে চায়, তা কিছুতেই লাভ করা যেতে পারে না। এমতাবস্থায় এ বিশেষ ইবাদতগুলোর দিক দিয়েও যাকে সত্যিকারভাবে খোদা পুরস্তি বলা হয়, তার সঠিক হক আদায় করা যেতে পারে না।

এ পাঁচটি বুনিয়াদি ইবাদত (নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, কালিমা) এগুলোকে ইসলামের স্তম্ভ বলা হয়েছে, গোটা ইসলাম বলা হয়নি। তার পরিষ্কার অর্থ এই যে, ইসলাম শুধুমাত্র এ পাঁচটি বুনিয়াদের নাম নয়; বরং তা ছাড়া আরও কিছু আছে যা তার মধ্যে অবশ্যম্ভাবীরূপে সন্নিবেশিত। স্তম্ভের অসাধারণ গুরুত্ব ও বিশিষ্ট স্থান অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু তাই বলে শুধু স্তম্ভ অথবা দেয়ালকে কখনো অট্টালিকা বলা হয় না। এজন্যে যদি একথা স্বীকারও করে নেয়া হয় যে, ইসলামের বুনিয়াদী আমলগুলো নিভৃত সাধনায় হতে পারে, তবুও এর দ্বারা ইসলামকে পুরোপুরি মেনে চলা হলো একথা বলা যায় না। ইসলামের আকিদামূলক এবং ব্যহারিক বুনিয়াদ সমূহের মধ্যে যেসব তত্ত্ব লুকায়িত আছে, তা একথাই ঘোষণা করে যে, বৈরাগ্যবাদের সাথে ইসলামের এবং ইসলামের সাথে বৈরাগ্যবাদের কোনই সম্পর্ক নেই। হযরত নবী করীম (সা:) বলেন–

لَارَهْبَانِيَّةَ فِىْ الاِسْلَامِ

"ইসলামে বৈরাগ্যবাদের কোন স্থান নেই।"[১৭] (পৃ:-১২১)

হযরত ওসমান বিন মাযউন (রা.) যখন খাশী হওয়ার অনুমতি চাইলেন তখন নবী করীম (সা:) তা অস্বীকার করে বললেন ঃ

اِنَّ اللهَ اَبْدَلَنَا بِالرَّهْبَانِيَّةِ الْحَنَفِيَّةَ السَّمْحَةَ

"আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বৈরাগ্যবাদের পরিবর্তে ইব্রাহীম (আ:)-এর সহজ এবং খাঁটি দ্বীন দিয়েছেন।" (তিবরানী) [১৭] (পৃ:-১২১)

খৃষ্টান সম্প্রদায় বৈরাগ্যবাদকে 'দ্বীন' এবং খোদা পুরস্তির চরম হিসেবে গ্রহণ করলে তার প্রতিবাদে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَرَهْبَانِيَّةَنِ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَهَا عَلَيْهِمْ -

"তারা বৈরাগ্যবাদের মনগড়া পথ অবলম্বন করেছে। তাদেরকে আমি এর হুকুম দেইনি।" (আল-কুরআন, সূরা আল হাদীদ, আয়াত-২৭)

জানা গেল যে, শুধুমাত্র ইসলামেই নয় বরং খোদা প্রেরিত কোন শরীয়তেই বৈরাগ্যবাদের শিক্ষা দেয়া হয়নি। যারা খোদা পুরস্তির জন্যে এ পন্থা অবলম্বন করেছে, তারা সম্পূর্ণরূপে নিজের কল্পনা থেকেই এ পথ আবিষ্কার করেছে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দ্বীনের মেজায-প্রকৃতি কখনো বৈরাগ্যবাদ দর্শনের অনুরূপ ছিল না।

দ্বীনের মেজায-প্রকৃতি যেমন বৈরাগ্যবাদ সহ্য করতে পারে না এবং তার বুনিয়াদী আকায়েদ ও আমলসমূহ যেমন বৈরাগ্যবাদের বিরোধীতায় সোচ্চার, তেমনি তার বিশদ শিক্ষা-দীক্ষার বেলায়ও তাই। বস্তুত নবী (সা:) বৈরাগ্যবাদের প্রত্যেকটি কর্মপদ্ধতি নিষিদ্ধ করেছেন। যেমন বিবাহ থেকে দূরে থাকা, সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা নষ্ট করা, সর্বদা অবিরাম রোযা রাখা, রোযার সময় রাতেও কিছু না খাওয়া, কথা বলার শক্তি রহিত করা, এমনভাবে রাত্রি জাগরণ করা যার দ্বারা দেহকে বিশ্রাম থেকে বঞ্চিত করা হয় ও পরিবার পরিজনের হক আদায় না করা ইত্যাদি।

সারকথা হলো এই যে, ঈমান ও ইসলামের আসল স্বদেশ হলো সমাজ জীবন। সমাজ জীবনেই তারা ইচ্ছামতো বিস্তার লাভ করতে পারে এবং নানান ফুল ফলে সুশোভিত হতে পারে। কিন্তু যখন তাদের এ 'স্বদেশ' তাদেরকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে দেয় না, তখন বাধ্য হয়ে তারা 'অন্যের দেশে' আশ্রয় গ্রহণ করে এবং গোপন কোণে গিয়ে মুসাফিরের ন্যায় সাদা-মাটা জীবন যাপন করা ছাড়া তাদের গত্যন্তর থাকে না। যেমনটা আমরা কুরআন মাজীদে বর্ণিত আসহাবে কাহফের ঘটনায় লক্ষ্য করি। সুনির্ধারিত কিছু কারণের প্রেক্ষিতে তারা নির্জনবাসে বাধ্য হয়েছিলেন। প্রথমতঃ তারা সংখ্যায় মাত্র কয়কজন ছিলেন এবং তাদের পুরো জাতি ছিল মুশরিক। দ্বিতীয়তঃ জাতির সামনে তারা প্রকাশ্যে নিজেদের ঈমানের কথা প্রকাশ করেন, জাতিকে তাওহীদের দিকে আহ্বান জানান ঃ

إِذَا قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ-

"যখন তারা উঠে দাঁদিয়েছিল, তখন তারা বলল আমাদের প্রভু তিনিই যিনি আকাশ সমূহ ও পৃথিবীর অধিপতি।" (আল-কুরআন, সূরা আল কাহাফ, আয়াত-১৪)

তাঁরা কেবল জাতিকে আহ্বান জানাননি বরং চূড়ান্তভাবে আহ্বান জানান এবং বিতর্কে তাদেরকে লা জওয়াব করে দেন ঃ

هُؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ-

"এরা আমাদেরই স্ব-জাতি, এরা তাঁর পরিবর্তে অনেক উপাস্য গ্রহণ করেছে। তারা এদের সম্পর্কে প্রকাশ্য প্রমাণ উপস্থিত করে না কেন?" (আল-কুরআন, সূরা আল কাহাফ, আয়াত-১৫)

তৃতীয়তঃ পর্বতগুহাকে তাঁরা নিজেদের আবাসস্থল নয় বরং আশ্রয়স্থল হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। যেখানে তারা এমন অবস্থায় আশ্রয় নেন যখন তাদের জাতি তাঁদেরকে বরদাশত করতে অস্বীকার করে এবং জনপদে বাস করার জন্যে তাঁদেরকে নিজেদের আত্মা ও ঈমান বিসর্জন দেয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল ঃ

إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ

"তারা যদি তোমাদের খবর জানতে পারে, তবে পাথর মেরে তোমাদেরকে হত্যা করবে, অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নেবে।" (আল-কুরআন, সূরা আল কাহাফ, আয়াত-২০)

সুতরাং উপরোক্ত পর্যালোচনায় একথা সুস্পষ্ট যে, নির্জনবাসের পদ্ধতি গ্রহণ কোনভাবেই সাধারণ ও শর্তহীন নয়। বরং তার সাথে কয়েকটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। কয়েকটি বিশেষ অবস্থায় কেবল এ পদ্ধতিকে কার্যকর করা যায়, অন্যথায় নয়।

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিকতার উদ্দেশ্য ঃ

পৃথিবীর প্রত্যেকটি সুসংবদ্ধ সমাজের কোন না কোন নির্ধারিত উদ্দেশ্য আছে। বরং বলা উচিত যে, নির্ধারিত উদ্দেশ্যই সমাজ সংগঠনের অস্তিত্বের প্রেরণা যোগায়। তাই সমাজ মূলতঃ কোন কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্যের ভিত্তিতেই নির্মিত হয়।

এ কথা যদি সকল সমাজের ক্ষেত্রে একটি স্বীকৃত সত্য হিসেবে পরিগণিত হয়, তাহলে ইসলামের নির্ধারিত সমাজের ক্ষেত্রে তা কেবল একটি ধারণায় পর্যবসিত হবে না। ইসলামের ব্যাপারে এই সুস্পষ্ট ও স্বীকৃত নীতিগত সত্যের বিরোধিতা করার কোন কারণ নেই। তাই বিবেক এ কথাই বলে যে, ইসলাম তার অনুসারীদেরকে যে সামাজিক ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছে, তার অর্থ শুধু সমাজ, শর্তহীন ঐক্য ও সংহতির ক্ষাতিরে সংহতি নয় বরং তা অবশ্য একটি বিশেষ ধরনের সমাজ, বিশেষ ধরনের ঐক্য ও উদ্দেশ্যমূলক সমাজ হবে। অবশ্যই কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের খাতিরে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত জীবন যাপনের এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ইসলাম তার অনুসারীদেরকে যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের জন্যে সংঘবদ্ধ সমাজ জীবনের নির্দেশ দিয়েছে তা জানার পূর্বে একটি বিষয়ে স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। আর তাহলো জাতি হিসেবে ইসলামের অনুসারীদের সৃজনের উদ্দেশ্য ও তাদের জাতীয় দায়িত্ব কি? কেননা কোন জাতির সৃজনের উদ্দেশ্য বা তার জাতীয় দায়িত্বকে কেন্দ্র করেই সে একটি সুসংগঠিত জাতিতে পরিণত হয়। তাই মুসলিম জাতির সৃজনের উদ্দেশ্য ও তার জাতীয় দায়িত্ব জানার পর ইসলামের কাঙ্ক্ষিত সমাজের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গের কুরআন মাজীদের ঘোষণা ঃ

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ -

"এভাবে আমি তোমাদেরকে একটি উত্তম জাতিতে পরিণত করেছি, যাতে করে তোমরা অন্যান্য মানব গোষ্ঠির জন্যে (সত্যের) সাক্ষ্যদানকারী হতে পারো।' (কুরআন মাজীদ, সূরা আল বাকারা, আয়াত-১৪৩)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ

"তোমরা একটি উত্তম জাতি, সমস্ত মানব জাতির জন্যে তোমাদেরকে সৃজন করা হয়েছে, তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দাও, অসৎ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখ।" (কুরআন মাজীদ, সূরা আলে-ইমরান, আয়াত-১১০)

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

"তিনি তোমাদের জন্যে সেই দ্বীন নির্ধারিত করেছেন, যা তিনি নূহ (আ:) কে দান করেছিলেন এবং যার সম্পর্কে (হে মুহাম্মদ!) আমি তোমার ওপর অহী অবতীর্ণ করেছি আর যার আদেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না।" (কুরআন মাজীদ, সূরা আশ্ শুআরা, আয়াত-১৩)

কুরআন মাজীদের এসব বাণী থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, যে দায়িত্ব ও উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্যে মুসলমানরা এ পৃথিবীতে একটি দল হিসেবে অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং একটি উম্মত হিসেবে কার্যরত রয়েছে তাহলো আল্লাহর দ্বীনের প্রতিষ্ঠা ও তার সাক্ষ্য দান। কাজেই ইসলামী সমাজের উদ্দেশ্যও দ্বীনের প্রতিষ্ঠা, সৎ কাজের আদেশ, মন্দ কাজের নিষেধ এবং সতের সাক্ষ্য ছাড়া আর কিছুই নয়। এ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পাদনের জন্যে মুসলমানদেরকে সংঘবদ্ধ জীবন-যাপন করার জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে এবং তাদের মধ্যে সংগঠিত সমাজ জীবনের চেতনা জাগ্রত রাখার জন্যে এ ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। মুসলমানরা ছিন্নভিন্ন ও নেতৃত্বহীন সেনাবাহিনীতে পর্যবসিত হওয়া যেমন ইসলামী জীবন নয়; বরং মূর্খতার জীবন, তেমনি ইসলামের পতাকা

উত্তোলন ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে যদি তারা একত্রিত ও সংগঠিত হয়, তাহলে তাও হবে পূর্ণত মূর্খতার নামান্তর।

সমাজগ্রন্থী ও ইসলামী সমাজের বিনির্মাণ পদ্ধতি ঃ

ইসলামী সমাজের উপরোল্লেখিত নির্ধারিত উদ্দেশ্য তার সমাজগ্রন্থীও নির্ধারিত করে। এ সমাজের একমাত্র উদ্দেশ্য যদি আল্লাহর দ্বীনের প্রতিষ্ঠা ও তার সাক্ষ্য হয়ে থাকে, তাহলে একমাত্র আল্লাহর দ্বীনই এ সমাজের কেন্দ্রস্থল ও কেন্দ্রবিন্দু, এতে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই কুরআন মাজীদ ঈমানদারদেরকে একটি ঐক্যবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ দল হিসেবে অবস্থান করার নির্দেশ দিয়ে যে শব্দ ব্যবহার করেছে। তা হলো ঃ

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

"তোমরা সবাই একত্রিত হয়ে আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরো এবং দল-উপদলে বিভক্ত হইও না।" (আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১০৩)

আল্লাহর এ বাণী যেমন সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে যে, সকল মুসলমানকে পরস্পর সম্পৃক্ত হয়ে থাকা আবশ্যক, তেমনি ভাবে এটিও সুস্পষ্ট যে, একমাত্র আল্লাহর রজ্জুই তাদেরকে সম্পৃক্ত একত্রিত করবে। বিষয়টি সম্পর্কে আরো সুস্পষ্ট ধারণা নিতে আল্লাহর রাসূল (সা:) এর কর্মজগতে প্রবেশ করতে হবে। তাঁর সম্পর্কে জগতের প্রত্যেক অনুসন্ধানী ব্যক্তিরই জানা যে, তিনি মানুষের সামনে আল্লাহর দ্বীন পেশ করেন, পরকালের কথা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেন এবং তাদেরকে এক আল্লাহর দাসত্ব করার আহ্বান জানান। সারা জীবন তিনি একাজই করেছিলেন। যে এ দাওয়াত গ্রহণ করতো, সে মুসলমান ও ইসলামী সমাজের সদস্য হয়ে যেত। তার বংশ, দেশ, বর্ণ ও ভাষা এ পথে কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারতো না। আর যে এ দাওয়াত গ্রহণ করতো না, সে কুরাইশ ও হাশেমী বংশের সদস্য হলেও এ দলের ধারে কাছে ঘেঁষতে পারতো না। এ দাওয়াত ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যের দিকে যেমন তিনি কখনো কাউকে আহ্বান জানান নি, ঠিক তেমনি এ সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোন সম্পর্কের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও সমাজের স্বার্থে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার কোন সুযোগ তিনি কারোর জন্যে রাখেন নি। বরং এর চরম পরিণতি সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে তিনি বলেন–

وَمَنْ دَعَا دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَى جَهَنَّمَ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ

"আর যে ব্যক্তি, জাহিলিয়াতের দিকে মানুষকে আহ্বান জানায় তার স্থান জাহান্নাম, যদিও সে রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং নিজেকে মুসলমান বলে মনেকরে।" (সুনানে আহমদ ও তিরমিযী শরীফ) [১৫] (পৃ:-৫৩,৫৪)

জাহিলিয়াতের অর্থ হলো ইসলামের বিপরীত বস্তু। যে আহ্বান ইসলামী নয়, যাকে কুরআন হকের আহ্বান বলে স্বীকার করেনি, যা কখনো রাসূলুল্লাহ (সা:)-এর মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছে বলে শোনা যায়নি এবং যা আল্লাহর দ্বীনে বৈধ বলে স্বীকৃতি লাভ করেনি তা জাহিলিয়াতের আহ্বান বলে গণ্য হবে। ইসলাম তার অনুসারীদেরকে একটি সংগঠিত সমাজবদ্ধ জীবন-যাপন করার নির্দেশ দিয়েছে এবং অসংগঠি- বিচ্ছিন্ন জীবন-যাপনের ব্যাপারে কঠের অসন্তোষপ্রকাশ করেছে। এমতাবস্থায় কোন ব্যক্তি যদি মানুষকে এই সামাজিকতা ও সমাজবদ্ধতামুক্ত করার দিকে আহ্বান করে, তাহলে এটি হবে একটি প্রকাশ্য জাহিলিয়াতের আহ্বান। অনুরূপভাবে কুরআন সকল মুসলমানকে আল্লাহর রজ্জুর বন্ধনে গ্রন্থীবদ্ধ থাকার নির্দেশ দিয়েছে। কাজেই এর বিপরীতে রক্ত, বর্ণ, ভাষা তথা অন্য যে কোন সম্পর্ককে কেন্দ্র করে তাদেরকে একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানালে তাহবে নিঃসন্দেহে একটি জাহিলিয়াতের আহ্বান। বিষয়টিকে আরো সুস্পষ্ট করে বুঝানোর জন্যে

অন্য হাদীসে এসেছে : لَيْسَ مِنَّا دُعَا اِلَى عَصَبَيْهِ-

"যে মানুষকে পার্থিব সম্পর্কের দিকে আহ্বান করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" (আবু দাউদ, কিতাবুল আছার) [১৫] (পৃ:-৫৪)

কোন পার্থিব সম্পর্কের দিকে ডাকার অর্থ হলো এই যে, ইসলামের অবিমিশ্র যুক্তি ও আকীদাভিত্তিক সমাজ সংগঠনকে বাদ দিয়ে মুসলমানদের বংশ, দেশ ভাষা বা বর্ণগত সম্পর্কের ভিত্তিতে একত্রিত করার চেষ্টা করা। বণী মুসতালিক যুদ্ধের সময় জনৈক মুহাজির ও আনসারের মধ্যে বিবাদ হয়। মুহাজির আনসারের পিঠে পদাঘাত করে। অন্যদিকে আনসার يَالَلْأَنصَارِ 'হে আনসাররা' ছুটে এসো বলে চিৎকার করে ওঠে। উত্তরে মুহাজিরও يَالَلْمُهَاجِرِيْنَ 'হে মুহাজিররা' ছুটে এসো বলে চিৎকার দেয়। নবী করীম (সা:)-এর কানে এ আওয়াজ পৌঁছে। তিনি বলেন

مَابَالُ دَعْوَى جَاهِلِيَّةٍ ؟ دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ -

"এ কি জাহিলিয়াতের আহ্বান শুনতে পেলাম? এ থেকে দূরে থাকো, কেননা এ অত্যন্ত দূষিত বস্তু।" (বুখারী ২য় খন্ড, কিতাবুস তাফসীর) [১৫] (পৃ:-৫৫)

বলাবাহুল্য 'হে আনসাররা ছুটে এসো' এবং 'হে মুহাজিররা ছুটে এসো'- এ আহ্বান মূলতঃ বংশ ও দেশভিত্তিক শ্লোগান ছিল। একটি সাময়িক বিপদ প্রসঙ্গে এমনি হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল, এতে কোন পূর্ব-পরিকল্পিত দর্শনভিত্তিক কোন স্থায়ী দল গঠনের আহ্বান ছিল না। তাতে নবী করীম (সা:)-এর নিকট এ আহ্বান এত শ্রুতিকটু ছিল যে, এগুলো যেন তার নিকট শুধু শব্দ নয়; বরং অবর্জনার পোকামাকড় ও দুর্গন্ধময় পদার্থ মনে হলো। তাই তিনি কালক্ষেপন না করে সাথে সাথেই সাহাবায়ে কেরামকে এ কাজে বাধা প্রদান করলেন।

যদি জাহিলিয়াত ও পার্থিব সম্পর্কের দিকে আহ্বানকারীর অস্তিত্ব ইসলামী সমাজে অনভিপ্রেত এবং জাহান্নামের ইন্ধন হয়ে থাকে, তাহলে যে ব্যক্তি এ ডাকে সাড়া দেয় সেও জাতির মূলধন ও জান্নাতের মেহমান হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে ও যুক্তিযুক্তভাবে তার অবস্থাও জাহিলিয়াত ও পার্থিব সম্পর্কের দিকে আহ্বানকারীদের মতো হবে।

কাজেই নবী করীম (সা:) যেখানে একথা বলেছেন যে– لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا اِلَى عَصَبِيَّةٍ সেখানে এ সিদ্ধান্তও ঘোষণা করেছেন যে-

لَيْسَ مِنَّا قَاتَلَ عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ-

"সে আমাদের দলভুক্ত নয় যে কোন পার্থিব সম্পর্কের কারণে যুদ্ধ করে এবং সেও আমাদের দলভুক্ত নয়, যে কোন পার্থিব সম্পর্কের জন্যে প্রাণ দেয়।"[১৫] (পৃ:-৫৬)

মোটকথা, মুসলমানদেরকে মুসলমান হিসেবে সমবেত করার জন্যে দ্বীন ছাড়া দুনিয়ার অন্য কোন সম্পর্ক, সহযোগিতা ও সম্বন্ধ নেই। বরং এ সম্পর্ক ইসলামী সমাজের গ্রন্থী হিসেবে কাজ করতে পারে। দ্বীন ছাড়া অন্য কোন বস্তুর ভিত্তিতে যদি মুসলমানরা সমবেত হয়, তবে তা হবে চরম ধৃষ্ঠতা ও হতাশার কারণ।

ইসলামের জীবন দর্শন ঃ

জীবন জিজ্ঞাসা ও জীবনবোধ মানুষের চিরন্তন ক্ষুধা। এর ওপর ভিত্তি করেই মানুষের ধর্ম বা জীবনদর্শন গড়ে ওঠে। একটা জীবনদর্শনের সাধারণত দু'টো দিক থাকে, একদিক হলো বাস্তব ও ব্যবহারিক। অন্য দিকটা হলো চিন্তা-অনুগ ও দার্শনিক। যে জীবনদর্শনের মধ্যে বাস্তব ও দার্শনিকের সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটে এবং এ দু'টো দিক যত বেশী একেবারে পিঠ-পিঠ ও লাগো-লাগো দাঁড়াতে পারে, সে জীবনদর্শন ততখানি জীবন্ত ও সার্থক

বলা যেতে পারে। কেননা এর মধ্যেই জীবনের বিচিত্র গতি ও অনুভূতি ষোলকলায় পূর্ণ হবার ভরসা থাকে। দার্শনিক দিকটা যখন বেশি প্রভাব বিস্তার করে, তখন জীবনদর্শন তার সুষমা আবহ হারিয়ে ফেলে। শুষ্ক মরমীবাদে পর্যবাসিত হয়। দর্শনের নীরব নিভৃত কোঠায় চলে তার আনাগোনা। কিন্তু সংগ্রামী ও প্রতিশ্রুতিশীল মানুষের জবিনে তা আর কোন প্রেরণা সঞ্চার করতে পারে না। ব্রাহ্মণ্যবাদের দশাও শেষটায় এ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। আবার ব্যবহারিক দিকটা যখন নিয়ম-কানুন ও অনুষ্ঠানের অহেতুক চাপে জর্জরিত হয়, তখন তা কুসংস্কার ও প্রাণহীন আচার-ব্যবহারে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। খোলসটুকুই তার শুধু অবশিষ্ট থাকে। ইহুদী ও খ্রিস্ট ধর্মের বর্তমান অবস্থা তারই প্রমাণ। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যাবে যে, ইসলামই একমাত্র জীবন্ত বলে দাবি করতে পারে। বাস্তবতা ও আধ্যাত্মিকতার অপূর্ব সমন্বয়ে জীবনের অনুপম দীপ্তি ইসলামে প্রতিভাত হয়েছে। ইসলাম প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর জীবনে চোখে পড়ে এ জীবনবোধেরই এক পরিপূর্ণ আলেখ্য। ড. পারসিভ্যাল স্পিয়ার তাঁর 'ইন্ডিয়া, পাকিস্তান এ্যান্ড দি ওয়েস্ট' শীর্ষক গ্রন্থে তাই ইসলামকেই সবচেয়ে বাস্তব জীবনদর্শন বলে আখ্যায়িত করেছেন।[২৬](পৃ:-৪৮)

মানব জীবনে অসংখ্য বৃত্তি-প্রবৃত্তির সন্ধান পাওয়া যায়। তার জীবনে রয়েছে যেমন স্ববোধ, তেমনি রয়েছে পরার্থপরতা; তার যেমন রয়েছে ক্ষুধা, যৌন প্রেরণা, প্রকৃতির সাথে একাত্ম হওয়ার বাসনা, সৌন্দর্য ভোগ করার প্রবৃত্তি, তেমনি রয়েছে প্রেম, আত্মত্যাগ, স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা, রুচিবোধ, নীতিবোধ, এ বিশ্বের প্রকৃত পরিচয় পাওয়ার জন্য অদম্য আকাঙ্ক্ষা।

মানব জীবনকে সুস্থ, সবল ও স্বাভাবিকভাবে বিকশিত করে তুলতে হলে তার জৈব-জীবনের নানাবিধ প্রবৃত্তির সুস্থ বিকাশ তার পক্ষে অতীব প্রয়োজন। জ্ঞানের ক্ষেত্রেও বোধি, বিচারবুদ্ধি ও ভূয়োদর্শনের যথাযথ জ্ঞান নির্দেশ করে তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করলেই জ্ঞানের পথ হয় সুগম; মানুষ সত্যের সঙ্গে পরিচয় লাভে হয় ধন্য। একই ভাবে মানুষের জৈব-জীবনের বিভিন্ন বৃত্তির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যমে পরস্পর বিরোধী ভিন্নমুখী প্রবৃত্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় শৃংখলা এবং ব্যক্তি জীবনে স্থাপিত হয় ভারসাম্য। মানব মনের আদিম স্ববোধ ও পরার্থিতার মধ্যে সমতা সাধিত হলে সমাজ ব্যবস্থা, ব্যক্তি কেন্দ্রিকতা বা সমষ্টি কেন্দ্রিকতার দোলায় দুলে প্রগতির পথে হয় অগ্রসর।

মানব জীবনে দেখা যায়, কোন এক বিশেষ বৃত্তির অতিরিক্ত অনুশীলনে ব্যক্তি জীবনে দেখা দেয় নৈরাজ্য। ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্য মানুষ আহার করে। সে আহার করতে গিয়ে যদি চব্বিশ ঘণ্টাই তাতে মগ্ন থাকে , তা হলে তার স্বাস্থ্যহানি তো হবেই তার উপর তাকে সম্মুখীন হতে হবে আরো নানাবিধ সমস্যার। তেমনি কাম কলার অতিরিক্ত অনুশীলনে মানব জীবন চরম অধঃপতনের স্তরে উপস্থিত হয়। কাজেই দেখা যায়, কোন বিশেষ বৃত্তির অতিরিক্ত বিকাশের ফলে অন্যান্য বৃত্তিগুলো হয় অবদমিত এবং তার পরিণতিতে এক বৃত্তির সঙ্গে অন্য বৃত্তির সংঘাত ও সংঘর্ষ হয়ে পড়ে অনিবার্য। অনুরূপ কেবল একটি পদ্ধতির অনুসরণেও জ্ঞানের অন্যান্য শক্তিগুলো হয়ে পড়ে সম্পূর্ণ অসাড়। তাই বিকাশের পথে দেখা দেয় চরম অন্তরায়।

তথাপি দুঃখজনক হলে ও এ যাবত যে সব মতবাদের উৎপত্তি হয়েছে, তাতে মানব জীবনের কোন বিশেষ দিকের উপর গুরুত্বারোপ করে, তারই আলোকে গোটা জীবনের ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়াস চালানো হয়েছে। যদিও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নামে সেগুলো জগতে প্রচারিত তবুও তাদের মধ্যে রয়েছে অবৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি।

বিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য বিশেষ থেকে সার্বিকে উপস্থিত হওয়া। অবরোহ পদ্ধতিতে কোন বিশেষ নীতিকে গ্রহণ করে নীচের দিকে নেমে যাওয়া বৈজ্ঞানিক জগতে আত্মহত্যারই নামান্তর। অথচ লক্ষ্যণীয়, আরোহ পদ্ধতিই বৈজ্ঞানিক জগতে একমাত্র বিষয় পদ্ধতি বলে স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও সেই অবরোহ পদ্ধতির প্রভাব বিজ্ঞান এড়াতে পারেনি। তাই গোড়াতে জীব-জগতের যুদ্ধ বা কাম-প্রবৃত্তির মৌলিকতা, মানুষের স্বার্থরপতা, প্রভৃতি

Dhaka University Institutional Repository

সূত্রগুলোকে স্বীকার করে তাদের একচোখা নীতির আলোকে জটিল জীবনের সবগুলো দিকের ব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছে।

এমন কি, যে কালমার্কস হেগেলের চিন্তা মাধ্যমগুলোকে শ্রেণী সংগ্রামে রূপান্তরিত করে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার সূত্রে জীবনের গতি ও ক্রমবিকাশের ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন, তাঁর মনেও সব সময়ে হেগেলের দর্শনের প্রভাবেই বিচিত্র ক্ষেত্রে তারই অমোঘতা স্বীকার করে নিয়েছেন। উৎপাদন ব্যবস্থা ছাড়া মানব জীবনে যত সব ফ্যাক্টর কার্যকরী সেগুলোকে তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন, প্রয়াস চালিয়েছেন যুক্তিবাদের প্রভাবে একটি ছকে ফেলে মানব জীবনের সবগুলো দিকের ব্যাখ্যা করতে। তাই দেখা দিয়েছে অবৈজ্ঞানিক মনোভাব।

মানব-জীবনের নানাবিধ সহজাত বৃত্তি ও প্রবৃত্তির আলোচনা করলে একথাই প্রমানিত হয় সবগুলো বৃত্তির মূলেই রয়েছে দু'টো লক্ষ্য। একটা হচ্ছে মানুষের আত্মরক্ষা (Self protection) অপরটি হচ্ছে আত্মপ্রতিষ্ঠান (Self perpetuation)। [৫ (পৃ:-৬২)] এজন্যে মানব জীবনকে সুষ্ঠুভাবে বিকাশের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে তার জন্যে এমন এক প্রকল্প (Hypothesis) গ্রহণ করতে হবে, যাতে তার জীবনে সম্পূর্ণভাবে সন্তোষ বিধান সম্ভবপর হয়। এর প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে আমাদের এমন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে, যা আমাদের জীবনকে নানাবিধ শত্রুর আক্রমণ থেকে নিরাপদ রাখতে পারে। আর দ্বিতীয় পদক্ষেপ হচ্ছে– এ প্রকল্পের মধ্যে এমন প্রতিশ্রুতি থাকবে যাতে এ বিশ্বে আমরা অমরত্ব বা আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করার সান্তনা পেতে পারি। একইভাবে এ প্রকল্পের মধ্যে পূর্বোক্ত বিষয়গুলোর পাশাপাশি জ্ঞানের নানাবিধ মাধ্যমেরও সন্তোষও বিকাশ সাধনের পদক্ষেপ থাকা বাঞ্চনীয়।

অতএব, আমাদের লক্ষ্য হবে এমন এক প্রকল্প গ্রহণ, যাতে কেবল বুদ্ধি নয় সবগুলো বৃত্তি ও সন্তোষ লাভে হয় সমর্থ। যার উপকরণ হবে জীবন্ত মানুষের সবগুলো বৃত্তি ও প্রবৃত্তি। তার লক্ষ্য হবে পূর্ণ মানুষ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ। তার নৈতিক আদর্শ হবে পরস্পর ভিন্নমুখী প্রবৃত্তির সামঞ্জস্য বিধান। তার সামাজিক ও রাষ্ট্রিক আদর্শ হবে ব্যষ্টি ও সমষ্টির অধিকারের সমন্বয়।

সে পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শনেরই অপর নাম ইসলাম। ইসলামকে তাই বলা হয় মানবতার ধর্ম। এ ধর্মের উৎপত্তি হযরত মুহাম্মদ মোস্তফার (সা:) প্রচার থেকে নয়। সৃষ্টির আদি থেকেই নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ভুল-ভ্রান্তির পথ পাড়ি দিয়ে মানুষ তার পূর্ণ পরিচয় লাভের জন্য এ পথেই চলেছে। ইসলামকে বলা হয় মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। মানব প্রকৃতির সাথে তার অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক বর্তমান। মানুষের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) বলেছেন

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ اَبَاءُهُمْ يُهَوِّدَانِ وَيُنَصِّرَانِ وَيُمَجِّسَانِ-

"সদ্যজাত শিশু সত্য ধর্মেই জন্ম নেয়; তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজারি বানায়।' (আল হাদিস) [৫ (পৃ:-৬৮)]

ইসলাম গোড়াতেই মানব জীবনকে দেখেছে পূর্ণভাবে, সেজন্যে বিভিন্ন প্রবৃত্তি বা জ্ঞানের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে তারতম্য করলেও কোনটাকেই অস্বীকার করে নি। মানব জীবনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ক্ষুধা, যৌনস্পৃহা প্রভৃতিকে ইসলাম ক্ষণিকের জন্যে হলেও অস্বীকার করে নি। বরং কিভাবে ক্ষুধার নিবৃত্তি হতে পারে, কিভাবে মানুষ জীবনে শান্তিপায় তার ব্যবস্থা করেছে। মানব-প্রকৃতির স্বাভাবিক বিকাশের পথ সুগম করার জন্যে এ জীবন দর্শনে মানব জীবনের বৈচিত্র্য গোড়াতে স্বীকৃত হয়েছে। জগতের পূর্ণ পরিচয়ের পদ্ধতিরূপে বোধির সাথে প্রয়োগ ও যুক্তি গৃহীত হয়েছে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে যেন কোন কালেই কোন সীমারেখা টেনে দেয়া না হয়, সেজন্যে মানুষের নবী ঘোষণা দিয়েছেন উদাত্ত কণ্ঠে-

اُطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ اِلَى اللَّحْدِ-

"তোমরা দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণ কর।" (আল হাদিস) [৫] (পৃ:-৬৯)

অপর এক বাণীতে বলেছেন

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ-

"প্রত্যেক মুসলমান নারী-পরুষের উপর জ্ঞান অর্জন করা ফরয।"(আল হাদিস) [৫] (পৃ:-৬৯) ।

অন্য জায়গায় বলা হয়েছে ঃ "জ্ঞান আহরণের জন্যে যদি প্রয়োজন হয় সূদূর চীন দেশেও যাও।" [৫] (পৃ:-৬৯)

এক্ষেত্রে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, জ্ঞান বলতে তিনি শুধু ঐশী জ্ঞানকেই বুঝতেন না। জ্ঞান ছিল তার কাছে ব্যাপক। সে চীন দেশের মনীষীর জ্ঞানই হোক আর সুদূর ইউরোপের জ্ঞানই হোক, যে কোন উপায়ে লব্দ জ্ঞানকে তিনি জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদানরূপে গ্রহণ করতেন।

এ দর্শনে ব্যষ্টিকে সমাজ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন স্বয়ম্ভুরূপে কল্পনা করা হয়নি। দেহের এক অঙ্গের সাথে অপর অঙ্গের যেমন অচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান তেমনি মানুষের মাঝেও যে একই প্রকৃতি, একই রক্তধারা বর্তমান সে সত্যটি গোড়াতেই ঘোষণা করা হয়েছে

إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ -

"নিশ্চয়ই এটি তোমাদের জাতি- এটিতো একই জাতি। আর আমিই তোমাদের প্রভু। কাজেই আমারই দাসত্ব কর।" (আল-কুরআন, সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত-৯২)

অপর জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ - فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

-

"আর নিশ্চয়ই তোমাদের এ জাতি, একই জাতি আর আমি তোমাদের প্রভু, সুতরাং আমাকে ভয় কর। মানুষেরা তাদের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠিতে বিভক্ত করেছে। আর প্রত্যেক জাতিই তার আইন-কানুন ও লোকাচারে আনন্দ বোধ করে।" (আল-কুরআন, সূরা আল মু'মিনুন, আয়াত-৫২, ৫৩)

আরো জোরালো ভাষায় অন্য এক স্থানে বর্ণিত হয়েছে-

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا

"মানুষেরা গোড়াতে একই জাতি ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে তাতে নানা বিভিন্নতা সৃষ্টি করেছে। তোমাদের প্রভু পূর্বেই যদি একটি সিদ্ধান্ত না দিতেন তাহলে তারা যে বিষয় নিয়ে মতানৈক্য করছে তার সমাধান অবশ্যই করে দেয়া হত।" (আল-কুরআন, সূরা ইউনুস, আয়াত-১৯)

অপর আয়াতে মানুষের আদি উৎসের স্মরণ করে দিয়ে বলা হয়েছে ঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا -

"হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন, এবং তা থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর উভয়ের মাধ্যমে অসংখ্য নারী-পুরুষ পৃথিবীতে ছড়িয়ে

দিয়েছেন। কাজেই তোমরা সেই আল্লাহকে ভয় কর, যার দোহাই দিয়ে পরস্পরের নিকট অধিকার দাবি কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি তৃক্ষ্ম দৃষ্টি দানকারী।" (আল-কুরআন, সূরা আন নিসা, আয়াত-১)

মূলতঃ ইসলাম সর্বাবস্থায় সাম্য ও মৈত্রীর রুপায়নে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। মানুষের মাঝে সাম্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠা হওয়া সত্ত্বেও যেন তাদের মধ্যে কাজকর্মে বা উৎপাদন ব্যবস্থায় আপেক্ষিক স্বাধিনতা বজায় থাকে তার জন্যে ইসলাম কোন অবস্থায়ই কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেনি। ব্যক্তিগত বা সমাজগত জীবনে যেন মানুষ স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারে বা উৎপাদন ব্যবস্থায় স্বীয় অভিমত অনুসারে চলতে পারে, তার জন্যে ইসলামী সমাজে রয়েছে প্রচুর সুযোগ। ব্যক্তি ইচ্ছা করলেই যেমন একা উৎপাদন করতে পারে, তেমনি সংঘদ্ধভাবে অপর দশজনের সাথে মিলিত হয়েও সে উৎপাদন করতে পারে।

ইসলাম গোড়াতেই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের সাথে স্বার্থপরতার যোগ স্বীকার করেনি। ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যকে ইসলাম সবসময়েই তার বিকাশের হেতু বলে ধরে নিয়েছে। সেই ব্যক্তিত্ব বিকাশের অর্থ এ নয় যে, অপরকে শোষণ করে সে তার উদর পুর্তি করবে। তার পরিষ্কার অর্থ এই জীবনের সবগুলো বৃত্তির পরিপূর্ণ বিকাশের পর তাদের আসল কর্তব্যে নিয়োগ করা। ইসলামে ব্যক্তির বিকাশের পর সে হয় ইনসান-ই-কামিল। তখন সে অপরকে শোষণ করতে চায় না বরং নিজের মত অপরকেও বিকাশের পথে টেনে নেয়।

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের যে সূত্রপাত লক থেকে হয়েছিল, তারই পূর্ণ পরিণতিতে পাওয়া যায় নীটসের অতি মানবকে। সে অতি-মানবকে অতি-দানবও বলা যায়। কারণ তার মাঝে মানবীয় গুণের চেয়ে দানবীয় গুণেরই প্রাধান্য বেশী। আর ইনসান-ই-কামিলের মাঝে মানব-জীবনের সবগুলো বৃত্তির সুষ্ঠু বিকাশই তার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। রাজনৈতিক জীবনে যেমন সে আপনার স্বার্থের জন্য হয় তৎপর, তেমনি আপনার সাথে অপরের অচ্ছেদ্য যোগসূত্র স্বীকার করে বলে আপনার ও সমাজের স্বার্থে কোন তারতম্য সে দেখতে পায় না। আর এটি শুধুমাত্র আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব স্বীকারেরই ফলশ্রুতি। ইসলামী জীবন দর্শনের মূলকথা : এ বিশ্বের আদি কারণ সর্বমঙ্গলময় পরম শক্তিশালী আল্লাহ্ তাআলা। তাঁর সত্ত্বা থেকে বিশ্বের সবকিছুর উৎপত্তি এবং তাঁর মাঝেই সবকিছুর লয়, আর মানব জাতির উৎপত্তিও তার থেকেই হওয়ায় তারা পরস্পর ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ। যেমনটি আমরা ইতিপূর্বে আলোচিত আয়াতে কারীমা সমূহে প্রত্যক্ষ করেছি।

ইসলাম গোড়াতেই ইহলৌকিক, পারলৌকিক, ধর্মীয় বা রাষ্ট্রীয় বলে জ্ঞানের কোন পৃথক জগত স্বীকার করেনি। সমগ্র জীবন দিয়ে সত্য লাভের চেষ্টা ইসলামের কাম্য। ইসলাম মানব-জীবনকে পূর্ণ বিকাশের পথে এগিয়ে দিতে চায় বলে জ্ঞানের প্রত্যেকটি পদ্ধতি স্বীকার করে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে জীবন-সমস্যার সমাধান করতে চায়, ফলে ধর্ম-জীবনের সাথে রাষ্ট্রীয়-জীবনের, কর্ম-জীবনের সাথে নৈতিক-জীবনের দ্বন্দ্বের হয় অবসান।

বিভিন্ন জ্ঞানের উপকরণকে সমন্বয় করে ইসলাম এসে উপনীত হয় এক সার্বিক সিদ্ধান্তে যেখানে মানব-মনের সবগুলো দাবি সন্তোষ লাভে হয় সামর্থ। বর্তমানকালে ধর্ম ও রাষ্ট্রের যে দ্বন্দ্ব তার মূলে রয়েছে আমাদের একদেশদর্শী জ্ঞানের কার্যকারিতা। যুক্তিসর্বস্ব জ্ঞানের আলোকে আমরা গড়ে তুলি রাষ্ট্র। তাতে কোথাও ব্যষ্টির, আবার কোথাও সমষ্টির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করি। ধর্ম-জীবনকে রাষ্ট্রীয়-জীবন থেকে পৃথক করে দেখি বলে রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় জীবনে শুরু হয় ভীষণ দ্বন্দ্ব। ধর্ম-জীবনে যা ন্যায়-নীতি বলে সর্বত্র স্বীকৃত হয় রাষ্ট্র-জীবনে তা অনেক স্থলেই উপহাসের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। তার প্রধান কারণ, আমরা একই সত্যকে কোথাও দেখি বিশুদ্ধ জ্ঞানের আলোকে, আবার কোথাও দেখি সংজ্ঞার মাধ্যমে। সামগ্রিক দৃষ্টি নিয়ে একে বুঝার চেষ্টা করলে একই সত্যের দু'টো রূপ বলেই তা ধরা পড়বে।

রাষ্ট্র-জীবনে জীবনকে দেখা হয় শুধু বুদ্ধির আলোকে। সে জন্যে এখানে ধর্মীয় ও নৈতিক মানগুলো কোন স্থান পায় না। ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনের মানগুলো স্বজ্ঞার মাধ্যমেই পাওয়া যায়। বুদ্ধির সাথে বোধির যোগ

Dhaka University Institutional Repository

হলে তবেই সত্যের সমগ্র রূপ ধরা পড়ে। সেই যোগসূত্র স্থাপনের জন্যে ইসলামে রয়েছে জোর তাগিদ। সেজন্যে ইসলাম রাজনীতিকে ধর্মনীতি থেকে কোনকালেই পৃথক করে দেখেনি। কেবল ধর্ম ও রাজনীতি নয়, আধ্যাত্মিক বা জাগতিক বলেও ইসলামে কোন পৃথক পৃথক বিভাগ নেই।

আল্লামা ইকবাল সত্যিই বলেছেন– "ইসলামে আধ্যাত্মিক ও জাগতিক বলে দু'টো ভিন্ন ক্ষেত্র নেই। যতই জাগতিক (উদ্দেশ্য প্রণোদিত) হোক না কেন, কর্তার মনের ভাবধারার আলোকেই কর্মের নির্ধারণ হয়ে থাকে। ইসলামে একই সত্যকে এক দৃষ্টিভঙ্গিতে চার্চ বলা হয়, অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে বলা হয় রাষ্ট্র। চার্চ ও রাষ্ট্রকে একটি বস্তুর দুটো দিক বললে ঠিক বলা হবে না। ইসলাম বিশ্লেষণের অতীত এক সত্য। আমাদের দৃষ্টিকোণের পরিবর্তনের ফলে তাকে বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখায়। এই ভুলের কারণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, ঐক্যকে দ্বিখণ্ডিত করে দু'টো ভিন্ন সত্যের সৃষ্টির ফলেই এর উৎপত্তি। আসলে সত্য হল জড় পদার্থ, স্থান-কালের সম্পর্কে আত্মা বৈ আর কিছু নয়।"[৫] (পৃ:-১৮২)

কাজেই সব দেখে-শুনে মনে হয়, অনাগত বিশ্বসংস্থার জন্যে যে কয়টি মৌলিক নীতির স্বীকৃতির প্রয়োজন এবং যে মানসিকতার অত্যন্ত প্রয়োজন ইসলামের মধ্যে তার সমস্ত রয়েছে। তাই এ ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ দুনিয়ার বুকে আবার শান্তিফিরিয়ে আনতে হলে মানব-সভ্যতাকে ইসলামের জীবনাদর্শ গ্রহণ করতে হবে। এর বিকল্প নেই।

জীবনদর্শনে ধর্মের ভূমিকা :

প্রগতির চলতি পথে 'ধর্মের' দিন ফুরিয়ে এসেছে- এই মতবাদ আধুনিক সমাজ চিন্তার একটা বড় কথা। ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত হলে মানুষ বর্তমান অবস্থাকে আল্লাহর দান বলে গ্রহণ করে, উন্নতির পথে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে না, নিজের অদৃষ্টকে-ভাগ্যকে সে বিধিলিপি বলে অকাতরে গ্রহণ করে নেয়। হতাশা, অদৃষ্টবাদ ও দুঃখবাদ তাকে জর্জরিত করে ফেলে। তথাকথিত ধর্মীয় মানুষের পক্ষে কর্মহীন জীবন যাপন করাই নাকি যুক্তিযুক্ত, কারণ নিজের অবস্থার পরিবর্তন করা নাকি 'খোদার উপর খোদকারি' করা!

আধুনিক যুগের মানুষ ধর্মকে নেহাৎ বুদ্ধিগত কার্যক্রম বা জ্ঞানের সসীমতার প্রকাশ মনে করে; কিন্তু নিছক বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনায় ধর্মের গোটা রূপ ধরা পড়ে না। আর দ্বিতীয় সংজ্ঞায় অর্থাৎ মানুষের জ্ঞানের অভাব ধর্মের পতন করেছে এ ধারণার মধ্যে ঈমান, ইবাদত সবই বাদ পড়ে যায়। এ থেকে আরও একটি ধারণার উদ্ভব হয়েছে। সেটা হলো, দুঃখ-দুর্দশা ও দারিদ্র্যের ফলেই মানুষ ধর্মের আশ্রয় নিয়ে থাকে। কিন্তু এসব কথা ধর্মের আসল রূপটি তুলে ধরতে পারে না। সুস্থ, সবল, সাধারণ মানুষেরও যে ধর্মীয় অনুভূতি ও ধর্মীয় প্রয়োজন রয়েছে, এ কথাটি একেবারে বাদ পড়ে যায়। বিশ্বের আদিসত্তার উপর বিশ্বাস স্থাপন, সম্পর্কের যোজন, ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে সামাজিক-গোষ্ঠিগত, পারিবারিক ও জাতিগত ভিত্তিতে ধীরে ধীরে ধর্ম বিকাশ লাভ করে।

আদর্শ হিসেবে ধর্ম তাই মানব জীবনে অপরিহার্য, যুগে যুগে ধর্ম যে কেবল মানুষের দুঃখের দিনে আশার বাতি জ্বেলেছে তাই নয়– মানুষের নবজন্মের দিশারীরূপে কাজ করে এসেছে। ধর্ম যখন জীবন-বাণী হিসেবে মানুষের সমগ্র সত্তা ও গোটা জীবনকে আন্দোলিত করে, তখনই ধর্মের এ ভূমিকা সার্থক হতে পারে– সমাজ বিবর্তনের বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও জীবনবোধ অটুট থাকে।

পুরোহিততন্ত্রের অবিসংবাদিত প্রভাব ও প্রগতিশীল ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক যুগের প্রাথমিক পর্যায়ে ধর্মকে নিতান্ত ব্যক্তিগত নেতিবাচক ও সংকীর্ণ পন্থারূপে চিত্রিত করা হয়েছে। প্রাচ্যের চাইতে প্রতীচ্যের ব্যাপারেই এ কথা বেশী সত্য। যেভাবে ইউরোপীয় চার্চ ও রোমের পোপ মানুষের বিবেক ক্রয় করে নিয়েছিল,

তাতে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মনে যথেষ্ট বিক্ষোভ ও বিতৃষ্ণার সঞ্চার হয়। ফলে ধর্ম সম্পর্কেও অনেক ভুল ধারণার জন্ম হয়েছিল।

ধর্মের নাম করে চার্চীয় ধর্মের প্রবল প্রতিপত্তির ফলে ইউরোপে ধর্ম সম্পর্কে বিরাট আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। একথা মনে রেখেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা চার্চ ও রাষ্ট্রের অর্থাৎ তাদের মতে ধর্ম ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণের দাবি তোলেন। এর ফলে একদিকে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় ঐক্য, স্বাধিকার ও জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে নতুন পথ উন্মোচিত হয়। আবার অন্যদিকে চার্চ ও ধর্মকে একই জিনিস বলে মনে করার ফলে ধর্মীয় আদর্শ মানবতা ও সার্বজনীনতা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র হতে বিলুপ্ত হয়। সে স্থানে রাজনীতি, জাতীয়তাবাদ ও বাস্তববাদের নামে অরাজকতা বেড়ে চলতে থাকে। অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, দর্শন, সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রে সংকীর্ণতা ও 'জোর যার মল্লুক তার' নীতি অনুসৃত হতে থাকে।

অপেক্ষাকৃত অগ্রসর ও জীবনমানের দিক থেকে উন্নত দেশগুলোতেই এ বিবর্তন অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। এর কারণ বহুবিধ। শিল্পোন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ ধর্মবিরোধী বা ধর্ম উদাসীন হওয়ার ফলে জীবন মানের উন্নতির সাথে সাথে ধর্মের প্রভাব স্বল্পায়িত হয়ে আসে। কাজেই শিল্প-বাণিজ্য ও উৎপাদন ব্যবস্থার অনগ্রসরতাই ধর্মীয় প্রভাবের প্রধান কারণ হিসেবে মনে করা হয়।

অর্থাৎ যান্ত্রিক সভ্যতার প্রতিদ্বন্দ্বীতায় পিছিয়ে পড়ার দরুনই ধর্মের প্রভাব এখনও টিকে আছে। এ রকম ধারণা সাধারণভাবে বিদ্যমান রয়েছে। ধর্মের প্রভাব বলে পুরোহিততন্ত্রের প্রভাব মনে করলে এ কথাই সত্য। কিন্তু সার্বজনীন ধর্মীয় নীতির আবেদন ও নিয়ন্ত্রণের কথা বিচার করে দেখলে আমরা একেবারে ভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছাই। কারণ ধর্মীয় প্রভাব নিছক নেতিবাচক অনুন্নত অবস্থার উপর নির্ভর করে না। সত্যিকার ধর্মীয় মূল্যবোধের ভূমিকা গোটা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও তার জীবনভিত্তিক সর্বাঙ্গীন রূপায়নের ওপর নির্ভর করে। এ ঐতিহ্য যেখানে প্রবল ও সৃষ্টিশীল সেখানে মানববাদী ধর্মীয় সমাজ সংগঠিত হয়। নতুন পরিবেশ ও প্রয়োজনের সাথে মানিয়ে নিতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না। কিন্তু এ ঐতিহ্য যেখানে দুর্বল, সেখানে তা কখনই সম্ভব হতে পারে না। কারণ সেক্ষেত্রে জীবনকে খণ্ডিত করে ভিন্ন ভিন্ন সংকীর্ণ পথে পরিচালনা করা হয়। নতুবা ধর্মের নাম করে পুরোহিততন্ত্রের প্রতিষ্ঠিত হয়। উভয় অবস্থাই ধর্মীয় বিকৃতির প্রতিফলন মাত্র- মূল প্রকৃতি বা আসল পরিচয় নয়।

ধর্মের বিকৃতি ও ধর্মকে একই পর্যায়ে ফেললে এ কাজে হাত দেয়াই যাবে না। মোল্লা-পুরোহিতের অহেতুক আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণের চাপে অনেক সময় মানুষের সত্যিকার ধর্মীয় অনুভূতির অপমৃত্যু ঘটে। আবার জীবন-দর্শনকে সমাজ অন্যদিকে ধর্মানিরপেক্ষ মনে করলে ধর্মকে সত্যিকারভাবে জীবনে রূপায়িত করা সম্ভব হয় না। কারণ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে পরিপূর্ণতা লাভ ধর্মের মৌলিক বস্তু।

মানব প্রকৃতি এমনভাবে সৃষ্টি হয়েছে যে, ভালমন্দের ধারণা ও জীবনসত্তা সম্পর্কে বোধশক্তি মানুষের পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক। এটা তার প্রকৃতিগত। কাজেই যেখানে মানুষ আছে সেখানে তার ধর্ম আছে–[৪] যা তার সমগ্র সত্তাকে প্রভাবিত করে এবং জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। এমন কি যার ধর্ম বলে কিছু নেই, যার ধর্মে কোনো ঈমান নেই, তার পক্ষে তো একথা কমবেশী সত্য।

[৪] সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা যায়, বিশ্বের প্রায় ৭০ শতাংশ লোক কোনো না কোনো ধর্মে বিশ্বাস করে। অর্থাৎ বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় চারশ' কোটিরও বেশী লোক ধর্মবিশ্বাসী। (অধ্যাপক মোহাম্মদ ইন্নাস আলী, মীর লুৎফুল কবীর সা'দী, বিজ্ঞান সমাজ ধর্ম, কসমিক পাবলিশার্স, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারী ২০০৮, পৃ: ২৭।)

কেবল দুঃখ-দুর্দশার জন্যেই ধর্মের প্রয়োজন, কথাটি আদতেই ভুল। সাধারণ মানুষের নৈতিক জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ও প্রভাব অনস্বীকার্য। ধর্মহীন নৈতিকতা শেষটায় নৈরাশ্যে পর্যবসিত হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশ্বাস না থাকলে যেমন মানুষের শক্তির অপচয় ঘটে, তেমনি সার্বজনীন ধর্মে বিশ্বাস না রাখলে আত্মবিশ্বাস ক্ষুণ্ন হয়। বিখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল, যিনি 'আমার কোন ধর্মীয় অনুভূতি নেই'-[২৬ (পৃ:-৪৭)] এ কথা প্রচার করেছিলেন তিনিও পরিশেষে প্রেমসও ভালবাসার ওপর জোর দিয়েছেন আর বলেছেন– "মানুষের মধ্যে যা সত্যিকার মহান, তাকে জাগ্রত করতে হবে।'[২৬ (পৃ:-৪৭)] মূল্যবোধের এ মৌলবস্তুর অনেকখানি সার্বজনীন ধর্মীয় আদর্শের মধ্যেই সম্পৃক্ত।

বিচিত্র পরিবেশে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে ধর্মের বাহ্যিক রূপ পাল্টেছে, কিন্তু তার মৌলিক সুরের ঐকতান আজও ধ্বনিত হচ্ছে। নানা কারণে হিন্দু ধর্ম বলতে ঠিক কি বোঝায় জানবার উপায় নেই। তবুও প্রাথমিকভাবে বৈদিক ধর্ম ও মোটামুটি গীতার ধর্মকেই হিন্দু ধর্ম বলা যেতে পারে। অস্পষ্টতা সত্ত্বেও সাধারণ হিন্দুর জীবনে ধর্মের অপরিসীম প্রভাব অস্বীকার করার উপায় নেই। মানুষের জীবনে নানা পরিবর্তন-বিবর্তনের মাঝে নিয়ন্ত্রণের পন্থা পরিবর্তিত হয়। কিন্তু ধর্ম বলতে মানুষের সমগ্র জীবন দর্শন ও জীবন-পদ্ধতি বুঝায়। গীতায় এ জীবন কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের মাধ্যমে রূপায়িত হয়েছে। পৃথিবীকে পরিত্যাগ করা ধর্মের লক্ষ্য হয়নি– বিশ্বনিয়ন্ত্রার শক্তির আলোকে মানব জীবনকে বিকশিত করাই ধর্মের উদ্দেশ্য।

বৌদ্ধধর্মে সুষ্ঠু জীবনের আটটি পথ দেখানো হয়েছে।[২৬ (পৃ:-৩৬)] এ অষ্ট মার্গে পৌঁছানোর চাবিকাঠি হলো মধ্যপন্থা ও মিথ্যাচার, হত্যা, মিথ্যা, চৌর্যবৃত্তি, ব্যভিচার নিন্দিত ও ঘৃণিত। সমগ্র জীবনের যে নিয়ম তাকে লঙ্ঘন না করে প্রতিপালন করবার জন্যে রয়েছে আহ্বান। জীবে দয়া ও অহিংস এর মূলমন্ত্র। চীন, জাপান ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব প্রত্যক্ষ।

ইরানের জরথুস্ত্রবাদে বলা হয়েছে–[২৬ (পৃ:-৩৬)] 'মানব জীবন সংগ্রামের জীবন'– মানুষ যা ভোগ করবে তা নিজের হাতে, মেহনত দিয়ে অর্জন করে নিবে। বিশ্বনিয়ন্তাকে ভালবাসলে মানুষকেও ভালবাসা যায়। ধর্মের সার বস্তু হলো সত্য। আর আইনের মৌলিকতা পূণ্য। মানুষ তার কাজের জন্যে দায়িত্বশীল। বিশ্বস্ততা, 'আহুরা মর্যাদা' বা বিশ্বপ্রদীপের সাথে– 'আহরিমানে' (আকোমানি) সংগ্রাম চলছে অনুক্ষণ। আহরিমান অন্ধতা ও কালিমার প্রতীক। 'আাহুরা মযাদার' সাহায্য নিয়েই মানুষ পাপ-কালিমা, দুঃখ-দুর্দশা পার হয়ে যেতে পারে। পারসীদের দৈনন্দিন জীবনে এ মতাবাদের প্রভাব অপরিসীম। সত্য, সৎচিন্তা, দয়া ও কর্মময় জীবন এ ধর্মের মূল কথা।

চীনের কনফ্যুসীয়বাদ মধ্যপন্থাকেই ধর্মের সারবস্তু সাব্যস্ত করেছে। 'মঙ্গলকে মঙ্গলের মাধ্যমে, মন্দকে ন্যায়নীতির দ্বারা জয় কর।' উদারতা, সাধুতা, উপযোগিতা, প্রজ্ঞা ও আন্তরিকতা কন্‌ফ্যুসীয়বাদের মূলমন্ত্র; তার বক্তব্য হলো জীবনকে গ্রহণ করতে হবে ও সমাজের সাথে সুষ্ঠু সম্পর্ক ও সমঝোতা স্থাপন করতে হবে। এমনি করেই শান্তিশৃঙ্খলা স্থাপিত হয়। এর নামই হলো 'লী' (harmony)। [২৬ (পৃ:-৩৬)] মাতা-পিতা, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে পারস্পরিক সমঝোতা ও সুষ্ঠু সম্পর্ক স্থাপন চীনের জাতীয় জীবনের ভিত্তি। লাওৎসেও জীবন পথের কথা বলেছেন,- [২৬ (পৃ:-৩৬)] এ পথ বিশ্বস্ততা, দয়া, ন্যায়নীতি ও সুবিচারের পথ–' অমঙ্গলকে মঙ্গলের মাধ্যমে জয় করার পথ। কনফ্যুসীয়াস ও লাওৎসের ধর্মের মধ্যে পার্থক্য এই যে, লাওৎসে সামাজিক জীবন থেকে কিছুটা দূরে সরে থাকবার পক্ষপাতী ছিলেন। এ দিক দিয়ে লাওৎসের মতবাদ বৌদ্ধধর্ম ও খ্রিস্টধর্মের স্বভাবধারাজাত।

সন্ন্যাসবাদ ইহুদী ধর্মের লক্ষ্য নয়। এ জীবনকে আল্লাহর নীতির আলোকে সুখী সুন্দর করে গড়ে তুলতে হবে। পরিপূর্ণতা লাভ করতে হলে মানুষকে কঠোর সাধনায় ব্রতী হতে হবে। হযরত মূসা (আ.) বলেন : [২৬ (পৃ:-৩৬)] আল্লাহর শক্তি অপরিসীম, চিরন্তন ও সর্বব্যাপী। তাঁর থেকেই মানুষের জীবনে আদর্শের রূপ

প্রতিফলিত হয়। মানুষ সৃষ্টির সেরা। বাস্তব ও আধ্যাত্মিক বিকাশের মধ্যেই সাধনার পথে তার উর্ধ্বগতি। দশটি উপদেশের মধ্যে রয়েছে : একমাত্র আল্লাহর উপাসনা করা, মূর্তি পূজা না করা, মাতাপিতাকে ভক্তি করা, অযথা নরহত্যা না করা ও প্রতিবেশীর ধন-সম্পদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি না রাখা।

শোষিত-নিপীড়িত রোমক সাম্রাজ্যে শান্তির বাণী নিয়ে আসলেন হযরত ঈসা (আ.)। নিপীড়িত ও অবহেলিত মানুষকে তিনি শোনালেন আশ্বাস বাণী, দেখালেন আশার আলো; বললেন : [২৬ (পৃ:-৩৭)] আল্লাহর ইচ্ছা শুধু বেহেশতে নয়, দুনিয়াতেও রূপায়িত হবে। মানুষ যখন সমাজে জন্ম নেয় তখন তার ঋণের শেষ নেই। এ ঋণ তাকে পরিশোধ করতেই হবে। সমগ্র মানুষের জন্যে প্রেম, দানশীলতা, সাম্যের বাণীও প্রতিষ্ঠিত হবে। জীবনের হাসি-আনন্দ হযরত ঈসা (আ:) কে সমানভাবে আন্দোলিত করেছে। এসব তিনি কখনই বাদ দিতে চাননি। ভাল মন্দ সব মানুষই আল্লাহর সন্তানের মত। পরবর্তীকালে– "আল্লাহর পাওনা আল্লাহকে ও সীজারের পাওনা সীজারকে মিটিয়ে দাও"–[২৬ (পৃ:-৩৭)] হযরত ঈসা (আ.) এর এ বাণীর এমন ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, যার ফলে মানুষের জীবন সম্পূর্ণরূপে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। মৌলিকভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে, তিনি মানুষের জীবনে দ্বৈত নীতির দুর্লভ্য প্রাচীর রচনা করার কথা কল্পনা করতেও পারেন নি। আর তা করলে খ্রিস্ট ধর্ম নিছক ব্যক্তিগত জীবনেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়।

ধর্মের ইতিহাসে সর্বশেষ বিবর্তিত ধর্ম ইসলাম। এর প্রাণনির্যাস হলো তাওহীদ - আল্লাহ এক ও অভিন্ন এ কথা প্রচার করে ইসলাম। ইসলাম রচনা করেছে আল্লাহ পাক ও মানুষ এবং মানুষের সাথে মানুষের বিরাট ঐক্যবন্ধনী। এ থেকে যে কেবল জীবন সম্পর্কে একক ও মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম হয়েছে তাই নয়, তাওহীদ নিয়মের রাজত্বের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বিজ্ঞানেরও প্রেরণা দিয়েছে। এতে করে নীতিবোধ, আইন ও ন্যায় পরায়ণতার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী বিপ্লব সাধীত হয়েছে। মানব মঙ্গল তাওহীদের শেষ পরিণতি। তাওহীদ তাই কেবল ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশী নয়, সামাজিক ও মানসিক প্রত্যয়। ইসলাম বিশ্বাস করে যে, দুনিয়ার সব জাতির মধ্যেই আল্লাহর নবীরা এসেছেন ও তাঁরা তাওহীদ, নৈতিকতা ও সুবিচারের অমিয় বাণী প্রচার করে গেছেন। এ সব নবীতে ঈমান রাখা ধর্মের অন্যতম মূলনীতি হিসেবেও সাব্যস্ত হয়েছে। আর রাসূলে আকরাম (সা:) সেই ধর্মকেই পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। একেই বল হয় রিসালাতের নীতি। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, মানুষের অধিকার ও খিলাফত নীতি কেবল ইসলামেই ঐক্যসূত্রে গ্রথিত রয়েছে। রাসূল (সা:) বলেছেন : [২৬ (পৃ:-৩৭)] মানুষকে যে ভালবাসে আল্লাহকে সে ভালবাসে।

ইসলাম বাস্তব জীবন ও আধ্যাত্মিক জীবনের সমন্বয় সাধন করেছে। পার্থিব জীবন আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ ও বাস্তব ভিত্তি এবং আধ্যাত্মিক জীবন পার্থিব জীবনের নৈতিক গাঁথুনি। বাস্তব জীবনকে সুষ্ঠু ও সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্যে রয়েছে অফুরন্ত প্রেরণা। তবু পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই সব জ্ঞানের শেষ নয়। লতিফা বা কালবের বিকাশের মাধ্যমে যে জ্ঞানের নতুন দরজা খুলে যায়, এ পথে সাধনা করতে হলে আত্মশুদ্ধি, প্রেম অর্জনে সম্যক, জ্ঞান-চৈতন্য চাই। তবেই আল্লাহর প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান ও আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ লাভ করা সম্ভব হয়। আদর্শের ধারণায় ধর্মীয় আদর্শের সর্বোত্তম বিবর্তন তাওহীদের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে। জাগতিক ঐক্য, মানবিক ঐক্য, সাম্য, স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব এর থেকেই জন্ম নিয়েছিল। ইসলাম এর ওপর জোর দিয়ে যে বিপ্লবের গোড়াপত্তন করেছে, নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও তার প্রভাব সমগ্র পৃথিবীতে সুপরিস্ফুট ও সদা জাগ্রত।

ইসলাম মানুষের জীবন-পথের বাস্তব দিশারী। এর মূল কথাই হচ্ছে ব্যক্তিগত উৎকর্ষ সাধন ও সামাজিক উন্নয়ন পরিবর্তন। ইসলামী সমাজ যুগে যুগে সংগঠিত হয় ইসলামী সমাজনীতিকে অবস্থা ও প্রয়োজনানুগ রূপায়নের মাধ্যমেই। ইসলামী আইন-বিজ্ঞানে একেই বলা হয় ইজাতিহাদ। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, তমদ্দুন, শিক্ষা সব বিষয়েই যুগ যুগ ধরে রয়েছে এর ব্যাপক, সর্বাঙ্গীন ও চির সুন্দর ভূমিকা। স্বৈরতন্ত্রের স্থানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছে সার্বজনীন খিলাফত, অসাম্যের মাঝে সাম্য, মানুষের অর্থনৈতিক অধিকার তাওহীদ ভিত্তিক এক মানবিক সংস্কৃতি বা তমদ্দুন, অশিক্ষার স্থানে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষা।

ব্যক্তি-সত্ত্বা ও সমাজকল্যাণ উভয়ই ইসলামে পেয়েছে তার নিজ নিজ স্থান। মানুষকে ধর্ম পর্যন্ত গ্রহণ করবার ব্যাপারে ইসলাম যুক্তির আশ্রয় নিয়েছে, গ্রহণ করার সময় যুক্তি দিয়ে বুঝে নিতে বলেছে। কারণ সে বুদ্ধিজীবী। রাসূল (সা:) বলেছেন[২৬] (পৃ:-৪৩) : ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন কর না, স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন কর। আবার সমাজের কাছে তাঁর নির্দেশ : শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকাবার আগেই তার মজুরি পরিশোধ কর। তাই সুষ্ঠু সমাজ গঠন হয়ে উঠেছে সব সময়েই ইসলামের বিশেষ লক্ষ্য।

ইসলাম সব সময়ই এক সাধনা-সাপেক্ষ ও প্রচেষ্টা-ভিত্তিক জীবন পথের সন্ধান দেয়। ইসলাম বলে : لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلاَّ مَاسَعَ "যে যতটুকু শ্রম সাধনা করে সে ততটুকুই ফল পাবে।" সাধনার পথে এগিয়ে যাবার জন্যে কুরআন ঘোষণা করল : মানুষ ধাপে ধাপে প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। আল্লাহ কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করে না, যে পর্যন্তনা তারা নিজেরা নিজেদের উন্নত করে। মানুষ প্রত্যেকেই নিজ কর্মের জন্যে নিজেই দায়ি থাকবে। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) বললেন:

اِلا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَاعِيَتِه-

"সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই এক একজন মেষপালক। আর প্রত্যেক মেষপালককে তার মেষের হিসাব অর্থাৎ কাজের হিসাব দিতে হবে।"

কেউ কেউ বলেন, মানুষ কেবল ভাল বুঝে কাজ করুক– ধর্ম কথা একটা লোক ঠকানো বিষয় মাত্র, কথাটি কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না। কেননা 'ভাল বুঝে' কথাটির ভেতরে অনেক বুঝার গরমিল ও কাজের গলদ রয়েছে। অনেক সময়ই মানুষের চিন্তাধারা বিভিন্ন স্বার্থজড়িত অসরল পথের অনুকূল। মানুষ (ব্যক্তি, জাতি বা গোষ্ঠী) যা নিজের জন্যে ভাল মনে হয় তা করবার পরেও এবং পরিবেশের উপর প্রভুত্ব পেয়েও বিভিন্নভাবে ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক গোলামির শৃঙ্খলকে বেঁধে চলেছে নিজের পায়ে, জোরে আরও জোরে। যতই সময় এগিয়ে চলেছে ততই। কথা হচ্ছে, ইচ্ছে করলেই যা সবার জন্যে ভাল শুধু তাই কেন, কখন কখন বা শুধু নিজের জন্যে যা ভাল তাও কার্যে ফলানো যায় না। বর্তমান দুনিয়ার শক্তি সংঘর্ষ ও যুদ্ধই এর প্রধান নজির। এর জন্যে যেমন সুসংগত পরিবেশ দরকার, সাথে সাথে ভাল মন্দের একটি নৈতিক মানদণ্ডও দরকার। নতুবা মানুষের পদে পদে হয় অধঃপতন- এগিয়ে গিয়ে সে পিছু হাঁটে। সাময়িকভাবে সময়ের প্রয়োজনে একটু-আধটু নৈতিক মানদণ্ড দুনিয়ার বিভিন্ন ধর্ম দিয়ে গেছে। কিন্তু নৈতিক মানদণ্ডের পরিপূর্ণতা ও তার পরিপোষক পরিবেশ সৃষ্টির শিক্ষার বিকাশ হয়েছে কেবলই ইসলামের ভেতর দিয়ে।

ইসলাম দিয়েছে মানুষের জীবনের মানদণ্ড। মানুষের বিবেক, প্রচেষ্টা ও মনীষা একে কাজে লাগাবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে একে প্রয়োগ করতে হবে সমবিচার ও মৌলিকভাবের উপর লক্ষ্য রেখে। মনে রাখতে হবে যে, এই মানদণ্ডই যথাসর্বস্ব নয়। তাই যদি হতো, তবে কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় দুনিয়ার বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিকে বশে এনে কাজে লাগাবার কথা ইসলামে বা কুরআনে থাকতো না, এমনকি অতীতে মুসলমানরা সভ্যতা বিনির্মাণে তাদের চিহ্ন রেখে যেতেও পারতেন না।

তবে প্রগতি কোন পথে? প্রগতির জন্যে মানুষের আমিত্ব ও নীতি উভয় চাই। একটিকে ছাড়লেই শান্তির পথে ব্যাঘাত হয়। কারণ প্রগতির পথ যেমন অবিরাম কর্মচঞ্চলতার পথ, তেমনি সবিরাম শান্তি উপভোগের পথও বটে। বর্তমান ইউরোপের নীতিজ্ঞানহীন বস্তুতান্ত্রিক সাধকেরা বাস্তব বিষয়ে ইজতিহাদী মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছে, কিন্তু এটা ইসলামের ইজতিহাদ নয়। কারণ, তারা নৈতিক পরীক্ষায় শুন্য পেয়ে বসে আছে। আমিত্ব ও বস্তুতন্ত্রকে তারা সংযত গণ্ডির বাইরে ছেড়ে দিয়েছে। ধর্মের নামে অনাচার ও কুসংস্কারকে তারা ধর্মের সাথে এক গোষ্ঠীতে স্থান দিয়েছে ও ধর্মীয় মূলনীতির কার্যকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে চিন্তা করা ছেড়ে দিয়েছে। নৈতিক মানদণ্ডের সঠিক মূল্য নিরূপণে তারা ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। আমাদের অধিকাংশ উলামা যেমন কাজ ছেড়ে শুকনো-নীতির নীল চশমার ভেতর দিয়েই পৃথিবীর মূল্য নির্ধারণে ব্যস্ত হয়েছেন, তেমনি

আমিত্ব ও বাস্তব প্রয়োজনের হলদে চশমার ভেতর দিয়ে এঁরাও জিনিসের বিচার করেন। নিজের ঠুসির রঙেই তারা পৃথিবীকে দেখেন, আর এর রূপ বিচার করেন। ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত অধিকাংশ শিক্ষাভিমানীরা এই দলভুক্ত। নীতি ছেড়ে শুষ্ক বস্তুবাদ গ্রহণের ফলে পৃথিবীতে হিংসা-বিদ্বেষ, হানা-হানি চলছে,মানুষের নৃশংসতায় নিরীহ মানুষ ব্যথিত-মথিত হয়েছে– হচ্ছে বারে বারে। মুসলিম সমাজে নীতিকে বাস্তবতা থেকে সরিয়ে নিয়ে কিতাবগত করে রাখার ফলে জীবনের সাথে ইসলামের সংযোগ সাধিত হচ্ছে না।

ইসলামের পথে, অর্থাৎ ইজতিহাদ ও নীতির মিলন পথেই রয়েছে প্রকৃত প্রগতি। নীতির স্রষ্টা আল্লাহ; কাজ করবার ভার মানুষের ওপর। তার কাজের ব্যারোমিটার হচ্ছে এই নীতি। ইসলাম এই নীতিবোধকে শক্তিশালী করেছে দায়িত্ববোধের ভেতর দিয়ে। ইসলামের এই ইজতিহাদ, নীতিবোধ ও দায়িত্ববোধ মানুষের ব্যক্তিগত সামাজিক ও সর্বকালীন শান্তির জন্যেই গড়া হয়েছে– মানুষের স্বাধীনতাকে খর্ব করবার জন্যে নয়। কারণ যা ইচ্ছা তা করতে পারাটা স্বাধীনতার অপনাম– উচ্ছৃঙ্খলতা।

নৈতিক মূল্যমান এবং উচ্চতর আদর্শসমূহ ব্যক্তিত্ব সুস্থতার উন্নয়ন সাধনের একটা বিশেষ কার্যকারণ এবং এ ক্ষেত্রে একটা বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম। একটা সমন্বয়কারী জীবনদর্শন উপস্থাপনই ধর্মের লক্ষ্য। ধর্মের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে মানুষের সভ্যতার অগ্রগতিতে- তার নৈতিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন উন্নয়নে, তার সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা ও স্থাপত্যে। পরিশেষে মোটাদাগে ব্যক্তি জীবনে ধর্মের কয়েকটি বিশেষ প্রভাব বর্ণনা করে বিষয়ের ইতি টানছি।

১. ধর্ম- তার তাৎপর্য জীবন কর্ম : ধর্ম [9] শব্দটি ধর্মমত সম্পর্কিত জ্ঞান বুঝায়। অক্সফোর্ড ডিকশনারীতে ধর্মের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে– "অতিমানবীয় নিয়ন্ত্রক শক্তির মানবীয় অনুমোদন এবং বিশেষ করে একজন ব্যক্তির আল্লাহর স্বীকৃতি- যিনি আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী, আচার-আচারণ ও মানসিক প্রবণতার উপর এই স্বীকৃতি বা অনুমোদনের প্রভাব অনিবার্য হবে।"[৫২] (পৃ:-৩৯) ধর্মে একই সাথে বিশ্বাসের বিষয়াদিও শামিল রয়েছে। জ্ঞান হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্র। আর বিধান হচ্ছে সংবেদনশীল জীবনের সারনির্যাস। জীবনের সমালোচনামূলক ঘটনাবলী একজনের মন-মেজাজ ও প্রকৃতিকে পরীক্ষার সম্মুখীন করে দেয়। আর একজনের বিশ্বাসই তাকে মানসিক ভারসাম্য সহকারে অনুরূপ অবস্থার মুকাবিলা করতে সক্ষম বানিয়ে দেয়।

২. ধর্ম ব্যক্তিত্বের জন্যে অপরিহার্য উপকরণ : ব্যক্তিত্বের যথার্থ ও যথাযথ উন্নয়ন একান্তভাবে নির্ভর করে বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানসিক সম্প্রসারণের নিরবচ্ছিন্ন প্রবৃদ্ধি পদ্ধতির কার্যকারিতার উপর। তা জীবনের সব ঘটনার ক্ষেত্রে সতর্ক ও সক্রিয় জবাব বা প্রতিক্রিয়া বেষ্টন করে। একটা আদর্শ ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা এবং সংবেদনশীল স্থায়িত্বের প্রেরণা দানের জন্যে কঠোর চেষ্টা চালানোই ধর্মের প্রধান লক্ষ্য। অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা সমূহের

---

[9] ধর্ম শব্দটি সংস্কৃত 'ধৃ' ধাতু থেকে উদ্ভূত। 'ধৃ' মানে ধারণ করা। সুতরাং ধর্ম বলতে বুঝায় সে জিনিসকে যা মানুষকে ধারণ বা পোষণ করে। ইংরেজী 'রিলিজিয়ন' শব্দটিও উৎপন্ন মূল 'রিলিজিও' থেকে। রিলিজিও মানে যুক্ত করা। আর এই বুৎপত্তিগত অর্থে রিলিজিয়ন বলতে বুঝায় মানুষকে সত্য ও কল্যাণের সাথে যুক্ত করাকে। অন্য কথায়, ধর্মই বলি আর রিলিজিয়নই বলি, মানুষের সামাজিক জীবনকে ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করা, মানুষকে ন্যায়, সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের- তথা পরমসত্তার সন্ধান দেয়াই এর কাজ। এ অর্থেই ধর্মকে গতানুগতিকভাবে দেখা হয়ে আসছে এমন এক বা একাধিক অতীন্দ্রিয় ও অতিমানবীয় শক্তিতে বিশ্বাস হিসেবে, যা মানুষের ভাগ্য এবং জগতের গতি-প্রকৃতিকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। এই অতীন্দ্রিয় ও অদৃশ্য শক্তিকে বিশ্বাস থেকে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির মনে সৃষ্টি হয় সেই অদৃশ্য শক্তির উপর নির্ভর করার এবং এর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছা ও ব্যাকুলতা। এ বিশ্বাস থেকেই সেই ব্যক্তির মনে ক্রমশ গড়ে ওঠে ভীতি, ভক্তি, প্রেম ও আনুগত্যের আবেগ এবং ধর্ম নির্দেশিত বিশেষ পন্থায় আচরণ করার মানসিকতা। এ মতে ধর্ম মানুষের তৈরি কোন কৃত্রিম বিধান নয়, বরং একটা পুরোদস্তুর অলৌকিক ও দৈব (divine) ব্যাপার। যথার্থ ধর্ম মাত্রই অতিপ্রাকৃত ও প্রত্যাদিষ্ট (revealed) এবং মানুষ ও তার স্রষ্টার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনই এর মূল উদ্দেশ্য। (ড. আমিনুল ইসলাম, মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, চতুর্থ মুদ্রণ, আগস্ট-২০০৮, পৃ:- ১।)

মুকাবিলার জন্যে একটা সুস্থ ও সহিষ্ণুতাপূর্ণ আচরণ লাভ করা সম্ভব কেবল আল্লাহ প্রদত্ত বুদ্ধিমত্তার প্রতি সুদৃঢ় ও অকৃত্রিম বিশ্বাস দ্বারা।

৩. ধর্ম নিরাপত্তার অনুভূতি সৃষ্টি করে : আমাদের জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে নিরাপত্তার অনুভূতি লাভের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করি। জীবনের প্রাথমিক দিনগুলো পিতামাতার দরদপূর্ণ স্নেহযত্ন ও পৃষ্ঠপোষকতা আমাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। আর বয়স্ক জীবনে ভারসাম্যপূর্ণ সংবেদনশীলতাকে বিপর্যস্ত করে দেয়ার মত পরিস্থিতির সম্মুখীন হই, তখন আল্লাহ তা'আলার সুনিশ্চিত ও সুপ্রসন্ন অনুগ্রহের প্রতি বিশ্বাস এককভাবেই আমাদের বহুবিধ মানসিক সংঘাত থেকে আমাদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম।

৪. ধর্ম ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক ও সর্বাত্মক উন্নয়ন চায় : ধর্ম জীবনের ইতিবাচক কার্যাবলীর চালিকা শক্তি। ধর্মানুগ জীবন বলতে জীবনের সব আনন্দ-আহলাদ বিতাড়িত করা বুঝায় না। জীবন সম্পর্কিত সংকীর্ণ ও গোঁড়ামীপূর্ণ ধারণা, আত্মাহীন জীবন বুঝায়। প্রকৃত ধর্ম ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ পূর্ণত্ব বুঝায়। দৈহিক, মানসিক, সংবেদনশীল ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজন সমূহ একটা সুস্বাস্থ্যপূর্ণ জীবন দৃষ্টি গড়ে তোলার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। প্রকৃত ধর্ম সমস্ত প্রয়োজনের প্রতিনিধি বৃত্তির ভারসাম্য রক্ষা করে। এ ভারসাম্য না থাকলে বা ক্ষুণ্ন কিংবা বিঘ্নিত হলে সর্বাত্মক বিপর্যয় অবধারিত হয়ে পড়ে। আত্মোন্নয়ন সমাজকল্যাণমূলক ভাবধারার সাথে মিলিত হয়ে আত্মবিবেচনার ও আত্মানুভূতির বিজয় সূচিত করে।

৫. ধর্ম পালায়ণপরতা রোধ করে : বাস্তব জীবনের কঠোর পরিশ্রম থেকে পালিয়ে থাকার কাজে ধর্ম কখনোই ব্যবহৃত হয় না। নিতান্ত ভাগ্যের উপর নির্ভরশীলতা মহান আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের প্রতি বিশ্বাসের পরিপন্থী। ধর্মকে একটা স্থিতিশীল বিশ্বাস বা মত রূপে গ্রহণ করা হলে আল্লাহ সম্পর্কিত ভুল মনোভাবের প্রকৃত লক্ষণ প্রকট হয়ে পড়বে। অথচ মানুষ নিজেকে যেমন বিশ্বাস করে তেমনি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস অবিচল রাখাও প্রত্যেকটি মানুষেরই কর্তব্য।

ধর্ম নিরবচ্ছিন্ন শৌর্য ও সাহসের সূত্র বা উৎস। জীবনের বিশেষ কোন ক্ষেত্রের ব্যর্থতা ও হতাশা নৈরাশ্য একথা বুঝায় না যে, জীবনের উদ্দেশ্যই চিরকালের তরে হারিয়ে ফেলা হয়েছে। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের সাথে জীবনের লক্ষ্য সম্পৃক্ত। প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনেরই একটা পরিসমাপ্তি যা কারুরই অজানা নেই এবং আল্লাহর সাহায্য নিয়ে ভবিষ্যতের মুকাবিলা করাই প্রত্যেকটি মানুষের অদৃষ্টলিপি। এমন অনেক নৈরাশ্য ও হতাশা আছে, যা আমরা আগাম দেখতে পাই না, তা নিয়ন্ত্রণও করতে পারি না। আকস্মিক মহাদুর্ঘটনা ও বিপদ-আপদ প্রায়ই এবং যখন তখন সংঘটিত হয়ে থাকে প্রত্যেক দেশ ও সমাজে, প্রতিটি ব্যক্তি জীবনে। এই ধরনের পরিস্থিতি জীবনে বহু জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে থাকে। এসব সমস্যা একটা মানসিক ভারসাম্য সহকারে সব অতিশয্যতা দূর করার সুপরিচিত আচরণ দ্বারা সমাধান করা সম্ভব। আর এ ধরনের একটা আচরণ কেবল মাত্র ধর্মের মাধ্যমেই লাভ করা যেতে পারে।

৬. ধর্ম জীবনের চালিকানীতি : একটি ব্যক্তিত্বের সুবিন্যস্ত ও ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ এই তাৎপর্য বহন করে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকেই একটা আত্মনিয়ন্ত্রণ শক্তি দ্বারা ভূষিত করা হয়েছে, যা সমাজ কল্যাণমূলক কাজে তার সমস্ত কর্মক্ষমতা নিয়োজিত করতে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে। এই শক্তিটির সংবেদনশীল স্থায়িত্ব ও পূর্ণাঙ্গ স্থৈর্য তার মন-মেজাজের উপর প্রভাবশালী রূপে প্রতিষ্ঠিত। এই ধরনের আচরণ অর্জন করা সম্ভব আল্লাহ প্রদত্ত বুদ্ধিমত্তা ও তাঁর বিশ্বপরিকল্পনার প্রতি অবিচল আস্থা ও প্রত্যেয়ের দ্বারা। এই জীবনের পরিসমাপ্তিতে মৃত্যুর পর আরও একটা জীবন আছে, এই বিশ্বাস আমাদেরকে কষ্টসহিষ্ণুতা ও বিশাল আত্মবিশ্বাসে বলিয়ান করে। ধর্মের আর একটি ব্যাখ্যা হচ্ছে, জীবনের সমস্যাবলীর প্রতি বাস্তবতাভিত্তিক দৃষ্টিপাত। আর জীবন হচ্ছে একটা নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা যা মানুষের মৃত্যুর দরুন নিঃশেষ হয়ে যায় না।

৭. ধর্ম মানব মনের দিগন্ত প্রসারিত করে : ধর্ম মানব মনের দিগন্তকে প্রসারিত করে। সেখানে জীবন এ পৃথিবীতে সীমিত নয়; এর উর্ধ্বে তা এক অনন্তজগতে সম্প্রসারিত। এটাই মানুষের অন্তরে আশার দ্যুতি আনে এবং তাদের সাহস যোগায় সরাসরি অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে। ধর্ম শেখায় প্রেম, সহানুভূতি ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব। এভাবে তা হয়ে দাঁড়ায় শান্তি, উন্নতি ও প্রগতির একমাত্র পথ। ধর্মই মানুষের কঠিন জীবন-সংগ্রামে সর্বাধিক সম্ভাব্য প্রস্তুতি দান করে।

৮. ধর্ম মানুষকে নিঃস্বার্থ বানায় : ধর্ম বিশ্বাসই কেবল মানুষকে স্বার্থচিন্তার উর্ধ্বে নিতে পারে এবং মহৎ ও উত্তম আদর্শের জন্যে কষ্ট স্বীকার করাতে পারে। ধর্ম থেকে মুক্ত হলেই মানুষ স্বার্থচিন্তার বাইরে কিছুই ভাবতে পারে না। ফলে সে এক পর্যায়ে পশুতে পরিণত হয়। বহুলোক মহান সত্যের জন্যে জীবনভর সংগ্রাম করে যায় অথচ পার্থিব বিবেচনায় সে কোন স্বার্থই লাভ করে না। কোন মহৎ প্রেরণা এ মানুষের এরূপ নিঃস্বার্থ সংগ্রামে লিপ্ত করে যাতে তার কিছু পাওয়ার বদলে যা ছিল তাও হারায়? নিঃসন্দেহে ধর্ম বিশ্বাসের এটা হচ্ছে বহু অলৌকিক কীর্তির অন্যতম।

৯. সামাজিক সংহতি ও সম্প্রীতির সূত্রাকার : সামাজিক সংহতি ও সম্প্রীতি সাধনের ক্ষেত্রে ধর্ম কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গকে সমবেত করে, ফলে তাদের মধ্যে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়। ধর্মবোধ মানুষের মধ্যে ক্ষুদ্র অহং সত্ত্বার অবলুপ্তি ঘটায় এবং বৃহৎ অহং সত্ত্বার উত্তরণের পথ প্রশস্ত করে।

এসম্পর্কে অধ্যাপক ম্যাকাইভার ও পেজ (R.M. Maciver and C.H. Page) তাঁদের Society : An Introductory Analysis গ্রন্থে বলেছেন, ... the church at the sometime a fellowship a brotherhood to believers, basis of social intercourse." [১৪] (পৃঃ-২৩৭)

ধর্মের ফলে ব্যক্তি ক্ষুদ্র স্বার্থের উর্ধ্বে গিয়ে বৃহত্তর জীবনের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারে। যথার্থ ধর্মীয় চেতনা মানুষের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি করে। এ ক্ষেত্রে মানুষ সমবেত হয়ে পারস্পরিক ঐক্য, সম্প্রীতি ও সংহতির পথকে দৃঢ় করে।

অধ্যাপক ডেভিস (Kingsley Davis) তাঁর Human Society গ্রন্থে বলেন, One of the functions of religion is to justyfy, rationalise and support the sentiments that give cohesion to society." [১৪] (পৃঃ-২৩৭)

১০. ব্যক্তির চরিত্র গঠন : মানুষের চরিত্র গঠনে ধর্ম বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সুস্থ সমাজ জীবনের লক্ষ্যে ধর্ম সামাজিক নীতি আদর্শকে চর্চার জন্যে ব্যক্তিকে উৎসাহিত করে। ফলে মানুষের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি ঘটে। যে সমস্ত লোক সমাজে নীতিভ্রষ্ট তারা ধর্মচ্যুত বলে বিবেচিত হয়। ধর্মবোধের প্রভাবে মানুষ সহনশীল, সৎ, বিবেকবান, সহানুভূতিশীল, পরোপকারী এবং মমত্ববোধ যুক্ত হয়ে উঠে। ফলে মানুষে চিন্তা-চেতনা ও আচার-আচরণে সৎ চরিত্রবান হয়ে থাকে। এ ছাড়া সে সামাজিক দায়-দায়িত্ব যত্নসহকারে পালনে বিশেষভাবে আগ্রহী হয়ে থাকে।

১১. ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে সুনিয়ন্ত্রণ : সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই রয়েছে ধর্মের দিক-নির্দেশনা। যেমন বিবাহ, যৌন সংসর্গ, গর্ভধারণ, সন্তান জন্মদান, লালন-পালন, শিক্ষা, বার্ধক্য, মৃত্যু, অ্যান্তোষ্টিক্রিয়া, পেশা ইত্যাদি ক্ষেত্রে রয়েছে ধর্মের সক্রিয় দিক নির্দেশনা। আধুনিক মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনসহ সকল ক্ষেত্রে রয়েছে ধর্মের সক্রিয় উপস্থিতি। আর এ উপস্থিতি মানুষকে সমাজে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালিত করছে। ধর্ম মানুষের মধ্যে এই নিয়ন্ত্রণের লাগাম টেনে দিয়েছে। তাই সামাজিক ও

ব্যক্তি জীবনে ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। এ সম্পর্কে Religeon শীর্ষক গ্রন্থে ইভানস প্রিচার্ড (E. E. Evans Prichard) এর অভিমত উদ্ধৃত করে অধ্যাপক বিদ্যাভূষণ ও সচদেব বলেছেন,

> Religious rites are performed on many occasions as in relation to vital events and dominant interest birth, initiation marriage, sickness, death, hunting animal, husbandry and so on and they are intimately concerned with family and kinship interests and with political institutions. [১৪] (পৃঃ-২৩৬)

১২. অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ : মাক্সওয়েবার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে ধর্মের ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে, প্রোটেস্ট্যান্ট নীতিবোধ থেকে ইংল্যান্ড, আমেরিকা ও হল্যান্ডে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটেছে। ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীদের দেশ ইতালি ও স্পেনে পুঁজিবাদের বিকাশ এভাবে ঘটেনি। মাক্সওয়েবার তাঁর 'The Religion of India' (1958) গ্রন্থে উপমহাদেশে পুঁজিবাদের বিকাশে ধর্মের ভূমিকা ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর বিবেচনায় উপমহাদেশের ধর্মসমূহ বস্তুবাদের বিকাশে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক বিদ্যাভূষণ ও সচদেব মন্তব্য করে বলেছেন,

> ..... according to him (Max Weber), capitalism grew in the protestant nations like England USA and Holland. It did not grow in Italy and spain where the people are catholics. The Hindus lay great stress an spiritual progress. Hence materialism could not grow in India. [১৪] (পৃঃ-২৩৮)

বস্তুত: আঠার ও উনিশ শতকের বৈজ্ঞানিক সাফল্যে চমৎকৃত হয়ে পাশ্চাত্যের অনেক মনোবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানী ভেবে বসলেন ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেছে এবং বিজ্ঞানের কাছে তা চিরতরে আত্মসমর্পণ করেছে।তাদেরই অন্যতম একজন বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ ফ্রয়েড আধুনিক যুগে ধর্মের প্রয়োজনীয়তার স্বপক্ষের সব যুক্তির ব্যর্থতা দেখিয়ে বলেছেন, 'মানব জীবন তিনটি মনস্তাত্ত্বিক স্তর পার হয়ে চলেছে : কুসংস্কার, ধর্ম ও বিজ্ঞান। এখন বিজ্ঞানের যুগে আসায় ধর্ম অচল হয়ে গেছে।'[২০] (পৃঃ-১১)

ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের ধর্মবিরোধী মনোভাব ও ধর্ম বিদ্বেষের বিশেষ কতগুলো কারণ রয়েছে। সেখানে বিজ্ঞানী ও পাদরীদের ভেতর বিরাট বিতর্ক দেখা দিয়েছিল। ফলে তারা ন্যায়তই ভাবতে বাধ্য হলো, ধর্ম হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল প্রগতিবিরোধী পশ্চাৎমুখী ও কুসংস্কারপূর্ণ। তাই মানব সভ্যতার অগ্রগতি অব্যাহত রাখার জন্যে ধর্মকে অবশ্যই বিজ্ঞানের জন্য পথ ছেড়ে দিতে হবে।

এ দুর্ভাগ্যজনক বিরোধকালীন ইউরোপের অদ্ভূত জীবন ধারার সাথে নিজেদের তৎকালীন ইসলামী জীবন ধারার পার্থক্য বিচার-বিশ্লেষণ না করেই একদল লোক পূর্বসূরীদের থেকে প্রাপ্ত পবিত্র ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিরোধী হয়ে গেল এবং সোজাসুজি সেগুলোর বিলুপ্তিরও দাবী করে বসল। তারপর ইসলামী দুনিয়ায় পরাধীনতার অভিশাপ হয়ে দেখা দিল সংক্রামক অনুকরণের মহামারী। শাসিতরা সগৌরবে ভাবতে লাগল শাসকদের জীবন ধারাই একমাত্র প্রগতির পথ। তাই ইউরোপের মতই তাদের ধর্ম বর্জন করতে হবে। তা না হলে তারা প্রতিক্রিয়াশীলতা, অনগ্রসরতা ও আত্মম্ভরিতার গভীর ফাঁদে ফেঁসে যাবে বলে শংকিত হল।

অথচ তারা লক্ষ্যও করল না যে, পাশ্চাত্যের খ্যাতনামা সব মনীষীই ধর্মের বিরোধী নন। এমনকি তাদের এমন কতিপয় খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবী দেখতে পাই যারা নাস্তিক ইউরোপীয় জড়বাদী জীবনদর্শন থেকে মুক্ত থেকে ঘোষণা করেছেন, ধর্ম মানুষের জন্যে মনস্তত্ত্ব ও বুদ্ধিবৃত্তি উভয় বিবেচনায়ই অপরিহার্য।

তাঁদের ভেতর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলেন, জেমস্ জীনস। সংশয়ী নাস্তিক হিসেবে তিনি জীবন শুরু করেন। অবশেষে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মাধ্যমে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতম সমস্যার সমাধান খোদার বিশ্বাস ছাড়া সম্ভব নয়। বিখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক জীনস্ ব্রীজ তো ইসলামকেই প্রশংসা করলেন এ কারণে যে, জৈবিক ও আত্মিক জীবনে চমৎকার সমন্বয় ঘটিয়ে ইসলাম এক বাস্তব জীবনদর্শন দান করেছে। খ্যাতনামা ইউরোপের পুরোনো খোদা তাড়িয়ে এক নতুন খোদা আবিষ্কার করেছে, আর তা হলো বিজ্ঞান।[২০] (পৃ:-১২) ভ্যাটিকানের পরলোকগত পোপ পলের হুঁশিয়ারী এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'মানুষ আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দাসে পরিণত হয়েছে। পরমসত্তার দেয়া মুক্ত ইচ্ছা ও আত্মচেতনাকে সে আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কাছে সর্ম্পণ করতে চলেছে।'[৬] (পৃ:-৩৩)

মোটকথা মানুষের জীবনের এক বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে ধর্ম, প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে উভয় ক্ষেত্রে ধর্মের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এ সম্পর্কে অধ্যাপক টয়েনবি (A. Toynbee), ডসন (C. H. Dawson) প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানীদের অভিমত হল, মানব সভ্যতার জন্মস্থলে ধর্মের অস্তিত্ব বর্তমান। ধর্ম সামাজিক নিয়ন্ত্রণের একটি শক্তিশালী বাহনরূপে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে! এজন্যে বলা হয়,

> It is not that the sacred society or church becomes or takes the place of God, but rather that man finds he can best approach his God as he does so in fellowship, with others, as a member of a community which exists to secure the ends for which the God stands. [১৪] (পৃ:-২৩৫)

এর অর্থ এই নয় যে, ধর্মীয় সমাজ অথবা গীর্জা ঈশ্বরের স্থান অধিকার করে বসে আছে, বরং মানুষ মনে করে যে বন্ধুদের মত ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভে সক্ষম। ঈশ্বরের অস্তিত্ব যে, উদ্দেশ্য সাধন করে সে সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবেই তা অর্জন করতে সমর্থ। বস্তুতঃ মানুষের সমগ্র জীবন ব্যবস্থায় ধর্মের বিশেষ প্রভাব সর্বদাই পরিলক্ষিত হয়।

দার্শনিকদের দৃষ্টিতে সমাজ সমষ্টি :

দার্শনিকরা মনে করেন, বাহ্যিক পটভূমিতে সমাজ সমষ্টির কোনো অস্তিত্ব নেই। বাহ্যত আছে শুধু ব্যক্তিগত। এই ব্যক্তিগণের একজনের সাথে আর একজনের মিলিত হওয়া থেকে লব্ধ রূপ ব্যতীত সমাজ সমষ্টি বলতে কিছুই নেই।

এই দার্শনিকদের বাইরে সমাজ-বিদ্যা পারদর্শিগণ এই ধারণা পোষণ করেন যে, সমাজ-সমষ্টির একটা বাহ্যিক অস্তিত্ব অবশ্যই আছে। এই অস্তিত্ব স্বতন্ত্র এবং বাস্তব। এ কারণেই তো ব্যক্তিগণের পরস্পরের মধ্যে একটা সামাজিক সম্পর্ক বর্তমান থাকে, ব্যক্তিগণের অধিকার নির্ধারিত থাকে এবং সে সমাজের থাকে কতগুলো সুস্পষ্ট আইন-বিধান ও নিয়ম-ধারা।

সত্য কথা হলো, এই উভয় মত পরস্পর বিরোধী হলেও সত্য ও নির্ভুল। তা এজন্যে যে, দার্শনিকগণ বস্তু যা বিষয়সমূহের নিরেট স্পর্শযোগ্য বাস্তবতার দৃষ্টিকোণ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেন। অথচ ব্যক্তির সত্তাগত বাস্তবতার বাইরে প্রকৃতি জগতের পটভূমিতে বাস্তব হিসেবে তা পায় না। এ কারণে ব্যক্তিগণের অস্তিত্বের বাইরে সমাজ-সমষ্টির একটা বাস্তব অস্তিত্ব অস্বীকার করার কোনো উপায় দেখতে পান না।

পাঁচজন ব্যক্তি যখন একটি টেবিলের চতুস্পার্শ্বে গোল হয়ে বসে, তখন দার্শনিক এই পাঁচজনের একত্রে বসা লব্ধ সামষ্টিক রূপকে কোনো স্বতন্ত্র ও বিশেষ সত্তা যা এই পাঁচজনের বাইরে ৬ষ্ঠ হতে পারে তা তারা গণ্য করেন না।

কিন্তু অধিকারের দৃষ্টিকোণে প্রকট হয়ে উঠে যে, মানব-সমষ্টি আকারে যত ক্ষুদ্রই হোক, একটি সুপরিচিত বাস্তবতার অধিকারী। প্রচলিত ধারায় এই দৃষ্টিকোণই সর্বাধিক পরিচিত। সেই সমষ্টির এমন কতগুলো অবশ্য পূরণীয় অধিকার রয়েছে, যা ব্যক্তির জন্য নেই। অথবা এখানকার ব্যক্তির এমন কতগুলো কর্তব্য, অধিকার ও দায়দায়িত্ব রয়েছে, যেমন রয়েছে সমষ্টির জন্যে। বর্তমান দুনিয়ার সংস্কৃতিবান জাতিসমূহ সমাজকে এই দৃষ্টিকোণেই দেখে। তাই সমাজের একটা স্বতন্ত্র সত্তা তাদের নিকট প্রকট ও স্বীকৃত। তার একটা নিয়ম-শৃঙ্খলার আবশ্যকতা এবং বিশেষ কিছু অধিকার ও কর্তব্যও নির্ধারণ করে।

কুরআনের দৃষ্টিতে সমাজ সমষ্টি :

ইসলামের দৃষ্টিকোণে ব্যক্তি ও সমষ্টির অধিকার বিবেচনা করলে উভয়েরই নিজ ক্ষেত্র ও পরিবেশে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার না করে কোনো উপায় থাকে না। উভয়েরই স্বতন্ত্র্য, অধিকার ও সমান-সমান দায়িত্ব কর্তব্য অবশ্যই মেনে নিতে হয়।

কুরআনুল করীম এ অধিকারের দৃষ্টিতে সমাজের উপর দৃষ্টিপাত করে। তা সমাজের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব, জীবন ও পুনরুজ্জীবন, নির্দিষ্ট সময়কাল এবং অগ্রবর্তিতা ও পশ্চাদপদতা প্রভৃতি সবই রয়েছে বলে স্বীকার করে, যেমন এসব হয়ে থাকে ব্যক্তির ক্ষেত্রেও। এ কারণে ব্যক্তির প্রতিকূলে সমাজ-সমষ্টির বাস্তব অবস্থান অস্তিত্ব যথোপযুক্তভাবে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। এ পর্যায়ে কুরআন মজীদের আয়াতসমূহ আমাদেরকে স্পষ্ট পথ-নির্দেশ করে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন :

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

"প্রত্যেকটি জনসমষ্টির জন্যে নির্দিষ্ট একটা সময়কাল রয়েছে। তাদের জন্যে সেই নির্দিষ্ট সময়কাল যখন নিঃশেষ হয়ে আসবে, তখন একটা মুহূর্ত বিলম্বেও যাবে না, আগেও আসবে না।" (আল-কুরআন, সূরা আল আরাফ, আয়াত-৩৪) ।

كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا

-"প্রত্যেকটি উম্মতকে ডাকা হবে এই বলে যে, এসো নিজ নিজ আমলনামা দেখে নাও।" (আল-কুরআন, সূরা আল যাসিয়া, আয়াত-২৮)।

كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ

-"আমরা এমনিভাবেই প্রতিটি মানব মণ্ডলীর জন্যে তাদের কার্যকলাপকে চাকচিক্য করে দিয়েছি।" (আল-কুরআন, সূরা আল আনআম, আয়াত-১০৮)

مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ

-"তাদের মধ্যে কিছু সখ্যক লোক ন্যায়বাদী সত্যপন্থীও রয়েছে।" (আল-কুরআন, সূরা আল মায়িদা, আয়াত-৬৬)

أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ

"এদের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে, যারা সত্য সঠিক পথে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে।" (আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১১৩)

وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ

"প্রত্যেক জনগোষ্ঠিই তাদের রাসূলের উপর আক্রমণ চালিয়েছে, যেন তারা তাকে গ্রেফতার করতে পারে। তারা সকলেই বাতিলের হাতিয়ার সমূহের দ্বারা দ্বীনকে নিচু দেখবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি তাদের পাকড়াও করেছি। দেখ, আমার দেয়া শাস্তি কত কঠিন ও কঠোর ছিল।" (আল-কুরআন, সূরা আল-মু'মিন, আয়াত-৫)

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ -

"প্রত্যেক উম্মত- জনসমষ্টির জন্যে একজন রাসূল রয়েছে। অতঃপর যখন কোনো উম্মতের নিকট তার রাসূল এসে পৌঁছেছে, তখন পূর্ণ ইনসাফ সহকারে তাদের মধ্যকার ফয়সালা চুকিয়ে দেয়া হয়েছে।" (আল-কুরআন, সূরা ইউনুস, আয়াত-৪৭)

এ আয়াতসমূহ স্পষ্ট ও উদাত্ত কণ্ঠে গোষণা করছে যে, ব্যক্তিগণের সামষ্টিকতা সমাজ ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়, ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে সমাজের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। আর সে সমাজের একটা সময়কাল রয়েছে, কিতাব রয়েছে, চেতনা রয়েছে, সমঝ-বুঝ আছে, আনুগত্য ও অনানুগত্য, গুনাহ-নাফরমানী ও পুণ্যশীলতা রয়েছে এবং সামষ্টিকভাবে অনেক বিষয়ে ফয়সালাও হয়ে থাকে। (তাফসীরুল মিযান) [৪৫] (পৃ:-১০৮)

এসব আয়াতের প্রেক্ষিতে একথাও প্রকট হয়ে উঠে যে, কুরআন জনসমষ্টির উম্মতের ইতিহাসকে ততটাই গুরুত্ব দিয়েছে, যতটা দিয়েছে ব্যক্তির কাহিনীর উপর। বরং সত্য বলতে কী, পূর্বে ইতিহাসে প্রধানত ব্যক্তিরাই অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। তখনকার ইতিহাস রাজা-বাদশাহ ও বড় বড় দিগ্বিজয়ী রাজ্য স্থাপনকারী ব্যক্তিদেরই কাহিনীতে পূর্ণ ছিল। তাতে জনসমষ্টি ও জাতিসমূহের ইতিহাস বড় একটা ছিল না। আসলে জাতি ও জনসমষ্টির ইতিহাস গুরুত্ব ও স্বীকৃতি লাভ করেছে কুরআন মাজীদ নাযিল হওয়ার পর। তাই উত্তরকালে আল-মাসউদী ও ইবনে খালদূনের ন্যায় ব্যক্তিবর্গ মানব জাতির ও জনসমষ্টির খ্যাতনামা ইতিহাসবেত্তা রূপে আবির্ভূত হতে পেরেছেন। ফলে পরবর্তীকালে ব্যক্তিদের কাহিনীর স্থলে জাতি ও জনসমষ্টির ইতিবৃত্তই হয় ইতিহাসের প্রধান উপজীব্য। বস্তুত: ইসলামে সমাজ-সমষ্টির উপর যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বলেই এরূপ হওয়া সম্ভব হয়েছিল। সমাজ সমষ্টির ইতিহাসের প্রতি এরূপ গুরুত্ব দুনিয়ার অপর কোনো ধর্ম বিধান বা সামষ্টিক রীতিতে লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, ব্যক্তির চরিত্র গঠন ও মানুষোপযোগী প্রশিক্ষণ কেবল সমাজ-সমষ্টির মধ্যেই সম্ভব। এ কারণে ব্যক্তির মানব চরিত্র ও ভাবধারার সাংঘর্ষিক বৈচিত্র ও বিভিন্নতা সমাজ-পরিবেশের মধ্যেই মেরুকৃত ও একাকার হতে পারে কোনো-না-কোনো মাত্রায়। আর অন্যান্য দৃষ্টিতে ব্যক্তি ছাড়া সমাজ-সমষ্টির যেমন ধারণা মাত্র করা যায় না, তেমনি সমাজ সমষ্টি ছাড়া ব্যক্তির ধারণা করাও কঠিন।

এই কারণেই ইসলামের সালাত, হজ্জ, জিহাদ ও অর্থ ব্যয় প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিধানই সমাজ-সমষ্টির ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত। আর এগুলোর সমাজ-সমষ্টির ভিত্তি হিসেবে যথাযথ দায়িত্ব পালন সম্ভব করার জন্যেই ইসলামী হুকুমাত বাস্তবায়িত করে, আল্লাহর নির্ধারিত সীমাসমূহকে রক্ষা করে। এ ছাড়া সাধারণ মানুষকে সর্বাত্মক কল্যাণের দিকে আহবান 'আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার' এর দায়িত্ব এই সরকারই যথাযথভাবে পালন করতে পারে। এই সবের ফলে যে সৌভাগ্যপূর্ণ ও পবিত্র ভাবধারা সম্পন্ন সমাজ গড়ে উঠে। তাই ব্যক্তিদের নৈতিক উন্নয়ন সাধন করে। আর তাই হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য লাভের প্রধান উপায়। আর এসব কারণেই ইসলামী সমাজ দুনিয়ার অন্যান্য সমাজ-সমষ্টি থেকে অধিক উন্নত ও সার্বিক কল্যাণময় হয়ে উঠতে পারে।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তির জন্যে কতগুলো কর্তব্য অপরিহার্য করে দেয়া হয়েছে। যেমন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, একমাসকালীন সিয়াম, পিতা-মাতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও এই ধরনের অন্যান্য বহু কাজ ব্যক্তিকে

Dhaka University Institutional Repository

অবশ্যই করতে হবে। অনুরূপভাবে ইসলামী সমাজের জন্যে বেশ কয়টি দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারিত হয়েছে, সেগুলো সামাজিকভাবেই কাজে পরিণত করতে হবে এবং এ ব্যাপারে কোনো টাল-বাহানা বা গড়িমসি করা চলবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, আল্লাহ ইসলামী সমাজ সমষ্টিকে নির্দেশ দিয়েছেন :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ -

"পুরুষ লোক চোর ও মেয়েলোক চোর উভয়ের হাতসমূহ কেটে দাও তাদের উভয়ের দুষ্কৃতির শাস্তিস্বরূপ, আল্লাহর পক্ষ থেকে শিক্ষা দান হিসেবে। আর আল্লাহ প্রবল শক্তি সম্পন্ন সুবিবেচক।" (আল কুরআন, সূরা আল মায়িদা, আয়াত-৩৮)

ব্যভিচারী নারী-পুরুষ সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ-

"ব্যভিচারী নারী-পুরুষ এদের প্রত্যেককে একশ'টি করে দোররা মার এবং তাদের প্রতি দয়াশীলতা আল্লাহর আইন কার্যকর করার ব্যাপারে তোমাদেরকে যেন বাধাগ্রস্থ করতে না পারে। যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার হও এবং এই দুইজনকে দেয়া শাস্তি যেন মুমিনদের কিছু সংখ্যক লোক প্রত্যক্ষ করে।" (আল কুরআন, সূরা আন নূর, আয়াত-২)

সশস্ত্র ডাকাত ও লুণ্ঠনকারীর শাস্তি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ-

"যেসব লোক আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ চালায় এবং পৃথিবী জন-সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টির লক্ষ্যে চেষ্টা ও তৎপরতা চালায়, তাদের শাস্তি হচ্ছে তাদের হত্যা করা হবে বা শুলে চড়ানো হবে অথবা তাদের হাত ও পা বিপরীত পরম্পরায় কেটে ফেলা হবে কিংবা তাদের নির্বাসিত করা হবে। এই লাঞ্ছনা ও অপমান তো তাদের জন্যে এই দুনিয়ায়। আর পরকালে তাদের জন্যে তা থেকেও অনেক বড় শাস্তি রয়েছে।" (আল কুরআন, সূরা আল মায়িদা, আয়াত-৩৩)

অনুরূপভাবে ইসলামী দেশ ও রাজ্যের সীমানা সংরক্ষণ ও বাহিরাক্রমণ প্রতিরোধে সক্রিয়া থাকতে বলা হয়েছে ধৈর্য ও পাহারাদারির সাথে। ইরশাদ হচ্ছে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"হে ঈমানদার লোকগণ! ধৈর্য অবলম্বন কর, বাতিল পন্থীদের প্রতিরোধে দৃঢ়তা ও অনমনীয়তা প্রদর্শন কর, ইসলামী রাজ্য সংরক্ষণে সর্বদা প্রস্তুত থাক এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক। আশা আছে, তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে।" (আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত-২০০)

অপর এক আয়াতে রাষ্ট্রদ্রোহী আল্লাহ দ্রোহীদের মুকাবিলায় যুদ্ধ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেন শেষ পর্যন্ত তারা দমিত হয়ে সত্য দ্বীনের আনুগত্য করতে বাধ্য হয় এবং রাষ্ট্রদ্রোহীতা, আল্লাহদ্রোহীতা ও সর্ব প্রকারের সীমালংঘনমূলক কার্যকলাপ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত হয়। ইরশাদ হয়েছে :

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ -

"আর ঈমানদার লোকদের মধ্য থেকে দু'টি দল যদি পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তাহলে তাদের মধ্যে সন্ধি করে দাও। পরে যদি তাদের মধ্য থেকে কোনো এক পক্ষ অন্য পক্ষের প্রতি বাড়াবাড়ী ও সীমালংঘনমূলক আচরণ করে তাহলে এই সীমালংঘনকারী পক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই কর যতক্ষণ না সে পক্ষটি আল্লাহর বিধান পালনের দিকে ফিরে আসে। অতঃপর সে পক্ষ ফিরে এলে তাদের মাঝে সুবিচার সহকারে মীমাংসা-মিলমিশ করে দাও। আর সব সময়ই সুবিচার নীতি অনুসরণ করে চলতে থাক। কেননা আল্লাহ সুবিচার কারীদের পছন্দ করেন। (আল-কুরআন, সূরা আল হুযরাত, আয়াত-৯)

ঈমানদারদের সামষ্টিক দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে বলা হয়েছে :

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ -

"তোমাদের মধ্য থেকে অবশ্যই এক জন-সমষ্টি বের হয়ে আসতে হবে, যারা সার্বিক কল্যাণের দিকে সতত আহবান জানাতে থাকবে এবং ভালো-শরিয়ত সম্মত কাজের আদেশ করতে ও অন্যায়-মন্দ তথা, শরীয়াত বিরোধী কাজ করতে নিষেধ করতে থাকবে।" (আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১০৪)

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا -

"এবং তোমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আল্লাহর রজ্জু ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যেও না।" (আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১০৩)

أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ -

"তোমরা সকলে মিলে দ্বীন কায়েম কর এবং এ ব্যাপারে তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যেও না।" (আল-কুরআন, সূরা আশ্ শুরা, আয়াত-১৩)

এভাবে উপরোক্ত কয়েকটি আয়াত ছাড়াও আরো অসংখ্য আয়াতে কারীমা রয়েছে। যেগুলোর মাধ্যমে স্পষ্ট, অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, দ্বীন ইসলাম মূলতই এক সামষ্টিক জীবন-বিধান। আল্লাহ তা'আলা সামষ্টিক আদর্শরূপে তা মুমিন সমষ্টির উপরই পালন করা কর্তব্য করে দিয়েছেন; ঠিক যেমন বহু ব্যক্তিগত কাজের দায়িত্ব ব্যক্তিগতভাবে ব্যক্তিগণের উপর অর্পণ করেছেন। দ্বীন কায়েম করার দায়িত্ব মুসলিম লোক-সমষ্টিই পালন করতে পারে। তাদের সমন্বয়ে যে সমাজ-সমষ্টি গড়ে উঠে। আল্লাহর আদেশসমূহ পালন করা সেই সমষ্টিরই কর্তব্য, তাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যকের জন্যে এখানে কোনো বিশেষত্ব নেই, নেই কোনো তারতম্য।

এ দীর্ঘ আলোচনা থেকে আমরা এই তত্ত্ব উদ্ধার করতে পারি যে, কুরআন মাজীদে সমাজ সমষ্টির গুরুত্ব স্বীকৃত। আর সেই সমাজ সমষ্টিরই কর্তব্য এমন এক সরকার প্রশাসনিক সংস্থা গড়ে তোলা, যা সেই সমাজ-সমষ্টির পক্ষ থেকে তার অর্পিত ক্ষমতা বলে এই সামষ্টিক কর্তব্য সমূহ পালন করবে। কেননা ইসলাম এই কর্তব্য সমূহকে সামষ্টিক কর্তব্য রূপে ফরয করেছে এবং এই কাজগুলো করা কেবলমাত্র একটি সমাজ সমষ্টির পক্ষেই সম্ভব।

বস্তুতঃ একটি সরকার প্রশাসন-সংস্থা যা জীবনের বিভিন্ন দিকের গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব কর্তব্য সমূহ তার প্রাতিষ্ঠানিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাদির মাধ্যমে সুসম্পন্ন করবে, একান্তভাবে দায়িত্ব সহকারে প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ক্ষেত্রে আল্লাহর আইনসমূহ যথাযথভাবে কার্যকর করবে। এটিই ইসলামের সামষ্টিক বিধানের মূলকথা।

বিবেক বুদ্ধির দৃষ্টিতে সমাজ সমষ্টি :

ইসলামী শরীয়াতে মানুষের সহজ সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার পরে একটি অন্যতম উৎসরূপে স্বীকৃত। সেসব ক্ষেত্রে এই বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগের অবকাশ রয়েছে। সেখানে তা শরীয়াতের ঈমামগণ ব্যাপকভাবে ও গুরুত্ব সহকারে প্রয়োগ করেছেন। এখানে এই দৃষ্টিতে আমাদের বক্তব্য :

সুস্থ সহজ বিবেক-বুদ্ধি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করছে যে, জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে সরকার ও প্রশাসনিক সংস্থা গড়ে তোলা একান্তই কর্তব্য। কেননা তা না হলে মানুষের জীবনে কোনো ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করাই সম্ভব নয়। আর মানব-সমাজের শৃঙ্খল ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত রাখা যে একান্তই কর্তব্য, তাতে একবিন্দু সন্দেহের অবকাশ নেই।[৪৫] (পৃ:-১১৪)

মানুষের মধ্যে সামাজিক শৃঙ্খলা স্থাপন, তার সংরক্ষণ ও উন্নয়ন স্বয়ং মানব জীবনের সংরক্ষণ ও স্থিতির জন্যই আবশ্যক। সেজন্যে চেষ্টা-সাধনা ও কষ্ট স্বীকার সাধারণভাবে সমস্ত মানুষের জন্যেই কর্তব্য। কেননা মানুষ এরূপ শৃঙ্খলাপূর্ণ সমাজ পরিবেশেই নিশ্চিত ও নিরাপত্তাপূর্ণ জীবন-যাপন করতে পারে, পারে তার কাম্য কল্যাণ ও উৎকর্ষ উন্নতি অর্জন করতে। এ কারণে আমরা দেখতে পাই, দুনিয়ায় এমন বহু জাতি রয়েছে যারা কোনো দ্বীন বা শরীয়াতের অনুসারী না হলেও তারা নিজেদের সামাজিক শৃঙ্খলা দৃঢ়তার সাথে স্থাপন করেছে।

এ দৃষ্টিতে আমরা সহজে বলতে পারি যে, সামাজিক-সামষ্টিক নিয়ম-শৃঙ্খলা স্থাপন স্বাভাবিক বিবেক বুদ্ধিরই ঐকান্তিক দাবি। মানুষ কোন দ্বীন বা শরীয়াত পালন না করলেও এই কর্তব্যের কথা কেউ-ই অস্বীকার করতে পারে না।

আর সামাজিক নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যে একান্তই প্রয়োজন, তাও সর্বতোভাবে অনস্বীকার্য। এমন একটি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান প্রত্যেক সমাজে অবশ্যই থাকতে হবে, যা সেই সমাজের জনগণের সার্বিক সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে দিনরাত একান্তভাবে নিয়োজিত ও কর্মরত থাকবে। শুধু তাই নয়, সামাজিক-সামষ্টিক নিয়ম-শৃঙ্খলা বিধান, সংরক্ষণ ও উন্নয়নমুলক কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্যে দায়িত্বশীল ব্যক্তিও থাকতে হবে, যার মধ্যে এই দায়িত্বশীলতার জন্যে জবাবদিহির তীব্র অনুভূতিও থাকতে হবে। এ কারণে মানব সমাজের ইতিহাসে এমন কোন অধ্যায়ের সন্ধান পাওয়া যায় না। যেখানে এরূপ দায়িত্বশীল বলতে কেউ কোথাও নেই। সভ্য ও আধুনিক সমাজের তো কোন প্রশ্নই উঠে না। প্রাচীন, আদিম, অসভ্য, বর্বর সমাজেও এরূপ দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসেবে আমরা দেখি সমাজ প্রধান বা গোত্র সরদারকে। গোটা সমাজ বা গোত্র যেমন তার নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে, তেমনি সেই সমাজ ও গোত্রের সার্বিক সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্যে তাকেই কাজ করতে হয়, সে কাজ যথাযথরূপে সম্পন্ন হলো কিনা, সে জন্যে তাকে সেই সমাজ বা গোত্রের জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে হয়।

বৃহত্তর ও আধুনিক সম্প্রসারিত জীবন প্রেক্ষিতে এই দায়িত্বশীল ব্যক্তিত্বই আত্মপ্রকাশ করেছে সরকার বা প্রশাসনিক সংস্থারূপে। এরূপ একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা ও তার সদা কার্যকারিতা ব্যতীত কোন সমাজের অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না। ইসলাম তাই এরূপ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করার উপর যথেষ্ট তাকীদ পেশ করেছে। এরূপ একটি সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন জীবনই মানুষের জন্যে সম্ভব বলে ইসলাম বিশ্বাস করে। এরূপ একটি জীবনেই সম্ভব ইসলামী আদর্শের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন ও পালন-অনুসরণ। এরূপ একটি জীবনেই আশা করা যায়, মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ। এক কথায় মানুষের সার্বিক কল্যাণ এরূপ একটি সংস্থাধীন জীবন ছাড়া কল্পনাও করা যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী সমাজের স্বরূপ :

মানব সমাজ সম্পর্কে ইসলামের মূলনীতি এই যে, দুনিয়ার সব মানুষই এক আদমের সন্তান, অতএব সকলেই সমানভাবে পরস্পরের জ্ঞাতি ভাই। জাতি, অঞ্চল, বর্ণ ও ভাষা-সংস্কৃতির বিভিন্নতার দরুন মানুষকে মৌলিকভাবে বিভিন্নভাগে বিভক্ত করার নীতি ইসলাম আদৌ সমর্থন করে না। বস্তুত সমগ্র মানব জাতির একই আদম ও হাওয়ার সন্তান হওয়ার কথা ইসলাম উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছে :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِيْ **خَلَقَكُمْ** مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

"হে মানুষ, তোমরা তোমাদের সেই মহান প্রভুকে ভয় কর ও মেনে চল, যিনি তোমাদের সকলকে একই 'মানুষ' হতে সৃষ্টি করেছেন। (এইভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, প্রথমে) তা হতে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং (পরে) দুইজনের ঔরসে অসংখ্য পুরুষ ও নারী (সৃষ্টি করে দুনিয়ার বুকে) ছড়িয়ে দিয়েছেন।" (আল-কুরআন, সূরা আন্ নিসা, আয়াত-১)

অবশ্য একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মানুষের মধ্যে বর্ণ, অঞ্চল, জাতি, ভাষা ও সংস্কৃতির বৈষম্য স্বাভাবিকভাবেই বর্তমান আছে। ইংল্যাণ্ডে যার জন্ম হয়েছে, তাকে ইংরেজ বলে চিনি, যে ব্যক্তি তুরস্কে জন্ম লাভ করেছে, তাকে বলি তুর্কী। মানুষ শ্বেতবর্ণের যেমন আছে, তেমন আছে কৃষ্ণাঙ্গ। ইসলাম এই বিভিন্নতাকে অতি স্বাভাবিক ব্যাপাররূপে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং ইসলাম মানুষের এই বৈচিত্র ও বিভিন্নতাকে আল্লাহর অস্তিত্বের অন্যতম নিদর্শন বলে ঘোষণা করেছে :

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ-

"আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈষম্য আল্লাহর অস্তিত্বের একটি নিদর্শন, নিশ্চয়ই এতে সারে জাহানের অধিবাসীদের জন্যে সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে।" (আল-কুরআন)

বস্তুত: এই সব জিনিসকে ইসলাম মানুষের মধ্যে বিরোধ ও বৈষম্য সৃষ্টির একমাত্র ভিত্তি হিসেবে মোটেই স্বীকার করে না। মানুষের পরস্পরের মধ্যে যে পার্থক্য ইসলাম সমর্থন করে তা বর্ণ, বংশ, জাতি ও ভাষার পার্থক্য নয়; সে পার্থক্য সম্পূর্ণত: নৈতিক ও আদর্শগত। যারা ইসলামের নিয়ম-কানুন, বিধি-নিষেধ, মতবাদ-আদর্শ বিশ্বাস করে এবং নিজেদের বাস্তব কর্ম-জীবনে তা অনুসরণ করে চলে তারা এক জাতি-দল। আর যারা তা বিশ্বাস ও পালন করে না তাদের দল স্বতন্ত্র, তারা ভিন্ন জাতি। প্রথমটি ইসলামী সমাজ এবং দ্বিতীয়টি কাফের অথবা অমুসলিম সমাজ। আল্লাহ তাআলা বলেন :

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ **وَالَّذِينَ كَفَرُواْ** أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ -

"আল্লাহ ঈমানদার লোকদের বন্ধু, তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে ক্রমান্বয়ে আলোর দিকে পরিচালিত করেন এবং কাফেরদের বন্ধু হচ্ছে আল্লাহ বিরোধী শয়তানী শক্তিগুলো, এরা তাদেরকে কেবলই আলো হতে অন্ধকারের দিকে টেনে নেয়।" (আল-কুরআন, সূরা আল বাকারা, আয়াত-২৫৭)

এখানে ঈমানদার ও কাফের লোকদেরকে দু'টি স্বতন্ত্র জাতিরূপে পেশ করা হয়েছে। একইভাবে বিদায় হজ্জের দিন বিরাট জনসমুদ্রের সম্মুখে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) ঘোষণা করেছিলেন :

Dhaka University Institutional Repository

اِنَّ اللهَ اَذْهَبَ عَنْكُمْ عَيْبَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالاَبَاءِ اِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنُ تَقِىْ وَفَاجِرُ شَقِىُّ النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُوْ اٰدَمَ وَاٰدَمَ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ-

"আল্লাহ জাহিলী যুগের অহংকার ও বংশীয় গৌরব তোমাদের মধ্য হতে চিরতরে দূর করে দিয়েছেন। মানুষ এখন মাত্র দু'টি দলে বিভক্ত হতে পারে– ঈমানদার ও আল্লাহভীরু, কিংবা কাফের ও পাপী। মূলত: সমগ্র মানুষই আদমের সন্তান, আর আদম মাটির সৃষ্টি।" (তিরমিযী শরীফ) [৪৬] (পৃ:-৯৫)

সমগ্র মানবের ঐক্য প্রমাণ করার পর মানুষকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করার মূলীভূত কারণ হলো, ইসলামী বিধান অনুসারে নৈতিক ও ধর্মীয় আদর্শের ভিত্তিতে সমাজ গঠিত হয়ে থাকে। তাই যারা এই আদর্শ স্বীকার করে না, তারা সে সমাজের সদস্য বলে গণ্য হতে পারে না; কিন্তু যারা এই আদর্শ স্বীকার ও বাস্তব জীবনে প্রতিফলনের মাধ্যমে একই সমাজভূক্ত হয়, তাদের প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার ও মর্যাদা সবদিক দিয়ে সমান হয়ে থাকে। বংশ ও গোত্রের কোনো বৈশিষ্ট্য কিংবা আভিজাত্যের কোনো গৌরব ও বৈষম্য সে সমাজে স্থানই পেতে পারে না।

এটাও সুস্পষ্ট যে, দ্বীন-আকিদার ভিত্তিতেই যখন মুসলিম ও অমুসলিম দুটি সমাজের সৃষ্টি, তখন দু'টি সমাজের বুনিয়াদও পৃথক পৃথক। যখন বুনিয়াদ (ভিত্তি) পৃথক, তখন তাদের কাঠামোও অবশ্যই পৃথক ধরনের হয়। ফলে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারসমূহে তাদের মধ্যে কোনো সমঝোতা সামঞ্জস্যতাও লক্ষ্য করা যায় না। তখন স্বাভাবিকভাবেই এ দু'টি সমাজের অনুসারীদের জন্যে ইসলামের আহকামও (নির্দেশাবলী) পৃথক ধরনের হবে।

অমুসলিম সমাজ সম্পর্কে ইসলামী নির্দেশনার সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে, তাদের লোকজনের সাথে সাধারণ মানবীয় নৈতিকতা, যথা ইনসাফ ও ন্যায়নীতি, বিশ্বাসভাজনতা-আমানত, দয়া-দাক্ষিণ্য ও স্নেহ-ভালবাসা, সততা ও অঙ্গীকার পূরণ প্রভৃতি সহকারে আচার-আচারণ করতে হবে। কিছুতেই এসব নীতি লংঘন করা যাবে না।

বিদায় হজ্জের দিন বিশ্বনবী (সা:) বিশ্ব মানবতার মৌলিক ঐক্য ও সাম্যের যে গভীর তত্ত্ব উদ্ভাষিত করেছেন তা অত্যন্ত চমৎকার, মর্মস্পর্শী এবং সুস্পষ্ট। দুনিয়ার সমাজ বিজ্ঞানের ইতিহাসে এর কোনো তুলনাই নেই। তিনি বলেছিলেন :

لَيْسَ لِلْعَرَبِىِّ فَضْلٌ عَلَى الْعَجَمِىِّ وَلاَ لِلْعَجَمِىِّ فَضْلٌ على الْعَرَبِىِّ – وَلاَ لاَبْيَضُ عَلَى الْاَسْوَدِ وَلاَ لاَسْوَدُ عَلَى اَبْيَضِ فَضْلٌ كُلُّكُمْ اَبْنَاءُ اٰدَمَ وَاٰدَمُ مِنْ تُرَابٍ

"অনারবদের ওপর আরববাসীদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য নেই, অনারবদেরও কোনো শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশিষ্টতা নেই আরবদের ওপর। কৃষ্ণাঙ্গের উপর শ্বেতাঙ্গের এবং শ্বেতাঙ্গের ওপর কৃষ্ণাঙ্গেরও কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। বস্তুত তোমরা সকলেই আদমের সন্তান আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি হতে।" (মাসনাদে আহমদ শরীফ) [৪৬] (পৃ:-৯৭)

হযরত ওমর ফারুক (রা:) বলেন

اَلنَّاسُ شَرِيْفُهُمْ وَوَضِيْعُهُمْ فِىْ دِيْنِ اللهِ سَوَاءٌ-

"আল্লাহর দ্বীনে আশরাফ ও আতরাফ সব মানুষই সমান।"[৪৬] (পৃ:-৯৮)

বিশেষ শ্রেণীর মানুষের জন্মগত কোনো অধিকার ও বিশিষ্টতা ইসলাম স্বীকার করে না। এজন্যেই মানবতার শ্রেষ্ঠ বন্ধু শেখ নবী (সা:)-এর কণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে :

اِسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاِنْ اُسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِىٌّ كَاَنَّ رَاْسَهُ زَبِيْبَةٌ

"বিদঘুঁটে চেহারার কোনো হাবশী গোলামকেও যদি তোমাদের ওপর আমীর কিংবা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয় তবুও তার কথা শোন এবং তাকে মেনে চল।" (সহীহ বুখারী) [৪৬] (পৃ:-৯৯)

অর্থাৎ হাবশী দাস বলে ইসলামী সমাজে তার কোনোই অসম্মান, অপমান বা মর্যাদাহানি হতে পারে না। রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্যতা তার মধ্যেও থাকতে পারে এবং তা থাকলে তাকেও রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা অনুরূপ কোনো দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত বা নির্বাচিত করা যেতে পারে। তখন তার আনুগত্য করা এবং তার নির্দেশে যাবতীয় আইন-কানুন পালন করা ইসলামী হুকুমতের প্রতিটি নাগরিকের অবশ্যই কর্তব্য। এই হাদীসের ব্যাখ্যাস্বরূপ নিম্নলিখিত হাদীসটি উল্লেখযোগ্য :

إِنْ أُمِر عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجْدِعٌ يَقُوْدُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ فَاسْمَعُوْا لَهُ وَاَطِيْعُوْا-

"কোনো নাক কাটা ক্রীতদাসকে যদি তোমাদের আমীর নিযুক্ত করা হয় এবং সে আল্লাহর বিধান, অনুসারে তোমাদেরকে পরিচালিত করে, তবে তোমরা অবশ্যই তার আদেশ পালন করবে এবং তার আনুগত্য করবে।" [৪৬] (পৃ:-৯৯)

ইসলামের দৃষ্টিতে মানবতার মূল্য এবং মর্যাদা সর্বাপেক্ষ বেশী। তাই অন্যান্য মানব রচিত সমাজ ব্যবস্থার মত ইসলামে জন্মগত উচ্চ-নীচের কোনোই অবকাশ নেই। মানুষের মধ্যে পার্থক্য করার একটি মাত্র মাপকাঠি ইসলাম গ্রহণ করেছে। আর তা হলো, আল্লাহর ভয়, নৈতিক বৈশিষ্ট্য এবং ইসলামের যাবতীয় আদেশ-নিষেধ পালন করার গুণ। কেবলমাত্র এই দিক দিয়েই সমাজের মধ্যে যে ব্যক্তি বিশিষ্ট প্রমাণিত হবে। সমাজ ক্ষেত্রে একেই অন্যান্যের তুলনায় শ্রেষ্ঠ আসন দেয়া যেতে পারে। আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ

"হে মানুষ, আমরা তোমাদেরকে একই নারী ও পুরুষের ঔরসে সৃষ্টি করেছি এবং বিভিন্ন দল ও গোত্রে বিভক্ত করে দিয়েছি শুধু এই উদ্দেশ্যে যে, এর সাহায্যে তোমরা পরস্পরকে চিনবে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে আল্লাহভীরু ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে তোমাদের তুলনায় সবচেয়ে বশী সম্মানিত।" (আল-কুরআন, সূরা আল হুজুরাত আয়াত-১৩)

অন্য আয়াতে মানব সমাজে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের একমাত্র উপায় হিসেবে পরিপূর্ণ ঈমান এবং তদানুযায়ী একনিষ্ঠ কর্মধারার উল্লেখ রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে :

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا

"তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের বংশ ও জনশক্তি এর কোনোটিই আমার কাছে সম্মানিত বা নিকটবর্তী করতে পারে না। কিন্তু ঈমান ও তদানুযায়ী আমল যাদের আছে কেবল তারাই আমার কাছে সম্মানিত। তাদেরকে তাদের প্রতিটি কাজের দ্বিগুণ ফল দান করা হবে।" (আল-কুরআন, সূরা সাবা, আয়াত ৩৭)

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের রক্ত সম্মানার্হ। বিশেষ বিশেষ অপরাধ ব্যতীত কোনো ক্রমেই মানুষের রক্তপাত করা যাবে না। একজন অপরজনের ধর্ম-সম্পত্তি হরণ করতে পারে না, কেউ কারো ইজ্জত নষ্ট করতে পারে না। হয়রত মুহাম্মদ (সা:) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন :

فَإِنَّ دِمَائَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَضَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا

"তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান, সবকিছুই পরস্পরের প্রতি আজকের দিনের মতোই সম্মানর্হ ও হারাম।" (সহীহ বুখারী) [৪৬] (পৃ:-১০০)

ইসলাম মানব সমাজকে সর্বপ্রকার পতন, পাপ ও অপবিত্রতার পংকিলতা হতে সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ ও পবিত্র করতে চায়। সেজন্যে মাদক ও জুয়া খেলাকে চিরতরে হারাম ঘোষণা করেছে। কেননা মদ মানুষের মন-মগজের স্বাভাবিক শক্তি ও সুস্থতাকে সম্পূর্ণ নষ্ট করে ফেলে, এতে স্বাস্থ্য, বুদ্ধি ও জ্ঞানের ভারসাম্য বিলুপ্ত হয়, মনের শক্তি শিথিল ও দুর্বল হয়ে পড়ে। একইভাবে জুয়া মানব-সমাজে ভয়ংকর বিবাদ ও নিদারুন শত্রুতার সৃষ্টি করে এবং কোটিপতিকেও নিমিষে দেউলিয়া ও সর্বসান্তকরে দেয়। কুরআনের ঘোষণা :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ –

"হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, পূজা-উপাসনার আস্তানা এবং পাশা খেলা অপবিত্র জিনিস ও শয়তানের কাজ। অতএব তোমরা তা পরিহার করো, তাহলে তোমাদের মঙ্গল হতে পারে।" (আল-কুরআন, সূরা আল মায়িদা, আয়াত-৯০)

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

"শয়তান মদ ও জুয়ার সাহায্যে তোমাদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ও মারাত্মক শত্রুতার সৃষ্টি করতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামায হতে অমনোযোগী বানাতে চায়, তা জেনেও তোমরা কি এ হতে বিরত থাকবে না।" (আল-কুরআন, সূরা আল মায়িদা, আয়াত-৯১)

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী এবং পুরুষ একই সমাজ বৃক্ষের দু'টি শিকড়, একজন না হলে অন্যজন একাকী সমাজকে বাঁচাতে পারে না। এদের প্রকৃতি, শারীরিক গঠন-আকৃতি ও অঙ্গ-সৌষ্ঠবে বিভিন্নতা ও পার্থক্য আছে। ঠিক এ কারণেই ইসলামী সমাজ বিধানে সামাজিক কর্ম-বণ্টন নীতি অনুযায়ী তাদের প্রত্যেকের কর্মক্ষেত্র সম্পূর্ণরূপে আলাদা করে দেয়া হয়েছে, এদের কেউই নিজ নিজ এলাকার সীমারেখা অতিক্রম করে অন্যজনের সীমার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। ইসলামের সমাজনীতিতে তা সবচেয়ে বড় অপরাধ। এজন্যে ইসলামে পর্দা প্রথাকে সমাজের অপরিহার্য অংশ বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশাকে চিরতরে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে–

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ - وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

"(হে নবী!) মুমিন পুরুষদের বলে দিন তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনমিত করে এবং লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ করে। এবং মুমিন নারীদেরকেও বলে দিন তারা যেন তাদের যা স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে তা ছাড়া যেন তারা তাদের বেশভূষা ও সৌন্দর্য প্রকাশ না করে।" (আল-কুরআন, সুলা আন নূর, আয়াত-৩০,৩১)

স্বাভাবিকভাবে নারীর কর্মক্ষেত্র আপন গৃহে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে এবং বিনা কারণে তাদের বাইরে যাওয়া নিষেধ। কুরআনের নির্দেশ :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ-

"এবং তোমরা (মেয়েরা) বাড়ির ভেতরে অবস্থান কর।"(আল-কুরআন, সূরা আল আহযাব, আয়াত-৩৩)

কিন্তু প্রয়োজনের তাকিদে সে বাইরেও বের হবে। তবে নিশ্চয়ই তা শালীনতার সাথে পর্দার সাথে। আল্লাহ বলেন :

يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ-

"(হে নবী! মুসলিম নারীদেরকে বলে দিন) তারা যেন তাদের চাদর দিয়ে মাথা ও বুকের উপর ঘোমটা টেনে দেয়।" (আল-কুরআন, সূরা আল আহযাব, আয়াত-৫৭)

নারীদেরকে সুগন্ধি ব্যবহার করে, অলংকারাদির বাহার দেখিয়ে ঠাক-ঠমকসহ বাইরে বের হওয়া ও অকারণে পর্দার আড়াল থেকেও গায়রে মুহরীম পুরুখের সাথে আলাপচারিতা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ রয়েছে। আর যদি কথা বলতেই হয় তাহলে কণ্ঠস্বরে যেন কোনো আকর্ষণ সৃষ্টি করতে না পারে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকার নির্দেশ রয়েছে :

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ -

"(যদি গায়েরে মুহরিমের সাথে কথা বলতেই হয়, তাহলে) যেন কথাবার্তায় কোনো মধুরতা বা আকর্ষণ না থাকে। নতুবা যার মনে বদমায়েশি আছে, স্বভাবতইঃ তার মনে খারাপ চিন্তার সঞ্চার হবে।" (আল-কুরআন, সূরা আল আহযাব, আয়াত-৩২)

মেয়েদের এমন ধরনের সাজ-পোশাক পরিধান করা অথবা এমনভাবে চলাফেরা করা নিষিদ্ধ যা অপরের কাছে সৌন্দর্য প্রকাশক বলে মনে হয়। ঐ সব মেয়েদের উপর লানৎ করা হয়েছে যারা এমন মিহি পোশাক পরিধান করে যে ভেতর থেকে দেহ সৌন্দর্য ঠিকরে বের হয় অথবা যারা ঠাক-ঠমকের সাথে চলে। এক হাদীসে রাসূল (সা:) বলেছেন :

لَعَنَ اللهُ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ-

"যেসব পুরুষ মেয়েদের বেশ ধারণ করে এবং যেসব মেয়ে পুরুষের বেশ ধারণ করে এদের উভয়কেই আল্লাহ তা'আলা অভিসম্পাত করেন।" (সহীহ বুখারী) [১৭](পৃ:-১৪১)

এতদ্ব্যতীত যেসব রসম-রেওয়াজের দরুন মানুষের পাশবিক লালসা ও নফসের খায়েস অস্বাভাবিক রকম উত্তেজিত হয়ে ওঠে, ইসলাম সগুলোকে চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছে। কারণ, ওগুলো সমাজের শান্তি-শৃংখলা ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। ইসলাম একান্তভাবে কামনা করে যে, সমাজে শান্তি স্থাপিত হোক, পাশবিক কাজ-কর্ম ও লালসার পংকিলতা থেকে সমাজ সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকুক। এজন্যে কুরআনে ঘোষিত হয়েছে :

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

"প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য কোনো অশ্লীতা ও পাপের কাছেও যেও না।" (আল-কুরআন, সূরা আল-আনআম, আয়াত-১৫১)

এজন্যে ইসলামী সমাজে যারা অনাচার, উশৃঙ্খলতা, পর্দাহীনতা, নারী-পুরুষের অবাধ-মেলামেশা, নাচ-গান, মীনাবাজার, বিচিত্রানুষ্ঠান, মেলা ও নারী বাহিনীর গার্ড-অব-অনার এবং নাচের সম্বর্ধনা গ্রহণের প্রচলন করে মুসলিম নারীর শরম ও সতীত্বের দূর্গ চূর্ণ করে নির্লজ্জতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে চায়, তারা ইসলামী সমাজ ও মিল্লাতে মুসলিমার ভয়ানক দুশমন। দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের জন্যে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। উপরন্তু এই শ্রেণীর লোক কখনও ইসলামী সমাজের অন্তর্ভূক্ত হতে পারে না। কুরআন মাজীদে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষিত হয়েছে :

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"মুসলমানদের সমাজে যারা লজ্জাহীনতা ও পাপ প্রথার প্রচলন করতে ভালোবাসে, তাদের জন্যে দুনিয়া ও আখিরাতের কঠিন আযাব নির্ধারিত রয়েছে। (কোন্ কাজে লজ্জাহীনতার চর্চা হয়, আর কোন্ কাজে হয় না তা) আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন, তোমরা তা জানো না।"(আল-কুরআন, সূরা আন নূর, আয়াত-১৯)

ইসলাম সমাজের লোকদের মধ্যে পারস্পরিক গভীর প্রেম, ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা, সম্মান ও সম্প্রীতি স্থাপন করতে চায়। পারস্পরিক সম্পর্ক দলীয় অথবা শ্রেণী কোন্দলের পরিবর্তে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে। কুরআনের ঘোষণা :

- اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ -

"নিশ্চয়ই মুমিনরা পরস্পর ভাই।" (আল-কুরআন, সূরা আল হুজরাত, আয়াত-১০)

বাস্তব ক্ষেত্রে ভাই ভাই সম্পর্ক কেমন হবে তার নির্দেশনাও আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সা:) এর বাণীতে পাওয়া যায় :

- يُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ-

"তারা নিজেদের ওপরে অন্যদেরকে প্রাধান্য দেয়। যদিও তারা নিজেরা অনাহারে থাকে।" (আল-কুরআন, সূরা আল হাশর, আয়াত-৯)

অন্য আয়াতে আসছে–

لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ ..... وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ ..... وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ..... اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ..... وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا

"কোনো দল কোনো দলের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে না ..... না কোনো নারী অন্য কোনো নারীর প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে ..... পরস্পর দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে কোনো মন্দ নাম ধরে ডেকো না ..... অধিক আন্দাজ অনুমান করা থেকে বিরত থাক ..... কারো রহস্য উদঘাটন করো না এবং একে অপরের নিন্দা করো না।" (আল-কুরআন, সূরা আল হুজরাত, আয়াত-১১,১২)

নবী করীম (সা:) বলেছেন :

اِيَّاكُمْ وَالظَّنِّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَلَا تَحَسَّسُوْا وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَاتَنَاجَشُوْا وَلَاتَحَاسَدُوْا وَلَاتَبَاغَضُوْا وَلَاتَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ اِخْوَانًا-

"তোমরা পরস্পরের প্রতি অমূলক সন্দেহ পোষণ করা থেকে বিরত থাক, নিশ্চয়ই এই অমূলক সন্দেহ বড় ধরনের মিথ্যা। কারো দোষ অন্বেষণ করো না এবং এলক্ষ্যে গুপ্তচর বৃত্তিও করো না, ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকাবাজি করো না, পরস্পরে হিংসা বিদ্বেষ করো না, শত্রুতা করো না এবং একে অন্যের পিছনে লেগে থেকো না। বরং পরস্পর এক আল্লাহর বান্দা ও ভাই ভাই হয়ে যাও।" (বুখারী ও মুসলিম) [৩৯] (পৃ:-১৫৩)

বড়কে সম্মান করা এবং ছোটকে স্নেহ করাক মিল্লাতে ইসলামীয়ার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্যে অপরিহার্য শর্ত করে দেয়া হয়েছে। নবী করীম (সা:) বলেছেন :

- لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا وَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُفِ وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ

"যে আমাদের সমাজের বড়কে সম্মান ও ছোটকে স্নেহ-দয়া করে না এবং ন্যায় কাজের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ ও নিষেধ করে না, সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য হতে পারে না।" (তিরমিযী শরীফ) [৪৬] (পৃ:-১০৩)

মুসলিম সমাজে পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ়করণে প্রিয় নবী (সা:) এর ঘোষণা :

تَرَىْ الْمُؤْمِنِيْنَ فِىْ تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَطَعَا طُفِهِمْ كَمَثْلِ الْجَسَدِ اِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى-

"তুমি মু'মিনদেরকে তাদের পারস্পরিক সহানুভূতি, বন্ধুত্ব ও দয়া-অনুগ্রহের ক্ষেত্রে একটি দেহের মত দেখবে। যখন দেহের কোনো অঙ্গ অসুস্থ হয় তখন সমস্ত শরীর তজ্জন্য বিনিদ্র ও জ্বরে আক্রান্ত হয়।" (বুখারী ও মুসলিম) [৩৯] (পৃ:-১২৮)

অন্য হাদীসে আসছে–

اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لاَيَظْلِمُهُ وَلاَيَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ ..... كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ-

"এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। কাজেই তার উপর অত্যাচার করবে না। তাকে লজ্জিত করবে না এবং তাকে হীন মনে করবে না। ..... বস্তুতঃ একজন মুসলমানের সব কিছুই অপর মুসলমানের জন্য হারাম। অর্থাৎ তার জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু।" (মুসলিম) [৩৯] (পৃ:-১২৯,১৩০)

لاَيُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يَحِبُّ لاخِيْهِ مَايُحِبُّ لِنَفْسِهِ -

"কোনো বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজের জন্যে যা ভালোবাসে অপর মুসলমান ভাইয়ের জন্যেও তা ভালোবাসে পছন্দ করে।" (বুখারী- মুসলিম) [৩৯] (পৃ:-১৩০,১৩১)

لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ-

"সেই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ না থাকে।" (মুসলিম) [৩৯] (পৃ:-১৩১)

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِيْ يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ اِلَى جَنْبِهِ-

"ঐ ব্যক্তি পূর্ণ ঈমানদার নয়, যে উদর পূর্তি করে খায় আর তার পার্শ্বেই প্রতিবেশী অভুক্ত রয়েছে।" (বায়হাকী) [৩৯] (পৃ:-১৩৯)

اَلْمُؤْمِنُ مَأْلَفٌ وَلاَخَيْرَ فِيْمَنْ لاَيَأْلَفُ وَلاَيُؤْلَفُ -

"ঈমানদার হলো ভালবাসার কেন্দ্রস্থল। তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই যে অন্যকে ভালোবাসে না এবং অন্যরাও তাকে ভালোবাসে না।" (আহমাদ ও বায়হাকী ফী শোআবুল ঈমান) [৩৯] (পৃ:-১৪০,১৪১)

এ হলো ইসলামী সমাজে লোকদের পারস্পরিক সম্পর্কের ধরণ। ভ্রাতৃত্বভাব এবং ভালোবাসার এ মনোভাব কোনো ভুল বুঝাবুঝি অথবা প্রবৃত্তির প্ররোচনায় যদি নষ্ট হতে দেখা যায় তাহলে সংশোধনের জন্যে অগ্রসর হওয়া অন্যান্যদের উপর ফরয হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহর নির্দেশ :

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ-

"মুমিনতো পরস্পর ভাই ভাই। অতএব (দু' ভাইয়ের মধ্যে কোনো প্রকার মনোমালিন্য হলে) উভয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও।" (আল-কুরআন, সূরা আল হুজরাত, আয়াত-১০)

একবার নবী করীম (সা:) সাহাবায়ে কেরামকে (রা.) জিজ্ঞেস করলেন :

اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِاَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ وَالصَّلَوةِ ؟ قَالُ قُلْنَا بَلَى قَالَ اِصْلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ-

"তোমাদেরকে কি আমি এমন একটি জিনিসের সংবাদ দেবো না, যা রোযা, সদকা এবং নামায থেকেও উৎকৃষ্ট? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ নিশ্চয়ই বলুন, রাসূল (সা:) বললেন, পারস্পরিক সম্পর্ক পূর্ণস্থাপন কর।" (তিরমিযী) [১৭](পৃ:-১৩৮)

সমাজে দুষ্কৃতি ও অনাচার হয়তবা সকলেই করে না, করে মুষ্টিমেয় লোক। কিন্তু তার পরিণামে যে আযাব আসে তা সকলকেই ভোগ করতে হয়। তাই সমাজের লোকদের সামষ্টিক কল্যাণের জন্যে ব্যক্তিগত পরহেযগারীর পাশাপাশি সমাজকেও সকল প্রকার অন্যায়-অনাচার থেকে রক্ষা করার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া মুসলিম সমাজের প্রতিটি সদস্যের কর্তব্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ -

"মু'মিন নারী-পুরুষ পরস্পর পরস্পরের কল্যাণকামী বন্ধু-অভিভাবক। তারা একে অপরকে সৎকাজের আদেশ করে অসৎ কাজের নিষেধ করে।"(আল-কুরআন, সূরা আত তাওবা, আয়াত-৭১)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ -

"তোমরাই হচ্ছ সর্বোত্তম জনগোষ্ঠী। তোমাদেরকে জনগণের কল্যাণের উদ্দেশ্যেই গড়ে তোলা হয়েছে। তোমরাই ভালো কাজের আদেশ কর ও মন্দ কাজ থেকে লোকদের বিরত রাখ। আর তোমরা সব সময়ই আল্লাহর প্রতি ঈমান রক্ষা করে চল।" (আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১১)

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ -

"হে মুসলিমগণ! তোমাদের মধ্য থেকে একটা জনগোষ্ঠী এমন অবশ্যই বের হয়ে আসতে হবে ও নিয়োজিত থাকতেই হবে, যারা সার্বিক কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাতে থাকবে এবং ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করবে। বস্তুত এরাই হচ্ছে সফলকাম।" (আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১০৪)

আর এ সমাজের লোকেরা পরস্পরকে মঙ্গল ও খোদাভীতির কাজে উৎসাহ যোগায় এবং অকল্যাণ ও সীমালংঘনের কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"তোমরা সকল পূণ্যময় ও আল্লাহভীতি মূলক কাজে অবশ্যই পরস্পরের সাথে সাহায্য সহযোগিতার কাজে এগিয়ে যাবে। অবশ্য গুনাহ ও নাফরমানীর কাজে কারোর সাথেই সহযোগিতা করবে না।" (আল-কুরআন, সূরা আল মায়িদা, আয়াত-২)

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলে মাকবুল (সা:) বলেছেন–

مَنْ رَأَي مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَانْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَانْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَان-

"তোমাদের মধ্যে কেউ যখন কোনো অন্যায় ও শরীয়াত পরিপন্থী কোনো কাজ হতে দেখে, তখন হাত দ্বারা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তা পরিবর্তন করতে চেষ্টা করা তার কর্তব্য। তা করতে সামর্থ না হলে মুখ দিয়ে তার বিরুদ্ধে বলতে হবে। আর তা করতেও অসমর্থ হলে অন্তর দিয়ে তার প্রতিবাদ করতে হবে– মনে মনে কাজটির প্রতি ঘৃণা পোষণ করতে হবে।" (বুখারী) [৪৫] (পৃ:-১৮৪)

ন্যায়পরতা ও সুবিচার সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার পক্ষে অত্যন্ত জরুরী। সামাজিক ন্যায়পরতা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত না হলে সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তাই ইসলামী সমাজের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا -

"(ঈমানদার লোকেরা) আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন যে, যাবতীয় আমানত সে সবের প্রকৃত উপযোগী বা মালিকের নিকট ফিরিয়ে দাও। আর লোকদের মধ্যে যখন কোনো বিষয়ে ফয়সালা করবে তখন তা পূর্ণ ইনসাফ সহকারে করবে। আল্লাহ তো তোমাদেরকে উত্তম উপদেশ দিচ্ছেন। আল্লাহ সব কিছু শুনেন ও দেখেন।" (আল-কুরআন, সূরাতুন নিসা, আয়াত-৫৮)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ -

"হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা সুবিচার প্রতিষ্ঠার পক্ষে শক্ত হয়ে দাঁড়াও, আল্লাহর জন্যে সাক্ষ্যদাতা হয়ে দাঁড়াও। যদিও সে সাক্ষ্য তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে হয়।" (আল-কুরআন, সূরাতুন নিসা, আয়াত-৫)

أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كان بما تعملون خبيرا -

"(তোমাদের সত্য সাক্ষের আঘাত তোমাদের নিজেদের উপর) কিংবা তোমাদের পিতা-মাতা ও নিকটস্থ লোকদের উপরই পড়ুক না কেন, আর পক্ষদ্বয় ধনী কিংবা গরীব যা-ই হোক না কেন, তাদের সকলের অপেক্ষা আল্লাহর এই অধিকার অনেক বেশী যে, তোমরা তাঁর দিকেই লক্ষ্য দেবে। অতএব নিজেদের নাফসের খাহেশের অনুসরণ করতে গিয়ে সুবিচার ও ন্যায়পরতা থেকে বিরত থাকবে না। তোমরা যদি মনগড়া কথা বল কিংবা সত্যবাদিতা থেকে দূরে সরে থাক, তাহলে জেনে রাখবে, তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত।" (আল-কুরআন, সূরাতুন নিসা, আয়াত-১৩৫)

ইসলামী সমাজের সদস্যরা বিচার-ফয়সালার ক্ষেত্রে যেমন ন্যায়পরতা গ্রহণ করে, একইভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও কোনোরূপ জুলুম, শোষণ ও বঞ্চনার প্রশ্রয় দেয় না। তারা মনে করে সূদ-ঘুষ পণ্য আটককরণ, অন্যায়ভাবে উচ্চমূল্য গ্রহণ, কাউকে দেয়া, কাউকে না দেয়া, ওজনে কম-বেশি করা এই সবই হচ্ছে অর্থনৈতিক জুলুম ও অবিচারের বিভিন্ন দিক। আর ইসলাম তার সমাজের সদস্যদের জন্যে এসব চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। ইরশাদ হচ্ছে :

- وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا-

"আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্যে ব্যবসাকে বৈধ করেছেন, আর সুদকে করেছেন হারাম।" (আল-কুরআন, সূরা আল বাকারা, আয়াত-২৭৫)

وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ -

"তোমরা যদি সূদী কারবার থেকে তাওবা কর– তাহলে তোমাদের মূলধন তোমরা ফেরত নিতে পারবে। তার ফল হবে এই যে, তোমরাও জুলুম করলে না আর তোমাদের উপরও জুলুম করা হলো না।" (আল-কুরআন, সূরা আল বাকারা আয়াত-২৭৯)

ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও যেন কোনোরূপ ঠকবাজি না হতে পারে সেজন্যে অত্যন্তকড়া ভাষায় কুরআনে বলে দেয়া হয়েছে :

- وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ – ذَالِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلاً-

"এবং তোমরা সঠিক দৃঢ় ভারসাম্যপূর্ণ পাল্লায় ওজন কর। এটা যেমন উপস্থিতভাবে কল্যাণকর, তেমনি পরিণতির দিক দিয়েও অতীব উত্তম।" (আল-কুরআন, সূরা আল ইসরা, আয়াত-৩৫)

ইসলামের সমাজনীতিতে মুসলমানদের পরস্পরের সাক্ষাৎকালে সালাম ও দো'আর অদান-প্রদান করার রীতি চালু করা হয়েছে; যেন লোকদের মধ্যে পারস্পরিক গভীর ভালোবাসা সদিচ্ছা ও সহানুভূতি জাগ্রত হয়। কুরআন হাকীমের ঘোষণা :

- فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً

"অতএব তোমরা যখন কোনো ঘরে প্রবেশ করবে তখন পরস্পরের মধ্যে সালামের আদান-প্রদান করবে; এটি আল্লাহ নির্ধারিত দো'আ বিশেষ, এটি খুবই মহান ও পবিত্র ব্যবস্থা।" (আল-কুরআন, সূরা আন-নূর, আয়াত-৬১)

একইভাবে কারো বাড়িতে বিনা অনুমতিতে হঠাৎ প্রবেশও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা অপরের ঘরে হঠাৎ করে প্রবেশ করো না যতক্ষণ না তার অনুমতি পেয়েছ এবং তাকে সালাম দিয়েছ।" (আল-কুরআন, সূরা আন-নূর, আয়াত-২৭)

ইসলামী সমাজ তার সদস্যদের বিলাসবহুল জীবন-যাপনে নিরোৎসাহিত করে। ইসলাম বলছে ব্যবহারের জন্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিসপত্র রাখা ব্যক্তির জন্য উচিত নয়।

فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِامْرَاتِهِ وَثَالِثٌ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ-

"স্বামীর জন্যে একটা বিছানা, একটা তার স্ত্রীর জন্যে এবং একটা মেহমানের জন্যে এরপর চতুর্থটি করা হলে তা হবে শয়তানের জন্যে।" (মুসলিম) [১৭](পৃ:-১৪৪)

অনুরূপ উঁচু দালান কোঠা তৈরি করে বাস করাও ঠিক নয়। নবী করীম (সা:) ইরশাদ করেন : "মুমিনের প্রতিটি ব্যায় যা সে করে তা হতে হবে আল্লাহর পথে। (প্রয়োজনের অতিরিক্ত) দালান কোঠা তৈরি করাতে কোনো মঙ্গল নেই।" [১৭](পৃ:-১৪৪)

এমনিভাবে সোনা-চাঁদির পাত্র ব্যবহার করতেও নিষেধ করেছে ইসলাম। পুরুষের জন্যে রেশমী কাপড় পরিধান করা কিংবা বাসার কাজে ব্যবহার করাও হারাম ঘোষণা করেছে।(মেশকাত শরীফ) [১৭](পৃ:-১৪৪)

ইসলামী সমাজের সদস্যরা চাল-চলন, খানাপিনা ও আয় ব্যায় সর্বাবস্থায় মধ্য পন্থা অবলম্বন করে। মু'মিনের প্রশংসা ও তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে কুরআন ঘোষণা করেছে :

Dhaka University Institutional Repository

- وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا

"যারা খরচ করলে না বেহুদা খরচ করে, না কার্পণ্য করে, বরং দুই সীমার মাঝখানে মধ্যম নীতির উপর দাঁড়িয়ে থাকে।" (আল-কুরআন, সূরা আল ফুরকান, আয়াত-৬৭)

মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব, ভালোবাসা ও আত্মীয়তার ভাব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা পরস্পরের সাধারণ প্রয়োজন মেটাবার জন্যে সাময়িক ঋণ দেয়া ও সাধারণ ব্যবহার্য জিনিসপত্র দিয়ে সাহায্য করার আদেশ করেছেন:

- وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا-

"আর আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও।" (আল-কুরআন, সূরা আল মুয্যাম্মিল, আয়াত-২০)

সকল মুফাস্সীরে কেরাম এখানে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেয়া অর্থে কোনোরূপ লভ্যাংশ ছাড়া অপর ভাইকে ঋণ দেয়া কিংবা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে আত্মীয়-স্বজন, গরীব-মিসকীন ইত্যকার লোকদের দান করা ও এদের পিছনে নিঃস্বার্থ ব্যয় করাকে বুঝিয়েছেন। যেমনটি সূরা বাকারায় বর্ণিত মুত্তাকীর গুণাবলীতে আমরা দেখতে পাই। আল্লাহ তাআলা বলেন :

- وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

"মূলত পূণ্য হলো ..... আর আপনজন ইয়াতীম, মিসকীন পথিক ভিক্ষুক ও পণবন্দীর জন্যে প্রাণপ্রিয় সম্পদ ব্যয় করা।" (আল-কুরআন, সূরা আল বাকারা, আয়াত-১৭৭)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে :

- وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا

"আর তারা (মু'মিনগণ) খাদ্যাভাব থাকা সত্ত্বেও মিসকীন, ইয়াতীম ও কয়েদীগণকে খাবার দান করে এবং বলে যে, শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে আমরা তোমাদেরকে খাওয়াচ্ছি। আমরা তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় এবং কৃতজ্ঞতা চাই না।" (আল-কুরআন)

অপর আয়াতে বলা হয়েছে :

- لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ -

"তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের প্রিয় সম্পদ হতে দান খয়রাত না করবে, ততক্ষণ কিছুতেই পূণ্য লাভ করবে না।" (আল-কুরআন, সূরা আলে-ইমরান, আয়াত-৯২)

অন্য আয়াতে আসছে :

- وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ -

"আর তারা নিজেদের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও (অপরের প্রয়োজন মেটানোকে) নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয়।" (আল-কুরআন, সূরা আল হাশর, আয়াত-৯)

তাছাড়া অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষায় ইসলাম তার অনুসারীদের যাকাতের বিধান দিয়েছে। ইরশাদ হয়েছে:

- وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ

"আর (মুমিন মুত্তাকীরা) সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে।" (আল-কুরআন, সূরা আল বাকারা, আয়াত-১৭৭)

অন্যত্র বলা হয়েছে :

- وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ -

"আর ধনীদের ধন-সম্পদে প্রার্থী, সব অভাবী ও বঞ্চিতদের জন্যে হক রয়েছে।" (আল-কুরআন, সূরা আয্ যারিয়াত, আয়াত-১৯।

পরিবার প্রথার উপর ইসলামী সমাজের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে। এই পরিবারের বিভিন্ন সূত্রে সমাজের দূরবর্তী মানুষ নিকটবর্তী আত্মীয়ে পরিণত হয়। ফলে সমাজের প্রায় সকল মানুষই আত্মীয়তার বন্ধনে পরস্পর আবদ্ধ হয়ে থাকে। এতে মানব সমাজের ভিত্তিমূল অধিকতর মজবুত হয়। ইরশাদ হচ্ছে

- وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً–

"আল্লাহ তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের জন্যে জুড়ি বানিয়ে দিয়েছেন (অর্থাৎ পুরুষের জন্যে স্ত্রী এবং স্ত্রীর জন্যে পুরুষ)। তারপর তোমাদের পারস্পরিক বিয়ের বন্ধনের ফলে পুত্র-পৌত্রের এক ধারা সৃষ্টি করেছেন।" (আল-কুরআন)

আরও বলা হয়েছে :

- وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَّصِهْرًا-

"সেই মহান প্রতিভাশালী আল্লাহ পানি (শুক্র) হতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং এই সৃষ্টিধারার সাহায্যে মানুষকে বংশ ও বৈবাহিক সম্পর্কে পরস্পর সংযুক্ত করে দিয়েছেন।" (আল-কুরআন

আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার যে অংশকে মানুষের জন্যে মঙ্গলকর বলে মনে করা হয় এবং যা নিয়ে বর্তমান সভ্যতা গৌরবে উন্মত্ত প্রায়, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় তা পুরোপুরিভাবেই পাওয়া যায়। কিন্তু এর ভুল-ত্রুটি, অন্যায়-অনাচার এবং খারাপ অংশগুলোর কোনোটিরই ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকার নেই। গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সমস্ত কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব নিরংকুশভাবে জনগণের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়। বস্তুত: এটিই হচ্ছে দুনিয়াব্যাপী সমস্ত অশান্তির মূল কারণ। এজন্যেই ইসলামী সমাজে সমস্ত প্রভুত্ব, সার্বভৌমত্ব একান্তভাবে নির্দিষ্ট হয়ে আছে আল্লাহর জন্যে। আল্লাহর দেয়া আইনই ইসলামী সমাজের বুনিয়াদি আইন, তাঁর নির্ধারিত সীমা মানুষের সমস্ত ক্ষমতা ও অধিকারের শেষ সীমান্ত। তা লঙ্ঘন করে অগ্রসর হওয়ার এক বিন্দু অধিকার কারো নেই।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় : চার

খিলাফত মতাদর্শ ও ইমামত

খিলাফত ধারণা :

ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থার নাম খিলাফত। খিলাফত তত্ত্বের উপরই ইসলামী রাষ্ট্র ও তার কাঠামো ভিত্তিশীল। খিলাফতের ধারণা থেকেই ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশ। ইসলামী রাষ্ট্রতত্ত্বের অন্তর্নিহিত ভাবধারাই হচ্ছে খিলাফত তত্ত্ব।

খিলাফত (خلافة) শব্দের অভিধানিক অর্থ : প্রতিনিধিত্ব, স্থলাভিষিক্ত, উত্তরাধিকার। ব্যবহারিক অর্থে "অন্য কারো অপসৃত হওয়ার পর তার স্থানে উপবেশন করাকে খিলাফত বলা হয়।[৪৪ (পৃ:-২৯)] অন্য কথায় মূল পদের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার নাম খিলাফত। ইমাম শব্দও এই অর্থেই ব্যবহৃত হয় এবং 'খলীফা' ও 'ইমাম' এই শব্দ দুটি একই ব্যক্তির দুইটি স্বতন্ত্র দিককে প্রকাশ করে। পূর্ববর্তী দায়িত্বশীলের প্রতিনিধি ও স্থলাভিষিক্ত হওয়ার দিক দিয়ে সে খলীফা এবং সমসাময়িক যুগের জনগণের অনুসরণীয় ও সর্বাধিক গণ্যমান্য হওয়ার কারণে সে ইমাম বা নেতা।

বস্তুত: পয়গম্বরের স্থলাভিষিক্ত হওয়া এবং তাঁর অন্তর্ধানের পর গোটা উম্মতের নেতৃত্ব দানকেই বলা হয় খিলাফত ও ইমামত।[৪৪ (পৃ:-২৯)] নবী করীম (সা:) ইরশাদ করেছেন, "তোমাদের পূর্বে বনী ইসরাইলের নবী ও পয়গম্বরগণই নেতৃত্ব দান ও রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন, এক পয়গম্বরের অন্তর্ধানের পর আর এক পয়গম্বর এসে তার স্থলাভিষিক্ত হতেন। কিন্তু এখন (আমার পর) নবুয়্যাতের ক্রমধারা সম্পূর্ণ হয়েছে (এখন আর কোনো নবী বা রাসূল হবে না)। অতঃপর তোমাদের মধ্য হতে খলীফাগণই অগ্রগামী হবে।"[৪৪ (পৃ:-২৯)] অন্য হাদীসে রাসূলে করীম (সা:) বলেছেন : "আমার পর আমার হেদায়াতপ্রাপ্ত খলীফাগণকে মেনে চলবে।"[৪৪ (পৃ:-৩০)]

আল্লামা আবুল মা'আলী (রহ.) 'মুসামারা' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, "রাসূলুল্লাহ (সা:) এর প্রতিনিধি হিসেবে দ্বীন ও দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়ে সর্বস্তরের মুসলমানদেরকে ব্যাপক নেতৃত্ব দান এবং সঠিক পথে পরিচালনা করাকে ইসলামের পরিভাষায় খিলাফত বলা হয়।[২১ (পৃ:-১৮)]

আল্লামা ইবনে খালদুন (রহ:)-এর মতে, ইহা (খিলাফত) হচ্ছে দ্বীনের হেফাযত ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা:)-এর প্রতিনিধিত্ব করা।[২১ (পৃ:-১৮)]

আল্লামা মাওয়ার্দী বলেন, দ্বীনের হেফাযত ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে নবুয়তি কাজের প্রতিনিধিত্ব করাকে ইমামত (খিলাফত) বলে।[২১ (পৃ:-১৮)]

আল্লামা ইবনে জারীর বলেন, খলীফা শব্দের অর্থ হলো যুগের পর যুগ ধরে বংশ পরম্পরায় একে অপরের স্থলাভিষিক্ত হয়ে চলা। তিনি বলেন, خليفة শব্দটি فعيله ওযনে সৃষ্টি। এর অর্থ স্থলাভিষিক্ত বা উত্তরাধিকারী। কেউ যদি কোনো ব্যাপারে কারো পরে তার স্থলাভিষিক্ত হয়, তাহলে বলা হয় অমুক অমুকের খলীফা হয়েছে।[২১ (পৃ:-৩৭৬)] যেমন আল্লাহ তা'আলা সম্প্রদায়গত খিলাফত প্রসঙ্গে বলেন :

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ -

"অতঃপর তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছি এই জন্যে যে, তোমরা কি কাজ কর তা দেখব।" (আল কুরআন, সূরা ইউনুস, আয়াত ১৪)

এ কারণেই শাসকবর্গের প্রধান ব্যক্তিকে খলীফা বলা হয়। কারণ, তিনি পূর্ববর্তী শাসক প্রধানের স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি পূর্ববর্তী শাসকের দায়িত্ব পালন করেন বলে তাকে খলীফা বলা হয়। পবিত্র কুরআনে হাকীমে খিলাফত শব্দটির বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন–

ক) আল্লাহর প্রতিনিধি অর্থে : পবিত্র কুরআন মানবজাতিকে পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলার নীতিগত প্রতিনিধি বলে আখ্যায়িত করেছে এবং এর জন্যে খলীফা শব্দটি ব্যবহার করেছে। যেমন, আদম (আ:)-এর সৃষ্টির প্রাককালে আল্লাহ বলেছেন : وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

"(সে সময়ের কথা স্মরণ কর) যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বললেন : আমি পৃথিবীতে খলীফা সৃষ্টি করতে যাচ্ছি।" (আল কুরআন, সূরা আল বাকারা, আয়াত ৩০)

আয়াতে 'খলীফা' বলতে শুধুমাত্র হযরত আদম (আ:) কে বুঝানো হয় নাই; বরং আদম জাতি তথা গোটা মানবজাতিকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ গোটা মানবজাতিই পৃথিবীতে খিলাফতের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত।[10] নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে এ সত্য অতি সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে :

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَا آتَاكُمْ

"তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীর খলীফা করেছেন এবং তোমাদের কাউকে অপর কারো উপর উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন যেন তিনি তোমাদের যাচাই করতে পারেন।" (আল কুরআন, সূরা আল আনআম, আয়াত ১৬৫)

أَمَّنْ يُجِيْبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ

"কে তিনি যিনি অসহায় ব্যক্তির দু'আ শুনেন যখন সে ডাকে এবং কে তার কষ্ট দূর করেন? আর কে তিনি যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীর খলীফা বানান?" (আল কুরআন, সূরা আন নাম্‌ল, আয়াত-৬২)

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِيْ الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ -

"তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা বানিয়েছেন। এখন যে কুফরী করবে তার কুফরীর শাস্তি তার উপরই বর্তাবে।" (আল কুরআন, সূরা আল ফাতির, আয়াত–৩৯)

آمِنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَأَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ

"ঈমান আনয়ন কর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর এবং ব্যয় কর সে সব জিনিস হতে যে সবের উপর তিনি তোমাদের খলীফা বানিয়েছেন।" (আল কুরআন, সূরা আল হাদীদ, আয়াত–৭)

---

10 ইবনে জারির বলেন, এখানে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে, খলীফা জিন ও ইনসানের ভিতর আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে তাঁর বিধান মোতাবেক ইনসাফ কায়েম করবেন। তাই প্রথম খলীফা হলেন আদম (আ:) আর পরবর্তী খলীফারা হলেন তাঁর সেসব উত্তরাধিকারী যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বনী আদমের মাঝে ইনসাফের অনুশাসন কায়েম করবেন। পক্ষান্তরে যারা হিংসা-বিভেদ ও রক্তারক্তি অনুসরণ করবে, তারা আল্লাহর খলীফা হওয়ার যোগ্যতা হারাবে। (আল্লামা ইবনে কাছীর (রহ.) অনুবাদক, অধ্যাপক আখতার ফারুক, তাফসীরে ইবনে কাছীর, প্রথম খন্ড, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ। পঞ্চম সংস্করণ, মার্চ-২০১১, পৃ:-৩৭৬।)

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, পৃথিবীতে মানুষ হচ্ছে আল্লাহর খলীফা। অর্থাৎ মানুষ আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর অধীনে তাঁরই নির্দেশ মতো এ পৃথিবীতে দায়িত্ব পালন করবে, জীবন যাপন করবে। অন্যান্য সৃষ্টিজীব ও বস্তুনিচয়ের উপর অধিকার প্রয়োগ করবে। এ থেকে জানা গেল যে, মূল সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী স্বয়ং আল্লাহ, মানুষ বা জনগণ নয়। মানুষের আসল মর্যাদা হচ্ছে প্রকৃত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা। তাই রাজনৈতিকভাবে কোনো একক মানুষ বা সমষ্টিগতভাবে জনগণ সার্বভৌমত্বের মালিক নয়, বরং খিলাফতের অধিকারী। মানুষের এ খিলাফত শুধু রাজনৈতিকই নয় বরং ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক তথা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত।

খ) স্থলাভিষিক্ত হওয়া অর্থে : কুরআন মজীদে কোনো জাতির পর তদস্থলে অন্য কোনো জাতিকে নেতৃত্বে অভিষিক্ত করা ও ক্ষমতা দান করাকে খেলাফত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, আদ জাতিকে লক্ষ্য করে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

- وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ

"স্মরণ করো, তিনি তোমাদেরকে নুহের জাতির পরে খলিফা বা স্থলাভিষিক্ত করেছেন।" (আল কুরআন, সূরা আল আরাফ, আয়াত–৬৯)

সামুদ জাতিকে হযরত সালেহ (আ:) স্মরণ করে দিলেন :

-وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ

"স্মরণ করো যখন (আল্লাহ) আদ জাতির পর তোমাদেরকে খলিফা-স্থলাভিষিক্ত করলেন।" (আল কুরআন, সূরা আল আরাফ, আয়াত–৭৪)

কুরআন নাযিলের সমসাময়িক জাতিকে লক্ষ্য করে আল্লাহ বলেন :

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ
- ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ -

"হে লোকেরা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছি যখন তারা জুলুমের নীতি অবলম্বন করেছিল– এখন তাদের পর তোমাদেরকে জমীনে স্থলাভিষিক্ত (খলিফা) করেছি যেন দেখতে পারি তোমরা কেমন কাজ করো।" (আল কুরআন, সূরা আল ইউনুস, আয়াত–১৩, ১৪)

গ) মুমিনদের প্রতিষ্ঠা লাভ ও নেতৃত্বকেও খিলাফত বলা হয়েছে : হযরত নূহ (আ:)-এর অমান্যকারী জাতি ধ্বংস হওয়ার পর তার সঙ্গী-সাথী নৌকায় আরোহী মুমিনদেরকে আল্লাহ খিলাফত দান করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন বলছে :

فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ

"তারা তাকে (নূহকে) মিথ্যা বলে অমান্য করল। এরপর আমরা তাকে এবং তার নৌকায় আরোহী সঙ্গীদের রক্ষা করলাম এবং যমীনে তাদেরকে খিলাফত দান করলাম, প্রতিষ্ঠা করলাম। আর আমার আয়াতের মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের ডুবিয়ে দিলাম। লক্ষ্য করো, যাদের সতর্ক করা হয়েছিল তাদের কী পরিণাম হয়েছে।" (আল কুরআন, সূরা ইউনুস, আয়াত–৭৩)

ফেরাউন জাতির ধ্বংসের পর হযরত মূসা (আ:) এর অনুসারী বণী ইসরাইলের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা তথা খেলাফত লাভ প্রসঙ্গে কুরআন বলছে :

قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

"তিনি মূসা (আ:)] বললেন, সে সময় বেশি দূরে নয় যখন তোমাদের রব তোমাদের শত্রুদের ধ্বংস করে দেবেন এবং পৃথিবীতে তোমাদেরকে খলিফা বানাবেন যেন তোমরা কি কর তা দেখতে পারেন।"
(আল কুরআন, সূরা আরাফ, আয়াত–১২৯)

উম্মতে মুহাম্মাদীকে খলিফা বানানো প্রসঙ্গ আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

"আল্লাহ ওয়াদা করছেন যে, তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল তাদেরকে তিনি অবশ্যই পৃথিবীতে খলিফা বানাবেন যেভাবে খলিফা বানিয়েছিলেন তাদের পূর্ববর্তী লোকদের।" (আল কুরআন, সূরা নূর, আয়াত–৫৫)

ঘ) ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজের নেতৃত্বকেও খলিফা বলা হয়েছে : হযরত দাউদ (আ:) একজন জবরদস্ত শাসক ছিলেন। তিনি একটি শক্তিশালী রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। তাঁর এই নেতৃত্ব ও ক্ষমতাকে আল্লাহ তাআলা খিলাফত বলে, আখ্যায়িত করেছেন– তাঁকে তিনি খলিফা বলে উল্লেখ করেছেন :

يَادَاوُدُ انَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِىْ الاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَتَتَّبِعِ الْهَوٰى

"হে দাউদ, আমরা তোমাকে পৃথিবীতে খলিফা করেছি। অতএব, লোকদের মধ্যে সত্যতা সহকারে শাসন চালাও এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না।" (আল কুরআন, সূরা সা'দ. আয়াত–২৬)

কুরআন মজীদে মানব সৃষ্টির ইতিহাস উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে : إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً -"আমি পৃথিবীতে খলীফা বানাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।" (আল কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত–৩০)

আল্লাহর ঘোষিত এই খলীফা কোনো ব্যক্তি বিশেষের জন্য বা কোনো মানুষের জন্য ব্যক্তিগতভাবে নির্দিষ্ট করা হয়নি। বরং তিনি যে আদমকে সৃষ্টি করলেন, তার সমস্ত বংশধর সমস্ত মানুষই খলীফা রূপে চিহ্নিত হয়েছিল। দুনিয়ায় মানুষকে আল্লাহর খলীফা বলে ঘোষণার ফলে দু'টি কথা অনিবার্য হয়ে পড়ে।[৫০] (পৃ:-৯৫)

১. মানুষ আল্লাহর খলীফা - আল্লাহর মহান নাম ও উচ্চতর পবিত্র গুণাবলির বাস্তব রূপায়নে। মানুষ আল্লাহর খলীফা, সে তার অস্তিত্ব দ্বারাই মহান আল্লাহর অসীম কুদরতের প্রমাণ ও প্রকাশ করছে। মানুষ এ দুনিয়ায় নানা জিনিস উদ্ভাবন করবে, নানা শিল্প কর্ম তৈরি করবে, আবিষ্কার করবে, নবোদ্ভাবন করবে, দিন রাত কাজ করবে এবং এসব করে মানুষ তার দুঃখকে হালকা করবে, অনুর্বরকে উর্বর করবে, বিরান স্থানকে আবাদ করবে, স্থলভাগকে জলভাগে ও জলভাগকে স্থলভাগে পরিণত করবে। গাছ-পালা রোপন করবে, শ্যামল শোভামণ্ডিত বাগান রচনা করবে, পশু-পালন করবে, তার বংশ বৃদ্ধি করবে। সে সবের মধ্যে কোনটি ছোট হবে, কোনটি বড় হবে, কোনটি গৃহিপালীত হবে আবার কোনটি বন্যই থেকে যাবে। এই সকল প্রকারের প্রজাতি দ্বারা মানুষ উপকৃত হবে, তাকে নিজের কাজে ব্যবহার করবে ঠিক যেমন প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক শক্তিসমূহ এবং অন্যান্য যাবতীয় সৃষ্টিকূলকে মানুষ নিজের ইচ্ছামত নানা কাজে ব্যবহার করছে।

যে আল্লাহ প্রত্যেকটি জিনিসকেই সৃষ্টি করেছেন এবং তার জন্যে একটা বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন- اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدٰى "তিনিই এইসব কিছু দিয়ে মানুষকে ধন্য করেছেন।" মানুষকে পৃথিবীতে খলীফা বানিয়েছেন, যেন মানুষ আল্লাহর সুন্নাতকে এখানে কার্যকর করে তাঁর সৃষ্টি কুশলতাকে উদ্ভাসিত করে তোলে, তাঁর হিকমতের তত্ত্ব-রহস্যকে উদঘাটিত করে, তাঁর বিধানের সার্বিক কল্যাণ মানুষ গ্রহণ করে। বস্তুত এ দুনিয়ায় আল্লাহর অসীম-বিস্ময়কর শক্তির ও ব্যাপক গভীর সূক্ষ্ম জ্ঞানের বাস্তব নিদর্শনই হচ্ছে মানুষ। "মানুষকে তিনি সর্বোত্তম মানে ও কাঠামোয় সৃষ্টি করেছেন।" (আল কুরআন, সূরা আত-তীন, আয়াত ৪)

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ

আর মানুষ তো এই সব দিক দিয়েই পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা। প্রাকৃতিক-স্বাভাবিক ব্যাপারাদির ক্ষেত্রে মানুষ আল্লাহর খলীফা, তাই পৃথিবীকে আবাদ করা, আবর্জনা-জঞ্জাল মুক্ত করা, এখানে বসবাসের বিপদ সংকুলতা দূর করার দায়িত্ব মানুষের উপরই অর্পিত। আর এ দুনিয়ায় সুষ্ঠু ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেই আল্লাহর লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করবে মানুষ। যেমন আল্লাহ বলেছেন :

هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا -

"সেই আল্লাহই তোমাদেরকে যমীন থেকে পয়দা করেছেন এবং এখানেই তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।" (আল কুরআন, সূরা হুদ, আয়াত ৬১)

আল্লাহ তা'আলাই স্থান-যমীন ও পশুকুলেরও রব। অতএব আল্লাহর খলীফা এই মানুষই সেই সম্পর্কিত যাবতীয় কাজের দায়িত্বশীল। হযরত আলী (রা:) তাই বলেছেন :

-اِنَّكُمْ مَسْئُوْلُوْنَ حَتَّى عَنِ الْبِقَاعِ وَالْبَهَائِمِ

"তোমরাই দুনিয়ার স্থান ও পশুকুলের ব্যাপারে দায়িত্বশীল।"[৪৫] (পৃ:-৯৬)

সারকথা, মানুষ এ দুনিয়ায় প্রাকৃতিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহর দেয়া শক্তি ও ক্ষমতার বলে আল্লাহ সুবহানাহুর প্রতিনিধি।

২. সেই সাথে মানুষ এ দুনিয়ার মানুষের সামষ্টিক ব্যাপারাদিতে নেতৃত্ব ও প্রশাসকত্বের ক্ষেত্রে আল্লাহর খলীফা। অর্থাৎ দুনিয়ায় মানুষ আল্লাহর খলীফা হওয়ার ব্যাপারটি শুধু উপরে উল্লেখিত ব্যাপার সমূহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, মানুষ দেশ শাসন ও জনগণকে নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রেও আল্লাহর খলীফা। কেননা মানুষ যখন দুনিয়ার স্থানসমূহের ব্যবস্থাপনা, জন্তু জানোয়ারের রক্ষণাবেক্ষণ ও যাবতীয় ব্যাপারাদি সূচারুরূপে সম্পাদনের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল- কিয়ামতের দিন এই সব বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে, তখন মানুষ তাদের নিজেদের ব্যাপারেও জিজ্ঞাসিত হবে অনিবার্যভাবে। মানুষ তার ব্যক্তি জীবন, সমাজ, রাষ্ট্র, সরকার-প্রশাসন, শিক্ষা, অর্থনীতি ও বিচার ইনসাফ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত না হয়ে পারে না। আর জিজ্ঞাসিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে, এসব ব্যাপারে তাদের কঠিন দায়িত্ব রয়েছে। অতএব এসব ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দান তাদের কর্তব্য। আর এ কর্তব্যের কারণেই তারা এ ক্ষেত্রেও আল্লাহর খলীফা।

এসব ক্ষেত্রে মানুষের খিলাফতের দায়িত্ব অবশ্যই পালিত হবে আল্লাহর দেয়া বিধানের ভিত্তিতে। নিজেদের ইচ্ছামত এ দায়িত্ব পালন করার কোনো অধিকার মানুষের থাকতে পারে না। ফলে মানুষের প্রশাসনিকতা আল্লাহর খলীফা হিসেবেই কার্যকর হবে এবং আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে এই প্রশাসনিক নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব সম্পাদিত হলেই কেবল বাস্তবায়িত হতে পারে এই যমিনে আল্লাহর খিলাফত। মানুষ আল্লাহর খলীফা হিসেবেই প্রশাসনিক কর্তৃত্ব প্রয়োগীয় সার্বভৌমত্বের অধিকারী হবে, যদিও আসল ও প্রকৃত সার্বভৌমত্ব সম্পূর্ণরূপে ও একান্তভাবে আলাহর জন্যেই নির্দিষ্ট, যাতে মানুষের কোনো অংশ আদপেই নেই। তাই বলা

যায়, মানুষ এ দুনিয়ার প্রশাসনিক কর্তৃত্ব সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ করবে কেবলমাত্র আল্লাহর খলীফা হিসেবে, আল্লাহর প্রতিনিধি রূপে, নিজস্ব ভাবে নয়।

এই প্রয়োগীয় সার্বভৌমত্ব বা প্রশাসনিক কর্তৃত্বের অধিকারী সাধারণ ভাবে সমস্ত মানুষ। কিন্তু যেহেতু সেই সর্ব সাধারণ মানুষ সকলে একত্রে খিলাফতের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন ও পরিচালনার যোগ্য বা সক্ষম হয় না এবং আলাদাভাবে প্রতিটি ব্যক্তিও এই কাজ সমাধা করতে পারে না, সেজন্যে খিলাফাত পরিচালনার দায়িত্ব সকলের পক্ষ থেকে নির্বাচিত খলীফাদের ওপরই ন্যস্ত করা হয়। কিন্তু তাদের ক্ষমতা ও অধিকার অতীব সীমাবদ্ধ। তারা কখনো ক্ষমতা লাভ করে 'ডিক্টেটর' হতে পারে না। যে ব্যক্তি মূল নিয়মতন্ত্রের বিরোধীতা করবে, সে-ই অপরাধী সাব্যস্ত হবে। তার বিরুদ্ধে আদালতে মোকাদ্দমা দায়ের করা যাবে। এভাবে নির্বাচিত খলীফা কিংবা খিলাফতের রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা কারো পক্ষে ডিক্টেটর, তথা স্বেচ্ছাচারী বাদশাহ বা শাসক হওয়ার সম্ভাবনা বা অবকাশ থাকেই না। ইসলাম ও বাদশাহী কিংবা ইসলাম ও ডিক্টেটরবাদ এবং ইসলাম ও বর্তমান ধর্মহীন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা মৌলিকভাবেই পরস্পর বিরোধী।

খিলাফত রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি :

খিলাফত রাষ্ট্রের ধারণা ও ভিত্তি কুরআন-সুন্নায় নিহিত রয়েছে। খিলাফত রাষ্ট্রের ধারণা কোনো মানব রচিত বা পণ্ডিতদের গবেষণা ও অভিজ্ঞতা প্রসূত বিষয় নয়। এর মূল ভিত্তি কুরআনে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ -

"আমরা আমাদের রাসূলগণকে অকাট্য যুক্তি ও সুস্পষ্ট বিধানসহ পাঠিয়েছি এবং তাদের কাছে 'আল-কিতাব' ও 'আল-মীযান' প্রেরণ করেছি যেন মানুষ ইনসাফ কায়েম করতে পারে। আর আমরা লৌহও নাযিল করেছি, এর মধ্যে বিরাট শক্তি নিহিত রয়েছে এবং রয়েছে প্রভূত কল্যাণের সম্ভাবনা।" (আল কুরআন, সূরা আল হাদীদ, আয়াত ২৫)

ইমাম ফখরুদ্দীন আল রাযী উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন– আয়াতে বর্ণিত 'লৌহ' অর্থ রাষ্ট্রশক্তি। তিনি বলেন, কিতাব ও মীযান নাযিল করা এবং লৌহ ধাতু ও লৌহ শক্তি (রাষ্ট্র) সৃষ্টির মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব সমাজে ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা।(ফখরুদ্দীন আল রাযী, তাফসীরে কবির, ২১ খন্ড, পৃ: ২৪০-৩)[২১](পৃ:-২২)

আল্লাহ তাআলা তাঁর আসমানী কিতাবে যে সামঞ্জস্য ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন-বিধান আল-মীযান নাযিল করেছেন, রাষ্ট্র শক্তিকে সেই অনুসারে পরিচালিত করে সামাজিক সুবিচার ব্যবস্থার (Social Justice) স্থাপন করাই রাসূলগণের কর্তব্য নির্দিষ্ট হয়েছে। আর রাসূলগণের পরে যারা এই দায়িত্ব পালন করবে তাদের সম্পর্কে অন্যত্র বলা হয়েছে :

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ

"ইসলামী হুকুমত পরিচালনার দায়িত্ব এমন লোকদের ওপর ন্যস্ত করতে হবে যে, তাদেরকে পৃথিবীর প্রতিপত্তি ও রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করলে তারা নামায পড়ার স্থায়ী ব্যবস্থা কায়েম করবে, যাকাত আদায়ের সামাজিক প্রথার প্রচলন করবে, (জনগণকে) পূণ্য, ন্যায় ও সৎকাজের নির্দেশ দান করবে এবং অন্যায় ও পাপ থেকে বিরত রাখবে।" (আল কুরআন, সূরা আল হাজ্ব, আয়াত ৪১)

বিশ্বনবীর প্রতি কুরআন শরীফ এজন্যই নাযিল হয়েছে যে, তদনুযায়ী মানুষের বিচার-ইনসাফ ও রাষ্ট্র পরিচালনার যাবতীয় কাজ সুসম্পন্ন করা হবে। আল্লাহ নিজেই ইরশাদ করেছেন :

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا -

"নিশ্চয়ই আমরা তোমার প্রতি পূর্ণ কুরআন শরীফ পরম সত্যতার সাথে এই জন্যই নাযিল করেছি যে, তুমি সেই অনুযায়ী মানুষের ওপর ঠিক আল্লাহ প্রদর্শিত পন্থায় রাষ্ট্র পরিচালনা করবে এবং বিচার-ইনসাফ কায়েম করবে। (কুরআনকে যারা এই কাজে ব্যবহার করতে চায় না, তারা এই মহান আমানতের খিয়ানত করে) তুমি এই খিয়ানতকারীদের সাহায্য ও পক্ষ সমর্থনকারী হইও না।" (আল কুরআন, সূরা আন নিসা, আয়াত -১০৫)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে :

فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

"সুতরাং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করছেন তদনুসারে তুমি তাদের শাসন-বিচার করো এবং যে সত্য তোমার নিকট এসেছে তা ত্যাগ করে তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করো না। তোমাদের জন্যে শরিয়ত ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করেছি।" (আল কুরআন, সূরা আল মায়েদা, আয়াত ৪৮)

একইভাবে আল্লাহর রাসূলের সিদ্ধান্ত দ্বিধাহীনচিত্তে মেনে চলাও একজন মুমিন বা মুমিন জাতির জন্যে বাধ্যতামূলক করে দিয়ে কুরআন ঘোষণা করছে :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا -

"কিন্তু না, তোমাদের প্রতিপালকের শপথ, তারা মু'মিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের বিবাদ-বিসংবাদের বিচার ভার তোমার উপর অর্পণ না করে; অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাদের মনে কোনো দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেয়।" (আল কুরআন, সূরা আন নিসা, আয়াত ৬৫)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا-

"হে মুমিনগণ, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে কর্তৃত্বের অধিকারী। সুতরাং কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে তা মিমাংসার জন্যে উপস্থাপন কর আল্লাহ ও তার রাসূলের নিকট। এটিই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।" (আল কুরআন, সূরা আন নিসা, আয়াত ৫৯)

হযরত রাসূলে করীম (সা:) একবার সাহাবাগণকে সম্বোধন করে বলেছিলেন : এমন এক সময় আসবে যখন নিরন্দ্র অন্ধকার রাতের ন্যায় ফেতনা-ফাসাদ সমগ্র দুনিয়াকে একেবারে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। একজন সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা:)! সেই বিপদ থেকে বাঁচবার উপায় কি? উত্তরে বিশ্বনবী (সা:) বলেছিলেন :

كِتَابُ اللهِ تَعَالَى فِيهِ نَبَأُ مَنْ قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ بَيْنَكُمْ وَهُوَ فَصْلٌ لَيْسَ بِالْهَزْلِ-

"আল্লাহর কুরআন, আল্লাহর দেয়া বিধানই বাঁচবার একমাত্র উপায়। তাতে অতীতকালের জাতিগুলোর ইতিহাস আছে, ভবিষ্যতের মানব বংশের অবস্থা ও ঘটনাবলী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী আছে এবং বর্তমানের

Dhaka University Institutional Repository

পরিপেক্ষিতে তোমাদের পারস্পরিক বিষয় সম্পর্কীয় রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনও তাতে আছে। বস্তুত তা এক চূড়ান্ত বিধান, তা কোনো বাজে জিনিস নয়।" (তিরমিযী শরীফ) [৪৬](পৃ:-৫৬)

অতঃপর নবী করীম (সা:) ইরশাদ করলেন :

مَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدِلَ وَمَنْ عَصِمَ بِهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ-

"যে ব্যক্তি এই বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করবে, সে এর প্রতিফল লাভ করবে। যে এর অনুসরণে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে তার শাসন সুবিচারপূর্ণ হবে এবং সে একে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরবে সে সঠিক এবং সত্যিকার কল্যাণের পথে পরিচালিত হতে পারবে।" (আল বাহরুস সাখিত) [৪৬](পৃ:-৫৬)

হযরত নবী করীম (সা:) কে উদ্দেশ্য করে সকল মুসলমানকে আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিচ্ছেন :

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ وَلاَ تَتَّبِعْ اَهْوَا ءَهُمْ-

"আল্লাহর বিধান অনুযায়ী মানুষের ওপর হুকুমত কায়েম করো, তাদের মনের খেয়াল-খুশী ও ধারণা-বাসনার অনুসরণ করো না।" (আল কুরআন, সূরা আল মায়েদা, আয়াত ৪৯)

এই সব আয়াত থেকে নিঃসন্দেহে জানা গেল যে, ইসলামী হুকুমতের বুনিয়াদী আইন হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ। মানুষের নিছক অভিজ্ঞতা, নিজস্ব মনোভাব কিংবা বিশেষ শ্রেণী বা দলের বিশেষ স্বার্থের ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্রে আইন রচনা করা যেতে পারে না। মূলকথা আল্লাহ ও রাসূলের ফয়সালা যেখানে আছে সেখানে কোনো মতবিরোধ-মতানৈক্য চলতে পারে না; বরং কুরআন সুন্নাহর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ও নিরংকুশ। আল্লাহর আইনের বিরোধিতা করা, তার বদলে কোনো মানবীয় আইন-বিধান ও নীতির কথা বলা, অনুসরণ করা এবং এগুলোকে উৎকৃষ্ট ও প্রকৃষ্ট মনে করা সবই হচ্ছে মূলত আল্লাহদ্রোহীতার শামিল। আল্লাহ পাক বলেন :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا -

"তুমি কি তাদেরকে দেখ নাই যাদেরকে কিতাবের অংশ দেয়া হয়েছিল তারা জিতে (আল্লাহ ব্যতী সকল পুজ্য সত্তা) ও তাগুতে (খোদাদ্রোহীতায়) বিশ্বাস করে। তারা কাফিরদের সম্পর্কে বলে, এদের পথ মুমিনদের অপেক্ষা প্রকৃষ্টতর।" (আল কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত ৫১)

বস্তুত আল্লাহর আইন ও নীতি পরিহার করে অন্য কোনো আইন-বিধান ও নীতি অনুসারে শাসন ও বিচার কার্য পরিচালনা করা কার্যত কুফরী, জুলুম ও ফিসক। যেমন কুরআন মাজীদের ঘোষণা :

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ -

"সুতরাং মানুষকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় করো এবং আমার আয়াতসমূহকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করো না। আর (জেনে রেখো) আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না - শাসন করে না তারাই কাফের।" (আল কুরআন, সূরা আল মায়েদা, আয়াত ৪৪)

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ-

"(তাওরাতে আমরা ইহুদীদের প্রতি) এই হুকুমই লিখে দিয়েছিলাম যে, জানের বদলে জান, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের পরিবর্তে দাঁত এবং সব রকমের যখমের জন্যে সমান বদলা নির্দিষ্ট। অবশ্যই কেউ এই কিসাস সাদকাহ করে দিলে তা তার জন্যে কাফফারা হবে। আর যারা খোদার নাযিল করা আইন অনুযায়ী ফয়সালা করে না তারাই জালেম।" (আল কুরআন, সূরা আল মায়েদা, আয়াত ৪৫)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ -

"আমাদের নির্দেশ ছিল যে, ইঞ্জিল বিশ্বাসীগণ আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করবে। আর যারাই আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করবে না তারাই ফাসেক।" (আল কুরআন, সূরা আল মায়েদা আয়াত ৪৭)

বস্তুত আল্লাহর দেয়া বিধানকে উপেক্ষা করে যারা আইন রচনা করে ও রাষ্ট্রে পরিচালনা করে, তারা একই সাথে তিনটি বড় মারাত্মক অপরাধ করে। প্রথমত: আল্লাহর বিধান, নিজের জীবন ও কর্মশক্তি এবং অধীনস্থ জনগণ একসাথে এসব কিছুর ওপর সে জুলুম করে। অপর দিকে আল্লাহর বিধানকে সে কার্যত অস্বীকার ও অমান্য করে এবং তৃতীয়ত: সে চূড়ান্ত ও নির্দিষ্ট সীমাকে পূর্ণ ধৃষ্টতার সাথে লঙ্ঘন করে।

ইসলামের দৃষ্টিতে মুমিনগণ অবশ্যই রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের অধীন থাকতে হবে। ইসলামী রাজনীতিতে আমীরের আনুগত্যকে বাস্তব গুরুত্বের দিক থেকে আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্যের অধীন সমান মর্যাদা সম্পন্ন করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলার নির্দেশ :

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ -

"আল্লাহ তাআলার অনুগত হও, তাঁর রাসূলকে অনুসরণ করে চল এবং তোমাদের মধ্য থেকে (নির্বাচিত) আমীরের আনুগত্য কর।" (আল কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত ৫৯)

হযরত রাসূলে করীম (সা:) বলেছেন :

مَنْ اَطَاعَنِیْ فَقَدْ اَطَاعَ اللهِ وَمَنْ عَصَانِیْ فَقَدْ عَصَی اللهُ وَمَنْ یُّطْعِ الْاَمِیْرَ فَقَدْ اَطَاعَنِیْ مَنْ یَّعْصِ الْاَمِیْرَ فَقَدْ عَصَانِیْ-

"যে আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করল; যে আমাকে অমান্য করল সে আল্লাহকে অমান্য করল এবং যে (নির্বাচিত) আমীরের আনুগত্য করল সে আমার আনুগত্য করল আর যে আমীরের অমান্য করল, সে আমাকে অমান্য করল।" (বুখারী, মুসলিম) [৪৬] (পৃ:-৬৪)

অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে : اِنْ اَمَّرَ عَلَیْکُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ یَقُوْدُکُمْ بِکِتَابِ اللهِ فَاسْمَعُوْا وَاَطِیْعُوْا-

"যদি এমন কোনো ক্রীতদাসকে তোমাদের আমীর পদে অধিষ্ঠিত করা হয়, যার অঙ্গ কেটে দেয়া হয়েছে, কিন্তু সে আল্লাহর আইন অনুযায়ী তোমাদের ওপর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে, তাহলে তার কথা শ্রবণ করো ও তার আনুগত্য স্বীকার করো।" (মুসলিম, কিতাবুল ইমারত) [১৫] (পৃ:-৬৮)

অপর হাদীসে আসছে : اِسْمَعُوْا وَاَطِیْعُوْا وَاِنْ اُسْتُعْمِلَ عَلَیْکُمْ عَبْدٌ حَبْشِیٌّ کَاَنَّ رَأْسَهُ زَبِیْبَةٌ-

"বিদঘুঁটে চেহারার কোনো হাবশী গোলামকেও যদি তোমাদের ওপর আমীর কিংবা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয় তবুও তার কথা শোন এবং তাকে মেনে চল।" (বুখারী) [৪৬] (পৃ:-৯৯)

অন্য হাদীসে আসছে– مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِىْ عُنُقِهِ بَيْعَةً مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً-

"যে ব্যক্তি, মুসলিম খলীফার বাইয়াতের শৃঙ্খল গলায় পরিধান না করে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সে মুর্খতার মৃত্যু বরণ করল।" (সহীহ মুসলিম, ২য় খন্ড, বিংশতি অধ্যায়, হাদীস নং ৪৫৬২)

রাসূল (সা:) আরো বলেছেন : اَمَرَكُمْ بِخَمْسٍ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ-

"আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি, আর তা হচ্ছে– ১. সমাজবদ্ধ জীবনের, ২. (নিদেশাবলী) শ্রবণ করার, ৩. (বিধিনিষেধের) আনুগত্যের, ৪. হিজরতের ও ৫. আল্লাহর পথে জিহাদ করার।" (আহমদ, তিরমিযী, মিশকাতের উদ্ধৃতি অনুযায়ী ৩২১ নং পৃ:)

হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা:) বলেন :

دَعَانَا النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَا فَكَانَ فِىْ مَا اَخَذَ عَلَيْنَا اَنْ بَايَعْنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِىْ مُنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا-

"রাসূলুল্লাহ (সা:) আমাদেরকে ডাকলেন। আমরা তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করলাম। তিনি এই কথাগুলোর উপর আমাদের শপথ গ্রহণ করালেন : পছন্দ হোক বা অপছন্দ, আমরা সচ্ছল থাকি বা অসচ্ছল- সদা সর্বদা আমরা আমাদের আমীরগণের নির্দেশ শুনবো ও তাদের আনুগত্য করবো।"(মুসলিম, কিতাবুল ইমরাত) [১৫] (পৃ:-৭১)

হযরত আলী (রা:) এর একটি উক্তি :

حَقٌّ عَلَى الْاِمَامِ اَنْ يَّحْكُمَ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ وَاَنْ يُّؤَدِّىَ الْاَمَانَةَ فَاِذَا فَعَلَ ذَالِكَ فَحَقٌّ عَلَى النَّاسِ اَنْ يَّسْمَعُوْا لَهُ وَاَنْ يُّطِيْعُوْهُ وَاَنْ يُّجِيْبُوْهُ اِذَا دَعَوْا-

"ইমাম-রাষ্ট্রনায়কের অধিকার হচ্ছে এতটুকু মাত্র যে, সে আল্লাহর নাযিল করা বিধানের ভিত্তিতে শাসনকার্য চালাবে। সে যদি তা করে, তাহলে জনগণের ওপর তার এই অধিকার হবে যে, তারা তার কথা শুনবে ও তার আনুগত্য করবে এবং যখন ডাকবে তখন তারা সে ডাকে সাড়া দেবে।"[৪৫] (পৃ:-১২০,১২১)

অন্য হাদীসে আসছে : مَنْ بَايَعَ اِمَامًا فَاَعْطَاهُ صَفْقَةً يَدِهِ وَثَمْرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَااسْتَطَاعُ-

"যে ব্যক্তি ইমাম-খলীফার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করল, সে তার হাতে নিজের হাত অর্পণ করল এবং নিজের হৃদয় সম্পদ তাকে দান করল সুতরাং নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী তার খলীফার আনুগত্য স্বীকার করা উচিত।" (মুসলিম, কিতাবুল ইমরাত) [১৫] (পৃ:-৭৪)

রাসূল (সা:) বলেন– مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِىَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا حُجَّةَ لَهُ-

"যে ব্যক্তি আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, (তার এই পন্থা অবলম্বনের পক্ষে) তার নিকট কোনো যুক্তি থাকবে না।" (মুসলিম, কিতাবুল ইমরাত) [১৫](পৃ:-৭২)

কিন্তু আমীর যদি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য না করে এবং তার বিধান অনুসরণ করে না চলে, তবে তার আনুগত্য করা কিছুতেই জায়েয হবে না। বরং তখন তার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করে একে ক্ষমতাচ্যুত করাই ঈমানদার নাগরিকদের পক্ষে অবশ্যই কর্তব্য। আল্লাহ তা'আলা পরিষ্কার বলেছেন :

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا -

"যার অন্তর আমার স্মরণ (এবং আমার আনুগত্যমূলক ভাবধারা) থেকে শূন্য, নিজের নফসের অনুসরণ করাই যার অভ্যাস এবং যে ব্যক্তি যাবতীয় কাজ-কর্মে (ইসলামের বিধান মেনে চলে না; বরং ইসলামী বিধানের নির্ধারিত) সীমা লঙ্ঘন করে, তার আনুগত্য মাত্রই করো না।" (আল কুরআন, সূরা আল কাহাফ, আয়াত ২৮)

তিনি আরো বলেছেন : وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ - الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ -

"যে সব লোক সীমালঙ্ঘন করে দুনিয়ায় অশান্তি ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে, তাদের মাত্রই তোমরা আনুগত্য করো না।" (আল কুরআন, সূরা আশ শুয়ারা, আয়াত ১৫১, ১৫২)

আরো সুস্পষ্ট ভাষায় অন্য আয়াতে বলা হয়েছে :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا - فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا-

"(হে নবী!) নিশ্চয়ই আমরা তোমার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি। অতএব ধৈর্য ধারণ করে কেবল তোমার রবের হুকুম পালন কর। আর কোনো পাপী কিংবা কাফের লোকের আনুগত্য করো না।" (আল কুরআন, সূরা আদ দাহর, আয়াত ২৩, ২৪)

নবী করীম (সা:) ইরশাদ করেছেন : لاَطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

"স্রষ্টার নাফরমানী করে সৃষ্টির আনুগত্য করা যেতে পারে না।"[৪৬](পৃ:-৭০)

অপর হাদীসে আসছে : لاَطَاعَةَ فِىْ مَعْصِيَةِ اللهِ اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِىْ الْمَعْرُوْفِ

"আল্লাহর অবাধ্যতায় কোনো আনুগত্য নেই; আনুগত্য কেবল মা'রূফ বা ভালো কাজে।" (মুসলিম, কিতাবুল ইমারত, অধ্যায় ৮, আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, অধ্যায় ৯৫, নাসায়ী, কিতাবুল বায়আত, অধ্যায় ৩৩)

ইমাম নববী (রহ.) বলেন : اَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى وُجُوْبِهَا فِىْ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ وَعَلَى تَحْرِيْمِهَا فِىْ مَعْصِيَةٍ-

"আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে এমন কোনো কাজ যা গুনাহ নয় তাতে ক্ষমতাশীল ব্যক্তিদের আনুগত্য ওয়াজীব, এবং অন্যায় ও গুনাহের কাজে তাদের আনুগত্য হারাম।" (শরহে মুসলিম, ২য় খন্ড : কিতাবুল আওতার)

অতএব উপরোক্ত দীর্ঘ আলোচনায় এটি সুস্পষ্ট যে, খিলাফত রাষ্ট্রের ধারণা কুরআন-সুন্নাহর মধ্যেই নিহিত। এটি কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মতামত ভিত্তিক তত্ত্ব নয় বরং কুরআন সুন্নাহর নির্দেশ। তাই মুসলিম সমাজকে তাদের সামষ্টিক দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্যে একজন শাসক-প্রশাসক নিযুক্ত করা একান্তই কর্তব্য। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর একজন 'ইমাম' বা রাষ্ট্রনায়ক নিযুক্ত করা শরিয়ত ও সাহাবায়ে কেরামের আমল 'ওয়াজিব' (ফরজ) প্রমাণ করেছে। রাসূলে করীম (সা:)-এর ইন্তিকালের পর সর্বপ্রথম কাজ হিসেবে সাহাবায়ে কেরাম (রা:) হযরত আবু বুকর (রা:) কে খলিফা নির্বাচিত করে এই কাজের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছেন। এই প্রেক্ষিতে আল্লামা জুরজানী (রহ:) দাবি করেছেন :

اِنَّ نَصْبَ الْاِمَامِ مِنْ اَتَمِّ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاَعْظَمِ مَقَاصِدِ الدِّيْنِ-

"ইমাম বা রাষ্ট্রনায়ক নিয়োগ মুসলমানদের কল্যাণ সাধনের পূর্ণতম ব্যবস্থা এবং দ্বীন-ইসলামের সর্বোচ্চ লক্ষ্যের সর্বাধিক মাত্রার বাস্তবায়ন।"[৪৫] (পৃ:-১২৩)

আল্লামা নাসাফী আহলিস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা হিসেবে লিখেছেন :

وَالْمُسْلِمِيْنَ لاَبُدَّ لَهُمْ مِّنْ اِمَامٍ يَقُوْمُ بِتَنْفِيْذِ اَحْكَامِهِمْ وَاِقَامَةِ حُدُوْدِهِمْ – سَدَّ ثُغُوْرِهِمْ وَتَجْهِيزِ جُيُوْشِهِمْ وَاَخْذَ صَدَقَاتِهِمْ وَقَهْرِ الْمُتَغَلِّبَةِ وَالْمُتَلَصِّصَةِ وَقُطَّاعِ الطَّرِيْقِ وَاِقَامَةِ الْجُمَعِ وَالْاَعْيَادِ وَقَطْعِ الْمُنَازَعَاتِ الْوَاقِعَةِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَقَبُوْلِ الشَّهَادَةِ الْقَائِمَةِ عَلَى الْحُقُوقِ وَتَزْوِيْجِ الصِّغَارِ وَالصَّغَائِرِ الَّذِيْنَ لاَ اَوْلِيَاءَ لَهُمْ وَقِسْمَةِ الْغَنَائِمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الاُمُوْرِ الَّتِيْ لاَيَتَوَلَّهَا اَحَادُ الاُمَّةِ-

"মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্যে একজন ইমাম রাষ্ট্রনায়ক অবশ্যই থাকতে হবে। সে আইন-কানুনসমূহ কার্যকর করবে, শরিয়ত নির্দিষ্ট শাস্তিসমূহ জারি করবে, বিপদ-আপদের সকল দিক বন্ধ করবে, সেনাবাহিনীকে সুসজ্জিত ও সদা প্রস্তুত রাখবে শত্রুতার আগ্রাসন বন্ধের লক্ষ্যে। লোকদের নিকট থেকে যাকাত-সাদাকাত ইত্যাদি আদায় ও বণ্টন করবে, বিদ্রোহী-দুষ্কৃতিকারী, চোর-ঘুষখোর ও ডাকাত-ছিনতাইকারীদের কঠিন শাসনে দমন করবে। জুমআ' ও ঈদের নামাযসমূহ কায়েম ও তাতে ইমামতি করবে। লোকদের অধিকার প্রমাণের জন্যে সাক্ষ্য গ্রহণ করবে। অভিভাবকহীন দুর্বল-অক্ষম ছেলে-মেয়েদের বিবাহের ব্যবস্থা করবে, জাতীয় সম্পদ জনগণের মধ্যে বণ্টন করবে। আর এই ধরনের বহু কাজই সে আঞ্জাম দেবে, যা কোনো ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে আঞ্জাম দিতে পারে না।" (শরহে আকায়েদ নাসাফী) [৪৫] (পৃ:-১২৩,১২৪)

সুতরাং প্রমাণিত মুসলিম উম্মাতের সুষ্ঠু জীবনের জন্যে যেমন রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন একজন ইমাম বা রাষ্ট্র প্রধানের।

খিলাফতের মৌল আদর্শ :

আল্লাহর খিলাফত-প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব তিনি নিজেই মানুষের উপর অর্পণ করেছেন। এই খিলাফতের অধিকার ও মর্যাদা প্রত্যেকটি মানুষের অভিন্ন। সকল মানুষ একত্রিত হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে এই খিলাফতের দায়িত্ব পালনে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে প্রয়োগ করবে। এই প্রয়োগীয় সার্বভৌমত্ব মানুষের নিকট এক মহান আমানত গচ্ছিত। কিন্তু কার্যত সকল মানুষ একত্রিত হয়েও একসাথে এই প্রয়োগীয় সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ করতে পারে না বলেই সকলের পক্ষ থেকে এক বা একাধিক ব্যক্তি তা প্রয়োগ করবে। এই কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য কয়েকটি ব্যবস্থার একান্তভাবেই প্রয়োজন।

প্রথমত মানব-সমাজকে এক ও অভিন্ন কেন্দ্রবিন্দুতে একত্রিত হতে হবে, যারা প্রদত্ত খিলাফত প্রয়োগ করে এই পৃথিবীতে ঐক্যবদ্ধ খলীফা সমষ্টি রূপে গণ্য হবে। তারা অন্যান্য সকল প্রকারের সম্পর্ক ছিন্ন করে নেবে এবং সমগ্র বিশ্বলোক ও তার মধ্যকার সব কিছুর একমাত্র মালিক ও নিয়ন্ত্রকরূপে সেই 'এক' কেই স্বীকার করবে। এই গভীর ও সূক্ষ্ম তত্ত্ব কুরআন বুঝাতে চেয়েছে একটি দৃষ্টান্তমূলক বর্ণনা দিয়ে। ইরশাদ হচ্ছে :

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا

"আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। এক ব্যক্তি তো সে, যার মালিকানায় বহু সংখ্যক বাঁকা স্বভাবের মনিব শরীক হয়ে আছে, যারা প্রত্যেকেই তাকে নিজের দিকে টানে। আর অপর এক ব্যক্তি পুরোপুরিভাবে একই মনিবের জন্যে নির্দিষ্ট। ..... এই দু'জনের অবস্থা কি একই রকমের হতে পারে?" (আল কুরআন, সূরা আল যুমার, আয়াত ২৯)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে :

ءَارْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ أَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ- مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوْهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَّا أَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّٰهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوْا إِلَّا إِيَّاهُ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ-

"হে মানুষ! ভিন্ন ভিন্ন ও একাধিক মা'বুদ স্বীকার করা ভালো, না একজন প্রকৃত শক্তিমান এবং সকলের ওপর জয়ী মা'বুদ ভালো? জেনে রেখো, এক আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা আর যে মা'বুদ নামের জিনিসগুলোর ইবাদত ও বন্দেগী করো, তা কতগুলো অর্থহীন নাম ছাড়া আর কিছুই নয়। আর সেই নামগুলোও তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা মিলে রেখেছ– আল্লাহ এ সম্পর্কে কোনো যুক্তি প্রমাণই নাযিল করেননি। অথচ হুকুম দেয়া ও আইন রচনা করার অধিকার ও ক্ষমতা এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। তিনি সকলের প্রতি এ আদেশ করেছেন যে, কেবল আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব ও বন্দেগী করো না। এ একমাত্র সত্য ও মজবুত 'দ্বীন' জীবন ব্যবস্থা। কিন্তু অনেক মানুষই তা জানে না।" (আল কুরআন, সূরা ইউসুফ, আয়াত ৩৯, ৪০)

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيلٌ -

"তিনিই তোমাদের রব। তিনি ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই। তিনিই প্রত্যেকটি জিনিসের সৃষ্টিকর্তা; অতএব কেবল তাঁরই দাসত্ব করো বন্দেগী করো। তিনি প্রত্যেকটি জিনিসের ব্যাপারেই দায়িত্বশীল।" (আল কুরআন, সূরা আনআম, আয়াত ১০২)

রাসূলে কারীম (সা:) কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে : قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّإِنَّنِي بَرِيْءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ -

"(হে নবী!) আপনি বলুন, কেবল সেই আল্লাহই প্রকৃত মা'বুদ তিনি এক ও একক এবং আমি নিজে তোমাদের শিরক থেকে সম্পূর্ণ দায়িত্বমুক্ত।" (আল কুরআন, সূরা আনআম, আয়াত ১৯)

قُلْ هُوَ رَبِّيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ -

"বল, তিনিই আমার রব। তিনি ব্যতীত আর কেউ মা'বুদ নেই। তাঁর ওপরই আমার একান্তভাবে ভরসা আর আমি তার দিকেই ফিরে যাচ্ছি।" (আল কুরআন, সূরা রা'দ, আয়াত ৩০)

অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে : قُلْ إِنَّمَا يُوحٰى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ -

"বল, আমার কাছে এই মর্মে ওহী পাঠানো হয়েছে যে, তোমাদের মা'বুদ একজন। তোমরা কি তাঁর অধীন ও অনুগত হয়ে থাকবে?" (আল কুরআন, সূরা আম্বিয়া, আয়াত ১০৮)

দ্বিতীয়ত: সেই সমাজ-সমষ্টিকে এক আল্লাহর জন্যে খালেস দাসত্বের ভিত্তিতে গড়ে উঠতে হবে, সমাজের লোকদের পারস্পরিক সম্পর্কও সেই অনুযায়ী গড়ে উঠতে হবে এবং অন্যান্য অসংখ্য তাগুতী শক্তির সার্বভৌমত্বের বন্ধন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও স্বাধীন হতে হবে। কুরআন মাজীদে হযরত মুহাম্মদ (সা:) কে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ -

"বল, হে নবী! আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, আমি একান্তভাবে বান্দা হব, দাসত্ব করব, কেবলমাত্র আল্লাহর; তাঁর সাথে কোনোক্রমেই শিরক করব না। আমি তাঁরই দিকে আহ্বান জানাচ্ছি এবং তাঁরই কাছে আমার আশ্রয়- চূড়ান্ত পরিণতি।" (আল কুরআন, সূরা রা'দ, আয়াত ৩৬)

হযরত ইব্রাহীম (আ:) তাগুতী শক্তির সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা দিয়েছিলেন :

إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ

"আমি তোমাদের ও তোমাদের সেই মা'বুদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করলাম, দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হলাম- আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদত কর। আমি তোমাদের সকল কর্তৃত্ব অস্বীকার ও অমান্য করলাম এবং এ মুহূর্ত থেকে আমাদের ও তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও ঘৃণা স্পষ্টভাবে শুরু হয়ে গেল চিরদিনের তরে। যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।" (আল কুরআন, সূরা মুমতাহিনা, আয়াত ৪)

তৃতীয়ত: সমগ্র সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্র থেকে পার্থক্য প্রাধান্য ও অগ্রাধীকার নীতি নির্মূল করে সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের প্রাণস্পর্শী পবিত্র ভাবধারাকে মূর্ত ও প্রবল করে তুলতে হবে। এখানে আল্লাহই হবেন একমাত্র সার্বভৌম, কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে একমাত্র আল্লাহর। আর সমগ্র মানুষ সর্বতোভাবে সমান, অভিন্ন সেই আল্লাহর সাথে সম্পর্কের দিক দিয়ে। আর এই সকল মানুষই পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা বিশ্ব ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে। মানব জীবন সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার ব্যাপারে। এখানে মান-মর্যাদা ও মৌলিক-স্বাভাবিক অধিকারও সকল মানুষের এক ও অভিন্ন, ঠিক যেন চিরুণীর কাঁটাগুলো সমান্তরাল।

একথা কারো অবিদিত নয় যে, ইসলামে সার্বভৌমত্বের একচ্ছত্র মালিক স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা; এখানে আইন রচনা ও নির্দেশ দানের মৌলিক অধিকারও আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। অতএব ইসলামী খিলাফতের প্রাথমিক ও মৌলিক বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

১. কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী, পরিবার, শ্রেণী দল, প্রতিষ্ঠান কিংবা গোটা রাজ্যের সমগ্র অধিবাসী ও বিচ্ছিন্ন কিংবা সম্মিলিতভাবে সার্বভৌমত্বের অধিকারী হতে পারে না। এটি একান্তভাবে আল্লাহ তাআলার জন্যেই নির্দিষ্ট। কুরআন মজীদের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা :

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ -

"আল্লাহ ছাড়া কারো নির্দেশ নেই- হুকুম নেই। তাঁর নির্দেশ, তোমরা তাকে ছাড়া কারো দাসত্ব করো না। এটিই সত্য-সঠিক সুদৃঢ় জীবন ব্যবস্থা। অথচ অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।' (আল কুরআন, সূরা ইউসুফ, আয়াত ৪০)

يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهُ لِلّٰهِ

"তারা বলে আমাদেরও কি কোনো হুকুম দেয়ার ইখতিয়ার আছে? বল, সমস্ত বিষয় আল্লাহরই ইখতিয়ারে।" (আল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৫৪)

-اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ -"সাবধান! সৃষ্টি তারই, নির্দেশও তার।" (আল কুরআন, সূরা আরাফ, আয়াত ৫৪)

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ -

"তুমি কি জানো না যে আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব- সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই জন্যে।" (আল কুরআন, সূরা মায়েদা, আয়াত ৪০)

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ اِلَى اللّٰهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ -

"তোমাদের মধ্যে যে মতভেদই হোক না কেন, তার ফয়সালা করা আল্লাহরই কাজ। সেই আল্লাহই আমার রব, তাঁর উপর আমি ভরসা করছি। তাঁর দিকেই মনোনিবেশ করছি।" (আল কুরআন, সূরা শুরা, আয়াত ১০)

২. ইসলামী রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহ; তবে জাগতিক ও রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রে এ ক্ষমতা তিনি সরাসরি প্রয়োগ করেন না। কার্যত এ ক্ষমতা প্রয়োগ করে মানুষই। মানুষ কোন অধিকার বলে এ ক্ষমতা প্রয়োগ করে? মানুষ আল্লাহর প্রতিভূ বা খলিফা হিসেবে এ ক্ষমতা প্রয়োগ করে। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ হচ্ছে আল্লাহর খলিফা। কুরআনুল কারীমে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। আদম (আ:) সৃষ্টি প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন–

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

"(সে সময়ের কথা স্মরণ কর) যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বললেন : আমি পৃথিবীতে খলীফা সৃষ্টি করতে যাচ্ছি।" (আল কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত ৩০)

শুধু হযরত আদম (আ:) ব্যক্তিগতভাবেই নন বরং গোটা মানব জাতিই পৃথিবীতে খিলাফতের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত। নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে এ সত্য অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ

"তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীর খলীফা করেছেন এবং তোমাদের কাউকে অপর কারো উপর উচ্চ মর্যাদা দান, করেছেন যেন তিনি তোমাদের যাচাই করতে পারেন।" (আল কুরআন, সূরা আনআম, আয়াত ১৬৫)

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ

"কে তিনি যিনি অসহায় ব্যক্তি দোয়া শুনেন যখন সে ডাকে এবং কে তার কষ্ট দূর করেন? আর কে তিনি যিনি) তোমাদের পৃথিবীর খলীফা বানান?" (আল কুরআন, সূরা নামল, আয়াত ৬২)

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ

"তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা বানিয়েছেন। এখন যে কুফুরী করবে তার কুফুরীর (শাস্তি) তার উপরই বর্তাবে।" (আল কুরআন, সূরা ফাতির, আয়াত ৩৯)

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ

"ঈমান আনয়ন কর আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর এবং ব্যয় করো সে সব জিনিস হতে যে সবের উপর তিনি তোমাদের খলীফা বানিয়েছেন।" (আল কুরআন, সূরা হাদীদ, আয়াত ৭)

৩. মূলগতভাবে আইন রচনার একচ্ছত্র অধিকার একমাত্র আল্লাহ তা'আলার। অর্থাৎ আল্লাহর নাযিল করা বিধানই হচ্ছে মৌলিক আইন। সকল মানুষ মিলিত হয়ে যেমন নিজেদের জন্য মূলগতভাবে কোনো আইন রচনা করতে পারে না, তেমনি আল্লাহ প্রদত্ত আইনে কোনোরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধন বা সংশোধনও করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা–

وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ - ..... فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ .... فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ-

"আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী যারা বিচার ফয়সালা করে না তারা কাফের ..... জালেম ..... ফাসেক।" (আল কুরআন, সূরা মায়েদা, আয়াত ৪৪-৪৭)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا -

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ে ফয়সালা করে দেয়ার পর সে ব্যাপারে কোনো মুমিন নারী-পুরুষের কোনো ইখতিয়ার (স্বাধীনতা) নেই। যে কেউ আল্লাহ এবং রাসূলের নাফরমানী করবে সে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত।" (আল কুরআন, সূরা আহযাব, আয়াত ৩৬)

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوْا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ -

"যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্যে তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয় তখন মুমিনদের পক্ষ থেকে এছাড়া আর কোনো কথা হতেই পারে না যে, তারা বলবে : আমরা শুনেছি, আনুগত্য করেছি এবং মেনে নিয়েছি। এমন ব্যক্তিরাই সফলতা লাভ করবে।" (আল কুরআন, সূরা নূর, আয়াত ৫১)

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوْكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْ اَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا -

"না, তোমার রবের শপথ! তারা কখনো মু'মিন হবে না যতক্ষণ না তারা তোমাকে (হে নবী) নিজেদের সকল মতবিরোধের ব্যাপারে ফয়সালাকারী হিসেবে মেনে নেবে। অতঃপর তুমি যে ফয়সালা করবে তাতে

নিজেদের অন্তরে কোনোরূপ কুণ্ঠাবোধ করে না; বরং এর প্রতি নিজেদেরকে পূর্ণরূপে সোপর্দ করে দেবে।" (আল কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত ৬৫)

اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ -

"তোমাদের রবের নিকট থেকে তোমাদের প্রতি যা কিছু নাযিল হয়েছে তার অনুসরণ কর, তাকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো পৃষ্ঠপোষক- নেতা কারোই অনুসরণ করো না।" (আল কুরআন, সূরা আরাফ, আয়াত ৩)

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ -

"অতঃপর আমি তোমাকে দ্বীনের ব্যাপারে এক শরীয়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। সুতরাং তুমি তারই অনুসরণ করো। যাদের কোনো জ্ঞান নেই তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না।" (আল কুরআন, সূরা জাসিয়া, আয়াত ১৮)

يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ

"লোকেরা বলে শাসন-কতৃত্বের ব্যাপারে আমাদের কোনো অংশ আছে কি? বলুন, শাসন-কর্তৃত্বের পুরোটাই আল্লাহর জন্যে নির্ধারিত।" (আল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৫৪)

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ -

"এসব হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা। এগুলো লংঘন করো না। যারা আল্লাহর সীমা লংঘন করবে তারাই জালেম।" (আল কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত ২২৯)

এগুলো ছাড়া ও সমার্থক আরো বহু আয়াত কুরআনে কারীমে রয়েছে। এসব আয়াত একথাই সুস্পষ্ট করে বলে দিচ্ছে যে, মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সকল বিষয়ে আল্লাহর বিধানই চূড়ান্ত ও নিরঙ্কুশ। আইন ক্রোনক্রমেই কুরআন-সুন্নাহ বাদ দিয়ে বা তার সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে না। খেলাফত মানে কুরআন-সুন্নাহর শাসন। মুসলমানগণ মুসলমান থাকতে হলে সে সব মানতে বাধ্য, তা ঈমানের অপরিহার্য দাবি।

৪. খিলাফত রাষ্ট্র কায়েম হবে নবীর উপস্থাপিত খোদায়ী আইনের উপর। এই রাষ্ট্রের শাসক-সরকার হবে খোদায়ী আইনের অনুসারী ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বাস্তবায়নকারী। আর তখনই কেবল ইসলামী জনতার নিকট সে শাসক আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী হবে।

খলীফা কেবল নিজস্ব মত অনুসারেই কার্য সম্পাদন করতে পারে না, জনসমর্থিত ও যোগ্য-সুদক্ষ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত মজলিসে শুরার (Parliament) সাথে পরামর্শ করেই তাকে যাবতীয় কাজ সম্পাদন করতে হবে। মজলিসে শুরার সংখ্যাগরিষ্ঠ মত অনুসারেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় একথা ঠিক; কিন্তু তা সত্ত্বেও সংখ্যাধিক্যতা খিলাফত শাসন ব্যবস্থায় ভাল-মন্দ, করণীয় বর্জনীয় বা হালাল-হারাম নির্ধারণের কোনো স্থায়ী মানদণ্ড নয়। তাই খলীফা কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে সংখ্যাগুরুর ফয়সালার সাথে দ্বিমত পোষণ করতে পারে এবং সে কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে যা সত্য বলে প্রত্যয় করবে, তদনুযায়ী কাজও করতে পারবে। অবশ্য এসব ক্ষেত্রে মুসলিম জনতার দায়িত্ব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করা যে, খলীফা সামগ্রিকভাবে কুরআন সুন্নাহ অনুসারে কাজ করে না নিজের খেয়ালখুশী অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে। দ্বিতীয় অবস্থায় খলীফা

ইসলামী জনতার নিকট হতে এক বিন্দুও আনুগত্য পাওয়ার অধিকার রাখে না; বরং এমতাবস্থায় তার পদচ্যুতির ব্যবস্থা করাই তাদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।

শুরা বা পরামর্শের ব্যাপারটি একটি বিশেষ ক্ষেত্রেই নয় বরং মুসলিম সমাজ গঠনের একটি ভিত্তিগত ও মৌল উপকরণ। কুরআন মজীদে বর্ণিত হয়েছে :

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوْا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُوْرَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُوْنَ -

"আর যারা তাদের রবের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে, নামায কায়েম করেছে এবং যাদের যাবতীয় কার্যাদী পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয় এবং আমরা তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।" (আল কুরআন, সূরা শুরা, আয়াত ৩৮)

ইসলামে পরামর্শ করার গুরুত্ব যে কত বেশী তা এ থেকেও স্পষ্ট হয় যে, নবী করীম (সা:) আল্লাহর নিকট থেকে প্রয়োজনীয় সব ব্যাপারে সরাসরি ওহী লাভ করেন এবং মাসুম, তা সত্ত্বেও তাঁকে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন :

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ -

"এবং হে নবী! আপনি লোকদের (সাহাবীগণের) সাথে পরামর্শ করুন। অতঃপর আপনি যে সংকল্প গ্রহণ করবেন, তা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করেই ফেলুন। মনে রাখবেন, আল্লাহ নিঃসন্দেহে (তাঁর উপর) তাওয়াক্কুলকারী লোকদের পছন্দ করেন, ভালোবাসেন।" (আল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৫৯)

শুধু মহানবী (সা:)-এর যুগে নয় বরং অতীত যুগেও পরামর্শ নীতিকে প্রশংসার চোখে দেখা হয়েছে। যেমনটি পবিত্র কুরআনে প্রাচীন সাবা রাষ্ট্রের সম্রাজ্ঞী বিলকিসের শাসন পদ্ধতি সম্পর্কে বলা হয়েছে :

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُوْنِ -

"(সম্রাজ্ঞী) বলল, হে আমার জাতির প্রধানগণ! আমার এ ব্যাপারে মতামত জ্ঞাপন কর; আমি তো তোমাদের সাথে পরামর্শ ও তোমাদের অভিমত ছাড়া কোনো ব্যাপারেই ফয়সালা গ্রহণ করি না।" (আল কুরআন, সূরা নামল, আয়াত ৩২)

শুধু তাই নয়, শুরা তথা পরামর্শ ব্যবস্থা এত গুরুত্বপূর্ণ যে, পারিবারিক একটি বিরোধ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা সমাধানের মূলনীতি হিসেবে বলেছেন :

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

"কিন্তু উভয় পক্ষ যদি পারস্পরিক সন্তোষ ও পরামর্শের ভিত্তিতে দুধ ছাড়াতে চায় তবে এরূপ করায় কোনো দোষ নেই।" (আল কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত ২৩৩)

অর্থাৎ পারিবারিক বিরোধ সমাধানের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক পরামর্শ ও সন্তোষ অপরিহার্য। বিশেষ করে যেখানে উভয়ের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট রয়েছে সেখানে পরামর্শ ছাড়া কোনো বিকল্প পথ নেই।

শুরার কথা কেবল কুরআনেই বলা হয়েছে, তা নয়। এই পর্যায়ে এত বিপুল সংখ্যক হাদীসের উল্লেখ হয়েছে যা গুণে শেষ করা যাবে না। এখানে কিছু সংখ্যক হাদীস উদ্বৃত করছি। নবী করীম (সা:) বলেছেন :

إِذَا كَانَتْ أُمَرَائُكُمْ خِيَارُكُمْ وَاَغْنِيَائُكُمْ سُمَحَائُكُمْ وَاُمُوْرُكُمْ شُوْرَى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الْاَرْضِ خَيْرٌ مِّنْ بَطْنِهَا-

"যখন তোমাদের শাসক ও কর্মকর্তাগণ হবে তোমাদের মধ্যকার সর্বোত্তম ব্যক্তিরা, তোমাদের ধনী লোকেরা হবে তোমাদের মধ্যে অধিক দানশীল এবং তোমাদের সামষ্টিক ব্যাপারাদিতে পরামর্শ গ্রহণ ব্যবস্থা কার্যকর হবে, তখন জীবনে বেঁচে থাকা মৃত্যুর তুলনায় উত্তম হবে।"(শরহে তিরমিযী, কিতাবুল ফিতান, পৃ: ৭৮)

তিনি বলেছেন : لَامُظَاهَرَةَ اُوْثَقُ مِنْ الْمُشَاوَرَةِ وَلَا عَقْلَ كَالتَّدْبِيْرِ-

"পারস্পরিক পরামর্শ অপেক্ষা অধিক দৃঢ় ও নির্ভরযোগ্য নীতি আর কিছু হতে পারে না। আর সব কাজের গভীর চিন্তা-ভাবনার মত বুদ্ধিমত্তাও কিছু হতে পারে না।"

'বুদ্ধিমত্তা' বলতে কি বুঝায়, জিজ্ঞাসা করা হলে নবী করীম (সা:) বললেন

مُشَاوَرَةُ ذِىْ الرَّاىِ وَاتِّبَاعُهُمْ

"মত দেয়ার যোগ্য লোকদের সাথে পরামর্শ করা এবং তাদের কথামত কাজ করাই হচ্ছে বুদ্ধিমত্তা।"

অন্য হাদীসে আসছে :

- مَنْ اَرَادَ اَمْرًا فَشَاوَرَ فِيْهِ وَقَضَى هُدِىَ لِاَرْشَدِ الْاُمُوْرِ-

"যে ব্যক্তি কোনো কাজ করার ইচ্ছা করল, পরে সেই বিষয়ে সে পরামর্শও করল এবং তারপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল, সে সর্বোত্তম পন্থায় কাজ করল।"

নবী করীম (সা:) এর প্রতি 'পরামর্শ কর' বলে আল্লাহর নির্দেশ নাযিল হওয়ার পর তিনি বলেছিলেন :

إِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ لَغَنِيَّانِ عَنْهَا وَلٰكِنْ جَعَلَهَا اللهُ رَحْمَةً لِاُمَّتِىْ- مَنِ اسْتَشَارَ مِنْهُمْ لَمْ يَعْدِمْ رُشْدًا وَمَنْ تَرَكَهَا لَمْ يَعْدِمْ غَيًّا-

"মনে রাখবে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল পরামর্শ করার মুখাপেক্ষী নন। তা সত্ত্বেও পরামর্শের এ বিধান আল্লাহ নাযিল করেছেন আমার উম্মাতের প্রতি রহমত স্বরূপ। অতএব যে লোক পরামর্শ করবে, সে সঠিক পথ কখনই হারাবে না। আর যে লোক পরামর্শ করবে না, সে বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা পাবে না। (উদ্ধৃত হাদীসসমূহ সিহাহ সিত্তার কিতাবে রয়েছে।)[৪৫] (পৃ:-২৭৮-২৮০)

উল্লেখ্য, হযরত আলী (রা:) থেকে বর্ণিত হাদীস

مُشَاوَرَةُ ذِىْ الرَّاىِ وَاتِّبَاعُهُمْ

"বিচক্ষণ ও বর্ণিত বিষয়ে কার্যকর মত প্রকাশে সক্ষম এমন লোকদের পরামর্শ মত কাজ করার" মাধ্যমে উম্মতের সবার নয়, বরং 'আহলুর রাইদের' জন্য পরামর্শ দেয়া নির্দিষ্ট করা হয়েছে। গণতন্ত্র যেখানে শিক্ষিত-মূর্খ, চরিত্রবান-চরিত্রহীন, আমানতদার-খিয়ানতকাররি, চোর-ডাকাত, দুর্নীতিবাজ নির্বিশেষে সবার মাথাপিছু এক ভোট হিসাব করে, মিথ্যা প্রচারণার অপকৌশলের দ্বার উন্মুক্ত করে; অস্ত্রবল, বাহুবল, হুমকি, প্রতারণার সব ব্যবস্থা গ্রহণ করে; তথাকথিত জনরায়ের ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচন করে তাদের মাধ্যমে আইন প্রণয়ন করার ব্যবস্থা দেয়া হয়েছে, তার সাথে **شورى** কিংবা مجلس شوري -এর নূনতম কোনো তুলনাই হয় না।

ইসলামের শুরা ব্যবস্থায় যেখানে কুরআনের ফয়সালা নেই, রাসূল (সা:) এর নির্দেশনা নেই কেবল সেই ক্ষেত্রেই শুরা হবে এবং তা কেবল 'আহলুর রাইদের' মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। চরিত্রহীন, অশিক্ষিত, মূর্খ, বাহুবল, অস্ত্রবল প্রদর্শনকারী, লম্পট, দুর্নীতিবাজ, প্রতারণাকারীদের রায় দেয়ার কোনো অধিকারই ইসলামের শুরা ব্যবস্থায় নেই। আর আহলুর রাইগণেরও কুরআন-হাদীস যে ফয়সালা দিয়েছে সে ব্যাপারে কোনোরূপ মত প্রকাশের সুযোগ নেই, বরং তারা কুরআন-সুন্নাহর ফয়সালা বাস্তবায়ন পদ্ধতি ও কৌশল নিয়েই আলোচনা করবে মাত্র। এ পর্যায়ে কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াতটি প্রণিধানযোগ্য। আলাহ তা'আলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ **آمَنُوْا** إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوٰى **وَاتَّقُوا** اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ-

"হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা যখন পারস্পারিক পরামর্শে লিপ্ত হও তখন যেন তোমরা গুনাহের কাজ, অন্যায় বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন এবং রাসূলের নাফরমানীর বিষয়ে পরামর্শ না করো; বরং তোমরা যাবতীয় কল্যাণময় ও আল্লাহর ভয়মূলক কাজেরই পরামর্শ করবে। আর তোমরা সেই আল্লাহকে ভয় করো, যার কাছে বিচারের জন্য তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে।" (আল কুরআন, সূরা আল মুজাদিলাহ আয়াত ৯)

নবী আদর্শের খিলাফত :

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ নবী ও রাসূল হিসেবে দুনিয়াতে প্রেরিত হয়েছিলেন। দুনিয়ায় তার উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল, ইসলামী পরিভাষায় সেই দায়িত্বের স্বরূপকে এক কথায় বলা যায় 'ইকামতে দ্বীন'। আলাহর দ্বীন পূর্ণাঙ্গরূপে কায়েম করাই ছিল সর্বশেষ নবীর মৌলিক দায়িত্ব।

আল্লাহ বলেন : هُوَ الَّذِيْ **أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ** بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ **كُلِّهِ** -

"সেই মহান আল্লাহই রাসূলকে হিদায়াতের বিধান ও আল্লাহর আনুগত্য ব্যবস্থাসহ পাঠিয়েছেন যেন তাকে অপরাপর (প্রচলিত) জীবন ব্যবস্থাসমূহের ওপর প্রতিষ্ঠিত ও বিজয়ী করে তোলেন।" (আল কুরআন, সূরা তাওবা, আয়াত ৩৩, সূরা সফ, আয়াত ৯, সূরা আল ফাত্হ, আয়াত ২৮)

আল্লাহর নাযিল করা আইন-বিধানকে ব্যক্তি জীবনে ও সমাজ-সমষ্টির সার্বিক ক্ষেত্রে পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করা ছিল রাসূল হিসেবে তাঁর কর্তব্য। এই কারণেই তাঁকে যে দ্বীনি দাওয়াতী প্রচেষ্টা চালাতে হয়েছে, তা পর্যায়ক্রমে বাস্তব রূপে পরিগ্রহ করে একটি পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই হিসেবে তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা এবং ঐ রাষ্ট্রের জনগণের একচ্ছত্র নেতা ও রাষ্ট্রপ্রধান।

নবী করীম (সা.) আল্লাহর নবী ও রাসূল মনোনীত হওয়ার পর দ্বীন ইসলামের যে কালজয়ী মহান আদর্শ প্রথমে গোপনে এবং পরে প্রকাশ্যে, প্রচার করতে শুরু করেছিলেন,[11] তাতে তদানীন্তন কুরাইশদের ধর্মমত,

---

11 রাসূলে করীম (সা:) এর দ্বীনি দাওয়াতের প্রথম সূচনা-পর্বে তাঁর বংশ ও পরিবার-পরিমণ্ডলের মধ্যেই আবর্তিত। কেননা আল্লাহ্ই তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ- وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ "এবং তোমার নিকটতম আত্মীয়-স্বজনকে সতর্ক কর এবং যারা ঈমান এনে তোমার অনুসরণ করবে, তাদের কল্যাণে তোমার বাহু বিছিয়ে দাও।"(সূরা শুয়ারা ঃ ২১৪,২১৫) এই নির্দেশের তাৎপর্য খুবই গুরুত্ববহ। আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে দূরবর্তী ও অনাত্মীয় লোকদের তুলনায় নিকটাত্মীয় ও রক্ত সম্পর্কের বা বংশের লোকদের থেকে অধিক আনুকূল্য পাওয়ার সম্ভাবনাকে কোনক্রমেই উপেক্ষা করা চলে না। বিশেষ করে গোত্র-কেন্দ্রিক সমাজ জীবনের সেই সংঘাতময় পরিস্থিতিতে বংশ ও রক্ত সম্পর্কের নৈকট্য বোধের ভাবধারায় এই আনুকূল্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। রাসূলে করীম (সা:) তাঁর দ্বীনি দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ের সুদীর্ঘ তিনটি বছরকাল পূর্ণ গোপনীয়তার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেন। তিনি নিজের ঘরে তাঁর চাচা-মামা পর্যায়ের ও সম্পর্কশীল ব্যক্তিদের একত্রিত করে সর্বপ্রথম যে দাওয়াত পেশ করেন, প্রামাণ্য ইতিহাসে তা নিম্নোক্ত ভাষায় উদ্ধৃত রয়েছে ঃ وَاللهِ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ إِنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ إِلَيْكُمْ خَاصَّةً وَ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً وَاللهِ لَتَمُوْتُنَّ كَمَا تَنَامُوْ وَلَتُبْعَثُنَّ كَمَا تَسْتَيْقِظُوْنَ وَلَتُحَاسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُوْنَ وَإِنَّهَا الْجَنَّةُ أَبَدًا وَالنَّارُ أَبَدًا "যে আল্লাহ ছাড়া আর

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিক চরিত্র, অর্থ ব্যবস্থা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে প্রবল প্রতিক্রিয়া সূচিত হয়েছিল। সত্যকথা এই যে, এর ফলে তাদের সকল প্রকার স্বার্থ, আশা–আকাঙ্খা এক কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে পরেছিল। এই কারণে কুরাইশরা নবী করীম (সাঃ) এবং তাঁর প্রতি ঈমানদার মুসলমানদের জীবনকে দুঃসহ অত্যাচার ও নিপীড়নে জর্জরিত করে তুলেছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি আল্লাহ তাআলার নির্দেশানুযায়ী মক্কা ত্যাগ করে মদীনা যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[12] এই সময় নবী করীম (সা:) হজ্জ উদ্‌যাপন উদ্দেশ্যে আগত মুসলমানদের নিকট হতে দু-দু'বার আনুগত্যের বায়াত গ্রহণ করেন, ইতিহাসে এই 'বায়াত' দু'টি 'প্রথম আকাবা বায়াত' ও 'দ্বিতীয় আকাবা বায়াত'[13] নামে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে। দু'জন স্ত্রীলোকসহ মদীনায় আউস ও খাজরাজ

কোন উপাস্য ও মাবুদ নেই তাঁর নামে শপথ করে বলছি, আমি আল্লাহর রাসূল রূপে বরিত ও নিয়োজিত হয়েছি বিশেষভাবে তোমাদের জন্যে এবং সাধারণভাবে সমস্ত মানুষের জন্যে। আল্লাহর নামে শপথ! তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে, যেসন করে তোমরা নিদ্রা থেকে জেগে উঠ। তখন তোমাদের যাবতীয় কাজকর্মের হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করা হবে। সেই সাথে এ-ও জানবে যে, জান্নাত চিরন্তন, জাহান্নামও চিরন্তন।(তারিখে কামেল, ইবনে আছির, পৃ:৪১)। অতপর তাঁর প্রতি দ্বিতীয় নির্দেশ নাযিল হল ঃ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ "হে নবী! যে কাজের জন্যে তোমাকে নির্দেশ করা হয়েছে, তুমি তা বলিষ্ঠভাবে চতুর্দিকে প্রকাশ ও প্রচার করে দাও এবং শিরকে লিপ্ত লোকদের একবিন্দু পরোয়া করো না।"(সূরা হিজর ঃ ৯৪)। এই নির্দেশ পেয়ে রাসূল (সা) প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী 'সাফা' পর্বতের শিখরে আরোহন করেন এবং উচ্চ কণ্ঠে আওয়াজ দিতে থাকেন ঃ 'হে প্রাতঃকালীন জনতা!' আওয়াজ শুনে চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী মক্কার জনতা পর্বতের পাদদেশে সমবেত হয়। তাদের সম্বোধন করে তিনি বলেন ঃ 'আমি যদি তোমাদের বলি যে, এই পাহাড়ের ঐ পাশে শত্রু পক্ষের একদল অশ্বারোহী দাঁড়িয়ে আছে, এখনই তারা তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, তাহলে তোমরা কি তা বিশ্বাস করবে না?' উপস্থিত জনতা সমস্বরে বলে উঠল ঃ 'আমরা আজ পর্যন্ত তোমার মুখে কোন মিথ্যা কথা শুনতে পাইনি, তোমার ব্যাপারে এর কোন অভিজ্ঞতাই আমাদের নেই।' এই কথা শুনে নবী করীম (সা:) বললেন ঃ ' হে কুরাইশ বংশের লোকেরা ! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। আল্লাহ থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করার জন্যে আমি কিছুই করতে পারব না - কোন কাজেই আসব না।আমি তো কঠিন আযাব আসার আগে তোমাদেরকে সুস্পষ্ট ভাষায় সাবধানকারী মাত্র। আমার ও তোমাদের ব্যাপারটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাতে চাইলে মনে কর ঃ এক ব্যক্তি শত্রু বাহিনী দেখতে পেল, সে তার আপন-জনদের সেই বিষয়ে সতর্ক করে দেয়ার ইচ্ছা করল। কিন্তু ভয় পেল যে, শত্রুরা তার আগেই তার আপন-জনের ওপর আক্রমণ করে বসে নাকি। তখন সে নিরুপায় হয়ে চিৎকার দিতে লাগল, হে সকাল বেলার জনগণ! সাবধান হয়ে যাও, নতুবা ধ্বংস হয়ে যাবে।' এভাবেই তিনি দ্বিনী দাওয়াতের সূচনা করেছিলেন। [মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, রাসূলুল্লাহর বিপ্লবী দাওয়াত, খায়রুন প্রকাশনী, তৃতীয় প্রকাশ, এপ্রিল–২০০০, পৃ: ৯০-৯৩]

12 মহাজির সাহাবীদের মদীনায় গমনের পর রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুমতির আশায় মক্কায় বসে প্রতীক্ষা করতে থাকেন। বাধাপ্রাপ্ত, নির্যাতিতগণ এবং হযরত আলী (রা) ও হযরত আবু বকর (রা) ছাড়া আর কেউই মক্কায় তাঁর সাথে ছিলেন না। হযরত আবু বকর (রা) প্রায়ই তাঁর কাছে হিযরতের অনুমতি চাইতেন এবং তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল স্বয়ং রাসূল (সা) যেন তাঁর হিযরতের সাথী হন। জবাবে রাসূল (সা) বলতেন ঃ'তাড়াতাড়ি করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমার কোন সাথী জুটিয়ে দেবেন।' অবশেষে প্রতীক্ষা শেষে হিজরতের দিন যখন এলো মহানবী (সা) অমুমতি প্রাপ্ত হলেন এবং হযরত আবু বকর (রা) কে সাথে নিয়ে রওয়ানা করলেন। ইবনে ইসহাক বলেন ঃ উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) দিনের কোন এক প্রান্তে ভোরে বা সন্ধ্যায় আবু বকরের ঘরে আসতে ভুল করতেন না। কিন্তু যেদিন আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ (সা) হিজরতের এবয় মক্কা ও তাঁর স্বজাতির কাছ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অনুমতি লাভ করলেন, সেদিন তিনি আমাদের বাড়িতে আগমন করেন দুপুর বেলা। সাদারণত এ সময় তিনি কখনো আসতেন না। হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ যখন আবু বকর (রা) তাঁকে দেখতে পেলেন, তখন বলে উঠলেন ঃ এ মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ (সা) এর আগমন ঘটেছে নিশ্চয়ই কোন অভিনব ব্যাপারের জন্যে। আয়েশা (রা) বলেন ঃ যখন তিনি প্রবেশ করলেন, তখন আবু বকর (রা) তাঁর চৌকি থেকে একটু সরে গেলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তখন বসলেন। আমি আর আমার বোন আসমা ছাড়া আর কেউ তখন সেখানে ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তোমার নিকট যারা আছে তাদেরকে সরিয়ে দাও। আবু বকর বললেন, এরা তো আমারই দুই মেয়ে হে রাসূলুল্লাহ (সা)! আমার পিতামাতা আপনার জন্যে কুরবান হোন, এরা থাকলে কী আর হবে? এরপর তিনি বললেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَذِنَ لِىْ فِى الْخُرُوْجِ وَالْهِجْرَةِ "আল্লাহ তা'আলা আমাকে বেরিয়ে পড়ার এবং হিজরত করার অনুমতি প্রদান করেছেন।' হযরত আয়েশা (রা) বলেন, তখন হযরত আবু বকর (রা) বললেন ঃ اَلصُّحْبَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ 'হে রাসূলুল্লাহ (সা)! আমিও কি আপনার সহচর রূপে থাকব? জবাবে তিনি বললেন ঃ اَلصُّحْبَةُ 'হ্যাঁ তুমিও সঙ্গে থাকবে।' হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এর পূর্বে কোন দিন আমি ভাবতেও পারিনি যে, কোন ব্যক্তি খুশিতেও কাঁদতে পারে! কিন্তু সেদিন দেখলাম আবু বকর খুশিতে কাঁদছেন। এরপর তাঁরা দু'জনে দু'টি উটে আরোহন করে হিজরতে রওয়ানা করেন। [আবূ মুহাম্মদ মালিক ইবন্ হিশাম মুআফিরী (রহ), সীরাতুন নবী (সা), দ্বিতীয় খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর-২০০৭,পৃ: ১৫০,১৫৬]

13 আকাবা-বায়া'আত শব্দের ব্যবহারিক ও পারিভাষিক অর্থ- আনুগত্যের শপথ। আকাবা-বায়া'আতের পূর্ণ বিবরণ এইরূপঃ মদীনার লোকেরা রাতের তৃতীয় প্রহরে আকাবা নামক স্থানে সমবেত হয়ে রাসূলে করীম (সা) এর আগমন প্রতীক্ষায় উদগ্রীব। একটু পরেই নবী করীম (সা) তাঁর চাচা আব্বাসকে (তিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি) নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। প্রথমেই আব্বাস বললেন ঃ হে খাজরাজ গোত্রের লোকেরা! তোমরা ভালো করেই জান, মুহাম্মদ আমাদের মধ্যে অত্যন্ত সম্মানিত ও মর্যাদাবান ব্যক্তি। তার শত্রুদের থেকে আমরাই তার সংরক্ষক। কিন্তু এখন সে নিজেই এই শহর ত্যাগ করে তোমাদের সাথে মিলিত হওয়ার

Dhaka University Institutional Repository

নামক দুই প্রধান বিবাদমান গোত্রের মোট প্রায় ৭৫ জন মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাসূল কারীম (সা:)-এর হাতে বায়াত গ্রহণ করেন। এই বায়াতে তারা দ্বীন ইসলামকে পূর্ণভাবে মেনে ও অনুসরণ করে চলার সাথে সাথে নবী করীম (সা:) এর সার্বিক নেতৃত্ব মেনে নেয়ার, তাঁর জন্যে পূর্ণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করার এবং তার নেতৃত্বের বিরোধীদের সাথে প্রাণ-পণ যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হওয়ার প্রতিশ্রুতি দান করেন। শুধু তাই নয়, নবী করীম (সা:) কে তার সঙ্গী সাথীসহ মদীনায় যাওয়ার জন্যে তারা আহ্বান জানান এবং সেখানে তাদের আবাসনের ব্যবস্থা করারও প্রতিশ্রুতি দেন। মদীনাবাসীরা নবী করীম (সা:) কে একজন আশ্রয়গ্রহণকারী রূপে নয়; বরং আল্লাহর রাসূল ও প্রতিনিধি এবং তাদের সর্বাত্মক নেতা ও প্রশাসক হিসেবেই এই আহ্বান জানিয়েছিল। আর তাই নবী করীমও (সা:) তাদের এই আহবানে সাড়া দেন।

বস্তুত: একটি রাষ্ট্রের দানা বাঁধার মূলে সর্বপ্রথম যে সামাজিক-সামষ্টিক চুক্তির অবস্থিতি প্রথম শর্ত, মদীনার স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট হতে নবী করীম (সা:) এর গৃহীত আকাবার এই বায়াত সেই চুক্তিরই বাস্তব রূপ। এই বায়াতের মাধ্যমেই ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। এক কথায়, এই বায়াত একদিকে যেমন ছিল প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র সংস্থার ভিত্তিপ্রস্তর, অপরদিকে এর মাধ্যমেই একটি আদর্শিক সমাজ সংস্থার ভিত্তিও সংস্থাপিত হয়েছিল।

আকাবার বায়াত অনুযায়ী রাসূলে করীম (সা:) এর হিজরতের সাথে সাথে ইসলাম মদীনায় স্থানান্তরিত হল। মদীনায় পৌঁছে নবী করীম (সা:) প্রথম পর্যায়ে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করলেন। **প্রথম** কাজটি হলো, একটি মসজিদের ভিত্তিস্থাপন। এই মসজিদ কেবল পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার স্থানই নয়; বরং এটি ছিল মুসলিম জনতার মিলন কেন্দ্র। এই মসজিদকে কেন্দ্র করে নবী করীম (সা:) ইসলামের জন্যে আত্মোৎসর্গীকৃত লোকদের নিয়ে একটি আদর্শ ভিত্তিক সামাজিক-সামষ্টিক শক্তির লালন ও বিকাশ সাধনের প্রচেষ্টা শুরু করেন। তিনি ইসলামের মহান আদর্শের ভিত্তিতে একটি পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যে যোগ্য নাগরিক ও কর্মী-নেতৃবাহিনী গড়ে তোলার সর্বাত্মক সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন এই মসজিদকে কেন্দ্র করে। এই

সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কেননা তোমরা তাকে নিজেদের শহরে আহ্বান জানিয়েছ। তোমরা যদি তার পূর্ণ সংরক্ষণে সামর্থ রাখ এবং তার শত্রুদের হাত থেকে তাকে রক্ষা করার সাহস রাখ তবেই তোমরা তা কর। অন্যথায় এখনি তোমাদের না বলে দেয় উচিৎ। কেননা মুহাম্মদ এখন আমাদের হেফাজতে আছে। তোমরা তাকে নিয়ে শত্রুদের হাতে ছেড়ে দিবে- এমটি মানা যায় না। তারা বললেন, 'আমরা আপনার কথা শুনেছি। এখন হে রাসূল (সা) আপনার বক্তব্য বলুন। আল্লাহর বিধান কিংবা আপনার নিজের সম্পর্কে আমাদের নিকট থেকে যদি কোন প্রতিশ্রুতি নিতে হয়, তবে তা গ্রহণ করুন। এর প রনবী করীম (সা) প্রথমে কুরআন মজীদের অংশ বিশেষ পাঠ করলেন। আল্লাহর বন্দেগী কবুল করার এবং তাঁর সাথে শির্ক না করার শর্ত পেশ করলেন। অতঃপর বললেন, 'আমি তোমাদের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি নিতেছি যে, তোমরা আমার সাহায্য-সহযোগিতা ও সমর্থন এমনভাবে করবে, যেভাবে তোমরা তোমাদের স্ত্রী-সন্তানদের করে থাক।' এ বলার সাথে সাথে তারা রাসূল (সা) এর হাত ধরে বলে উঠল ঃ 'হ্যাঁ, সেই মহান সত্ত্বার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য-সঠিক দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, আমরা এমনি ভাবে আপনার সহায়তা ওসংরক্ষণ করব, যেমন আমরা আমাদের পরিবারবর্গের ব্যাপারে করে থাকি।' অতঃপর সকলে সমবেতভাবে বললেনঃ 'আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আমরা সর্বাবস্থায় আপনার কথা শুনব, আপনার আনুগত্য স্বীকার করব দুঃখ-বিপদ, স্বপচ্ছন্দ্য-স্বচ্ছলতা কিংবা অভাব-অনটন যাই হোকনা কেন, আর আমরা যেখানেই থাকি না কেন, আমরা সবসময় ও সর্বাবস্থায় সত্য বলব, কাউকে ভয় করব না এবং কোন উৎপীড়কের উৎপীড়নেও পরোয়া করব না।' অতঃপর তারা বললেন ঃ 'আমাদের মনে একটা প্রশ্ন জেগেছে- এমন হবে না তো যে, আল্লাহ তা'আলা যখন আপনাকে বিজয় দান করবেন, তখন আপনি আমাদেরকে ত্যাগ করে আপনার নিজ জাতির লোকদের সাথে মিলিত হয়ে যাবেন?' এ কথা শুনে নবী করীম (সা) স্মিত হেসে বললেন ঃ 'না এ বিষয়ে তোমরা নিশ্চিত থাক। তোমরা যাদের সাথে লড়াই করবে, আমিও তাদের সাথে লড়াই করব। তোমরা যাদের সাথে সন্ধি করবে, আমিও তাদের সাথে সন্ধি করব। তোমাদের দায়িত্ব আমার দায়িত্ব এবং তোমাদের মর্যাদা-সম্ভ্রম আমার মর্যাদা-সম্ভ্রম রূপে গণ্য হবে। আর আমার জীবন-মরণ তোমাদের সাথেই হবে।' বস্তুত ঃ আকাবায় এরূপ কথোপকথনের মাধ্যমে প্রকারান্তরে একটি সামাজিক-সামষ্টিক চুক্তিই সম্পাদিত হয়েছিল। এর মাধ্যমে মদীনাবাসীরা নবী করীস (সা) কে নিজেদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা এবং রাষ্ট্র-কর্তারূপে যুগপৎ মেনে নিল এবং তাদের আহ্বানে তিনি মদীনায় হিজরত করলেন। [মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, খিলাফতে রাশেদা, খায়রুন প্রকাশনী, ৯ম প্রকাশ, জুন-২০০৯, পৃ: ১৪,১৫]

মসজিদই ছিল মদীনা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান ভবন, সেনাধ্যক্ষের (Supreme Commamder), হেড কোয়ার্টার এবং সর্বোচ্চ প্রশাসকের কেন্দ্রীয় অফিস।

দ্বিতীয় কাজটি হলো মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন। এ ছিল কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশের বাস্তব অনুসরণ। নির্দেশটি হলো :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ -

"নিশ্চয়ই মু'মিনরা পরস্পরের ভাই; অতএব তোমরা এই ভাইদের মধ্যে পারস্পরিক সন্ধি ও কল্যাণ স্থাপন কর। আর সকলে সম্মিলিতভাবে আল্লাহকে ভয় করে চল; আশা করা যায় তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হবে।" (আল কুরআন, সূরা হুজুরাত, আয়াত ১০)

নবী করীম (সা:) এ ভ্রাতৃত্ববোধকে সমাজ পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনের একটি কার্যকর হাতিয়ারে পরিণত করলেন। সমস্ত বৈষয়িক-বস্তুগত পার্থক্য-বিভেদ নিঃশেষ করে দিয়ে তিনি সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের সমাজ (Society of Universal Brotherhood) গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর গঠিত এই সমাজের প্রত্যেক ভাই তার অপর মুসলিম ভাইয়ের জন্যে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। ফলে কল্পনাতীত স্বল্প সময়ের মধ্যে মক্কা হতে নিঃস্ব-সর্বস্বান্ত হয়ে আসা বিপুল সংখ্যক লোকের পুনর্বাসনের কঠিন ও জটিল সমস্যার সহজ সমাধান হয়েছিল। শুধু তাই নয়, সামগ্রিকভাবে নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র বিপুল স্বচ্ছলতায় সমৃদ্ধ এবং নতুন শক্তিতে বলিয়ান হয়ে উঠেছিল। প্রতিটি নাগরিকই নিজের উপার্জনের প্রেরণা ও সুযোগ লাভ করল। ফলে কেউ কারো উপর বোঝা বা নির্ভরশীল (Dependant) হয়ে থাকল না।

রাসূলে করীম (সা:) **তৃতীয়** যে কাজটি করলেন তা হলো, মদীনার বিবাদমান গোত্রসমূহের অরাজক পরিস্থিতির অবসান ঘটানোর জন্যে একটি ঘোষণা পত্র তৈরি করা। ঐতিহাসিকগণ একে 'মদীনার সনদ' নামে অভিহিত করেন। এই সনদে মুহাজির ও আনসারদের সাথে সাথে মদীনার প্রাচীন ও অত্যন্ত প্রভাবশালী ইহুদীদের নাগরিক মর্যাদা, নাগরিক অধিকার ও দায়-দায়িত্ব এবং পারস্পরিক সম্পর্ক সুস্পষ্ট ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হয়। এর মাধ্যমে মদীনাবাসীদের মধ্যে বিশেষভাবে ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি হয়, একই সাথে মদীনার সমাজে মুসলিম প্রাধান্য ও হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর নিরঙ্কুশ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। (تاريخ اسلام السياسى والدين والثقافى والاجتماعى) [৪৭] (পৃ:-৬৫)

এই চুক্তি অনুযায়ী মদীনার সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল ব্যাপারে নবী করীম (সা:)-এর ফয়সালা ও রায়ই ছিল চূড়ান্ত। প্রশাসনিক, (Administrative), আইনগত (Legal) ও ফৌজদারী বা বিচার বিভাগীয় (Judisial) সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও মর্যাদাও ছিল তাঁরই। এ সমাজে সার্বভৌমত্ব কার্যকর ছিল একমাত্র আল্লাহর; নেতৃত্ব ছিল রাসূলে কারীম (সা:)-এর। ফলে ইহুদীরা সংখ্যালঘু অমুসলিম নাগরিকের অধিকার পেয়ে বসবাস করতে বাধ্য হয়; আর মুসলিম নাগরিকরা আল্লাহর কুরআন ও রাসূলের সুন্নাতের অনুসারী হয়ে খালেস বান্দায় পরিণত হল। আর এই হচ্ছে প্রকৃত ইসলামী সমাজের বাস্তব রূপ, নবী আদর্শের খিলাফত।

এতদ্ব্যতীত নবী করীম (সা:) একটি ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষে করণীয় অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজও সম্পন্ন করেন। এখানে উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি বড় বড় কাজের উল্লেখ করা যাচ্ছে :

১. তিনি মদীনার স্থিতি রক্ষা ও মক্কার আক্রমণ প্রতিহত করতে নব নির্মিত মসজিদ থেকেই উপদ্বীপের বিভিন্ন এলাকায় সামরিক গোষ্ঠী ও সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন। শত্রুদের ভীত-সন্ত্রস্ত করতে নানা পন্থা অবলম্বন করেন। তিনি যুদ্ধ করেছেন বিভিন্ন এলাকার মুশরিকদের বিরুদ্ধে, লড়াই করেছেন রোমানদের

বিরুদ্ধে। ঐতিহাসিকগণের মতে, রাসূলে করীম (সা:) তাঁর মদীনা জীবনের দশ বছরে আশিটি যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন।[৪৫](পৃ:-১৬)

২. মদীনায় স্থিতি লাভ ও মক্কার দিক থেকে আক্রমণের ভয় তিরোহিত হলে উপদ্বীপের বাইরের দিকে তিনি মনোনিবেশ করলেন। যে যে এলাকায় দাওয়াত তখন পর্যন্ত পৌঁছেনি, সেই সব এলাকায় দ্বীনের তাওহীদী দাওয়াত পৌঁছাবার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি বিভিন্ন গোত্রপতি, রাষ্ট্রপ্রধান ও শাসকদের নিকট সরাসরি পত্র পাঠিয়ে তাওহীদী দাওয়াত কবুলের বলিষ্ঠ আহ্বান জানান, একই সাথে তাঁর প্রতিষ্ঠিত হুকুমাতে ইলাহিয়ার অধীন শামিল হওয়ার প্রয়োজনীয়তাও তুলে ধরেন।

তিনি পত্র পাঠালেন রোমান সম্রাট কায়সার, মিসরের কিবতী প্রধান মুকাউকাস ও হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশীর নিকট। এছাড়া সিরিয়া ও ইয়ামানের বড় বড় নেতা ও রাজন্যবর্গের নিকট, গোত্রপতি ও রাজা-বাদশাহদের নিকটও তিনি পত্র পাঠালেন।[14] তাদের অনেকের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হলো, সামরিক ও রাজনৈতিক মৈত্রী স্থাপিত হলো, অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক আদান-প্রদানের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা হলো।

রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস (উপাধি 'কায়সার')-এর নিকট প্রেরিত নবী করীম (সা:)-এর পত্রের ভাষ্য :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ مِنْ مُحَمَّد عَبْدِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ اِلَى هِرَقْلُ عَظِيْمِ الرُّوْمِ سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى اَمَّا بَعْدُ- فَإِنِّىْ اَدْعُوْكَ بِدِعَايَةِ الْاِسْلاَمِ اَسْلِمْ تَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللهُ اَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اِثْمَ الاَرِيْسِيِّيْنَ وَيَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَنْ لاَ تَعْبُدَ اِلاَّ اللهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ-

"মহা দয়াময় ও অসীম করুণাশীল আল্লাহর নামে। আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সা:)-এর পক্ষ হতে রোমের প্রধান পুরুষ হিরাক্লিয়াস সমীপে। হিদায়াতের অনুসরণকারীগণের প্রতি সালাম। অতঃপর আমি আপনাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, সার্বিক অকল্যাণ হতে নিরাপত্তা লাভ করবেন। আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দান করবেন। কিন্তু আপনি যদি এতে অসম্মত হন, তবে আপনার প্রজাসাধারণের পাপের জন্যও আপনিই দায়ি হবেন। হে আহলে কিতাব, এমন সত্যের দিকে আস, যার সত্যতা আমাদের ও তোমাদের নিকট সমভাবে স্বীকৃত। তা এই, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পূজা করব না, তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করব না এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাদের মধ্য হতে কোনো মানুষই অন্য মানুষকে প্রভু বানিয়ে নিব না। যদি তোমরা অমান্য কর, তবে সাক্ষী থেক, আমরা এটি মেনে নিলাম।[৫৪] (পৃ:-৬৮৬) (সহীহ বুখারী)

---

14 তৎকালে পৃথিবীর ইতিহাসে যে কয়টি রাজশক্তি বিদ্যমান ছিল, তন্মধ্যে ইউরোপে রোম সাম্রাজ্য (The Holy Roman Empire), এশিয়ার পারস্য সাম্রাজ্য এবং অফ্রিকার হাবশ সাম্রাজ্যই ছিল প্রধান। মিশরের 'আযীয মুকাওকিস' য়্যামামার সরদার এবং সিরিয়ার গাসসানী শাসনকর্তাও বেশ প্রতাপশালী ছিলেন। তাই রাসূলুল্লাহ (সা:) তাঁদের নিকট একদিনে একই সময়ে ইসলামের আহ্বানপত্রসহ ছয়জন দূত প্রেরণ করেন। প্রেরিত দূতগণের তালিকা নিম্নরূপ :

দূত বা পত্রবাহকগণ	**যাদের নিকট প্রেরণ করেছিল**
১. হযরত দিহ্ইয়া কালবী–	রোম সম্রাট কায়সার।
২. হযরত আবদুল্লাহ বিন হুযাফা	পারস্য সম্রাট খসরু পারবেজ।
৩. হযরত হাতিব বিন আবু বুলতা'আ	মিশরের শাসনকর্তা,আযিযে মিসর।
৪. হযরত আমর বিন উমায়্যা	হাবশা- রাজ নাজ্জাশী।
৫. হযরত সলীত বিন উমর বিন আবদে শামস–	য়্যামামার সর্দারগণ।
৬. হযরত শুযা ইবনে ওহাব আসাদী–	গাস্সানী শাসক হারিস।

Dhaka University Institutional Repository

পারস্য সম্রাট খসরূ পারবেজ (উপাধি কিসরা)-এর নিকট প্রেরিত নবী করীম (সা:)-এর পত্র :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ – مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللهِ اِلَى كِسْرٰى عَظِيْمِ فَارِسٍ سَلَامٌ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى وَاٰمَنَ بِاللهِ وَرَسُوْلِهٖ وَشَهِدَ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللهِ اِلَى النَّاسِ كَافَّةً لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا اَسْلِمْ تَسْلِمْ- فَاِنْ اَبَيْتَ فَعَلَيْكَ اِثْمُ الْمَجُوْسِ-

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের নিকট হতে পারস্যের প্রধান কিসরার সমীপে, যারা আল্লাহর হিদায়াতের অনুসরণ করে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করে, এই কথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য নেই এবং সমগ্র মানব জাতিকে সতর্ক করবার জন্যে তিনি আমাকে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন, তার প্রতি সালাম। আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন, মুক্তি লাভ করবেন, অন্যথায় আপনার অগ্নি-উপাসক প্রজাবৃন্দের পাপের জন্যেও আপনিই দায়ী হবেন।"(তারীখুত তাবারী) [৫৪] (পৃ:-৬৮৮)

এভাবে রাষ্ট্রীয় দূত ও রাজনৈতিক প্রতিনিধি দল এবং চিঠিপত্র প্রেরণ তদানীন্তন সময়ের প্রেক্ষিতে এক সম্পূর্ণ অভিনব কূটনৈতিক কার্যক্রম ছিল। বরং সত্য কথা হচ্ছে ইসলাম তথা ইসলামের নবীই (সা:) সর্বপ্রথম তাঁর সময়ের বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ শাসক ও রাজন্যবর্গের প্রতি এই বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ কূটনৈতিক কার্যক্রম সর্বতোভাবে পরিচালনা করেছিলেন, যা কি না তাঁর বিশ্ব রাসূল ও বিশ্বনেতার পরিচয় বহন করে।

৪. রাসূলে কারীম (সা:) দূত ও পত্র প্রেরণের পাশাপাশি তাঁর অনুগত্য পোষণকারী বিভিন্ন এলাকায় বিচারপতি ও শাসক নিযুক্ত করেন। তিনি তাদেরকে প্রাতিষ্ঠানিক ও পলিসিগত কার্যসূচীও প্রদান করেছিলেন। তাদেরকে ইসলাম উপস্থাপিত নৈতিক আদর্শ ও রীতিনীতি, বিধি-বিধান পূর্ণমাত্রায় শিক্ষাদান করেন। যাকাত ও অন্যান্য সরকারী কর সমূহ আদায় করা ও তা পাওয়ার যোগ্য অধিকারী লোকদের যথাযথ বণ্টনের নিয়মাদি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করে তুলে লোকদের মধ্যে বিবাদ মীমাংসা এবং জুলুম ও সীমালঙ্ঘনমূলক কার্যক্রমের বিচার পদ্ধতি শিক্ষাদান করেন। এককথায় যাবতীয় জনকল্যাণমূলক কাজের প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে নিজ নিজ দায়িত্বে বসিয়েছিলেন।

তিনি যেমন কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগ করতেন, প্রয়োজনে পদচ্যুতও করতেন। আবার রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর ও সীলমোহরও লাগাতেন। এসব কাজই তিনি সম্পন্ন করতেন ইসলামী কল্যাণের দৃষ্টিতে, সামষ্টিক কল্যাণের জন্যে এবং রাষ্ট্রশক্তির বাস্তবায়নের প্রয়োজনে।

একালে রাষ্ট্র ব্যবস্থার অনেক রূপান্তর ঘটেছে, তার মূল কাণ্ড থেকে অনেক নতুন শাখা-প্রশাখাও উদ্ভাবিত হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। অনেক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ নতুন গড়ে উঠেছে। কিন্তু রাসূলে করীম (সা:) প্রতিষ্ঠিত সরকারযন্ত্র ও প্রতিষ্ঠান আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থারই প্রতিভূ, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

নবী প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য :

রাসূলে করীম (সা:) প্রতিষ্ঠিত এই রাষ্ট্রটি নিছক একটি রাষ্ট্রমাত্র ছিল না। এটি ছিল বাস্তবে অস্তিত্বহীন একটি আদর্শবাদের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন। যে বীজটি আরব ভূ-খণ্ডেরই একটি নির্জন স্থানে অতিশয় গোপনে উপ্ত হয়েছিল একুশ বছর পূর্বে, উত্তরকালে অষ্টম হিজরী সনে মক্কা বিজয়ের পর তাই এক বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়ে সমগ্র আরব উপদ্বীপকে ইসলামের একক ও নিরঙ্কুশ শাসনাধীনে ঐক্যবদ্ধ করে বিশ্বমানবতার জন্যে চিরস্থায়ী এক আলোক কেন্দ্র (Light house) স্থাপন করে দিয়েছিল। অনন্তকাল পর্যন্ত দুনিয়ার মানুষের জীবনে এই আলোকে কেন্দ্র হতে অজস্র ধারায় আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হতে থাকবে এবং অত্যাচার-নিপীড়নে

জর্জরিত দিশেহারা মানুষ তা থেকে মুক্তি ও কল্যাণ পথের নির্ভুল দিশা লাভ করতে থাকবে। এখানে নবী করীম (সা:) প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা আবশ্যক। সংক্ষেপে তা পেশ করা হচ্ছে।

১. নবী প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র সামাজিক-সামষ্টিক চুক্তি ও প্রতিশ্রুতির (Social Contract) ভিত্তিতে গড়ে উঠা পৃথিবীর সর্বপ্রথম রাষ্ট্রব্যবস্থা। মানব ইতিহাসে এই ধরনের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। নবুয়তের ত্রয়োদশ বছর মদীনার লোকেরা স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে নবী করীম (সা:) এর হাতে যে 'বায়আত' করেছিল এবং তাঁকে নিজেদের ধর্মীয় নেতার পাশাপাশি রাজনৈতিক নেতা ও শাসক মেনে নিয়েছিল, উত্তরকালে তাই পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছিল একটি পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাত্মক রাষ্ট্র ব্যবস্থায়।

২. এই রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সার্বভৌমত্বের (Sovereignty) উৎস ছিল মহান আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশভাবে। স্বয়ং নবী করীম (সা:) এরও কোনো অংশ ছিল না এই সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে। হযরত মুহাম্মদ (সা:) আল্লাহর রাসূল হিসেবে কুরআনী বিধানের ভিত্তিতে আইন প্রবর্তন ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন। সার্বভৌত্বের এই প্রশ্নটিই ইসলামী রাষ্ট্র ও দুনিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রদর্শনের মাঝে আকাশ-পাতাল পার্থক্যের ভিত্তিমূল। আল্লাহর নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের কোনো ব্যক্তি বাদশাহ বা স্বৈরতন্ত্রী হতে পারে না। বাদশাহ বা রাষ্ট্রপ্রধান কখনো ভুল করতে পারে না, বাদশাকে কখনো অভিযুক্ত করা যাবে না কিংবা বাদশাহ বা সর্বোচ্চ প্রশাসককে আল্লাহর আসনে বসাবার সকল ধারণা ও নীতিমালা এই নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্বের ফলে সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা প্রমাণিত হলো। নবী প্রতিষ্ঠিত এই রাষ্ট্রের কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর যেমন নিরঙ্কুশ ক্ষমতার মালিক হওয়া অসম্ভব তেমনি মানুষকে গোলাম বানাবার কোনো অধিকারও কারো নেই।

৩. এটি একটি পূর্ণাঙ্গ আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র (Ideological state)। নবী করীম (সা:)-ই পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত শাসনতন্ত্রের (Written Constitution)- ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা শুরু করেন। এটি নিছক কোনো বংশ, দেশমাতৃকা, বর্ণ, ভাষা ও অর্থনৈতিক একাত্মতা ভিত্তিক রাষ্ট্র ছিল না। এটি ছিল ইসলামী জীবনাদর্শের ধারক-বাহক জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে গোটা বিশ্বমানবতাকে ইসলামের সুমহান আদর্শের প্রতি আহ্বানকারী প্রথম রাষ্ট্র। ইসলামী আদর্শের পূর্ণ বাস্তবায়ন ও এর সর্বাত্মক বিজয় অর্জন এবং এর মাধ্যমে জনগণের সার্বিক কল্যাণ সাধনই এ রাষ্ট্রের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল।

৪. ইসলামী রাষ্ট্র প্রকৃত অর্থেই একটি গণ-অধিকার সম্পন্ন এবং জনমত ভিত্তিক কার্যকর রাষ্ট্র ব্যবস্থা। এখানে সমস্ত রাষ্ট্রীয় ব্যাপার জনগণের সমর্থন ও অনুমোদনের ভিত্তিতেই সুসম্পন্ন হয়ে থাকে বলে রাষ্ট্রীয় মৌলনীতির বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের সাথে পরামর্শ ভিন্ন কার্যকর হতে পারে না। এই নীতি রাসূলে করীম (সা:) কর্তৃক পুরোপুরি অনুসৃত।

৫. এই রাষ্ট্রের সাম্য ও সততা দু'টি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। একটি আদম সন্তান হওয়া– এর ফলে সকল মানুষই মূলগতভাবে সমান। আর দ্বিতীয় ভিত্তি ভ্রাতৃত্ব। সকল মুসলমান পরস্পরের ভাই এবং সর্বতোভাবে অভিন্ন।

৬. সুবিচার এ রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সমদৃষ্টি ও নিরপেক্ষতা এই রাষ্ট্রের স্থায়ী নীতি। নবী করীম (সা:) নিজে সবসময়ে সুবিচার নীতিকে ভিত্তি করে বিচার ফয়সালা করতেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে আইনের প্রয়োগ ছিল নির্বিশেষ। এমনকি, একটি বিচার কার্যের সময় 'ফাতিমা চুরি করলে দণ্ডস্বরূপ আজ তারও হাত কাটা হতো' বলে ঘোষণার মাধ্যমে তিনি বিচারও আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমস্ত দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির মূলোৎপাটন করেছেন।

৭. নবী আদর্শের খিলাফত রাষ্ট্র সঠিক অর্থে একটি জনসেবা ও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র (Welfare State) ছিল। রাসূলে করীম (সা:) প্রতিষ্ঠিত এই রাষ্ট্রে জনগণের কেবল আর্থিক পৃষ্টপোষকতাই করা হতো না,

ইতিবাচকভাবে গণ-অধিকার আদায় করা ও জনগণের দারিদ্র নির্মূল করার জন্যেও চেষ্টা চালানো হতো। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের মত অর্থোপার্জনের প্রতিযোগিতায় পরাজিতদের সম্পূর্ণ অসহায় করে রাখা এই রাষ্ট্রে মোটেই সম্ভবপর ছিল না। সকল লোকের সম্মুখে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার দ্বার সমভাবে উন্মুক্ত করে দেয়ার পরও পিছনে পড়ে থাকা লোকদের আর্থিক নিশ্চয়তার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করা ছিল একমাত্র এই রাষ্ট্রেরই বিশেষত্ব। শুধু অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা বিধানই নয় জনগণের নৈতিকমান উন্নতকরণ, তাদের মনে আল্লাহর ভয় জাগানো এবং দ্বীন ও শরিয়াত সম্পর্কে তাদেরকে সুশিক্ষিত করে তোলার জন্যেও নিরন্তর গুরুত্বের সাথে চেষ্টা চালানো হতো।

৮. এই রাষ্ট্রের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাহর নিকট জবাবদিহির তীব্র চেতনা। যা কিছুই করিনা কেন, ব্যক্তিগত কাজ কিংবা জাতীয়-রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন– যে ধরনেরই কাজ হোক না কেন, তা নিজের ঘরে গোপনে করা হোক, কি প্রকাশ্যে সব কিছুর মূলেই এ চেতনাটি প্রবল থাকা। আর এ কারণেই এ রাষ্ট্রের কোনো পর্যায়েই আল্লাহর নাফরমানী, গণঅধিকার হরণ এবং জুলুম-নির্যাতনের কোনো একটি ঘটনাও সংঘটিত হতে পারে নি। إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ "তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু ব্যক্তিই তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক সম্মানার্হ " এই মূলনীতিই ছিল এ কাজের মূল ভিত্তি। রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে নিম্নতম সরকারি কর্মচারি নিয়োগ পর্যন্ত সর্বাবস্থায় সর্বাধিক আল্লাহভীরু ব্যক্তিকেই অগ্রাধিকার দেয়া হতো।

৯. রাসূলে করীম (সা:) প্রতিষ্ঠিত খিলাফত রাষ্ট্রে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের অকীদা-বিশ্বাস গ্রহণের পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছিল। তারা নিজেদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি কোনো প্রকার বাধা-বিপত্তি ছাড়াই যথাযথভাবে পালন করতে পারত; নিজেদের মত-বিশ্বাসের প্রকাশ-প্রচার করবার অবাধ সুযোগও তারা পেত। তাদের নিজেদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদসমূহ নিজেদের ধর্ম বিধানের ভিত্তিতে মীমাংসা করার পূর্ণ ইখতিয়ার ছিল। সাধারণ রাষ্ট্রীয় ও সামষ্টিক ব্যাপারে তারা রাষ্ট্রের একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে মুসলিম নাগরিকদের ন্যায়ই অভিন্ন সম্মান ও মর্যাদা লাভ করত। খিলাফত রাষ্ট্রে তারা সর্বাত্মক নিরাপত্তার সাথে বসবাস করতো এবং তাদেরকে ধর্মমত পরিবর্তন কিংবা ইসলাম গ্রহণে কোনোরূপ বাধ্য করা হতো না; তারা শালীনতার সর্বজনবিধিত সীমার মধ্যে থেকে সত্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্যে দ্বীন-ইসলাম সম্পর্কে মুসলমানদের সাথে যুক্তি তর্কে লিপ্ত হওয়ারও অবারিত সুযোগ ছিল।

১০. নবী প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে ইহুদী, নাসারা ও অগ্নিপূজক ছাড়াও মুনাফিকদের একটা শ্রেণী বর্তমান ছিল। তারা মনে-প্রাণে কুফরের প্রতি অবিচল থাকলেও মুখে ইসলামের প্রতি বিশ্বাস প্রকাশ করত। নবী করীম (সা:) তাদের বাহ্যিক আচরণকেই গ্রহণ করেছিলেন আর প্রকৃত ব্যাপার সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। তবে এদেরকে রাষ্ট্র পরিচালনায় সুযোগদানের ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল। নবী করীম (সা:) কোনো দায়িত্বপূর্ণ পদেই তাদের নিযুক্ত করেন নি। তাদের প্রতি কখনো বিশ্বাসও স্থাপন করেন নি, নির্ভরতা প্রকাশ করেন নি।

বিশ্বনবী প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের মূলনীতি যেমন স্বভাবসিদ্ধ, তেমনি শাশ্বত, চিরন্তন। ব্যক্তি মানুষ ও মানব সমষ্টির প্রকৃত কল্যাণ কেবল এ ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থার মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। অন্য কোনো ধরনের রাষ্ট্র দ্বারাই এটি সম্ভব হতে পারে না এ যাবৎ হয়েও নি। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) এই আদর্শ রাষ্ট্রের পরিচালনা করেছেন। 'খিলাফতে রাশেদা' এই রাষ্ট্রেরই পরবর্তী নাম, এরই যথার্থ উত্তরাধিকারী।

খিলাফতে রাশেদা :

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর ইন্তিকালের পর যে চারজন প্রধান সাহাবী ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন, ইতিহাসে তাদেরকে খুলাফায়ে রাশেদীন নামে অভিহিত করা হয় এবং তাঁদের পরিচালিত রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে বলা হয় খিলাফতে রাশেদা। এ শাসন ব্যবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী না থাকলেও বিশ্বের

ইতিহাসে তা সর্বাধিক মর্যাদা লাভ করেছিল। শুধু মুসলিম ঐতিহাসিকগণই নয়, অমুসলিম ঐতিহাসিকগণও খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসন আমলকে মানব ইতিহাসের 'স্বর্ণ-যুগ' বলে শ্রদ্ধা জানাতে বাধ্য হয়েছেন।

মহানবী (সা:) মদীনায় যে খিলাফাত রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেছিলেন মানব ইতিহাসে এমন সাম্য, সৌভ্রাতৃত্ব, মৈত্রী, কল্যাণ, মানবতা, উদারতা, পরমতসহিষ্ণুতাপূর্ণ রাষ্ট্র ব্যবস্থার দ্বিতীয় কোনো নজির পাওয়া যায় না। তাঁর ওফাতের পর খিলাফতের এ দায়িত্ব অর্পিত হয় যথাক্রমে হযরত আবু বরক, হযরত ওমর, হযরত উসমান ও হযরত আলী (রা:)-এর উপর। তাঁরা সুদীর্ঘ ত্রিশ বছরের অধিককাল ধরে অত্যন্ত নিষ্ঠা, যোগ্যতা ও তাকওয়ার সাথে এ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে তা যেমন তাওহীদের মর্মবাণীকে মানুসের মাঝে তুলে ধরেছেন, তাঁদের অমিয় আহবানে মানুষ যেমন দলে দলে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে, তেমনি ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থাও একটি মজবুত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁদের সময়ই সমগ্র আরব জাহান, ইরান, ইরাক, মিশর, সিরিয়াসহ গোটা পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক দেশ বিজিত হয় এবং তাওহীদের বাণী বিশ্বের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

খুলাফায়ে রাশেদীন আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দীনের প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে ছিলেন নিবেদিত প্রাণ, যা উম্মাহর প্রতিটি সদস্যের জন্যে অনুকরণীয়। এডওয়ার্ড গিবন তার গ্রন্থ 'ডেক্লাইন এন্ড ফল অব দ্যা রোমান এম্পায়ার' (৩য় খন্ড) এ লিখেছেন, 'যিনি ঐতিহাসিক সংস্কার বর্জিত মন দ্বারা খলীফা চারজনকে বিচার করবেন তিনি নিঃসন্দেহে বলবেন যে, তাদের আচরণ ছিল এক রকম খাঁটি এবং অনুকরণীয়, তাদের আগ্রহ ছিল প্রচুর ও আন্তরিক : এবং অর্থ ও ক্ষমতার মধ্যে বাস করেও তাঁরা নৈতিক ও ধর্মীয় কর্তব্য পালনে ছিলেন একান্তভাবে নিবেদিত প্রাণ।"[৫৫] (পৃ:-১৯২)

আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেছেন, 'যারা কোনো ব্যক্তিকে অনুসরণ করতে চায় তাদের উচিত সাহাবীদের অনুসরণ করা, তারা ছিলেন জাতির মধ্যে উত্তম, তাদের অন্তর ছিল খাঁটি, তাঁদের জ্ঞান ছিল প্রগাঢ় এবং তাঁরা জীবনের বাহ্যিক প্রদর্শনীতে বিশ্বাস করতেন না। তাঁরা এমন লোক যাদেরকে আল্লাহ তার রাসূল (সা:)-কে সাহায্য করার জন্য মনোনীত করেছিলেন এবং তাঁরা ধর্মকে বিশ্বের বুকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। অতএব, তাদের জীবন যাপন পদ্ধতি ও আচার-ব্যবহারকে অনুকরণ করার চেষ্টা কর, কারণ খোদার কসম, তারা ছিলেন সঠিক হিদায়াত প্রাপ্ত।'[৫৫] (পৃ:-১৯২)

কুরআন ও হাদীস হতে খলীফার যোগ্যতা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যা জানা যায়, সে দৃষ্টিকোণে একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, খুলাফায়ে রাশেদীনই ছিলেন মুসলিম জাহানের খলীফা হওয়ার সর্বাধিক উপযোগী। খিলাফতে রাশেদার দায়িত্ব পালনের জন্যে কুরআন-সুন্নাহর দৃষ্টিতে নিম্নলিখিত গুণ-বৈশিষ্ট্য অপরিহার্য মনে করা হয়।[৪৪] (পৃ:-৩১,৩২) নবী করীম (সা:)-এর পর যাদের মধ্যে এ গুণাবলী পরিস্ফূটিত হবে তারাই এ দায়িত্বের যোগ্যতর বিবেচিত হবেন।

১. খলীফাকে প্রথম পর্যায়ের মুহাজির হতে হবে এবং হুদায়বিয়ার সন্ধি, বদর ও তাবুক যুদ্ধে শরীক ও সূরায়ে নূর অবতীর্ণ হওযার সময় উপস্থিত ছিলেন, এমন হতে হবে।

২. বেহেশতবাসী হওয়ার সুসংবাদপ্রাপ্তদের মধ্যে গণ্য হতে হবে।

৩. সিদ্দীক, শহীদ প্রভৃতি ইসলামী সমাজের উচ্চ পর্যায়ের লোকদের মধ্যে গণ্য হতে হবে।

৪. নবী করীম (সা:)-এর কোনো ব্যবহার, কাজ বা কথা দ্বারা একথা প্রমাণিত হতে হবে যে, তিনি নিজে কাউকে খলীফা নিযুক্ত করলে তাকেই নিযুক্ত করতেন।

৫. আল্লাহ তা'আলা রাসূল (সা:)-এর নিকট যেসব ওয়াদা করেছেন তা তাঁর (ঐ সাহাবীর) সত্তা দ্বারা বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব হতে হবে।

৬. তাঁর কথা ইসলামী শরীয়াতে প্রমাণিত হতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

এ গুণাবলী বিচ্ছিন্নভাবে অসংখ্য সাহাবীর মধ্যে বর্তমান ছিল; কিন্তু এগুলোর পূর্ণ সমন্বয় ঘটেছিল, মাত্র চারজন সাহাবীর মধ্যে। উপরন্তু তাঁদের সম্পর্কেই রাসূল (সা:)-এর সুস্পষ্ট মর্যাদাপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। যা আমরা সিহাহ সিত্তার গ্রন্থসমূহে দেখতে পাই। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা:) সম্পর্কে মহানবী (সা:) বলেছেন : "আমার উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম তুমিই বেহেশতে প্রবেশ করবে, হাওযে কাউসারে তুমিই হবে আমার সাথী; কেননা পর্বত গহবরে তুমিই ছিলে আমার সাথী।' হযরত উমর (রা:) সম্পর্কে নবী করীম (সা:) বলেন– 'উমরের কামনায়ই অসংখ্য আয়াত নাযিল হয়েছে।' হযরত উসমান (রা:) সম্পর্কে নবী করীম (সা:) বলেন : 'ফিরিশতাও যাকে সম্মান শ্রদ্ধা জানায়, আমি কি তাকে সম্মান না জানিয়ে পারি?' আরও বলেছেন : 'প্রত্যেক নবীরই বন্ধু থাকে, বেহেশতে উসমান হবে আমার বন্ধু।' হযরত আলী (রা:) সম্পর্কে বলেছেন : 'তোমার সাথে আমার হারুন ও মূসার ন্যায় সম্পর্ক স্থাপিত হউক, তুমি কি তা চাও না? আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যার প্রিয় পাত্র, আমি আগামীকাল তার হাতেই ঝাণ্ডা তুলে দেব।'[৪৪] (পৃ:-৩২) এতদ্ব্যতীত নবী করীম (সা:) তাঁদের গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আরো অনেক মূল্যবান কথাই বলেছেন। সেসব কথায় প্রমাণিত হয় যে, হযরতের (সা:) দৃষ্টিতে তাঁর ইন্তেকালের পর এঁরাই ছিলেন খলীফার পদে নির্বাচিত হওয়ার সর্বাধিক উপযুক্ত এবং অধিকারী।

ইতিহাসের যে পর্যায়টি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা:)-এর খিলাফত থেকে শুরু করে হযরত আলী (রা:) পর্যন্ত বিস্তৃত, ইতিহাসে তাই হচ্ছে খিলাফতে রাশেদার যুগ। আর ৬৩২ খৃ. (১১ হিজরী) থেকে ৬৬১ খৃ. (৪০ হিজরী) পর্যন্ত মুসলিম জাহানের যাঁরা রাষ্ট্রনেতা ছিলেন, তাঁদেরকেই খুলাফায়ে রাশেদীন বলে অভিহিত করা হয়। খুলাফায়ে রাশেদীনের সংখ্যা ছিল চার জন এবং তাঁদের খিলাফতকালের সময়সীমা ছিল ত্রিশ বছর মাত্র। (অবশ্য উমর ইবনে আব্দুল আজীজও (রহ:) ইসলামী খিলাফতের নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচিত ও দায়িত্ব পালনে সক্ষম হওয়ায় তিনিও খুলাফায়ে রাশেদীনের অন্তর্ভুক্ত বলে ইসলামের ইতিহাসে বিবেচিত)।

জালালুদ্দীন দাওয়ামী তাঁর গ্রন্থ আখলাক-ই জালালীতে বলেছেন, "খিলাফত সম্পর্কে স্বীকৃত অভিমত হচ্ছে এই যে, শুধু ত্রিশ বছর খিলাফত স্থায়ী হয়েছিল; তার পরে যারা শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন শুধু সৌজন্য মূলকভাবে তাদেরকে খলীফা বলা হতো।" দাওয়ামী এবং ইবনে খালদূন উভয়েই খিলাফত এবং পার্থিব রাজতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য করেছেন এবং বলেছেন যে, একমাত্র সত্যপন্থী শাসক, যারা সুবিচারমূলক শাসন করে এবং শরীয়তকে কার্যকরী করে, একমাত্র তারাই খলীফা বা ইমাম উপাধি পাওয়ার যোগ্য।[৫৫] (পৃ:-২০৬)

খুলাফায়ে রাশেদীনের নির্বাচন :

১. নবী করীম (সা:) এর ইন্তিকালের পর মুসলিম উম্মাহর দায়িত্বশীল নাগরিকগণ 'সাকীফায়ে বনী সায়েদা' নামক (টাউন হল কিংবা পরিষদ ভবনের সমমর্যাদা সম্পন্ন) স্থানে মিলিত হন এবং প্রকাশ্যভাবে দীর্ঘ ও বিস্তারিত আলোচনার পর হযরত ওমর (রা:), হযরত আবু বরক (রা:) এর নাম প্রস্তাব করেন এবং সর্বশেষে কোন প্রকার চাপ-প্রভাব এবং প্রলোভন ব্যতীত সর্বসম্মতিক্রমে হযরত আবু বকর (রা:)-কে খলীফা নির্বাচিত করেন। উপস্থিত জনতা তখন অকুণ্ঠ চিত্তে তাঁর আনুগত্যের শপথ (বায়'আত) গ্রহণ করেন। আবু বকর (রা.) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব, কর্তব্য ও নীতি নির্ধারণ মূলক ভাষণ দান করেন।

২. হযরত উমর ফারুক (রা:) এর নির্বাচনে স্বতন্ত্র পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল। প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা:) তাঁর গোটা ইসলামী জীবন ও খলীফা জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর পর খলীফা হওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি সমগ্র জাতির মধ্যে হযরত ওমর (রা:) অপেক্ষায় দ্বিতীয় কেউ বর্তমান নেই। তাঁর খিলাফতকালীন যাবতীয় ঘটনা ও গুরুত্বপূর্ণ সরকারি-বেসরকারি কাজে হযরত উমর (রা:)

Dhaka University Institutional Repository

নিবিড়ভাবে শরীক ছিলেন; কুরআন মাজীদ সঞ্চয়ন ও গ্রন্থাবদ্ধকরণও কেবলমাত্র তাঁরই ঐকান্তিক আগ্রহ, চেষ্টা ও পরামর্শে সম্পন্ন হয়েছিল। তাই হযরত আবু বকর (রা:) নিজের অভিজ্ঞতা ও প্রধান সাহাবীদের সাথে পরামর্শক্রমে হযরত উমর ফারুক (রা:) কেই পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের জন্যে মুসলিম জনতার নিকট সুপারিশ করে গেলেন।[15] মুসলিম জনসাধারণ প্রথম খলীফার সুপারিশ ও নিজেদের নিরপেক্ষ ও অকুণ্ঠ রায়ের ভিত্তিতে হযরত উমর (রা:) কেই খলীফা নির্বাচিত করল ও তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করল। উমর (রা:) খলীফা নির্বাচিত হয়ে তাঁর পূর্বসূরীর ন্যায় মুসলিম জাতীকে সম্বোধন করে নীতি-নির্ধারণী ভাষণ দান করেন।

৩. দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা:) যখন বুঝতে পারলেন যে, তাঁর জীবন-পাত্র সম্পূর্ণ হতে চলছে, তিনি আর বেশিদিন বেঁচে থাকবেন না, তখন তিনি নিজের স্থলাভিষিক্ত ও পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের প্রয়োজন বোধ করেন। সে জন্যে তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন। তিনি ছয়জন শ্রেষ্ঠ ও নেতৃস্থানীয় সাহাবীর সমন্বয়ে একটি 'নির্বাচনী বোর্ড' আধুনিক পরিভাষায় 'নির্বাচন কমিশন' গঠন করলেন।[16] অন্যান্যদের মধ্যে হযরত উসমান ও হযরত আলী (রা:) এই বোর্ডের অন্যতম সদস্য ছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে এই ছয়জনই খিলাফতের জন্যে যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আদেশ করলেন যে, তাঁর অন্তর্ধানের পর তিন দিনের মধ্যেই যেন এই বোর্ড নিজেদের মধ্য হতে সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তিকে খলীফা নির্বাচন করে। তাঁর কথানুযায়ী তাঁর ইন্তিকালের পর বোর্ড সুষ্ঠুভাবে তার দায়িত্ব পালনে স্বচেষ্ট হয় এবং এ ব্যাপারে নিকটবর্তী ও দূরবর্তী মুসলিম নাগরিকদের রায় সংগ্রহ করে।[17] মদীনার প্রতিটি ঘরে উপস্থিত হয়ে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের রায় জিজ্ঞেস করা হয়। দূরাগত ব্যবসায়ী ও পর্যটকদেরও রায় সংগ্রহ করতে ত্রুটি করা হয়নি। এভাবে মুসলিম নাগরিকদের সর্বাধিক রায় ও আলাপ-আলোচনার পর হযরত উসমানকেই (রা:) তৃতীয় খলীফা পদে নির্বাচিত করা হয়।

৪. তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা:)-এর শাহাদাতের পর মদীনার পরিবেশ ফিতনা-ফাসাদের ঘনঘটায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। মিশর, কুফা ও বসরার বিদ্রোহীরা মদীনায় প্রবল তান্ডবের সৃষ্টি করে। তখন প্রধান সাহাবীদের অধিকাংশই সামরিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের জন্যে রাজধানীর বাইরে অবস্থান করছিলেন। এমতাবস্থায় হযরত উসমান (রা:)-এর শাহাদাতের পর ক্রমাগত তিনদিন পর্যন্ত খলীফার পদ শূন্য থাকে। শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর হযরত আলীকেই (রা:) খলীফা নির্বাচিত করা হয়।

এই বিশ্লেষণ হতে একথা প্রমাণিত হয় যে, খুলাফায়ে রাশেদীনের নিয়োগ ও নির্বাচনের ব্যাপারে একই ধরনের বাহ্যিক পদ্ধতি (Form of Election) অনুসৃত না হলেও প্রতিটি পদ্ধতিতেই জনমতকে নির্বাচনের

---

15 হযরত আবু বরক (রা:) তাঁর ওফাতকালে হযরত উমর (রা:) সম্পর্কে ওসিয়াত লিখেন, অত:পর জনগণকে মসজিদে নববীতে সমবেত করে বলেন : 'আমি যাকে স্থলাভিষিক্ত করছি তোমরা কি তার উপর সন্তুষ্ট? আল্লাহর শপথ! সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে বুদ্ধি বিবেক প্রয়োগে আমি বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করিনি। আমার কোনো আত্মীয়-স্বজনকে নয়, বরং উমর ইবনুল খাত্তাবকে আমার স্থলাভিষিক্ত করেছি। সুতরাং তোমরা তাঁর নির্দেশ শুনবে এবং অনুগত্য করবে।' তখন সবাই সমস্বরে বলে উঠে। আমরা তার নির্দেশ মানবো। (আততাবারী, তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৬১৮)। [মুহাম্মদ আমিনুর রহমান, বিশ্বায়ন তাগুত খিলাফাহ, রেডিয়্যান্ট, ১৭৩/২, ফকিরাপুল, ঢাকা–১০০০, তৃতীয় প্রকাশ–২০০৪, পৃ: ৮৮-৮৯।]

16 বুখারী কিতাবুল মোহারেবীন, অধ্যায় ১৬। মুসনাদে আহমাদ, ১ম খন্ড, হাদীস নম্বর ৩৯১। তৃতীয় সংস্করণ, দারুল মাআরেফ, মিসর ১৯৪৯। মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় হযরত উমর (রা:) নির্বাচনি বোর্ড গঠনের প্রাককালে সাকীফায়ে বনী সায়েদার ইতিবৃত্ত বর্ণনান্তে বলেন : 'মুসলমানদের পরামর্শ ব্যতীত যে ব্যক্তি কোনো আমীরের হাতে বায়'আত করে, তার কোনো বায়'আত নেই।' অপর বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেন : 'পরামর্শ ব্যতীত কোনো ব্যক্তিকে এমারত দেয়া হলে তা কবুল করা তার জন্যে হালাল নয়।' (ইবনে হাযার, ফাতহুলবারী, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১২৫, আল মাতবায়াতুল খাইরিয়া, কায়রো, ১৩২৫ হিজরী, মুহাম্মদ আমিনুর রহমান, প্রাগুক্ত।)

17 কমিটির সদস্য আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা:) কে কমিটি শেষ পর্যন্ত খলীফার নাম প্রস্তাব করার ইখতিয়ার দান করে। সাধারণ লোকদের মধ্যে ঘোরাফেরা করে তিনি জানতে চেষ্টা করেন, কে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। হজ্জ শেষ করে যেসব কাফেলা বিভিন্ন এলাকায় ফিরে যাচ্ছিল, তিনি তাদের সাথেও আলোচনা করেন। এ জনমত যাচাইয়ের ফলে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, অধিকাংশ লোকই হযরত উসমান (রা:)-এর পক্ষে। (আততাবারী, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ২৯৬। ইবনুল আসীর, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৬। আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৪৬, মুহাম্মদ আমিনুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ–৯০।)

ভিত্তিরূপে স্বীকার করা হয়েছে এবং কোনো ক্ষেত্রেই জনমতকে উপেক্ষা করা হয়নি। বস্তুত: প্রকৃত খিলাফতের এটিই মৌলিক ভাবধারা[18] এবং জনগণের অধিকার সংরক্ষণ ও রাষ্ট্রীয় শৃংখলা স্থাপনের জন্যে প্রতিটি যুগে ও অবস্থায়ই এটি কার্যকর হওয়া একান্ত প্রয়োজন-অপরিহার্য। উপরন্তু মৌলিক ভাবধারাকে যথোপযুক্ত মর্যাদা ও গুরুত্বের সাথে রক্ষা করে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের যে কোনো বাহ্যিক পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। কেননা ইসলামে বাহ্যিক অবয়ব ও আকার-আকৃতির বিশেষ গুরুত্ব নেই; বরং জাতীয় ও তামদ্দুনিক ব্যাপারে তার মৌলিক ভাবধারাই হচ্ছে একমাত্র লক্ষ্য রাখার বস্তু।

খিলাফতে রাশেদার রাষ্ট্রস্বরূপ :

খিলাফতে রাশেদার রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ইসলামী সমাজ,সভ্যতা ও কৃষ্টি-তামাদ্দুনের পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছিল। এটি একাধারে ছিল দ্বীন-ভিত্তিক ও বৈষয়িক উন্নয়নের একমাত্র নিয়ামক রাষ্ট্র। দ্বীন ইসলামের উপরই এর ভিত্তি স্থাপিত ছিল এবং কুরআনের অকাট্য মূলনীতি ও রাসূলে করীম (সা:) এর সুন্নাহ অনুযায়ী মানবতার সার্বিক কল্যাণ সাধনই ছিল এর যাবতীয় চেষ্টা সাধনার কেন্দ্রবিন্দু।

ক. রাষ্ট্র ও সরকারের ধারণা :

খুলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে বাদশাহী শান-শওকত কিংবা ডিকটেটরী স্বৈরতন্ত্রের কোনো অস্তিত্বই বর্তমান ছিল না। তারা নিজেদেরকে সাধারণ নাগরিকদের সমপর্যায়ভুক্ত মনে করতেন। একমাত্র খিলাফত ভিন্ন অন্য কোনো দিক দিয়েই তাঁরা তাঁদের ও সাধারণ জনগণের মধ্যে একবিন্দু পার্থক্যেরও অবকাশ রাখেন নি। খলীফার দরবারে সরকারি কর্মচারী ও জনসাধারণের অবাধ যাতায়াত ছিল এবং এ ব্যাপারে কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতার লেশমাত্রই ছিল না। ফলে জনগণের অবস্থা ও অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে ওয়াকিফহাল হওয়া এবং কোনো প্রকার দীর্ঘসূত্রিতা ব্যতিরেকেই তার প্রতিকার করা তাদের পক্ষে অত্যন্ত সহজও ছিল।

হযরত আলী (রা:) জনৈক গভর্ণরকে লিখে পাঠান : "তোমাদের এবং জনসাধারণের মাঝে দীর্ঘ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করো না। শাসক ও শাসিতের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা দৃষ্টির সংকীর্ণতা এবং জ্ঞানের স্বল্পতার পরিচায়ক। এর ফলে তারা সত্যিকার অবস্থা জানতে পারে না। ক্ষুদ্র বিষয় তাদের জন্যে বৃহৎ হয়ে দাঁড়ায়, আর বিরাট বিষয় ক্ষুদ্র। তাদের জন্যে ভাল মন্দ হয়ে দেখা দেয়, আর মন্দ গ্রহণ করে ভালোর আকার; সত্য মিথ্যা সংমিশ্রিত হয়ে যায়।" (ইবনে কাসীর, ৮ম কণ্ড, পৃষ্ঠা ৮) [৫০] (পৃ:-৯৮)

খলীফারা সর্বক্ষণ জনগণের নাগালের মধ্যেই থাকতেন। তাঁরা দৈনিক পাঁচবার নামাযের জামা'আতে, সপ্তাহান্তে জুম'আর জামা'আতে এবং বছরে দুবার ঈদের জামা'আতে ও হজ্জের সম্মেলনে জাতির সামনে উপস্থিত হতেন। অন্য দিকে জনগণও এ সময়ে তাঁদের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ পেত। তাঁরা হাট-বাজারে জনগণের সাথে চলা-ফেরা করতেন। তাদের কোনো দেহরক্ষী ছিল না, ছিল না কোনো রক্ষীবাহিনী। যখন-তখন যে কোনো ব্যক্তি তাঁদেরকে প্রশ্ন করতে, সমালোচনা করতে ও তাঁদের নিকট থেকে হিসাব চাইতে পারত। তাঁদের নিকট থেকে কৈফিয়ত তলব করার স্বাধীনতা ছিল সকলেরই। এ স্বাধীন ব্যবহারের তারা কেবল অনুমতিই দেন নি, বরং এজন্যে তারা লোকদেরকে উৎসাহিতও করতেন। হযরত আবু বকর (রা.) সহ

---

18 খিলাফত সম্পর্কে খুলাফায়ে রাশেদীন এবং রাসূল (সা:) এর সাহাবীদের সর্বসম্মত মত হলো, খিলাফত একটি পরামর্শ ভিত্তিক পদমর্যাদা। মুসলমানদের পারস্পরিক পরামর্শ ও তাদের স্বাধীন মতামত প্রকাশের মাধ্যমেই কেবল তা প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। বংশানুক্রমিক বা বল প্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব তাঁদের মতে খিলাফত নয়; বরং তা বাদশাহী, রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র। হযরত আবু মূসা আশআরী (রা:)-এর বক্তব্যে তা সুস্পষ্ট : -اِنَّ الاَمَارَةَ ما اُوْتُمِرَ فِيْهَا وَاِنَّ الْمُلْكَ مَاغُلِبَ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ- "এমারত (খিলাফত) হচ্ছে তাই, যা প্রতিষ্ঠা করতে পরামর্শ নেয়া হয়েছে, আর তরবারীর জোরে যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা হচ্ছে বাদশাহী বা রাজতন্ত্র।" (তাবকাতে ইবনে সা'দ, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ১১৩, মুহাম্মদ আমিনুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ–৯১।)

প্রত্যেক খলীফাই নির্বাচিত হওয়ার পরোক্ষণে প্রথম ভাষণেই প্রকাশ্যে বলেছিলেন, আমি সোজা পথে চললে আমায় সাহায্য করো, বাঁকা পথে চললে আমাকে সোজা করে দেবে।

একবার হযরত সালমান ফরসী প্রকাশ্য মজলিশে হযরত ওমর (রা.) এর নিকট কৈফিয়ত তলব করলেন, 'আমাদের সকলের ভাগে এক এক খানা চাঁদর পড়েছে। আপনি দু'খানা চাদর কোথায় পেলেন? হযরত ওমর (রা.) তৎক্ষণাৎ স্বীয় পুত্র আব্দুলাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর সাক্ষ্য পেশ করলেন যে, দ্বিতীয় চাদর খানা তিনি পিতাকে ধার দিয়েছেন।[২৭] (পৃ:-৫৬) আর একবার তিনি মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিদের জিজ্ঞেস করলেন, আমি যদি কোনো ব্যাপারে কোনো শৈথিল্য দেখাই তাহলে তোমরা কি করবে? হযরত বিশর ইবনে সাদ (রা.) বলেন, এমন করলে আমরা আপনাকে তীরের মতো সোজা করে দেব। হযরত ওমর (রা.) বললেন, তবেই তো তোমরা কাজের মানুষ! (কানযুল উম্মাল, ৫ম খন্ড, হাদীস ২৪১৪) [৫০] (পৃ:-৯৮)। আর হযরত উসমান (রা:) সবচেয়ে বেশী সমালোচিত হয়েছেন এজন্য যে, তিনি কখনো জোর পূর্বক কারো মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করেননি, বরং সবসময় অভিযোগ এবং সমালোচনার জবাবে প্রকাশ্যে নিজের সাফাই পেশ করতেন।

হযরত উমর (রা:) রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের কঠিন বোঝার অনুভূতি প্রকাশে বলেছিলেন : "ফোরাত নদীর তীরেও যদি একটি বকরীর বাচ্চাও ধ্বংস হয়, তবে আমার ভয় হয়, আল্লাহ আমাকে সেজন্যে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।' (কানযুল উম্মাল, ৫ম খন্ড, হাদীস ২৫০৫) [২১] (পৃ:-৭০)। একদিন গভীর রাতে হযরত উমর (রা:) এক অসহায় বিধবা স্ত্রী এবং তার ক্ষুধাতুর শিশুদের জন্যে খাদ্যের বোঝা নিজ মাথায় তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সাথী হযরত আববাস (রা:) বোঝাটি মাথায় নিতে চাইলে, তিনি তা দিতে অস্বীকার করেন এবং খিলাফতের দায়িত্বভারে কম্পিত হৃদয়ে বলে উঠলেন :

لا وَاللهِ أنتَ لاتَحْمِلُ جَرَائِمِیْ وَظُلْمِیْ یَوْمَ الدِّیْنِ وَاَعْلَمْ یَا عَبَّاسَ اَنَّ حَمَلَ جِبَالِ الْحَدِیْدِ وَثِقْلِهَا خَیْرٌ مِّنْ حَمْلِ ظُلْمَةٍ كُبِرَتْ أو صَغُرَتْ-

"না, হে আববাস! আল্লাহর শপথ, বিচারের দিন তুমি আমার অপরাধ এবং জুলুমের বোঝা বহন করবে না। হে আববাস! জেনে রেখ, ছোট হোক আর বড় হোক, জুলুমের বোঝা বহন করা অপেক্ষা লৌহ পর্বত বহন করা অধিকতর সহজ।'[৪৬] (পৃ:-৮১)

অবশেখে তিনি খাদ্য বহন করে নিয়ে, নিজ হাতে রেঁধে খাইয়ে সকলকে পরিতৃপ্ত করে গভীর রাতে ফিরে এলেন।

হযরত আলী (রা:) হাতে দোররা নিয়ে কুফার বাজারে বেরুতেন, জনগণকে অন্যায় থেকে বারণ করতেন, ন্যায়ের আদেশ করতেন। প্রতিটি বাজারে ঘুরে ঘুরে দেখতেনব্যবসায়ীরা কাজ-কারবারে প্রতারণা করছে কিনা। দৈনন্দিন ঘোরা-ফেরার ফলে কোনো অপরিচিত ব্যক্তি তাঁকে দেখে ধারণাই করতে পারতো না যে, মুসলিম জাহানের খলীফা তার সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। (ইবনে কাসীর, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪-৫) [৫০] (পৃ:-৯৯)

বস্তুত: এই হলো খলীফাগণের খিলাফত তথা আমীরত্ব আর এটি সম্ভব হয়েছিল শুধুমাত্র আল্লাহর নিকট যাবতীয় কাজের জবাবদিহিতার তীব্র অনুভূতি ও 'রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব হলো পবিত্র আমানত'-[19] রাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁদের এই স্বচ্ছ ধারণার ফলশ্রুতিতে।

---

19 রাসূল (সা:) বলেন : 'ইহা (নেতৃত্ব, শাসন ক্ষমতা) হচ্ছে একটি আমানত। কিয়ামতের দিন তা লজ্জা ও অনুতাপের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। অবশ্য যিনি ন্যায় ভিত্তিক নেতৃত্বের অধিকারী তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সে সঠিকভাবে পালন করে তার কথা ভিন্ন।' (মুসলিম শরীফ), অধ্যাপক আহমদ আবদুল কাছের, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা:) তাঁর একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে বলেন :

اِنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطَعْمَةٍ وَّلَكِنَّهُ فِىْ عُنُقِكَ اَمَانَةٌ وَاَنْتَ مُسْتَرْعِىٌّ بِمَا فَوْقَكَ لَيْسَ لِكَ اَنْ تَفْتَاتَ فِىْ رَعِيَّةٍ-

"তোমার কাজ ও কর্তৃত্ব তোমার জন্যে কোনো স্বাদের খাবার নয়; বরং তা তোমার ঘাড়ের উপর একটি ভারী আমানত। তোমার উপরস্থের জন্যে তুমি প্রহরার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি। তুমি এই প্রহরার কাজে কোনোরূপ অন্যায় করতে পারো না।" (নাহজুল বালাগা, চিঠি-৫) [৪৫] (পৃ:-১২০)

তিনি আরো বলেন :

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اَمْرَكُمْ هذَا لَيْسَ لاَحَدٍ فِيْهِ حَقٌّ اِلاَّ مَنْ اَمَرْتُمْ وَاِنَّهُ لَيْسَ لِىْ دُوْنَكُمْ اِلاَّ مَفَاتِيْحُ مَالِكُمْ مَعِىْ-

"হে জনগণ! তোমাদের এই রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কিছু করার অধিকার কেবল তারই হতে পারে যাকে তোমরা নিযুক্ত করবে। আর খলীফা হিসেবে আমার কোনো ক্ষমতা নেই। আছে শুধু এই যে, তোমাদের যে মাল-সম্পদ আমার নিকট রয়েছে, তার চাবিগুলো আমার নিকট রক্ষিত।"[৪৫] (পৃ:-১২০)

তিনি আরো বলেন :

حَقٌّ عَلَى الْاِمَامِ اَنْ يَّحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ وَاَنْ يُّؤَدِّىَ الْاَمَانَةَ فَاِذَا فَعَلَ ذَالِكَ فَحَقٌّ عَلَى النَّاسِ اَنْ يَّسْمَعُوْا لَهُ وَاَنْ يُّطِيْعُوْهُ وَاَنْ يُّجِيْبُوْهُ اِذَا دَعَوْا-

"ইমাম-রাষ্ট্রনায়কের অধিকার হচ্ছে এতটুকু মাত্র যে, সে আল্লাহর নাযিল করা বিধানের ভিত্তিতে শাসনকার্য চালাবে। সে যদি তা করে, তাহলে জনগণের উপর তার এই অধিকার হবে যে, তারা তার কথা শুনবে ও তার আনুগত্য করবে এবং যখন ডাকবে তখন তারা সে ডাকে সাড়া দেবে।"[৪৫] (পৃ:-১২০)

দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুক (রা:) হযরত আবু মূসাকে (রা:) ইয়ামেন প্রদেশের গভর্ণর নিযুক্ত করে যে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিয়েছিলেন তার শেষ ভাগে তিনি বলেন :

اِنَّ مَنْ وَلِىَ اَمْرَ الْمُسْلِمِيْنَ يَجِبُ عَلَيْهِ مَايَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ لِسَيِّدِه -

"যে লোক মুসলমানদের দায়িত্বশীল হবে তার কর্তব্য তাই হবে যা মনিবের জন্যে গোলামের কর্তব্য।"[৪৬] (পৃ:-৭২)

খ. বিচার বিভাগ :

বিচার ও ইনসাফ প্রতিটি মানুষের অতি স্বাভাবিক অধিকার। পানি, আলো-বাতাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন দেশের প্রতিটি মানুষই পেতে পারে– এ অধিকার হতে কেউ কাউকেও বঞ্চিত করতে পারে না, তেমনি সুবিচারও প্রতিটি মানুষের সমানভাবে প্রাপ্য। এ ব্যাপারে ধনী-গরীব, রাজা-প্রজা, জমিদার-কৃষক, পুঁজিদার-মজুর, কালো-সাদা এমন কি কাফের ও মুসলিমের মাঝেও কোনো পার্থক্য করা চলে না। এটাই বিশ্বপ্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল ও স্বাভাবিক নিয়ম এবং এটাই খুলাফায়ে রাশেদীনের অন্যতম দায়িত্ব।

প্রথম খলীফার আমলে প্রত্যেক শহরের জন্যে নিযুক্ত শাসনকর্তাই বিচার কার্য সম্পাদন করতেন। কিন্তু দ্বিতীয় খলীফা তাঁর খিলাফতকালে বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সতন্ত্র করে দিয়েছিলেন। এজন্যে প্রত্যেক শহরেই স্বতন্ত্র মর্যাদা সম্পন্ন বিচারপতি বা কাজী নিয়োগ করেছিলেন। বিচারপতিগণ রায়দানের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। খলীফার পক্ষ থেকে তাঁদেরকে এই নির্দেশ দেয়া হতো যে, তারা বিচারে যে রায় দিবেন, তা যেন সর্বতোভাবে কুরআন সুন্নাহর ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়। হযরত উমর (রা:) শাসনকর্তাদের কোনো এলাকায় প্রেরণকালে সম্বোধন করে বলতেন : "মানুষের দণ্ড-মুণ্ডের মালিক বনে বসার জন্যে আমি

তোমাদেরকে মুহাম্মদ (সা:)-এর উম্মাতের উপর শাসনকর্তা নিযুক্ত করছি না; বরং আমি তোমাদেরকে এ জন্যে নিযুক্ত করছি যে, তোমরা সালাত কায়েম করবে। মানুষের মধ্যে ইনসাফের ফয়সালা করবে, ন্যায়ের সাথে তাদের অধিকার বণ্টন করবে।' (আত্ তাবারী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা–২৭৩) [৫০] (পৃ:-৯৭)

কাজী বা বিচারপতি সরাসরি খলীফা কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। কখনো কখনো সংশ্লিষ্ট শহরের শাসনকর্তাকেও বিচারপতি নিয়োগের ইখতিয়ার দেয়া হত; তথাপি বিচারপতি কখনই শাসনকর্তার অধীন ছিলেন না। বিচারকের বিচার কার্যের উপর কোনোরূপ চাপ বা প্রলোভবন প্রয়োগেরও কোনো অধিকার কারো ছিল না। এজন্যেই হযরত আলী (রা:) খলীফা পদে অভিষিক্ত হওয়ার পর তাঁর নিয়োগকৃত শাসনকর্তা মালিক আশতার নখ্য়ীকে লিখে পাঠিয়েছিলেন : 'বিচারককে তোমার নিকট এমন মর্যাদা দেবে, যা পাওয়ার লোভ তোমার বিশেষ লোকদের মধ্যে অপর কারোই মনে কখনই জাগবে না। তোমার নিকট এরূপ মর্যাদা থাকলেই বিচারক লোকদের সকল প্রকার প্রভাব ও প্রলোভন থেকে রক্ষা পেতে পারবে। অতএব তুমি সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবে।' (নাহজুল বালাগা, কিতাব অংশ, পৃষ্ঠা–৫৩) [৪৫] (পৃ:-২২৪)

বিচারকগণ খলীফা কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হলেও বিচারের ক্ষেত্রে খলীফার বিরুদ্ধেও রায় দিতে তারা ছিলেন অকুণ্ঠ-পূর্ণ স্বাধীন, যেমন স্বাধীন একজন সাধারণ নাগরিকের বেলায়। একবার হযরত উমর (রা:) এবং হযরত উবাই ইবনে কাব (রা:)-এর মধ্যে কোনো এক ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দেয়। উভয়ে বিচারপতি হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা:)-এর নিকট উপস্থিত হলেন। যায়েদ (রা:) দাঁড়িয়ে হযরত উমর (রা:)-কে তার আসনে বসাতে চাইলেন। কিন্তু তিনি উবাইয়ের সাথে বসলেন। অত:পর হযরত উবাই (রা:) তাঁর আর্জি পেশ করলেন, হযরত উমর (রা:) অভিযোগ অস্বীকার করলেন। নিয়ম অনুযায়ী যায়েদ (রা:)-এর উচিত ছিল হযরত উমর (রা:)-এর কাছ থেকে কসম আদায় করা। কিন্তু তিনি তা করতে ইতস্তত করলেন। হযরত উমর (রা:) নিজেই কসম খেয়ে মজলিস সমাপ্তির পর বললেন : 'যতক্ষণ যায়েদের কাছে একজন সাধারণ মুসলমান এবং উমর (রা:) সমান না হয়, ততক্ষণ যায়েদ বিচারক হতে পারে না।'[৩৪] (পৃ:-১০০)

ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লেকান বর্ণনা করেন যে, একবার হযরত আলী (রা:) এবং জনৈক জিম্মী বাদী-বিবাদী হিসেবে কাজী শোরাইহ-এর আদালতে উপস্থিত হন। কাজী দাঁড়িয়ে হযরত আলী (রা:) কে অভ্যর্থনা জানান। এতে তিনি (হযরত আলী রা:) বলেন, 'এটি আপনার প্রথম বে-ইনসাফী।'[২৩] (পৃ:-১০১)

ইসলামে নির্ভুল বিচারের জন্যে নিরপেক্ষ সাক্ষ্যের প্রয়োজন। কারো দাবি যদি সত্যও হয়, কিন্তু সে যদি নিরপেক্ষ সাক্ষ্য বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত করতে সক্ষম না হয়, তবে বাদী যত বড় লোকই হোক না কেন, তার মুকাদ্দমা খারিজ করে দেয়া হবে। এক ইহুদী ব্যক্তি খলীফা হযরত আলী (রা:)-এর লৌহবর্ম চুরি করেছিল। খলীফা তার কাছে তা ফেরত চাইলেন, কিন্তু সে তা ফেরত দিতে রাজি হলো না। খলীফাতুল মুসলিমীনের বর্ম চুরি করা চাট্টিখানি কথা নয়– তিনি ইচ্ছা করলেই পুলিশ দিয়ে চোরকে গ্রেফতার করতে এবং নিজ হাতে ইচ্ছা মত শাস্তি দিতে পারতেন। কিন্তু ইসলাম এরূপ সেচ্ছাচারিতার অধিকার কাউকেও দেয়নি; এমনকি খলীফাতুল মুসলিমীনকেও না। কাজেই হযরত আলী (রা:)-কেও একজন সাধারণ নাগরিকের মত আদালতে হাজির হয়ে মুকাদ্দমা দায়ের করতে হয়েছিল। কাজী তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রতি লক্ষ্য করে শুধু দাবির উপর ভিত্তি করে কোনো রায় দেননি; বরং বিচারের নিয়ম অনুসারে বাদীকে তার দাবির স্বপক্ষে সাক্ষী পেশ করতে বললেন। তিনি নিজ পুত্র হযরত হাসান (রা:) এবং ক্রীতদাস কুনবারকে সাক্ষী হিসেবে আদালতে উপস্থিত করলেন। কিন্তু ইসলামী বিচারনীতি অনুযায়ী নীরপেক্ষ সাক্ষী পেশ করতে না পারার অভিযোগে কাজী খলীফাতুল মুসলিমীনের মুকাদ্দমা খারিজ করে দিলেন। নিরপেক্ষ সুবিচারের এহেন আদর্শ নিজ চক্ষে প্রত্যক্ষ

করে সেই ব্যক্তি উচ্চস্বরে কালেমায়ে তাইয়্যেবা পড়ে উঠল এবং বলল– যে ধর্ম ব্যবস্থায় এরকম নিরপেক্ষ বিচার-নীতি আছে, তা নিঃসন্দেহে সত্য।[20]

ইসলামী রাষ্ট্রনীতিবিদগণ লিখেছেন : সরকারের প্রশাসন কর্তৃত্ব দুইভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগ হচ্ছে দেশ শাসন, অভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা ইত্যাদি। আর দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে জনগণের সংশ্লিষ্ট জটিল সামষ্টিক বিষয়াদিতে স্পষ্ট-অকাট্য রায় দান, পথ নির্দেশনা ও পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদে বিচার কার্য সম্পাদন। রাসূলে করীম (সা:) এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে এই দু'টি পদ দুই শ্রেণীর লোকের উপর স্বতন্ত্রভাবে অর্পিত ছিল। অবশ্য কখনো কখনো বিশেষ যোগ্যতার বিচারে এ উভয় ধরনের কাজের দায়িত্ব একই ব্যক্তিকেও দেয়া হয়েছে।[৪৫(পৃ:-২২৪,২২৫)] কিন্তু বিচার বিভাগ ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন- প্রশাসনের প্রভাব মুক্ত।

বিচার বিভাগের এই স্বাধীনতা ও সম্পূর্ণভাবে নির্বাহী শক্তির প্রভাবমুক্ত থাকার ফলে রাষ্ট্রপ্রধানকেও প্রয়োজনে বাদী কিংবা বিবাদী হয়ে বিচারকের নিকট উপস্থিত হতে হত এবং তথায় তাকে প্রতিপক্ষের সাথে সমান ও অভিন্ন মর্যাদা পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হতো। তিনি নিজস্বভাবে যেমন কাউকে কোনো অপরাধের জন্যে দায়ি করে তাকে দণ্ডিত করতে পারেন না, তেমনি তাঁর নিজের ব্যাপারেও বিচারকের দ্বারস্থ হতে একান্তভাবে বাধ্য।

গ. আইন বিভাগ :

খিলাফতে রাশেদার আমলে কুরআন মজীদ ও সুন্নাতে রাসূল (সা:) মুতাবিকই যাবতীয় আইন-কানুন প্রণয়ন করা হত। খুলাফায়ে রাশেদীন যদি এমন কোনো সমস্যা বা জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হতেন, যার প্রত্যক্ষ মীমাংসা কুরআন ও হাদীস হতে লাভ করতে পারতেন না, তা হলে নবী করীম (সা:) এর কার্যাবলীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সম্মুখে রেখে উত্তমভাবে তার মীমাংসা করতেন এবং কোনোভাবেই কুরআন ও সুন্নাতে রাসূলের মৌলিক আদর্শ লঙ্ঘিত হতে দিতেন না।

কুরআন-হাদীসের মূল সূত্র হতে বাস্তব ও ব্যবহারিক জীবনের খুঁটিনাটি আইন-কানুন প্রণয়নের অধিকারের ক্ষেত্রে খলীফার কোনো প্রাধান্য, বিশিষ্টতা ও অগ্রাধিকার স্বীকৃত ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে খলীফা বরং অন্যান্য

---

20 ইসলামী হুকুমাতের কাজীকে সার্বক্ষণিক সুবিচারের শানিত মানদণ্ড ধারণ করে থাকতে হবে। মুকাদ্দমার উভয়পক্ষ মুসলমান কিনা কিংবা এরা কোনো এক পক্ষ অমুসলিম, সেদিকে বিচারকের কোনোই ভ্রুক্ষেপ থাকবে না। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের প্রতিই তার নিরপেক্ষ বিচার দণ্ড সমানভাবে কার্যকর হবে। কোনোরূপ পক্ষপাতিত্ব করা মুসলিম বিচারকের পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ। দ্বিতীয়তঃ বিচারকের মনে নির্দিষ্ট কোনো জাতি-গোষ্ঠীর প্রতি বিদ্বেষও থাকতে পারবে না। কোনো বিচারক পূর্ব সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না যে, অমুক জাতি-গোষ্ঠীর লোক যদি বাদী হয় তবে তার দাবি সত্য হলেও তার পক্ষে কখনো রায় দেব না। একইভাবে ঐ জাতি-গোষ্ঠীর লোক বিবাদী হলে, তবে তাকে অবশ্যই অপরাধী সাব্যস্ত করে দণ্ডিত করবই। ইসলাম এ ধরনের যাবতীয় স্বেচ্ছাচারিতাকে সম্পূর্ণ হারাম করেছে। কুরআনের নির্দেশ :

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ-

"নির্দিষ্ট কোনো জাতির প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে তাদের প্রতি অবিচার করতে উদ্ধত না করে। তোমরা নির্বিশেষে সকলের প্রতি সুবিচার করো, কারণ এটিই তাকওয়া তথা ধর্মপালনের অনুকূল নীতি। (জেনে রাখ) নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজের খবর রাখেন।" (সূরা আল মায়েদা–৮)। এমনকি বিচার্য বিষয় সম্পর্কে বিচারকের নিজস্ব প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকলেও তারই ভিত্তিতে কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ ব্যতিরেকেই রায় দান করার কোনো অধিকারও তার নেই। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুক (রা;) হযরত আলী (রা:) কে জিজ্ঞেস করেছিলেন : مَاقُوْلُكُمْ لَوْ اَنَّ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ شَاهَدَ اِمْرَاةً عَلَى مَعْصِيَةٍ؟ "(বিচারক, খলীফা) আমীরুল মু'মিনিন নিজেই যদি কোনো নারীকে পাপ কাজে লিপ্ত দেখতে পায়, তবে এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই কি সে তাকে অভিযুক্ত ও দণ্ড দান করতে পারে?" তখন হযরত আলী (রা:) বলেন : يَأْتِيْ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ اَوْ يَحُدُّ الْقَذَفِ شَانُهُ فِيْ ذلِكَ شَانُ سَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ- "খলীফা বা বিচারককেও চারজন সাক্ষী পেশ করতে হবে। অন্যথায় তাকেও জেনার মিথ্যা অভিযোগ তোলার দায়ে শাস্তি ভোগ করতে হবে। এই ব্যাপারেও তার অবস্থা সাধারণ মুসলমানদেরই সমান।"

সাহাবীদের নিকট কুরআন-হাদীস ভিত্তিক রায় বা পরামর্শ জিজ্ঞেস করতেন। খলীফাগণ সরকারের কার্যনির্বাহ এবং আইন প্রণয়নের ব্যাপারে জাতির বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তের অধিকারী ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ না করে কাজ করতেন না। সুনানে দারেমীতে হযরত মায়মুন ইবনে মাহরানের একটি বর্ণনা আছে যে, হযরত আবু বকর (রা:)-এর নীতি ছিল, তাঁর সামনে কোনো বিষয় উত্থাপিত হলে তিনি প্রথমে দেখতেন এ ব্যাপারে আল্লাহর কিতাব কি বলে। সেখানে কোন নির্দেশ না পেলে এ ধরণের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা:) কি ফায়সালা দিয়েছেন, তা জানতে চেষ্টা করতেন। রাসূলের সুন্নাতেও কোনো নির্দেশ না পেল জাতীয় শীর্ষস্থানীয় জ্ঞানী এবং সৎ ব্যক্তিদের সমবেত করে পরামর্শ করতেন।[21] হযরত উমর (রা:)-এর কর্মনীতিও ছিল অনুরূপ।[৫০](পৃ:-৯২)

পরামর্শের ব্যাপারে খুলাফায়ে রাশেদীনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, শুরার সদস্যদের সম্পূর্ণ স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার অধিকার প্রদান। এ ব্যাপারে হযরত উমর (রা:) এক পরামর্শ সভার উদ্বোধনী ভাষণে খিলাফাতের পলিসি ব্যক্ত করেছেন এরূপে : 'আমি আপনাদেরকে যে জন্য কষ্ট দিয়েছি, তা এছাড়া আর কিছুই নয় যে, আপনাদের কার্যাদির আমানতের যে ভার আমার উপর ন্যস্ত হয়েছে তা বহন করার কাজে আপনারাও আমার সাথে শরীক হবেন। আমি আপনাদের অন্তর্ভুক্ত এক ব্যক্তি। আজ আপনারাই সত্যের স্বীকৃতি দানকারী। আপনাদের মধ্য থেকে যাদের ইচ্ছা আমার সাথে দ্বিমত পোষণ করতে পারেন; আবার যাদের ইচ্ছা আমার সাথে একমতও হতে পারেন। আপনাদের যে আমার মতামতকে সমর্থন করতেহবে- এমন কোনো কথা নেই এবং আমি তা চাইও না।'[৫০](পৃ:-৯২)

আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে খলীফার কোনো মৌলিক কর্তৃত্ব ছিল না। তাঁদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত বিধান এবং সুন্নাহ অনুসরণ করতে হত ইসলামের নীতি অনুযায়ী। সুতরাং ইসলামী বিধানকে আধুনিক আইন প্রণয়ন সম্পর্কিত সমস্যার মুকাবেলা করতে হতো না। কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা এবং কিয়াসকে ভিত্তি করে ব্যাখ্যা দেয়া, লিপিবদ্ধ করা এবং ধারাগুলোকে সাজানোই ছিল এ বিচার-বিধানের কাজ। এভাবে দেখা যায়, খিলাফতে আইন প্রণয়নের চূড়ান্ত অধিকার ছিল না; এতে কেবলমাত্র উপব্যবস্থাপনার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে, যা ব্যবহার করেছেন পণ্ডিতগণ। তাদেরই সাধনার ফলে ইসলামী আইন হয়েছিল বিধিবদ্ধ। ইসলামী শরীয়তের বিধান লঙ্ঘন না করে সুশাসনের জন্যে আদেশ জারী করা খলীফার ইখতিয়ারভুক্ত ছিল।[22]

---

21 প্রচলিত সংজ্ঞা অনুযায়ী আইন বিভাগ হচ্ছে সরকারের সেই বিভাগ যা জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্রীয় আইন কানুন বিধি বিধান প্রণয়ন করে থাকে। এটি সরকারের নীতি প্রণয়নও করে। ইসলামী রাষ্ট্রেও এমন একটি সংস্থা থাকে যারা জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে সরকারি নীতি নির্ধারণে সরকারের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বিধানে সক্রিয় থাকে। এটিই সাহাবীগণের যুগে 'আহলে আল আকদ' নামে পরিচিত ছিলো, যা পরবর্তী যুগে মজলিসে শুরা নামে পরিচিতি লাভ করে। মজলিসে শুরা বর্তমান যুগের আইন পরিষদ বা পার্লামেন্টের মতো কমবেশি ভূমিকা পালন করে থাকে। ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারকে পরামর্শ দান, নীতিনির্ধারণ ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন এবং সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে একটি মজলিসে শুরা (পরামর্শ পরিষদ) বা পার্লামেন্ট (আইন পরিষদ) থাকা আবশ্যক। মজলিসে শুরাকে যেহেতু কুরআন-সুন্নাহর আইন বের করতে হবে ও তার ভিত্তিতে গোটা দেশ, রাষ্ট্র ও সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে হবে, তাই কুরআন-সুন্নাহতে বিশেষ পারদর্শিতা সম্পন্ন লোক তাতে অবশ্যই থাকতে হবে। সুনানে আবু দাউদ এ এই হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে। রাসূলে করীম (সা:) বলেছেন : اَجْمِعُوْا الْعَالِمِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاجْعَلُوْهُ شُوْرَى وَلَا تُقْضُوْا فِيْهِ بِرَائِ وَاحِدٍ -"তোমরা কুরআন সুন্নাহতে পারদর্শী মু'মিন লোকদের একত্রিত কর। অতঃপর তাদের সমন্বয়ে শুরা গঠন কর। তবে তাদের কোনো একজনের মতের ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্ত করে ফেলবে না।"[(সুনানে দারেমী, বাবুল ফুতইয়া ওয়ামা ফিহে মিনাশ শিদ্দাতে।) মুহাম্মদ আমিনুর রহমান, বিশ্বায়ন তাগুত খিলাফাহ্, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা–৯২।]

22 খিলাফত রাষ্ট্র তথা ইসলামী রাষ্ট্রে মৌলিকভাবে কোনো আইন প্রণয়নের কাজ নেই। আছে রাসূলে করীম (সা:)-এর সুন্নাতের আলোকে আল্লাহর আইন সমূহকে সন্ধান করা, ধারাবদ্ধ করা, (Codify বা Codification) এবং আইন কার্যকরণের পদ্ধতি ও প্রেক্ষিত রচনা করা। ইসলামে আইনদাতা (Law-giver) হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। সে আইন তাঁরই মনোনীত প্রতিনিধি রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর প্রতি ওহীর মাধ্যমে নাযিল হয়েছে। তিনি নিজেই সে আইন পালন করেছেন, জনগণকে শুনিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন ও প্রচার করেছেন, প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, আল্লাহর নির্দেশ অনুমতি ও শিক্ষানুযায়ী উপবিধি (By laws) তৈরি করেছেন এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে তা কার্যকর করেছেন, জনগণের উপর জারি করেছেন। কাজেই ইসলামে আইন প্রণয়নের (Legislation) কোনো ধারণা নেই এবং এ ব্যাপারে কারো কোনো ইখতিয়ারও নেই। রাসূলে কারীম (সা:)-এর যুগে বা তারপর খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগেও তা ছিল না। আজকের দিনেও তার কোনো অবকাশ নেই। যার প্রয়োজন আছে, তা হচ্ছে আল্লাহর দেয়া আইন-আদেশকে রাসূলে করীম (সা:) প্রদত্ত ব্যাখ্যা এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে তার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সূক্ষ্ম অধ্যয়ন, অনুধাবন, অনুসরণ ও কার্যকরণ- সমসাময়িক সমাজ পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আল্লাহর দেয়া আইন পর্যায়ে মানুষের যতটুকু এবং যা কিছু করণীয়, তা করবার জন্যে একটি সংস্থা অবশ্যই গঠিত হবে। ইসলামী পরিভাষায় কাজের প্রকৃতির দৃষ্টিতে তার নাম 'মজলিসে শুরা।' আর এটিই শক্তভাবে কার্যকর ছিল খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলে। হযরত উমর ফারুক (রা:)-

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. নির্বাহী বিভাগ (Executive) :

ইসলামী খিলাফত শাসন ব্যবস্থা যদিও হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা:)-এর সময় থেকে সূচীত হয় এবং তাঁর সংক্ষিপ্ত শাসনকালে এর ভিত্তি রচনা করা হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুক (রা:)-এর সময়েই সূচিত হয় একটি সুষ্ঠু ও সুসংবদ্ধ রাষ্ট্রব্যবস্থা। এই সময়েই খিলাফতের বিকশিত রূপ বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করে। তাঁর আমলেই কায়সার ও কিসরার বিরাট রাষ্ট্রদ্বয়ই যে, মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হয়েছিল তাই নয়, পাক-ভারত উপমহাদেশের সীমান্ত হতে মিশর ও সিরিয়া পর্যন্ত' সমগ্র এলাকার উপর ইসলামের বিজয় নিশান উড্ডীন হয়েছিল। এ বিশাল সাম্রাজ্যে ইসলামী খিলাফত রাষ্ট্র ও সরকার নিজ মর্যাদা ও দায়িত্বের সাথে পূর্ণমাত্রায় কার্য সম্পাদনের সুযোগ লাভ করে। বস্তুত: একটি আধুনিক উন্নত রাষ্ট্রের যতগুলো দিক ও বিভাগ থাকতে পারে, ফারুকী খিলাফতে তার প্রায় সব কয়টিই যথার্থরূপে বর্তমান ছিল।

হযরত উমর (রা:) গোটা ইসলামী রাজ্যকে মোট আটটি প্রদেশে বিভক্ত করেছিলেন। মক্কা, মদীনা, সিরিয়া, জাযিরা, বসরা, কুফা, মিসর ও ফিলিস্তিন। এই কয়টি এলাকা তখন স্বতন্ত্র ও ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হিসেবে গণ্য হত। এতদ্ব্যতীত খোরাসান, আযাররাইজান ও পারস্য এই তিনটি প্রদেশও তাঁর খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। প্রতিটি প্রদেশের জন্যে আলাদাভাবে গভর্ণর, বেসামরিক ও সামরিক বিভাগের চীফ সেক্রেটারী, প্রধান কালেক্টর, পুলিশ বিভাগের ডিরেক্টর, প্রধান খাজাঞ্চী, প্রধান বিচারপতি প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্মচারি নিযুক্ত করা হয়েছিল।

সাধারণত: মজলিসে শুরার পরামর্শক্রমেই এসব দায়িত্বপূর্ণ পদে লোক নিযুক্ত করা হতো। খলীফার প্রধান কাজ ছিল প্রদেশসমূহের শাসনকতাদের প্রতি তীক্ষ্ম ও সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং তাদের স্বভাব-চরিত্র ও আদত-অভ্যাসকে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে তোলা। শাসনকর্তা ও দায়িত্বপূর্ণ পদে লোক নিয়োগের সময় তাদের নিকট থেকে তিনি এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করতেন যে, তারা কঠোরভাবে ইসলামী আদর্শ মেনে চলবেন এবং বিলাসিতা কিংবা জাহেলী সভ্যতার কোনো প্রভাবই কবুল করবেন না। সেই সাথে তাদের যাবতীয় ধন-সম্পদের একটি পূর্ণ তালিকাও তৈরি করতেন; পরবর্তীতে কারো ধন-সম্পদে অস্বাভাবিক স্ফীতি পরিলক্ষিত হলে পূর্বে রচিত তালিকার সাথে তুলনা ও যাচাই করে দেখতেন। কারো সম্পত্তি অকারণে স্ফীত হতে দেখলে তার অর্ধেক পরিমাণ বায়তুলমালে ক্রোক করে নিতেন।

শাসক ও পদস্থ অফিসারগণ যেন কোথাও সীমালঙ্ঘন করতে না পারে, সেদিকে খলীফা উমর (রা:) এর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এজন্যে তিনি প্রত্যেক হজ্জের সময় সাধারণভাবে ঘোষণা করতেন, কোনো সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কারো কোনো অভিযোগ থাকলে তা অনতিবিলম্বে খলীফার গোচরীভূত করতে। সেই সাথে তিনি সকল অভিযাগের যথোচিত প্রতিকারেরও সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

শাসকদের দ্বার জনগণের জন্য সর্বদা উন্মুক্ত রাখার জন্যে খলীফাতুল মুসলিমীন বিশেষ তাকীদ করতেন। জনগণের ফরিয়াদ শাসকদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করার পথে কোথাও বিন্দুমাত্র বাঁধার সৃষ্টি হতে দেখলে তিনি অবিলম্বে তা দূরীভূত করে দিতেন। তিনি দায়িত্বশীল সরকারি কর্মচারিদেরকে দৈনন্দিন কর্তব্য পালনে, সদা তৎপর থাকার জন্যে সব সময় তাকীদ করতেন। এই পর্যায়ে হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা:) কে যে উপদেশ

এর খিলাফত ছিল পূর্ণ মাত্রায় একটি গণ অধিকারভিত্তিক রাষ্ট্র। তাঁর আমলে দেশের যাবতীয় সমস্যা মজলিসে শুরার সম্মুখে পেশ করা হতো। কুরআন-সুন্নাহ ও প্রথম খলীফার অবলম্বিত রীতিনীতিকে সম্মুখে রেখে প্রতিটি বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা করা হত। এই মজলিসে শুরা ছাড়াও একটি সাধারণ মজলিসও তাকে পরামর্শ দান ও রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মীমাংসার জন্যে বর্তমান ছিল। মুহাজির ও আনসারদের সকল সাহাবী ছাড়াও গোত্রীয় প্রধানগণও এতে যোগদান করতেন। বিশেষ গুরুত্ববহ ও সংকটকালীন সময়ে এ সাধারণ মজলিসের অধিবেশন আহ্বান করা হতো। এ মজলিসদ্বয় ব্যতীত আরো একটি মজলিস তখন কার্যকর ছিল। যাকে 'মজলিসে খাস' বলা হয়। এতে কেবলমাত্র মুহাজীর সাহাবীগণই যোগদান করতেন।

লিখে পাঠিয়েছিলেন, তা সর্বকালের সর্বদেশের সরকারি কর্মচারিদের জন্যে মহামূল্যবান দিক-নির্দেশনারূপে গণ্য। তিনি লিখেছিলেন :

اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ الْقُوَّةَ فِىْ الْعَمَلِ اَنْ لاَّ تُوَخِّرُوْا عَمَلَ الْيَوْمِ لِغَدٍ فَاِنَّكُمْ اِذَا فَعَلْتُمْ ذٰلِكَ تَدَارَكْتُ عَلَيْكُمْ اَعْمَالَكُمْ فَلَمْ تَدْرُوْا اَيُّهَا تَاخُذُوْنَ فَاضَعْتُمْ-

'অত:পর জেনে রাখবে, সুষ্ঠু কর্মপন্থা এই যে, আজকের কাজ আগামীকালের জন্যে ফেলে রাখবে না। এরূপ করলে তোমাদের নিকট অনেক কাজ জমে যাবে। ফলে কাজের চাপে তুমি দিশেহারা হয়ে পড়বে। কি করবে, কোনটা করবে, কোনটা করবে না, তার দিশা পাবে না। পরিণামে সব কাজই তোমার বিনষ্ট করে ফেলবে।'[৪৪] (পৃ:-১৩৩)

খুলাফায়ে রাশেদীনের সকল খলীফাই প্রশাসনের দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্তির পূর্বক্ষণে সংশ্লিষ্ট কর্তা ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিয়ে সর্বক্ষেত্রে তাকওয়া, ন্যায়নীতি ও সুবিচার অবলম্বনের উপদেশ দান করতেন। এখানে আমর বিন আস ও অলীদ বিন আকাবা (রা:) কে যাকাত আদায়কারী নিয়োগকালীন হযরত আবু বকর (রা:) কর্তৃক উপদেশের অংশ বিশেষ উল্লেখ করছি। তিনি বলেন : 'প্রকাশ্যে ও একাকীত্বে আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহকে যে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে এমন একটি পথ ও রিযিক লাভের এমন উপায় সৃষ্টি করে দেন, যা কারো ধারণায়ও আসতে পারে না। আল্লাহকে যে ভয় করে, আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দেন এবং তার নেক কাজের ফল দ্বিগুণ ও ততোধিক পরিমান দান করেন। জনগণের কল্যাণ কামনা ও খেদমত নি:সন্দেহে উত্তম তাকওয়ার কাজ। এমন গুরুত্বপূর্ণ পথে তোমরা অগ্রসর হচ্ছ, যেখানে দ্বীনের প্রতিষ্ঠা ও খিলাফতের দৃঢ়তা সাধনের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র গাফলতি বা আতিশয্য ও অবহেলার কোনোই অবকাশ নেই। কাজেই অবসাদ ও উপেক্ষার কদর্য অভ্যাস পরিত্যাগ কর।" [৪৪] (পৃ:-১০২)

হযরত আলী (রা:) খলীফাতুল মুসলিমীন' হিসেবে জনৈক প্রশাসককে লিখেছিলেন :

مِنَ الْحَقِّ عَلَيْكَ حِفْظُ نَفْسِكَ وَالاِحْتِسَابُ عَلَى الرَّعِيَةِ بِجُهدِكَ فَاِنَّ الَّذِىْ يَصِلُ اِلَيْكَ مِنْ ذلِكَ (اَيْ مِنْ جَانِبِ اللهِ) اَفْضَلُ مِنَ الَّذِىْ يَصِلُ بِكَ (اَىْ مِنْ جَانِبِ النَّاسِ)

"তোমার অন্যতম কর্তব্য ও দায়িত্ব হচ্ছে নিজেকে রক্ষা করা এবং জনগণের অবস্থার উপর সজাগ সতর্ক দৃষ্টি রাখা। এজন্যে তোমাকে প্রাণপণ চেষ্টা চালাতে হবে। জেনে রাখবে, একাজের ফলে তুমি আল্লাহর নিকট থেকে যে সাওয়াব পাবে, তা থেকে অনেক উত্তম, যা তুমি জনগণের নিকট থেকে পাবে।' '[৪৫] (পৃ:-১৮৯)

হযরত উসমান (রা:) দেশের প্রশাসনযন্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও দোষত্রুটি সংশোধনের উদ্দেশ্যে একটি কেন্দ্রীয় 'অনুসন্ধান কমিটি' গঠন করেছিলেন এবং রাজধানীর বাইরে সর্বত্র একে পাঠাতেন। কমিটি সারা অঞ্চল ঘুরে ঘুরে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের কাজকর্ম ও জনগণের অবস্থা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করতো। এছাড়া দেশের সাধারণ জনগণের অবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অবহিতি লাভের জন্যে হযরত উসমান (রা:) জুম'আর দিন মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা শুরু করার পূর্বেই উপস্থিত জনতার নিকট দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পরিস্থিতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। উপরন্তু দেশবাসীর নিকট সাধারণভাবে ঘোষণা করে দেয়া হয়ছিল যে, কোনো প্রমাসকের বিরুদ্ধে কারো কোনোরূপ অভিযোগ থাকলে হজ্জের সময় তা যেন খলীফার সমীপে পেশ করা হয়। কেননা এই সময়ে ইসলামী খিলাফতের সমস্ত দায়িত্বশীল কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক মক্কা শরীফে উপস্থিত থাকতে হতো।

দেশের অভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো, দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের কার্যাবলী ও আচার-ব্যবহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে একবার হযরত কা'আব ইবনে মালিক (রা:) কে নিযুক্ত করে হযরত আলী (রা:) নিম্নোক্ত ভাষায় তাঁকে নির্দেশ দিলেন :

اُخْرُجْ فِيْ طَائِفَةٍ مِّنْ اَصْحَابِكَ حَتَّى تَمُرَّ بِاَرْضِ السَّوَادِ كَرَرَةً فَتَسَأَلَهُمْ عَنْ عَمَّالِهِمْ وَتَنْظُرَ فِيْ سِيْرَتِهِمْ-

'তুমি তোমার সঙ্গীদের একটি দল নিয়ে বের হয়ে যাও এবং ইরাকের প্রতিটি জেলায় ঘুরে ফিরে কর্মচারীদের কাজকর্ম এবং তাদের স্বভাব-চরিত্র ও আচার ব্যবহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ কর।' [৪৪] (পৃ:-১৬৬)

তিনি মিসরের শাসনকর্তা মালিক আশতার নখয়ীকে বলেছিলেন :

اِنَّ شَرَّ وُزَرَائِكَ مَنْ كَانَ لِلْاَشْرَارِ قَبْلَكَ وَزِيْرًا وَمَنْ شَرَكَهُمْ فِي الْاٰثَامِ فَلَا يَكُوْنَنَّ لَكَ بِطَانَةً فَاِنَّهُمْ اَعْوَانُ الْاَئِمَةِ وَاِخْوَانُ الظَّلَمَةِ-

'তোমার পরামর্শদাতা ও কর্মকর্তাদের মধ্যে খারাপ হচ্ছে তারা যারা তোমার পূর্বে খারাপ লোকদের পরামর্শদাতা ও সহকারী ছিল এবং অন্যায় ও পাপের কাজে তাদের সাথে শরীক হয়েছিল। অতএব তাদের সাথে তোমার কোনো বন্ধুত্বের সম্পর্ক কখনই হতে পারে না। কেননা তারা হচ্ছে অপরাধীদের সাহায্যকারী এবং জালিমদের ভাই।' [৪৫] (পৃ:-১৯৫)

হযরত উসমান (রা:) প্রকৃতিগতভাবে একটু নম্র স্বভাবের ছিলেন; কিন্তু তিনি রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় ব্যাপারে কঠোরভাবে হিসাব-নিকাশ নিতে ও বুঝা-পড়া করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস একবার বায়তুলমাল হতে মোটা অংকের অর্থ ধার নিয়েছিলেন, যা তিনি পরিশোধ করতে পারেন নাই। হযরত উসমান (রা:) কঠোরভাবে তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং পদচ্যুত করে দেন। ওয়ালিদ বিন উতবা মদ্যপান করলে তাকে পদচ্যুত করেন এবং প্রকাশ্যে শাস্তি দেন।

খোলাফায়ে রাশেদীন সরকারী কর্মচারিবৃন্দের প্রতি এমন কড়া নজর রাখতেন যে, কোনো কর্মচারী ঘুখ নেয়া, মজুতদারী, অন্যায় ও জোর জুলুম করবার সাহস পেত না। নিজেদের প্রতি তারা আরও বেশি সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। হযরত আবু বকর (রা:)-এর আমলে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে অরাজকতা এবং বিশৃঙ্খলার মানসিকতা ছিল না। হযরত উমর (রা:)-এর আমলে তা করার কারও সাহস ছিল না। খলীফার চাবুকের ভয়ে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি সম্পর্কেও সকল সাহাবী সন্ত্রস্ত থাকতেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) রাসূল (সা:)-এর অতি প্রিয় সাহাবী ছিলেন। তিনি সদা-সর্বদা রাসূল (সা:)-এর কাছেই পড়ে থাকতেন এবং ছায়ার মত অনুসরণ করতেন। সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হাদীস তিনিই বর্ণনা করেছেন। খলীফা উমর (রা:) তাঁকে ইয়েমেনের গভর্নর নিয়োগ করে পাঠান। ইয়েমেন থেকে প্রত্যাবর্তনের পর খলীফা দেখেন যে হযরত আবু হুরায়রা (রা:) এর উটের পিঠে বেশ কিছু মালসামান এবং তাঁর পায়ে জুতা। কোনোরূপ জিজ্ঞাসা ছাড়াই তিনি এমন সম্মানিত সাহাবীকে চাবুকাঘাত করতে শুরু করলেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বুঝতেও পারেননি কেন তাঁর উপর এমন শাস্তি নেমে আসছে।

খলীফার ব্যবহারে প্রতিবাদ জানালে খলীফা প্রশ্ন করলেন, তাঁর উটের পিঠে এতো মাল সামান কোথা হতে এলো। হযরত আবু হুরায়রা (রা:) জানালেন যে, লোকজন তাঁকে ইয়েমেন ত্যাগকালে হাদিয়াস্বরূপ দিয়েছেন। খলীফা বললেন, হাদিয়া নয়, এ হলো ঘুষ। কারণ যখন তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা:) কে ইয়েমেনের গভর্ণর করে পাঠান, তখন তাঁর পায়ে জুতা ছিল না। আজ তিনি জুতো পরিহিত। যদি লোকজন তাঁকে সত্যিকার হাদিয়া হিসেবেই দিত তবে কেন গভর্ণর হওয়ার পূর্বে তাঁকে হাদিয়া দেয়নি যাতে তিনি জুতা পরতে

পারতেন। খলীফা বুঝালেন তাঁকে যা হাদিয়া বলে দেয়া হয়েছে, তা তাঁর সরকারি ক্ষমতার জন্যই। হযরত আবু হুরায়রা (রা:) সূক্ষ্ম ব্যাপারটি না বুঝার অক্ষমতাকৃত অপরাধের জন্যে অনুতপ্ত হলেন এবং খলীফাকে বললেন আপনি আমাকে আরো চাবুক মারুন। আমার দেহ রক্তাক্ত করে দিন, যাতে আমার পাপের বোঝা কিছুটা লাঘব হয়। '[১৮] (পৃ:-৪৯,৫০)

বস্তুত প্রশাসনিক বিভাগই রাষ্ট্রের প্রকৃত আদর্শ, রীতি-নীতি ও সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকর করার প্রধান হাতিয়ার। শুধু তাই নয়, এ বিভাগের পূর্ণ দক্ষতা ও কার্যকরতার উপর নির্ভর করে রাষ্ট্রের সাফল্য ও স্থিতি। তাই যোগ্য ও সঠিক লোককে সংশ্লিষ্ট পদে নিয়োগ দিতে হবে। এ ব্যাপারে সর্বপ্রকার স্বজনপ্রীতির উর্ধ্বে উঠে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে যোগ্যতার ভিত্তিতে তাদের নিয়োগ দিতে হবে।[23] এ নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন খুলাফায়ে রাশেদীন। হযরত আবু বকর (রা:) তাঁর খিলাফতকালে আপন গোত্রের কোনো লোককে সরকারি কোনো পদে নিয়োগ করেন নি। বরং তিনি ছিলেন স্বজনপ্রীতির উর্ধ্বে। ইয়াযীদ ইবনে আবু সুফিয়ানকে দামেশকের গভর্ণর নিয়োগ করার সময় তিনি তাকে নিম্নোক্ত উপদেশ দিয়েছিলেন– "হে ইয়াযীদ, সেখানে তোমার আত্মীয় স্বজন ও ঘনিষ্ঠ লোকজন রয়েছে। আমার একটি বড় রকমের ভয় হচ্ছে এই যে, তুমি বিভিন্ন পদে নিয়োগের ব্যাপারে তাদেরকে অগ্রাধিকার দাও কিনা। রাসূল (সা:) বলেছেন যে, যদি কোনো ক্ষমতাসীন ব্যক্তি শুধু তাঁর আত্মীয় হওয়ার কারণে কাউকে কোনো পদে নিয়োগ করে তাহলে সে আল্লাহর অভিশম্পাত লাভ করে।" '[৫৫] (পৃ:-২১৯)

এমনকি যদি কোনো ব্যক্তির কোনো উচ্চ পদে নিযুক্ত হওয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকত, তাহলে খলীফার সাথে তার ব্যক্তিগত মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও তাকে সেই পদে নিয়োগের ব্যাপারে অযোগ্য গণ্য করা হতো না, যেমন ঘটেছিল খালিদ ইবন সাঈদের সাথে। তিনি আবু বকর (রা:) এর খলীফা নিযুক্ত হওয়ার ব্যাপারে বিরোধিতা করেছিলেন। তথাপি তাকে সিরিয়ার একটি অভিযানের পরিচালক নিযুক্ত করা হয়েছিল।

হযরত উমর (রা:) তাঁর গোটা শাসনকালে তাঁর গোত্রের একজনমাত্র ব্যক্তিকে (যার নাম ছিল নোমান ইবনে আদী) বসরার নিকটে মাদয়ান নামক এক ক্ষুদ্র এলাকার তহশিলদার নিযুক্ত করেছিলেন। অল্প কিছুদিন পরই আবার ঐ পদ থেকে তাকে বরখাস্ত করেছিলেন।[24] এদিক থেকে এ দু'জন খলিফার কর্মধারা সত্যিকার আদর্শভিত্তিক ছিল।

হযরত উমর (রা:) জীবনের শেষ অধ্যায়ে আশঙ্কাবোধ করলেন, তাঁর পরে আরবের গোত্রবাদ পুনরায় যেন মাথাচাড়া দিয়ে না ওঠে এবং তার ফলে ইসলামের মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি না হয়ে যায়। তাই তিনি হযরত আলী

---

23 হযরত উমর (রা:) বলেন -مَنْ وُلِّىَ مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا فَوَلَّى رَجُلاً لِمُوَدَّةٍ اَوْ قَرَابَةٍ بَيْنَهَا فَقَدْ خَانَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَالْمُسْلِمِيْنَ "যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোনো ব্যাপারে (নির্বাহীর) দায়িত্ব পেয়ে যোগ্যতর লোককে বাদ দিয়ে) এমন ব্যক্তিকে কর্মকর্তা নিযুক্ত করে, যার সাথে তার স্নেহের সম্পর্ক আছে কিংবা সে তার স্বজন, তবে সে আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল এবং মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল।" (ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) অনুবাদ : জুলফিকার আহমদ কিসমতী, শরীয়তী রাষ্ট্রব্যবস্থা আহসান পাবলিকেশন, প্রকাশকাল জানুয়ারী ২০০৮, পৃষ্ঠা ২৬।

24 হযরত নুমান ইবনে আদী (রা:) ছিলেন প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের অন্যতম। হযরত উমর (রা:)-এরও আগে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। আবিসিনিয়ায় হিজরতকালে যারা মক্কা ত্যাগ করেন, তাঁদের মধ্যে তিনি এবং তাঁর পিতা আদীও ছিলেন। হযরত উমর (রা:) যখন তাঁকে মাইসান-এর তহসিলদার নিযুক্ত করেন, তখন তাঁর স্ত্রী তাঁর সাথে যাননি। তিনি সেখানে স্ত্রীর বিরহে কিছু কবিতা রচনা করেন। এ সকল কবিতায় কেবল মদের বিষয় উল্লেখ ছিল। এতে হযরত উমর (রা:) তাঁকে পদচ্যুত করেন। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে তাকে কোনো পদে নিয়োগ না দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তিনি। (ইবনে আব্দুল বার, আল ইস্তিআব, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা–২৯৬। দায়েরাতুল মাআরেফ, হয়দারাবাদ। মু'জামুল বুলদান, ইয়াকুত হামাবী, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৪২-২৪৩। দারে ছাদের, বৈরুত ১৯৫৭। মুহাম্মদ আমিনুর রহমান, বিশ্বায়ন তাগুত খিলাফাত প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ১০২-১০৩।) অপর এক ব্যক্তি হযরত কোদামা ইবনে মাযউন, যিনি হযরত উমর (রা:)-এর ভগ্নিপতি ছিলেন। তিনি তাঁকে বাহরাইন এর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তিনি ছিলেন আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অন্যতম। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে মদ্যপানের অভিযোগ প্রমাণিত হলে তিনি তাঁকে বরখাস্ত করে দণ্ড দান করেন। (আল–ইস্তীআব, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৩৪, ইবনে হাজার, আল ইসাবা, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ২১৯-২২০। মুহাম্মদ আমিনুর রহমান, প্রাগুক্ত।

(রা:) হযরত উসমান (রা:) এবং হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা:)-এর প্রত্যেককে ডেকে বলেন : আমার পর তোমারা খলীফা হলে স্ব-স্ব গোত্রের লোকদেরকে জনগণের উপর চাপিয়ে দেবে না। '[৫০] (পৃ:-১০৪)

উপরন্তু ছয় সদস্যের নির্বাচনী শুরার জন্যে তিনি যে হেদায়াত দিয়ে যান, তাতে অন্যান্য বিষয়ের সাথে নিম্নোক্ত বিষয়টিও ছিল : নির্বাচিত খলীফাগণ একথা মেনে চলবেন যে, তাঁরা আপন গোত্রের সাথে কোনো ব্যতিক্রমধর্মী আচরণ করবেন না।[৫০] (পৃ:-১০৪) কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত: তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা:) এ ক্ষেত্রে ইপ্সিত মানদণ্ড বজায় রাখতে সক্ষম হননি। তাঁর শাসনামলে বনী উমাইয়াকে ব্যাপকভাবে বড় বড় পদ এবং বায়তুলমাল থেকে দান-দক্ষিণা দেয়া হয়। অন্যান্য গোত্র তিক্ততার সাথে তা অনুধাবন করতে থাকে।[১৩](পৃ:-১০৪) তাঁর কাছে এটা ছিল আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদাচারের দাবী। তিনি বলতেন : 'উমর (রা:) আল্লাহর জন্যে তার নিকটাত্মীয়দের বঞ্চিত করতেন, আর আমি আল্লাহর জন্যে আমার নিকটাত্মীয়দের দান করছি।'[১৩](পৃ:-১০৪) একবার তিনি বললেন : বায়তুলমালের ব্যাপারে আবু বকর (রা:) ও উমর (রা:) নিজেরাও অসচ্ছল অবস্থায় থাকা পছন্দ করতেন এবং নিজের আত্মীয় স্বজনকেও সেভাবে রাখতে ভালবাসতেন। কিন্তু আমি এ ব্যাপারে আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদাচার পছন্দ করি।[১৩](পৃ:-১০৪) যদিও পরবর্তীতে এ বিষয়কে কেন্দ্র করে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-বিক্ষোভ দেখা দেয়, ফলশ্রুতিতে কেবল তিনিই যে, শাহাদাত বরণ করেন তাই নয়; বরং গোত্রবাদের চাপা দেয়া স্ফুলিঙ্গ পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠে এবং অবশেষে এর অগ্নিশিখা খেলাফতে রাশেদার ব্যবস্থাকেই জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়

ঙ. প্রতিরক্ষা বিভাগ :

আধুনিক শাসনতান্ত্রিক পরিভাষায় বলতে গেলে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম সমাজের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সীমারেখাগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। খলীফা ছিলেন ইসলামী সমাজের প্রধান শাসক; তাঁর উপর ইসলামী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নিরাপত্তা, প্রশাসন, ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দায়িত্ব ন্যাস্ত ছিল।[১৮](পৃ:-২৬) প্রতিরক্ষা প্রশ্নে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক হুমকির মুকাবেলার জন্যে দু'টি প্রতিষ্ঠান-সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় : ১. আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে পুলিশ বাহিনী (Shurth) [১৮](পৃ:-২৬) এবং ২. পেশাদার সেনাবাহিনী, যার প্রধান সেনাপতি (Rais-al-jaysh) ছিলেন স্বয়ং খলীফা। প্রয়োগের সুবিধার্থে খলীফার নিজের কর্তৃত্ব অন্য কর্মচারির হাতে অর্পণ করতে পারতেন।[১৮](পৃ:-২৬) সেনাবাহিনী নিয়োজিত থাকতো বাহিরাক্রমণ হতে সীমান্ত রক্ষায়, ধর্মদ্রোহ, বিদ্রোহ এবং তস্কর দমনে।[১৮](পৃ:-২৬)

খিলাফত আমলে যুদ্ধ বা সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করার মূল ক্ষমতা খলীফার হাতেই নিবদ্ধ থাকত। কেননা নবী করীম (সা:)-এর জামানায়ও এ নীতিই কার্যকর ছিল। তিনি নিজেই সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব দিতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে শাসন পরিধি যখন বিশালতর হতে লাগল, তখন খলীফাগণ সর্বশ্রেষ্ঠ বীর ও যোদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও পৃথকভাবে সেনাধ্যক্ষের নিযুক্তি শুরু হল। তাকে মেনে চলা স্বয়ং খলীফাকে মেনে চলার মতই অবশ্য কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যুদ্ধের অবসান হলে সামরিক ব্যাপারসমূহ পর্যবেক্ষণ ও ভবিষ্যতের জন্যে তাদেরকে ট্রেনিং দেয়াই ছিল সেনাধ্যক্ষের একমাত্র কাজ।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা:)-এর খিলাফত আমলে সমগ্র সৈন্যবাহিনী অবৈতনিক ও স্বেচ্ছামূলক ছিল। কোনো রেজিষ্ট্রী বইতে তাদের নাম লিপিবদ্ধ ছিল না। হযরত উমর ফারুক (রা:)-এর খিলাফত কালেই সৈন্য বিভাগ সুষ্ঠু ও সুসংবদ্ধভাবে গঠিত হয় ও প্রতিটি সৈনিকের নাম রেজিষ্ট্রীভুক্ত হয়। ফলে সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়। কোনো সৈনিক পালায়ন করলে কিংবা পশ্চাতে থেকে গেলে অতি সহজেই তা ধরা পড়ত। পালাতক সৈনিকদের জন্য তখন একটি বিশেষ ধরনের শাস্তি নির্দিষ্ট ছিল। পালাতকের নিজ মহল্লার মসজিদে তার নাম প্রকাশ ও প্রচার করে ঘোষণা করা হতো যে, এই ব্যক্তি জিহাদের ময়দান হতে পালিয়ে আসছে;

আল্লাহর পথে আত্মদান করার ব্যাপারে সে কুণ্ঠা প্রদর্শন করেছে। বস্তুত: এতটুকু ভৎসনা আরবদের জন্যে মৃত্যুদণ্ড অপেক্ষাও সাংঘাতিক ছিল। কেননা সমগ্র বিশ্ব-জাতির মাঝে আরবদের যে অতুলনীয় বীরত্ব ও বিস্ময়কর সাহসিকতার অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছিল, তাতে কোনো ব্যক্তিকে অপৌরুষ ও ভীরুতার দায়ে অভিযুক্ত করা এবং প্রকাশ্যভাবে উলক্তরূপ ঘোষণা দেয়া মৃত্যু অপেক্ষাও অনেক কঠিন ব্যাপার ছিল।

হযরত উমর (রা:) সমস্ত সৈনিকদের জন্যে বায়তুলমাল হতে বেতন নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন।[25] ইসলামী আদর্শ অনুসরণের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্যই ছিল মুজাহিদদের বেতন নির্ধারণের একমাত্র মাপকাঠি। অবশ্য শেষ পর্যায়ে হযরত আলী (রা:) এই পার্থক্যও খতম করে দিয়ে সকলের জন্য সমান মানের বেতন চালু করেছিলেন। ইসলামী বাহিনীতে প্রত্যেক দশজন সৈনিকের উপর একজন 'প্রধান' নিযুক্ত হতো। আরবী সামরিক পরিভাষায় তাকে বলা হতো 'আরীফ'। এই আরীফদের হাতেই সকল সৈনিকের বেতন অর্পণ করা হতো; তারাই তা অধীনস্থা সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করে দিত।

সৈন্যবাহিনী সংগঠনের ব্যাপারে খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। প্রাক-ইসলাম যুগে আরবগণ শত্রুপক্ষকে কখনো সারিবদ্ধভাবে আর কখনো বিচ্ছিন্নভাবে মুকাবিলা করার জন্যে অগ্রসর হতো। প্রথমে উভয় পক্ষ হতে এক-দু'জন বীরপুরুষ সম্মুখ-সমরে লিপ্ত হতো, তারপর সাধারণ হামলা পরিচালিত হতো এবং শেষ পর্যন্ত এলোমেলোভাবে আক্রমণ ও অস্ত্র পরিচালনা করা হতো। মুসলমানগণও ইসলামী জিহাদের প্রথম পর্যায়ে এ রীতিরই অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তারা যখন পারস্য ও রোমানাদের সুসংগঠিত সৈন্য বাহিনীর মুখোমুখী হতে আরম্ভ করলেন, তখন তারা সুস্পষ্টরূপে বুঝতে পারলেন যে, আধুনিক পদ্ধতিতে এই সুসংগঠিত সৈন্যবাহিনী ও সমরনীতির মুকাবিলা করতে হলে প্রাচীন রীতি অবশ্যই পরিহার করতে হবে। অতঃপর তারা নূতনভাবে নিজেদের সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন এবং সম্পূর্ণ আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতে শুরু করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যবাহিনীকে সুষ্ঠুরূপে সারিবদ্ধ করা হতে লাগল, কেউ অগ্রে বা পশ্চাতে পড়ে থাকত না। গোটা সৈন্যবাহিনীকে মোটামুটি পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা হতো। সকলের অগ্রবর্তী বাহিনীকে বলা হতো 'মুকদ্দমা', যুদ্ধের সূচনা করাই হতো এর দায়িত্ব। মধ্যবর্তী বাহিনীকে বলা হতো 'শলব', মূল সেনাধ্যক্ষ এদের দ্বারাই পরিবেষ্টিত থাকতেন। ডান পার্শ্বে স্থাপিত বাহিনীকে বলা হতো 'মায়মানা', এবং বাম পার্শ্বে অবস্থিত বাহিনীকে বলা হতো 'মায়সারা'। আর সকলের পাশ্চাতে অবস্থিত বাহিনীর নাম দেয়া হতো 'সাকাহ'।

যে সৈন্যবাহিনী এই পাঁচটি উপ-বাহিনীতে বিভক্ত হতো, তাকে 'খামীস' বলা হতো। এর প্রত্যেক অংশেরই একজন করে 'আমীর' হতেন এবং তিনি মূল সেনাধ্যক্ষের ফরমান অনুসারে নিজ নিজ বাহিনী পরিচালনা করতেন। অশ্বারোহী বাহিনীর আমীর হতেন স্বতন্ত্র। পশ্চাদ্দিক সংরক্ষণের জন্যে মুসলিম সৈনিকগণ

---

[25] হযরত উমর (রা:) ১৫ হিজরী সালে একট স্থায়ী প্রতিরক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন এবং সমস্ত সক্ষম লোকের নাম রেজিস্টারভুক্ত করেন। মাখরামা ইবন নাওফিল, জাযির ইবন মুতাম এবং আকিল ইবনে আবু তালিবকে এই রেজিষ্ট্রেশনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। রাসূল (সা:)-এর পরিবারবর্গ ছিল এই তালিকার শীর্ষে। বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের জন্যে নিম্নোক্ত হারে বার্ষিক ভাতা নির্ধারণ করা হয়। ১. বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী- পাঁচ হাজার দিরহাম। ২. আবেসিনিয়ায় হিজরতকারী এবং উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী- দুই হাজার দিরহাম। ৩. মক্কা বিজয়ের পূর্বে হিজরতকারী- তিন হাজার দিরহাম। ৪. মক্কা বিজয়ের সময়ে ইসলাম গ্রহণকারী- দুই হাজার দিরহাম। ৫. কাদেসিয়া এবং ইয়ারমুক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী- দুই হাজার দিরহাম। ৬. ইয়ামেনের অধিবাসী- চারশত দিরহাম। ৭. কাদেসিয়া এবং ইয়ারমুক যুদ্ধের পরে হিজরতকারী- তিনশত দিরহাম। ৮. অন্যান্য- দু'হাজার দিরহাম। সৈন্যদের স্ত্রী ও সন্তানদের প্রত্যেককে বছরে দুইশত দিরহাম থেকে দু'হাজার দিরহাম পর্যন্ত প্রদান করা হতো। এই বেতন ও ভাতাদি গ্রহণকারীদের মধ্যে নিয়মিত সৈন্যও ছিল এবং আরও ছিল স্বেচ্ছাসেবকগণ যাদেরকে যে কোনো জরুরী মুহূর্তে তলব করা হতো। পরবর্তীতে এই নীতি আরো অধিক ব্যাপক আকার ধারণ করে। আরবের সমগ্র গোত্র ও কবীলার লোকদেরকেও এর অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়। শেষ পর্যন্ত দুগ্ধপোষ্য শিশুদের জন্যও বৃত্তি নির্ধারণ করা হয়। এর অর্থ এই ছিল যে, আরব জাহানের প্রতিটি শিশুকে জন্মদিন হতে ইসলামী সৈন্যবাহিনীর একজন সিপাহীরূপে গণ্য করা হলো। (সায়্যিদ আতহার হুসেন, অনুবাদ : মুহাম্মদ সিরাজ মান্নান, গৌরবময় খিলাফত, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা–২৭০)

বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন, যেন শত্রু-সৈন্য কোনো সুযোগেই পশ্চাদ্দিক হতে তাদের উপর হামলা করতে সমর্থ না হয়। নৈশকালীন আক্রমণ হতে গোটা বাহিনীকে হেফাজত করার জন্যে তাঁরা বিশেষ ব্যবস্থা ও কর্মপন্থা গ্রহণ করতেন। মুসলমানদের সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ ছিল সর্বাধিক সুসংগঠিত ও সুসংবদ্ধভাবে সক্রিয়। সেই কারণে শত্রুদের অধিকাংশ গোপন ইচ্ছা বা পরিকল্পনা তাঁরা পূর্বাহ্নেই জানতে পারতেন।

দ্বিতীয় খলীফার আমলে সৈনিকদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে বিশেষ যত্ন নেয়া হতো; সৈনিকদের ক্যাম্প তৈরি করার ব্যাপারে আবহাওয়ার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হতো। গ্রীষ্মকালে সৈন্যদেরকে শীত প্রধান এলাকা এবং শীতকালে উষ্ণ এলাকায় প্রেরণ করা হতো। বসন্তকালে ভাল চারণভূমি সম্পন্ন এলাকা এবং স্বাস্থ্যকর স্থান দেখে সৈন্যদের জন্যে আবাসস্থল নির্ধারণ করা হতো। সৈন্যরা যখন মার্চ করে অগ্রসর হতো, তখন শুক্রবার দিন একরাত ও একদিন যাত্রা বিরতি করত এবং কোনো একদিনে বেশি দূরত্ব অতিক্রম করত না। যেখান থেকে তারা তাদের রসদপত্র সংগ্রহ করতে পারত সেখানেও যাত্রা বিরতি করত। পরিবারের সদস্যদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্যে সৈন্যদেরকে বছরে একবার বা দু'বার ছুটি দেয়া হতো। তাদের সব রকম আরাম-আয়েশের প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি দান করা হলেও তারা যেন তাদের কষ্ট সহিষ্ণুতাও পরিত্যাগ না করে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হতো। খলীফা উমরের (রা:) স্থায়ী নির্দেশ ছিল যে, সৈন্যরা যেন রেকাবের সাহায্যে অশ্বে আরোহণ না করে, মোলায়েম কাপড় পরিধান না করে, গোসলখানায় গোসল না করে এবং সূর্যের আলো থেকে দূরে সরে না থাকে। তাদেরকে আরো নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন অশ্বচালনা, সাতারকাটা, তীর ছোড়া এবং খালি পায়ে হাটা ইত্যাদি ব্যাপারে পারদর্শিতা অর্জন করে। ফুতুহুল বুলদানে বর্ণিত আছে যে, প্রত্যেক সৈন্যকে সুই, সূতা, কাঁচি এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস সঙ্গে রাখত হতো। প্রতিটি সেনাদলের নিজস্ব ডাক্তার এবং সার্জন ছাড়াও এর সাথে থাকত হিসাব সংরক্ষণ অফিসার, ট্রেজারী অফিসার, কাযী, অনুবাদক। প্রতিটি সেনাদলের অংশ হিসেবে এর সাথে থাকত পরিখা বা সুড়ঙ্গ খননকারী লোকজন এবং তাদের কাজ ছিল রাস্তা পরিষ্কার করা, সড়ক ও কালভার্ট নির্মাণ। সাধারণত: বিজিত লোকদের উপর একাজের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হতো।

সৈনিকদের বিশেষভাবে ট্রেনিং দেয়ার দিকে হযরত উমর (রা:)-এর সতর্ক দৃষ্টি ছিল; এমনকি বিজিত এলাকাসমূহের কেউ যেন সামরিক জীবন ছেড়ে কৃষিকাজ ও ব্যবসা-বাণিজ্য জড়িয়ে না পড়ে সে জন্যে বিশেষ তাকীদী ফরমান প্রচার করা হয়েছিল।[26] কেননা তা করা হলে মুসলিম মুজাহিদদের সামরিক যোগ্যতা, প্রতিভা, বীরত্ব ও সাহসিকতা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার সমূহ আশঙ্কা ছিল।

হযরত উসমান (রা:) বেসামরিক প্রশাসনের উদ্দেশ্যে দেশকে বিভিন্ন প্রদেশ ও জেলায় বিভক্ত করেছিলেন। আর সামরিক উদ্দেশ্যে মদীনা, কূফা, বসরা, মসুল, ফুসতাত, দামেস্ক, হেমস, জর্দান এবং প্যালেস্টাইনকে কেন্দ্র করে সারাদেশকে কয়েকটি অঞ্চল ও উপ-অঞ্চলে বিভক্ত করেন। এই সব স্থানেই সৈন্যদের জন্য ব্যারাক নির্মাণ করা হয়েছিল। কূফা, বসরা এবং ফুসতাত ছিল আসলে সেনানিবাস। এর প্রতিটি জায়গায় চার হাজার অশ্ব পালনের জন্যে আস্তাবল নির্মান করা হয়েছিল। অশ্বের প্রতি যথেষ্ট যত্ন করা হতো এবং মদীনায় খলীফা নিজেই অশ্ব পালনের প্রতি তদারকি করতেন। উষ্ট্র এবং অশ্বের বিচরণের জন্যে বিভিন্ন স্থানে চারণভূমি গড়ে তোলা হয়েছিল। দশ বর্গমাইল ব্যাপী সবচেয়ে বড় চারণভূমি ছিল রাবাযায়। সৈন্যরা যেন উন্নতমানের অশ্ব ব্যবহার করতে পারে এই জন্যে অশ্বের প্রজননের প্রতি সবিশেষ যত্ন নেয়া হতো। এই সব যায়গায় খাদ্য ও অন্যান্য রসদের মজুত গড়ে তোলা হয়েছিল। এই সব স্থান ছাড়াও আরও

---

[26] যেহেতু সৈন্যদেরকে কৃষিকাজ বা অন্য কোনো ব্যবসা-বাণিজ্য করতে অনুমতি দেয়া হতো না, তাই তাদের যাবতীয় প্রয়োজন মেটানোর জন্যে উচ্চহারে বেতন দেয়া হতো। সর্বানিম্ন বেতন ২০০ থেকে ৩০০ দিরহামে উন্নীত করা এবং কমান্ডিং অফিসারদের বেতন বার্ষিক ৭০০০ দিরহাম থেকে বৃদ্ধি করে ১০,০০০ দিরহাম নির্ধারণ করা হয়। যুদ্ধে যোগ্যতা প্রদর্শনের উপর ভিত্তি করেও বেতন বৃদ্ধি করা হতো। তাছাড়াও গনীমতের মাল সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করা হতো। (সায়্যিদ আতহার হুসেন, অনুবাদ : মুহাম্মদ সিরাজ মান্নান, গৌরবময় খিলাফত, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৭২)

অনেক শহরে সেনানিবাস স্থাপন করা হয়েছিল এবং কোনো নতুন শহর অধিকার করা হল সেখানে কিছু সংখ্যক সৈন্য মোতায়েন করা হতো।

হযরত উসমান (রা:) শুধু হযরত উমর (রা:)-এর অধিকৃত এলাকাকেই সংহত করেননি, বরং কয়েকটি সফল অভিযান পরিচালনা করে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমা সবদিকেই যথেষ্ট বর্ধিত করেন। উমর (রা:)-এর প্রবর্তিত সামরিক ব্যবস্থাকে তিনি আরও উন্নত করেন। যে সব ব্যক্তি সামরিক বিভাগে কাজ করেছেন তিনি তাদের ভাতা আরও একশত দিরহাম বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি সামরিক বিভাগকে প্রশাসনিক বিভাগ থেকে পৃথক করে দেন এবং সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে কমান্ডার নিযুক্ত করেন। হযরত উমর (রা:) কর্তৃক স্থাপিত সামরিক ঘাঁটি ছাড়াও তিনি নতুন কয়েকটি স্থান যথা, ত্রিপলী, সাইপ্রাস এবং আর্মেনিয়ায় সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেন। অর্শ্ব এবং উষ্ট্র পালন ও চরানোর জন্যে অনেকগুলো নতুন চারণভূমি গড়ে তোলেন। আবু কায়েসের নেতৃত্বে উসমান (রা:) ই প্রথমে নৌবাহিনী গড়ে তোলেন। এই নৌবাহিনীতে পাঁচ শত যুদ্ধ জাহাজ ছিল এবং তিনিই প্রথম নৌ-অভিযানের আদেশ প্রদান করেছিলেন।[৫৫(পৃ:-২৭৪)]

আলী (রা:)-এর চার বছর শাসনকাল প্রায় অনবরত যুদ্ধ বিগ্রহে কাটে। অতএব, তাঁকে তার সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠন করার দিকে সবিশেষ মনোযোগ দিতে হয়েছিল। তিনি নিজেই ছিলেন একজন বীর যোদ্ধা এবং বহু যুদ্ধের হীরো, এজন্যে কি প্রয়োজন তা তিনি ভাল করেই জানতেন। তিনি এটা নিশ্চিত করেছিলেন যে, রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে সৈন্যদের বেতন যেন প্রথম দেয়া হয় এবং সৈন্যরা যেন যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা লাভ করে তার প্রতি তিনি বিশেষ জোর দিতেন।

ইমামত ও খিলাফত ঃ

হযরত নবী করীম (সা) ২৩ বছর ধরে ইসলামী শরীয়াতের প্রচারে ও কল্যাণকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা চালিয়ে মদীনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর তিনি ১১হিজরীর প্রথম দিকে পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। হযরত (সা) এর বিদায়ের সাথে ওহী ও নবুওয়াতের ধারা বন্ধ হওয়ার ফলে আর কোন নবী আসবেনা কিংবা নতুন কোন শরীয়তও আসবেনা। তথাপি তাঁর উপর যে দায়িত্ব ছিল, (ওহী পৌঁছানোর দায়িত্ব ব্যতীত) অবশ্যই তার পরিসমাপ্তি ঘটেনি। ফলে তাঁর বিদায় নেয়ার পর তাঁর খলিফা ও উত্তরাধিকারী হিসেবে সর্বকালেই কোন এক বিজ্ঞ ও পরিশুদ্ধ ব্যক্তিকে এ সকল দায়িত্ব সম্পাদনের ভার গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়টিতে সকল মুসলমানই এক মত, যদিও মহানবী (সা) এর উত্তরাধিকারীর কিছু বৈশিষ্ট্য ও তার নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে শিয়া ও সুন্নি মাযহাবের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

সুন্নিদের নিকট ইমারত,ইমামত ও খিলাফত একই অর্থ দেয়। যিনি ইমাম তিনিই খলিফা তিনিই আমীর। আর এ আমীর, খলিফা ও ইমামের আনুগত্য করা সকল মুসলমানের জন্যে ফরজ। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যকার 'উলুল আমর্'-দায়িত্বশীল লোকদেরও আনুগত্য কর।" (আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত-৫৯)।

এ মৌলিক নীতিতে শিয়া-সুন্নি উভয় সম্প্রদায় একমত। শিয়া-সুন্নি নির্বিশেষে সকলেই আমীর, ইমামই যামান, খলিফ বা উলুল আমর এর আনুগত্যকে অপরিহার্য বলে বিশ্বাস করেন। কিন্তু তাদের মতানৈক্য হলো (আমীর, ইমামই যামান, খলিফ বা উলুল আমর কে) ব্যক্তি নির্ণয়ের ব্যাপারে। এ নেতৃত্ব কার? কিভাবে তিনি নেতৃত্বে আসবেন?

সুন্নিগণ মনে করেন, খলিফা বা ইমাম কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি নন; বরং এটি একটি পদের নাম। ইসলামের নীতিমালা অনুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তি মাত্রই খলিফা বা ইমাম হবেন। পূর্ব থেকে কাউকে উক্ত পদে নিযুক্ত করা হয়নি। তাদের মতে, মহানবী (সা) কাউকে খলিফা নিযুক্ত করে যাননি। তাঁর ইন্তিকালের পর মুসলমানগণই পরপর খলিফা নির্বাচিত করেছেন। মহানবী (সা) কাউকে খলিফা নিযুক্ত না করার প্রসঙ্গে হযরত আলী (রা) ও হযরত ওমর (রা) হতে তিরমিযি শরীফে হাদীস বর্ণিত ঃ

قَالَا لَمْ يَعْهَدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ الْخِلَافَةِ شَيْئًا

"তাঁরা উভয়ে বলেন, খিলাফত প্রসঙ্গে মহানবী (সা) কোনরূপ অসিয়ত করে যাননি।"(তিরমিযি ঃ ৪৫/২)[১৯](পৃ:-৬৯)

পক্ষান্তরে, শিয়াগণ বলেন, ব্যক্তিগত ভাবে হযরত আলী (রা) জন্য খিলাফতের অসিয়ত করা হয়। তাদের যুক্তি হলো ঃ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ "এবং নিকট আত্মীয়দের ভয় প্রদর্শন করুন।"(সূরা আশ শূয়ারা-২১৪)।

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূল (সা) হাশেমী বংশের প্রথম সারির লোকদের ডেকে বললেন, আমি তোমাদের জন্যে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ বয়ে এনেছি। মহান আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছেন তোমাদেরকে সে দিকে আহ্বান করার জন্যে। কে আছ যে এ দ্বীনের প্রচারের জন্যে আমার সাহায্যকারী হবে- যাতে সে আমার ভাই, ওসী এবং উত্তরাধিকারী হবে? রাসূল (সা) তিনবার এ কথাটির পুনরাবৃত্তি করলেন এবং প্রতিবারই একমাত্র হযরত আলীই (রা) নিজের প্রস্তুতির কথা ঘোষণা করলেন। এর পর রাসূল (সা) বলেন ঃ

اِنَّ هَذَا اَخِيْ وَ وَصِيِّ وَ خَلِفَتِي فِيْكُمْ

"নিশ্চয়ই এই (আলীই) তোমাদের মধ্যে আমার ভাই, ওসী ও আমার খলিফা।"(মুসনাদে আহমদ১/১৫৯,তারিখে তাবারী ২/৪০৬,তাফসীরে তাবারী-জামেয়ুল বায়ান-১৯/৭৪-৭৫) [৫৩](পৃ:-১৩৯)

শিয়াগণের মতে, নবীর স্থলাভিষিক্ত হবার জন্যে নবুওয়াত ও ওহী নাযিল ব্যতিরেকে নবীর অন্য সমস্ত গুণের অধিকারী ব্যক্তির নেতৃত্ব অপরিহার্য- যার গুনাবলীর মধ্যে পাপমুক্ততা ও ভুলহীনতা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গুণ। আর এ ধরনের নেতৃত্ব আল্লাহর পক্ষ থেকেই মনোনীত হতে হবে। খলিফা বা ইমাম তাদের মতে নির্বাচিত হন না, নিযুক্ত হন আল্লাহর পক্ষ থেকে।

তাদের মতে, হযরত আলী (রা) ও হযরত ফাতেমা (রা) এর বংশধরদের মধ্য থেকে এ ইমমি হতে হবে। নীতিগতভাবে ইমাম আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উভয় ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেবেন। তবে যেহেতু ঐশী নির্দেশনায় মনোনীত তাই জনগণ ইমামকে না মানলেও তিনি ইমামের পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন। যদিও এক্ষেত্রে কার্যত রাজনৈতিক ক্ষমতা ছাড়া শুধু আধ্যাত্মিক ভাবেই ইমামত কার্যকর থাকবে। এ অর্থেই তারা হযরত আলী (রা), হযরত হাসান (রা), হযরত হুসাইন (রা), ও ইমাম জয়নুল আবেদীন, হযরত বাকের, ইমাম জাফর সাদেক প্রমূখকে ইমাম মানেন। যদিও হযরত আলী (রা), হযরত হাসান (রা) ছাড়া অন্য কেউ কোন সময়ের জন্যে রাজনৈতিক কতৃত্বের অধিকারী হননি।

সুন্নিগণের মতে, যেহেতু কুরআন পরিপূর্ণ হেদায়াতরূপে বর্তমান সেহেতু স্বয়ং উম্মাহ্ নিজের জন্য যথোপযুক্ত নেতৃত্ব বেছে নিতে সক্ষম। অতএব, আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত নেতৃত্বের অপরিহার্যতা বিদ্যমান নেই। আর যেহেতু কুরআন-সুন্নাহ এবং সচেতন উম্মাহ নেতার প্রহরী, সেহেতু তাঁকে যে কোন বড় ধরনের বিচ্যুতি থেকে তা-ই রক্ষা করতে সক্ষম। অতএব, নবীদের মত জন্মগত পাপমুক্ত ও ভুলমুক্ত অপরিহার্য নয়।[৪১](পৃ:-৫০)।

মোট কথা, ইমামবাদের বিশেষ আকীদা একমাত্র শিয়া মতাবলম্বীদের নিজস্ব মাযহাবগত আকীদা মাত্র। উম্মাতের অধিকাংশ আলিম এতে দ্বিমত পোষণ করেন। কাজেই সামগ্রিক ভাবে এ মতবাদকে ইসলামের বুনিয়াদী আকীদা বলা যাবেনা- যা অস্বীকার করা হলে কেউ মূল ইসলাম হতে খারিজ হয়ে যাবে। আবার ইমাম সম্পর্কে শিয়াগণ যে বর্ণনা দেন তাতেও অন্যান্য ফের্কার আলিমগণ দ্বিমত রাখেন। স্বয়ং শিয়া সম্প্রদায়ের মাঝেও বার ইমাম নির্ণয়ে মতান্তর রয়েছে। ইসনা-আশারী শিয়াগণ যে বার জন ইমামের নাম নিয়ে তাকেন, অন্যান্য শিয়াগণ তা গ্রহণ করেন না এবং এ বিষয়ে একমত হতে পারেননি। ইসনা-আশারী মতে, তাদের সুনির্দিষ্ট বার জন ইমামকে ইমাম বলে গ্রহণ না করলে কোন শিয়াও 'ইসনা-আশারী শিয়া' হতে পারবেনা। কারণ, সুনির্দিষ্ট বার জন ইমামে বিশ্বাস স্থাপন করা 'ইসনা-আশারী শিয়ার' বুনিয়াদী বিষয়। কাজেই বিষয়টিকে 'ইসলামের মৌল আকীদা' না বলে শিয়া মাযহাবের বুনিয়াদী আকীদা বলাই শ্রেয়।

ইমামতের বিষয়টি যে ইসলামের মৌলিক আকীদার অন্তর্ভুক্ত নয় এ বিষয়ে উভয় সম্প্রদায়ের বিজ্ঞ আলেমগণ যে মত প্রকাশ করেছেন তা হলো ঃ "ইমামবাদ দ্বীন ইসলামের মূল বিষয় নয়। বরং শিয়া মাযহাবের মূল বিষয়। তাওহীদ, নবুওয়াত, আখিরাতে বিশ্বাসী হলে, ইমামবাদের অস্বীকারকারী হলেও মুসলমান থাকবে। তবেশিয়া হতে পারবেনা।"(মুকারাত-ই দ্বারুত তাকবীর, কায়রো, পৃষ্ঠা-২০৫,আমীর কাবীর তেহরানে মুদ্রিত) [১৯](পৃ:-৭০)।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি উদ্ধৃতি পেশ করছি ঃ "শিয়া দৃষ্টিকোণে, শিয়া মাযহাবের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলো দু'ভাগে বিভক্ত ঃ প্রথম ভাগটি বুনিয়াদী বিষয় সংক্রান্ত। আর তা হলো- ইমামবাদ। ইমাম মতবাদে বিশ্বাসী প্রত্যেকটি শিয়াকে বার ইমামের ইমাম হওয়ার উপর অবশ্যই আকীদা রাখতে হবে। যে ব্যক্তি জেনে বা না জেনে, এ বার ইমামকে ইমাম বলে মানবেনা, অথচ তিনটি বুনিয়াদী বিষয়ের (পরকাল, নবুওয়াত, তাওহীদ) প্রতি ঈমান রাখেবে- শিয়াদের মতে, সে অ-শিয়া মুসলমান হিসেবে গণ্য হবে।এরূপ ব্যক্তি সকল ব্যাপারে, সমস্ত মুসলমানের সাথে অংশিদার হবে। বস্তুত: ইমামবাদ শিয়া মাযহাবের আসল বিষয়। যা 'হাদীস-ই-সাকালাইন' দ্বারা সমর্থিত- 'আমার আহলে বাইতগণ নূহের কিস্তির মত। যে তাতে আরোহণ করবে, বেঁচে যাবে। আর যে পেছনে থেকে যাবে, সে ডুবে যাবে'।" (মুকারাত-ই দ্বারুত তাকবীর, কায়রো, পৃষ্ঠা-২০৫,আমীর কাবীর তেহরানে মুদ্রিত) [১৯](পৃ:-৭১)।

অতএব প্রমাণিত, এটি সর্বসম্মত ইসলামী আকীদার অন্তর্ভুক্ত নয় এবং এই শিয়া-ইমামবাদে বিশ্বাসী নয় বলে কেউ ইসলাম হতে খারিজ হবে না। অবশ্য শিয়া মাযহাবে এর গুরুত্ব রয়েছে। কেউ যদি এ মতবাদ অস্বীকার করে, তাহলে সে 'ইমামী শিয়া' হতে পারবে না। যেমনটি হানাফী, শাফেয়ী, মালিকী, হাম্বালী প্রমুখ মাযহাবের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এসকল মাযহাবের প্রত্যেকটির বিশেষ বিশেষ কিছু বক্তব্য ও মাসআলা-মাসায়েল আছে, যেগুলো অমান্য করলে কোন ব্যক্তি ঐ মাযহাবের সদস্য বলে গণ্য হবে না; কিন্তু সর্বাবস্থায় সে মুসলমানই থেকে যাবে। এ কথাটি আকীদা-বিশ্বাসের বেলায়ও খাটে।আশাইরাদের খাস আকীদায় বিশ্বাস না এনে কেউ 'আশআরী' ফের্কাভুক্ত হতে পারবেনা। মাতুরিদিয়াদের মতবাদ গ্রহণ না করে কেউ 'মাতুরিদী' ভুক্ত হতে পারবেনা। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, এরূপ ব্যক্তি মুসলমান থাকবেনা বা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত হতে খারিজ হয়ে যাবে। মোতাযিলা, জাহমিয়া, জাবরিয়া, কাদরিয়া প্রমূখ সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

খিলাফত ও ইমামতের সমন্বয় ঃ

শিয়া ও সুন্নিদের মধ্যে খিলাফত ও ইমামত নিয়ে যে মাযহাবগত মত-পার্থক্য রয়েছে তার সমন্বয় সাধন কিভাবে সম্ভব? এ দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে সহাবস্থানের উপায় বা কি? এসব প্রশ্নের জবাব উপরের আলোচনা থেকেই পাওয়া যায়। উপরন্তু এ বিষয়ে শিয়া আলিমগণ যা বলেছেন তার একাংশ উল্লেখ করছি ঃ

"রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে খিলাফতের দায়িত্বভার বহন করা নিযুক্ত ও মনোনিত ইমামের জন্যে জরুরী নয়। কারণ, এটা অন্য এমন ব্যাপারের সাথে জড়িত যা ইমামতের জন্য শর্ত নয়। কারণ, উপায় অবলম্বন সংগ্রহের অভাবে বা গোলযোগের আশংকায়, অথবা কুরআন সংকলনের জন্য ব্যস্ত থাকায়, অথবা খিলাফতের আসল উদ্দেশ্য কোন ন্যায়-পরায়ণ নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি দ্বারা সমাধা হওয়ার দরুন খিলাফতের দায়িত্ব ইমাম অন্যের উপর ছেড়ে দেন। এতে তার খোদা প্রদত্ত মর্যাদায় বিন্দুমাত্র ত্রুটি আসে না।" (মুকারাত-ই দ্বারুত তাকবীর, কায়রো, পৃষ্ঠা-২০৫,আমীর কাবীর তেহরানে মুদ্রিত) [১৯](পৃঃ-৭৩)।

এ উদ্ধৃতি দ্বারা প্রমাণিত যে, ইমামতের জন্য খিলাফতের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা জরুরী নয়। কোন নির্ভরযোগ্য ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির দ্বারা খিলাফতের কাজ সুচারুরূপে পরিচালিত হলে ইমাম তাঁর উপর ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব ছেড়ে দেন। আর নিজে কুরআন সংকলন, ইলম-ই-দ্বীন বিস্তার বা অন্য কোন ইসলামী কাজে আত্মনিয়োগ করে থাকেন। অথবা গোলযোগের সমূহ সম্ভাবনা থাকলে তিনি খিলাফতের ব্যাপারে পাশ কেটে চলেন। এতে তার ইমামতের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয় না। প্রকৃতপক্ষে ইমামত এক প্রকার রূহানী মর্যাদা যা শিয়াদের মতে, আল্লাহ পাক তাদের ইমামগণকে দান করেছেন। তাদের ইমামদের মূল কাজ হল কুরআনের জ্ঞান ও সুন্নাহর শিক্ষাকে হিপাযত করা। ইসলামের বিরুদ্ধে যে সন্দেহের সৃষ্টি হয় তার সঠিক উত্তর দান করা। ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়াদির সমাধান পেশ করা। [১৯](পৃঃ-৭৪,৭৫)

তাছাড়া ইরানের ইসলামী সংবিধানেও বিষটির সমাধান লক্ষ্য করা যায় ঃ "ইরানের রাষ্ট্রীয় ধর্ম হলো ইসলাম। আর জাফরী ইসনা আশারী মাযহাব। এ ধারাটি সর্বদায় অপরিবর্তিত থাকবে। অন্যান্য ইসলামী মাযহাবগুলো যেমন হানাফী, শাফেয়ী, মালিকী, হাম্বলী, যায়দী - পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ভোগ করবে। এসব মাযহাবের অনুসারীগণ তাদের ফিকাহ মোতাবিক তাদের দ্বীনি অনুষ্ঠানাদী পালনে স্বাধীনতা ভোগ করবেন। এসব মাযহাব শিক্ষাদানে, ধর্মীয় অনুশীলনে, নিজস্ব ব্যাপারাদিতে (বিয়ে, তালাক, উত্তরাধিকার আইন, অসিয়ত) আর এতদসংক্রান্ত বিচারালয়ে দাবী উত্থাপনে সরকারী সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে। আর যে অঞ্চলে এসব মাযহাবের কোনটি সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে, ঐ অঞ্চলের স্থানীয় বিধান রচনায় আঞ্চলিক মজলিস-ই-শুরার আওতাধীনে ঐ মাযহাব মোতাবিক আইন প্রণয়নের অধিকার হবে। তবে, অন্যান্য মাযহাবের অধিকার ক্ষুণ্ন করা যাবে না।" (ধারা নং-১২) [১৯](পৃঃ-২৫)

আসলে পরবর্তী লোকেরা ইমামবাদ নিয়ে অযথা বাড়াবাড়ি করেছে। হযরত আলী (রা) থেকে এ বিষয়ে চরম আচরণের প্রমাণ মিলেনা। তাঁর অভিযোগ ছিল, তাঁকে না ডেকে কেন খিলাফতের বিষয় সিদ্ধান্ত নেয়া হল। অথচ তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ লোক ছিলেন। ইসলামের জন্যে তাঁর দরদ ও কুরবানী কম ছিল না। পরে আলোচনার পর তিনি সম্মত হন। তাঁকে বলা হয় আনসার পক্ষকে নিবৃত করতে। তিনি গিয়ে দেখেন সাকীফা-ই-বনু সাইদাতে হঠাৎ করে বায়আত অনুষ্ঠিত হয়ে যায়। আউস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয় হযরত সায়াদ ইবনে ওবাদাহ (রা) এর হাতে বায়আত করার উপক্রম করে। তখন হযরত আবু বকর (রা) এর হাতে বায়আত করা না হলে হযরত আলী (রা) হযরত আবু বকর (রা) উভয়জনই বঞ্চিত হতেন। মুহাজিরদের হাত থেকে খিলাফত চলে যেত। যার ফলে আরবে গোত্রবাদের অশুভ তাণ্ডব শুরু হয়ে যেত। ইসলামী হুকুমতের অস্তিত্ব থাকত না। এ বিষয়ে ন্যায়-পন্থী শিয়া আলেমগণ বলেন ঃ

> "তখন হযরত ইমাম আলী (রা) এর মর্যাদা, খরীফা হওয়ার জন্যে তাঁর যোগ্যতা, নেতৃত্ব দানে তাঁর ব্যক্তিগত উচ্চমানের গুণাগুণ ও তাঁর কার্যকারিতা অস্বীকার করা হয়নি। শুধু তাঁর অভিযোগ ছিল, তাঁকে উপস্থিত না করে কেন তাড়াহুড়া করে খলীফা নিযুক্ত করা হলো? এমনকি ইমাম আলী (রা) স্বীকার করেছেন, আউস ও খাজরাজ গোত্রের আনসারদের সমর্থনপুষ্ট হযরত সাআদ ইবনে ওবাদার (রা) কারণে খলীফা নিযুক্তিতে তাড়াহুড়া করা হয়েছিল।" (মুকারাত-ই দ্বারুত তাকবীর, কায়রো, পৃষ্ঠা-২২০,আমীর কাবীর তেহরানে মুদ্রিত) [১৯](পৃঃ-৭৬)।

খিলাফত বা রাষ্ট্রীয় কতৃত্ব লাভ যেহেতু ইমামের জন্য অবধারিত কর্তব্য নয়, ইমাম আলী এ নিয়ে বেশী আগে বাড়েননি। তিনি তখনকার খলীফার হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। খিলাফতের ব্যাপারে শিয়াদের মতামত ব্যক্ত করে আরও বলা হয় ঃ "শিয়াগণ ইমামতের জন্য খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণকে শর্ত মনে করেন না। ইমাম খিলাফতের জন্য অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য হলেও না। এ ব্যাপারটি জাহিরী উপায়-উপকরণাদী সংগৃহীত হওয়ার উপর নির্ভর করে। বস্তুত আল্লাহ পাক কারণ ব্যতীত কার্যের বিকাশ চান না।"(মুকারাত-ই দ্বারুত তাকবীর, কায়রো, পৃষ্ঠা-২২০,আমীর কাবীর তেহরানে মুদ্রিত) [১৯](পৃঃ-৭৭)।

আমরা আলোচনার চূড়ান্ত পর্যায়ে তাফসীর আল-মীযানের একটি উদ্ধৃতি উত্থাপন করছি ঃ "ইমাম হলেন মানুষ ও মানুষের প্রভুর মাঝে যোগসূত্র। তিনি আধ্যাত্মিক ফয়েয আহরণ করে লোকজনকে বিলিয়ে দেন।"(আল-মীযান ঃ৩৩৩/১৪) [১৯](পৃঃ-৭৭)।

কাজেই খিলাফতের রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের সাথে ইমামবাদের রূহানী ব্যবস্থার সংঘাত বাধার কোনই অবকাশ নেই। অতীতে শিয়া ইমাম ও শিয়া জনগণ ইসলামী খিলাফতের অধীনে পাশাপাশি জীবন-যাপন করেছেন। তবে, খিলাফত রাজতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রে রূপান্তরিত হওয়ার পর খিলাফতের দায়িত্ব সূচারুরূপে সম্পাদিত হচ্ছিলনা বলে শিয়া ইমামদের সাথে সংঘর্ষ বেধে যায়। আর এরূপ সংঘর্ষে ইমাম আবু হানিফা (রহ) শিয়া ইমামদের সাথে বিদ্রোহে সহযোগিতা করেছেন। শিয়া ইমামদের পক্ষে ফতোয়া প্রদান করেছেন।[১৯](পৃঃ-৭৭)

বস্তুত ইমাম ও ইমামত বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। রাজনৈতিক অর্থে ইমামত খিলাফতেরই সমার্থক। কিন্তু খিলাফত শব্দটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্যে যতটা সুনির্দিষ্ট, ইমামত শব্দটি ততটা নয়। শিয়া দৃষ্টিভঙ্গিতে ইমাম শব্দ বিশেষ (খাস) হলেও সাধারণভাবে ইমাম শব্দটি আম বা সাধারণ অর্থবোধক আর খিলাফত ও খলিফা শব্দটি খাস বা বিশেষ অর্থবোধক। অবশ্য আহলে বাইতের যে ইমামগণকে শিয়া মাযহাব আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত মা'ছুম ও মা'ছুন ইমাম গণ্য করেন, সুন্নী মাযহাবের দৃষ্টিতেও তাঁরা ইসলামী উম্মাহর শ্রেষ্ঠতম দ্বীনি ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিগণিত এবং বারজন ইমামের আগমণ হবে বলে সুন্নীগণও বিশ্বাস রাখেন। তিরমিযি শরীফে বর্ণিত আছে ঃ

يَكُوْنُ مِنْ بَعْدِ اثْنَا عَشَرَ اَمِيرًا

"আমার পরে বারজন আমীরের আগমন হবে।" (তিরমিযি ঃ৪৫/২, প্রসঙ্গ টীকা ৫) [১৯](পৃঃ-৭০)।

তাছাড়া সহীহ বোখারী ৯/৮১ বাবে এস্তেখলাফ, সহীহ মুসলীম৬/৩ কিতাবুল ইমারাহ, মোসনাদে আহমাদ ৫/৮৬,১০৮, মোস্তাদরাকে হাকেম ৩/৮ প্রমূখ হাদীসে বারজন খলিফা সম্পর্কিত রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে।[৫৩](পৃঃ-১৫১)

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় পাঁচ
ইসলামে রাষ্ট্র ও নেতৃত্ব

ইসলামে রাষ্ট্রের ধারণা :

সমাজ জীবনের পূর্ণ নিয়ম-শৃংখলা স্থাপন এবং সমাজকে একটি নির্দিষ্ট আদর্শে সুষ্ঠুরূপে গড়ে তোলার জন্যে একটি অমোঘ শক্তির (coercive power) একান্তই আবশ্যক; আধুনিক পরিভাষায় এই শক্তির নাম হচ্ছে রাষ্ট্র (State)। যেহেতু একটি রাষ্ট্রের জন্যে নির্দিষ্ট ভূখন্ড, জনসংখ্যা, সরকার ও সার্বভৌমত্ব এই চারটি উপাদান অপরিহার্য তাই রাষ্ট্রের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলতে হয় যে, একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ডের অধিবাসীদের ওপর আইন-কানুন কার্যকর করণ ও শৃংখলা স্থাপনের জন্যে ভূখন্ডের অধিবাসীগণের সামগ্রিক ইচ্ছা ও সমর্থনে যে উচ্চতর শক্তির নিরংকুশ প্রভুত্বের অধিকার স্বীকার করে নিজেদেরকে সুসংগঠিত করে নেয়, সেই শক্তির নাম রাষ্ট্র (State)। স্টিফেন লী কক-এর ভাষায় একটি সুসংগঠিত সমাজকেই বলা হয় রাষ্ট্র। একদিকে জনগণের উপর আধিপত্য বিস্তার, অপরদিকে জনগণের পক্ষ থেকে আনুগত্য স্বীকার, এই বিবিধ সম্পর্ক স্থাপিত হলেই রাষ্ট্র অস্তিত্ব লাভ করে।

রাষ্ট্র সাধারণত দুই ধরণের : লৌকিক রাষ্ট্র ও আদর্শবাদী রাষ্ট্র। লৌকিক রাষ্ট্রে কোন আদর্শ বা ধর্মকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয় না। লৌকিক রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রও বলা হয়। একে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র না বলে ধর্মহীন রাষ্ট্রই বলা শ্রেয়। সেক্যুলার রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হলো, সেখানে রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্যে কোন স্থায়ী মূলনীতি স্বীকার করা হয় না। আল্লাহ্‌র স্বীকৃতি এ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আদৌ প্রয়োজন নেই। ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের নীতি সবসময় পরিবর্তনশীল। কারণ, সেখানে আইনের উৎস হিসেবে কোন স্থায়ী আদর্শের স্বীকৃতি নেই। এ ধরণের রাষ্ট্র ব্যবস্থার কোথাও ব্যক্তি বিশেষ, দল বিশেষ আবার কোথাও পরিষদ সদস্যদের অধিকাংশের মতের উপরই রাষ্ট্রীয় নীতি ও আইন নির্ভরশীল, যার ফলে ব্যক্তি বা দলের পরিবর্তনের সাথে সাথেই গোটা রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয়। মূলত ধর্মহীন রাষ্ট্র খোদাদ্রোহী রাষ্ট্রেরই নামান্তর। কেননা, এখানে আল্লাহ্‌র প্রভুত্বকে ও তাঁর আইনকে উপেক্ষা করে মানবীয় প্রভুত্বের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। ফলে মানবীয় প্রভুদের স্বেচ্ছাচারিতায় গণজীবনে খোদাদ্রোহীতা, চরিত্রহীনতা ও জুলুম নির্যাতনের ধ্বংসলীলা বিরাজ করে।

অন্যদিকে আদর্শবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় একটি সুস্পষ্ট আদর্শকে আইন, শাসন, বিচার ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় বিভাগের স্থায়ী মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। ইসলাম মূলত আদর্শবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থা, তাই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শকেই সে স্থায়ী মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করে। যে রাষ্ট্র সরকার ও জনগণের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা, আইন, শাসন, বিচার ইত্যাদি জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগ ইসলামী মূলনীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, তাই ইসলামী রাষ্ট্র। ইসলামী রাষ্ট্র মূলত তাওহীদ, রিসালাত ও খিলাফতের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহকে একক শক্তি হিসেবে স্বীকার করে, রাসূল (সা:)কে তাঁর প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত শেষ নবী হিসেবে গ্রহণ করে, রাসূলের (সা:) প্রদত্ত ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করে, মানুষ আল্লাহ্‌র খলীফা হিসেবে তাঁর মর্জী মুতাবিক এই রাষ্ট্র পরিচালনা করে।

ইসলামে পোপবাদ বা যাজক শ্রেণী বা মোল্লাতন্ত্রের কোন স্থান নেই। ইসলাম নির্ভেজাল তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাসের বুনিয়াদে মহান আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত এক কল্যাণকর জীবন পদ্ধতি। ইসলামকে পাশ্চাত্য জগতের তথাকথিত ব্যক্তিগত ধর্মের দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করার অপচেষ্টা করা নিছক অজ্ঞতারই নামান্তর। ইসলাম শুধু নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিপ্লবের কর্মসূচীই নয়। ইসলাম অর্থনৈতিক, সংস্কৃতিক জীবনালেখ্য। ইসলামী রাষ্ট্র হচ্ছে সত্যিকার জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র। ইসলামী রাষ্ট্র পাশ্চাত্য নগ্ন ভৌগলিক জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে সাম্য, মৈত্রী ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের আহ্বান জানিয়ে এক বিশ্বজনীন আদর্শ রাষ্ট্র

প্রতিষ্ঠার মূলনীতিই উপস্থাপন করেছে। এক কথায় ইসলামী রাষ্ট্র হলো "আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব, কুরআন, সুন্নাহ ও ইজতিহাদ ভিত্তিক আইনের শাসন, স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী ও বিশ্বশান্তির জয়গানে উদ্বুদ্ধ, স্বত:স্ফূর্তভাবে আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধানে আনুগত্যশীল জনসমষ্টি ও ভূখন্ডই হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র।"[২৫](পৃ:-৬৫,৬৬)

রাষ্ট্র সম্পর্কিত পাশ্চাত্য ধারণা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ইসলামী রাষ্ট্র শব্দটি। তাই ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার আলোকে রাষ্ট্র শব্দটি বুঝা দরকার। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে যে অর্থে রাষ্ট্র সম্পর্কিত ধারণাটি বুঝা হয় সে অর্থে কুরআনের পরিভাষার প্রেক্ষিতে তা খুঁজে পাওয়ার কোন প্রায়াস ব্যর্থ হতে বাধ্য। আধুনিক আরবি অভিধানে 'দাওলাহ' শব্দটি রাষ্ট্রের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়।[৬০](পৃ:-৯২) কিন্তু কুরআনে আমরা রাষ্ট্রের পরিবর্তে কোন শব্দ পাইনা। কুরআনে 'দাওলাহ' শব্দটি থাকলেও তা রাষ্ট্র এর অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। বরং তা অলঙ্কারিকভাবে সম্পদকেই বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে, যদিও আক্ষরিক অর্থে হস্তান্তরযোগ্য পণ্য যা হাত বদল হয়– এ অর্থই বুঝিয়ে থাকে।[১৮](পৃ:-১৩৪) যে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব একজনের মধ্যে সীমিত থাকে না– সম্ভবত সেরূপ কর্তৃত্ব বুঝাতেই নির্দিষ্ট ভূখন্ডে বসবাসকারী জনসমষ্টি বিদেশী নিয়ন্ত্রণমুক্ত আইনগতভাবে গঠিত একটি সরকার- এসব উপাদানের সমষ্টিতে তৈরী এক বিমূর্ত আইনগত সত্ত্বাকেই বুঝিয়ে থাকে।[১৮](পৃ:-১৩৪) আর তাই আমরা ইসলামে রাষ্ট্র সম্পর্কিত অনুরূপ ধারণা পাই না।[১৮](পৃ:-১৩৪)

সামাজিক শাসন ছাড়া কোনো মানুষই সামাজিক জীবনে সুখ, শান্তি, নিরাপত্তা পেতে পারে না। তাই সমাজের মধ্যে সামাজিক ইনসাফ কায়েম করতে হবে। আর এই ইনসাফ কায়েম করতে একটি শাসন ব্যবস্থা একান্ত জরুরী। আর এই শাসন ব্যবস্থা হলো এমন একটি শক্তি যা সকলের উপর কার্যকর থাকবে। ইংরেজীতে থাকে Coersive power বলে। এ শক্তি সম্পর্কে কুরআন মজীদের সূরা হাদীদে আল্লাহ তা'আলা পরিষ্কার করে বলেছেন :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ -

"আমরা আমাদের রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি ও হেদায়েতসহ পাঠিয়েছি এবং সেই সাথে কিতাব ও মানদন্ড নাযিল করেছি, যেন লোকেরা ইনসাফ ও সুবিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আর আমরাই লৌহ অবতীর্ণ করেছি।" (আল-কুরআন, সূরা আল হাদীদ, আয়াত-২৫)

আল্লাহ্ তাআলা বলেন– وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ আর আমরা ইস্পাত (হাদীদ) অবতীর্ণ করেছি। এখানে হাদীদ শব্দের অর্থ লোহা। লোহা হলো সে জিনিস যা খুব শক্ত এবং ধারালো যা অন্যকে কাটে। হাদীদের আর একটি অর্থ লোহার খনি। যে খনি দ্বারা মানুষ দা-কোদাল, কুড়াল কিংবা অস্ত্র-সস্ত্র ইত্যাদি তৈরী করে। কিন্তু এখানে হাদীদের অর্থ এমন শক্তি যার দ্বারা অন্য সব কিছুকে কাটা যায় বা দমিয়ে রাখা যায়। অর্থাৎ যবরদস্ত শক্তি– যার মুকাবেলা কেউ করতে পারে না। এ ধরনের ক্ষমতা থাকে একমাত্র সরকারের। যারা অবাধ্য, হঠকারী, যারা কোন প্রমাণ মানে না এবং ন্যায়-নীতি অনুযায়ী কাজ করতে সম্মত হয় না, সমাজের মধ্যে যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, যাদেরকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিলে সমাজে ন্যায়-ইনসাফ কায়েম করা সুদূর পরাহত হয়, তাদেরকে বশে আনার জন্যে, দমিয়ে রাখার জন্যে লোহা দ্বারা নির্মিত অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োজন– যা শাসকবর্গ ব্যবহার করে।

এরপর বলেছেন : فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ এতে রয়েছে শক্ত-শক্তি। সরকার সকলকে দমন রাখে, সকলকে শাসন করে, সকলের ওপরে শক্তি প্রয়োগ করে। কিন্তু সরকারের ওপর কারো শক্তি চলে না।

এরপর বলেছেন : وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ লোকদের জন্যে বিপুল কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আর এ কল্যাণের মধ্যে আছে রাষ্ট্র শক্তি। যে রাষ্ট্রশক্তির মুকাবেলা কেউ করতে পারে না। আর সে রাষ্ট্র শক্তি দ্বারা মানুষের কল্যাণ

হয়– ফায়দা হয়। মানুষের জন্যে এবং সমাজের জন্যে যদি কল্যাণকর কিছু করতে হয় তাহলে এই শক্তির প্রয়োজন। কারণ এ শক্তি ছাড়া মানুষের জন্য কল্যাণকর কোন কিছু করা সম্ভব নয়। সমাজের বুকে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হলে, সমাজকে অপরাধ মুক্ত করতে হলে এবং সেই সাথে আল্লাহ্‌র দেয়া জীবন ব্যবস্থাকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে হলে এ শক্তি ছাড়া সম্ভব নয়। কুরআনে বর্ণিত চুরি, ডাকাতি ও জেনাসহ বিভিন্ন বড় বড় অপরাধের শাস্তি কার্যকর করতে হলে রাষ্ট্র শক্তির বিকল্প নেই।

কাজেই যদি সরকারী ক্ষমতা ছাড়া এভাবে দ্বীনের অগণিত হুকুম রহিত হয়ে যায় এবং তার বাস্তবায়ন অসম্ভব হয়ে পড়ে, অথচ শরীয়াতের কোন অংশ পরিত্যাগ করা কুফরী মনোভাবেরই পরিচায়ক, ইসলামকে মেনে নেয়া হয়না, তাহলে তার পরিষ্কার অর্থ এই যে, রাষ্ট্র শক্তি ইসলামের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এসব দিক লক্ষ্য করে হযরত ওমর (রা:) যথাথই বলেছেন :

لاَاسْلاَمَ الاَّ بِجَمَاعَةٍ وَلاَجَمَاعَةَ الاَّ بِالاِمَارَةِ-

"সংঘবদ্ধতা ব্যতীত ইসলাম হতে পারে না এবং ইমারত (রাষ্ট্রব্যবস্থা) ব্যতীত কোন সংঘই (জামা'আত) সংঘ নয়।" (جامع بيان العلم) [১৭](পৃ:-১৬৮)

খ্যাতানামা তাবেয়ী হযরত কা'বুল আহবার (রহ) বলেন :

مَثَلُ الاِسْلاَمِ وَالسُّلْطَانِ وَالنَّاسِ مِثْلُ الْقِسْطَاطِ وَالْعَمُوْدِ وَالاَوْتَادِ وَالْقِسْطَاطِ الاِسْلاَمِ وَالْعَمُوْدِ السُّلْطَانِ وَالاَوْتَادِ النَّاسِ وَلاَ يُصْلِحُ بَعْضُهُمَا بِبَعْضٍ-

"ইসলাম, সরকার এবং জনসাধারণ– এ তিনের উদাহরণ (দৃষ্টান্ত) যথাক্রমে শামিয়ানা, আর খাম্বা ও খুঁটির ন্যায়। ইসলাম হচ্ছে– শামিয়ানা, সরকার তার খাম্বা এবং জনসাধাদরণ হলো এর খুঁটি। এর যে কোন একটি অপর দু'টি ব্যতীত সঠিক অবস্থায় থাকতে পারে না।" (আল আকদুল ফরীদ : ১ম খন্ড) [১৭](পৃ:-১৬৮)

মোটকথা রাষ্ট্র শক্তির ধারণা থেকে যদি ইসলামকে পৃথক করে দেখা হয়, তাহলে ইসলাম আর সে ইসলাম থাকে না, যা আল্লাহ তাআলা প্রেরিত, কুরআনে হাকীমে বর্ণিত এবং রাসূলে খোদা (সা:) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। ইসলামকে তার সঠিক রূপে তখনই দেখা সম্ভব, যখন তাকে রাষ্ট্র শক্তির সামনে সমাসীন করে দেখা হবে।

ইতিহাসের পাঠক মাত্রই জানেন, হযরত রাসূলে আকরাম (সা:) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পর সেখানে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন। শুধু তাই নয় হযরত মুহাম্মাদ (সা:)-এর পূর্বেও বিভিন্ন নবী রাসূল (আ:) রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। কুরআন মজীদ ও বাইবেলের দলিল থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, অন্তত: হযরত দাউদ ও হযরত সোলায়মান (আ:) রাষ্ট্র পরিচালনা করেছিলেন।[27]

অবশ্য ইসলামে রাষ্ট্র সংক্রান্ত আলোচনায় পূর্ববর্তী নবী রাসূলদের (আ:) উদাহরণ হয়ত কারো কারো কাছে অসঙ্গত মনে হতে পারে। তাঁদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া যেতে পারে যে, ইসলাম চৌদ্দশত বছর আগে সৃষ্ট নতুন কোন ধর্ম নয়। বরং ইসলাম হচ্ছে মানব জাতির জন্যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত একমাত্র দ্বীন বা জীবন বিধান যা হযরত আদম (আ:) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মাদ (সা:) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূল (আ:)

---

[27] কুরআন মজীদের সূরা ছোয়াদ-এর ২৬নং আয়াতে হযরত দাউদ (আ:)-এর রাজত্বকে সুদৃঢ় করার কথা বলা হয়েছে। বাইবেলে উল্লেখ আছে, হযরত দাউদ (আ:) ত্রিশ বছর বয়সে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। (শামুয়িল : ৫:৪) এছাড়া সূরা ছোয়াদের ৩৫-৩৯ নং আয়াতে হযরত সোলায়মান (আ:)-এর অতুলনীয় রাজত্ব প্রার্থনা ও রাজত্ব দানের কথা উল্লেখ আছে এবং বাইবেলে বলা হয়েছে যে, তিনি চল্লিশ বছর রাজ্যশাসন করেন। (রাজাবলি : ১১:৪২)।

মানুষের সামনে পেশ করেছেন তা যে যুগে, যে ভাষায়, যে নামেই হোক না কেন। অবশ্য মানব জাতির প্রাথমিক স্তরে মানুষের জীবন যাত্রা যখন খুবই সহজ সরল ছিল তখন এ দ্বনের সকল বিধি-বিধানের প্রয়োগক্ষেত্র বিদ্যমান ছিল না, তাই তখনকার প্রয়োজন অনুযায়ীই বিধি-বিধান নাযিল হয়েছে। পরে ধীরে ধীরে তা পূর্ণতর আকারে নাযিল হতে হতে সবশেষে হযরত মুহাম্মাদ (সা:)-এর মাধ্যমে এ দ্বীন পরিপূর্ণতা লাভ করে। আল্লাহ্ তাআলা এ প্রসঙ্গে কুরআন মজীদে ইরশাদ করেন :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

"আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে তোমাদের জন্যে সম্পূর্ণ করে দিয়েছি এবং তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করে দিয়েছি। আর ইসলাকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে কবুল করে নিয়েছি।" (আল কুরআন, সূরা আল মায়েদা, আয়াত-৩।

পূর্ণতা দানের অর্থই হলো পূর্ব থেকে চলমান কোন অপূর্ণ বস্তুর পূর্ণতা বিধান করা। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা এখানে দ্বীনকে পূর্ণতা দানের কথা উল্লেখ করেছেন, সেহেতু এ দ্বীন (ইসলাম) নতুন কোন দ্বীন নয়; বরং এটি পূর্ব থেকে চলে আসা দ্বীনের সামগ্রিক ও পূর্ণরূপ মাত্র। অতএব, হযরত আদম (আ:) থেকে শুরু করে সকল নবী-রাসূল (আ:) এবং তাঁদের একনিষ্ঠ অনুসারীরা এ দ্বীনেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।[28]

যাই হোক, হযরত মুহাম্মাদ (সা:) এবং আরো কোন কোন নবী-রাসূল (আ:) দ্বারা রাষ্ট্র পরিচারিত হবার পর আর ইসলামে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকতে পারে না। তবে কারো মনে এ সংশয় সৃষ্টি হতে পারে যে, তাঁদের রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ হয়তবা ঘটনাক্রমের ব্যাপার, অথবা নবী হওয়ার কারণে বিশেষ মর্যাদা বলে হয়েছেন, অন্যথায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ইসলামের লক্ষ্য নয়। এহেন সংশয় নিরসনের জন্যে কুরআন মজীদে বহু দলিল রয়েছে। আমরা এখানে তা থেকে মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করব।

বস্তুত: ইসলামের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত লক্ষ্যই হচ্ছে এ জীবন-বিধানকে অন্য সকল জীবন বিধানের ওপর বিজয়ী করা হবে এবং একে পুরোপুরি বাস্তবায়িত করা হবে। এ লক্ষ্যে কেবল হযরত রাসূলে আকরামের (সা:) সময়ই নির্ধারিত হয়নি বরং সকল নবী-রসূলের (আ:) যুগেই নির্ধারিত ছিল। এরশাদ হয়েছে :

---

28 কুরআন মাজীদ যে, হযরত আদম (আ:) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা:) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূলকে (আ:)-এক অভিন্ন দ্বীন (ইসলাম)-এর প্রচারক গণ্য করে এবং তাঁদেরকে ও তাঁদের প্রকৃত অনুসারীদের মুসলিম গণ্য করেছে তার বহু প্রমাণ রয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ:)-এর দুআ : رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ. -"হে আমাদের রব! আমাদের দুজনকে তোমার অনুগত (মুসলিম) বানিয়ে দাও এবং আমাদের বংশধরদের মধ্য থেকে তোমার অনুগত (মুসলিম) একটি জাতির উদ্ভব ঘটাও।" (বাকারাহ : ১২৮)। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে :.[illegible] "ইবরাহীম ইহুদীও ছিল না, খৃষ্টানও ছিল না, বরং সে ছিল একজন একনিষ্ঠ মুসলিম।" (আলে ইমরান-৬৭)। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর দুআ: تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ: -"হে আসমানসমূহ ও জমীনের স্রষ্টা! ইহকাল ও পরকালে তুমিই আমার পৃষ্ঠপোষক; আমাকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যুদান কর এবং পরিণামে আমাকে সৎকর্মশীলদের সাথে মিলিত কর।" (ইউসুফ : ১০১)। হযরত ইয়াকুব (আ:)-এর ইন্তিকালের সময় তাঁর পুত্রগণ তাঁর প্রশ্নের জবাবে বলেন : نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. -"আমরা আপনার ইলাহ এবং আপনার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের ইলাহ সেই এক ও অদ্বিতীয় ইলাহ্র ইবাদত করব এবং তাঁর অনুগত (মুসলিম) হয়ে থাকব।" (বাকারাহ-১৩৩)। হযরত ঈসা (আ:)-এর ঘনিষ্ঠ শিষ্যগণ (হাওয়ারীগণ) তাঁর এক প্রশ্নের জবাবের শেষাংশে বলেন : وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ-"আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা মুসলিম।" (আলে-ইমরান-৫২)। হাওয়ারীগণ আল্লাহকে উদ্দেশ্য করেও একই কথা বলেছিলেন। (মায়েদা : ১১১)। হযরত নূহ (আ:) বলেন :.وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ -"আর আমি তো মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত থাকার জন্যেই আদিষ্ট হয়েছি।" (ইউনুস : ৭২)। এ ধরণের আরো বহু প্রমাণ রয়েছে।

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْنَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ-

"তিনি তোমাদের জন্যে জীবন-বিধান বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন যার আদেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন এবং (হে মুহাম্মাদ (সা:)) এখন যা তোমার প্রতি ওহী করেছি, আর যে নির্দেশ আমি ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে দিয়েছি। তা হচ্ছে : তোমরা এ জীবন-বিধানকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং এ (জীবন-বিধান) প্রশ্নে তোমরা বহুধাবিভক্ত হয়ে যেয়ো না।"

আরো ইরশাদ হচ্ছে :

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ اللهِ-

"তিনি হেদায়াত ও সত্যিকারের জীবন-বিধান সহকারে তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন, যেন তিনি তাকে (এ জীবন বিধানকে) সকল মতবাদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেন।"(আল কুরআন, সূরা তাওবাহ, আয়াত-৩৩, সূরা ফাত্হ, আয়াত-২৮, সূরা ছাফ, আয়াত-৯)

বস্তুত: নবী প্রেরণের অন্যতম উদ্দেশ্যই ছিল, তাঁরা আল্লাহ্র দেয়া বিধান অনুযায়ী মানুষের মাঝে বিচার ফয়সালা করবে। ইরশাদ হচ্ছে–

وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

"আর তিনি তাদের (রাসূলদের) সাথে কিতাব অবতীর্ণ করলেন যাতে তারা লোকদের মাঝে তাদের বিরোধের বিষয়ে বিচার-ফয়সালা করে দেয়।" (আল-কুরআন, সূরা আল বাকারাহ, আয়াত-২১৩)

হযরত দাউদ (আ:)-কে সম্বোধন করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

يَادَاوُدَ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ-

"হে দাউদ! আমরা তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি (খলিফা) বানিয়েছি, অতএব লোকদের মধ্যে সততার সাথে ন্যায়ভাবে বিচার-ফয়সালা ও শাসনকার্য পরিচালনা কর।" (আল-কুরআন, সূরা ছোয়াদ, আয়াত-২৬)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত রাসূলে আকরাম (সা:)-কে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন–

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ

"নি:সন্দেহে আমরা তোমার প্রতি সত্যতা সহকারেই এ গ্রন্থ নাযিল করেছি যাতে আল্লাহ তোমাকে যেভাবে পথনির্দেশ করেছেন সেভাবে তুমি লোকদের মাঝে বিচার-ফয়সালা কর।" (আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত-১০৫)

সূরা নিসার ৬৫তম আয়াতে রাসূল (সা:)-কে মানব জাতির জন্যে প্রশ্নাতীত বিচার কর্তারূপে উল্লেখ করা হয়েছে। একই সূরার ৫৮তম আয়াতে মুসলমানদেরকে লোকদের মাঝে ইনসাফের সাথে বিচার-ফয়সালা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এছাড়া আরো বহু আয়াতে বিচার-ফয়সালা প্রসঙ্গ উল্লেখ করে নবী ও মুমিনদেরকে ন্যায়ভাবে বিচার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে অনৈসলামী বিচার-ফয়সালা কামনার নিন্দা করা হয়েছে। (আল-কুরআন, সূরা মায়েদাহ, আয়াত-৫০)

এমনকি খোদায়ী বিধান অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা এবং শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কঠিন হুঁশিয়ারীও উচ্চারণ করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে–

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

-"আর যারা আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার কার্য– শাসনকার্য পরিচালনা করে না তারা কাফের।" (আল-কুরাআন, সূরা মায়েদাহ, আয়াত-৪৪)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ -

"আর যারা আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করে না তারা যালেম।" (আল-কুরআন, সূরা মায়েদাহ, আয়াত-৪৫)

অন্য আয়াতে আসছে

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ -

"আর যারা আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করে না তারা ফাসেক।" (আল-কুরআন, সূরা মায়েদাহ, আয়াত-৪৭)

অতএব কুরআনের অনুসারী কোন মুসলমানের পক্ষে আল্লাহ প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী সমাজে বিচার-ফয়সালা করার দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার কোনোই উপায় নেই। আর যেহেতু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বা রাষ্ট্র ক্ষমতা ছাড়া বিচার-ফয়সালার দায়িত্ব পালন সম্ভব নয় সেহেতু মুসলমানদের জন্যে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বা প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের ইসলামী করণ অপরিহার্য কর্তব্য।

ইসলামী রাষ্ট্র ও সংশ্লেষণবাদ :

রাষ্ট্র-সম্পর্কিত ধারণায় প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য দু'টি ভিন্ন ধারার প্রতিনিধিত্ব করে। সাংবিধানিক কাঠামোগতভাবে এ দু'টি ধারণার মাঝে রয়েছে দুর্লঙ্ঘনীয় পার্থক্য।

এর একদিকে রয়েছে পাশ্চাত্যের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বিশ্বমাত্রিক আদর্শ, যেখানে ধর্ম ও রাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে না হলেও যথেষ্ট পৃথক। ফ্রান্স ও মেক্সিকোতে এই মতবাদের মোটামুটি যথার্থ প্রয়োগ ঘটেছে, অপরদিকে অন্যান্য পাশ্চাত্য প্রজাতন্ত্রে বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও জার্মানীতে ধর্ম এবং রাষ্ট্র কোন না কোনভাবে এখনো সম্পর্কযুক্ত রয়ে গেছে (ধর্মীয় শিক্ষা : বিদ্যালয়ে প্রার্থনানুষ্ঠান, চার্চ কর, ছুটির দিন, মর্যাদর সাথে রবিবার পালন, ধর্মীয় শপথ ইত্যাদি)। আইনের শাসন, দল ও মতের বৈচিত্র্য এবং ক্ষমতা বিভাজনের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যে কোন খাঁটি গণতান্ত্রিক দেশের জন্যে ধর্ম ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণ একটি অপরিহার্য মৌলিক পূর্বশর্ত (Condition sine qua non) হিসেবে পাশ্চাত্য বিশ্বে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হয়েছে। এর বিপরীতে রয়েছে ইসলামের সংশ্লেষণবাদ, রাষ্ট্র ও ধর্মের একত্রীকরণের আদর্শ।

খৃষ্টান পক্ষ তারা উপস্থাতিপ করেছে "যা কিছু সিজারের প্রাপ্য তা সিজারকে দাও এবং যা কিছু ঈশ্বরের প্রাপ্য তা ঈশ্বরকে দাও"– বাইবেলের এই শ্লোকটি। প্রত্যুত্তরে ইসলামের শ্লোগান হচ্ছে : দ্বীন ওয়া দাওলাহ (ইসলাম একধারে ধর্ম ও রাষ্ট্র)।

যদিও এই শ্লোগানটি সরাসরি কুরআনে পাওয়া যাবে না, তথাপি কুরআন তার সামগ্রিক দুটি ভঙ্গির মাধ্যমে সংশ্লেষণ বাদকেই তুলে ধরেছে। এখানে মানুষকে দেখা হয় নৈতিকপ্রাণী হিসেবে; রাষ্ট্রের নাগরিক বা পরিবারের সদস্য যে কোন অবস্থান থেকেই তার চিন্তা-চেতনা হবে সদা-সর্বদা ধর্ম কেন্দ্রিক। ইসলাম মানুষকে

বিচার করে জীবনের সামগ্রিকতার প্রেক্ষিতে। মানব জীবন বলতে ইসলাম পৃথিবীর হাতে গোনা কয়টি দিনকে বোঝে না।

মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ একটি মতিভ্রম, যা একটি আত্ম-প্রবঞ্চনাও হতে পারে। তাদের কাছে স্বতসিদ্ধ হচ্ছে : আদর্শবাদ ছাড়া কোন রাষ্ট্র চলতে পারে না। আপাত নিরপেক্ষ সেক্যুলারিজম ও প্রকৃত পক্ষে একটি ভেল্টআনশাউ (বিশ্ববীক্ষা) তথা আদর্শবাদই বটে। বাস্তবিকই, আমরা যখন ফ্রান্স অথবা কামাল পাশা পন্থী, তুরস্কের দিকে তাকাই তখন দেখতে পাই তাদের ধর্মকে অস্বীকার করবার নীতিটিও আসলে একটি অপধর্মীয় আদর্শই বটে! এবং যেহেতু অস্থায়ী ভিত্তির উপর কারো পক্ষে একটি পরিপূর্ণ বিশ্বাসকে ধরে রাখা সম্ভব নয়, সেহেতু ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করে নেবার প্রচেষ্টাটি প্রকারান্তরে মানুষকে মানসিকভাবে রোগাগ্রস্থ (Schizophrenic) করে ফেলে, ফলে তার চিন্তা-চেতনা, অনুভূতি ও কর্মের মাঝে কোন সামঞ্জস্য থাকে না। একজন সত্যিকার বিশ্বাসী তার ধর্ম বিশ্বাসকে নোংরা জামাকাপড়ের মত খুলে ফেলতে পারে না।

ম্যাকিয়াভেলির পূর্বযুগে এমনকি উনবিংশ শতকের বেশ কিছু অংশ জুড়ে খৃষ্টান সমাজেও এই ধরণের বিশ্বাসই প্রচলিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে ইউরোপয়ী খৃষ্ট সমাজের আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে রূপান্তরের প্রক্রিয়াটি আত্মিক অনুভূতি সম্পন্ন মানবতার বিরুদ্ধে অ-ধর্মীয় শক্তি সমূহের বিজয়ের ফলশ্রুতি মাত্র। অষ্টাদশ শতকে যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বারুদে অগ্নিসংযোগ করেছিলেন, তথা আলোকায়নের যুগ (Age of enlightenment) এর নায়ক ভলটেয়ার, প্রশিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডরিখ, লেসিং এবং কান্টদের উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক প্রতাপশালী চার্চগুলোকে তাদের স্ব-স্ব অবস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। পরিশেষে তারা স্বয়ং চার্চগুলোকেই ধর্মচ্যুত করে ছেড়ে দিয়েছে। তখন থেকে রাষ্ট্রকেই যেন দেবালয়ে পরিনত করে উপাস্য বিবেচনা করা শুরু হলো। যার মূলে রইল কতগুলো রাজনৈতিক তত্ত্ব, যেগুলোর অবগুণ্ঠন সরিয়ে দিলে সেখানে শুধুমাত্র পরিলক্ষিত হবে একটি বিকল্প অধিবিদ্যা।

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অপরিহার্যতা :

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় امر بالمعروف ونهى عن المنكر -ভালো কাজের আদেশ দান এবং মন্দ কাজ প্রতিহত করণ-কে মুসলমানদের জন্যে অপরিহার্য করা হয়েছে। কুরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াত ও বহু হাদীসে বিষয়টি উল্লেখিত হয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে :

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

"তোমরাই হচ্ছো শ্রেষ্ঠ জাতি যাদেরকে মানুষের (পথনির্দেশ ও পরিচালনার) জন্যে বহির্গত (নির্বাচন) করা হয়েছে, তোমরা ভালো কাজের আদেশ কর, মন্দ কাজ প্রতিহত কর আর আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান পোষণ কর।" (আল-কুরআন, সূরা আলে-ইমরান, আয়াত-১১০)

আরো ইরশাদ হয়েছে :

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ

"তোমাদের মধ্যে যেন অবশ্যই এমন একটি জনগোষ্ঠী থাকে যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং ভালো কাজের আদেশ দেবে ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে।" (আল-কুরআন, সূরা আলে-ইমরান, আয়াত-১০৪)

হযরত রাসূলে আকরাম (সা:) ইরশাদ করেন :

وَالَّذِيْ نَفْسِى بِيَدِه لَتَامُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ لَيُؤْشَكَنَّ اللهُ اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ عِنْدِه ثُمَّ لَتَدْ عُنَّهُ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ-

"তাঁর শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, নিশ্চয়ই তোমরা ভালো কাজের নির্দেশ দেবে এবং অবশ্যই মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে, অন্যথায় আল্লাহ তাঁর নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের ওপর কঠিন শাস্তি প্রেরণ করবেন, এরপর তোমরা তাঁকে ডাকবে, কিন্তু তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবেন না।" (তিরমিযী) [৪৮](পৃ:-১৮০)

তিনি আরো ইরশাদ করেন :

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ مُرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَوْ عَنِ الْمُنْكَرِ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَدْعُوْنِىْ فَلاَ اُجِيْبَكُمْ وَتَسْأَلُوْنِىْ فَلاَ اُعْطِيَكُمْ وَتَسْتَنْصِرُوْا نِىْ فَلاَ انْصُرُوَكُمْ-

"হে জনগণ! নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন যে, তোমরা অবশ্যই ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে সেই অবস্থা সৃষ্টি হবার পূর্বে যখন তোমরা আমাকে ডাকবে কিন্তু আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব না, আর তোমরা আমার কাছে চাইবে কিন্তু আমি তোমাদেরকে প্রদান করব না এবং তোমরা আমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে কিন্তু আমি তোমাদের সাহায্য করব না।" (মুসনাদে আহমদ ও ইবনে মাজাহ) [৪৮](পৃ:-১৮৭)

আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত অপর একটি হাদীসের শেষাংশে রাসূল (সা:) বলেন :

قَالَ كَلاَّ وَاللهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَى الظَّلِمِ وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ اِطْرًءً وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا اَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللهُ بِقُلُوْبِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ لَيَلْعَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَّهُمْ-

"তিনি বলেন, আল্লাহ্র শপথ! এর ব্যতিক্রম কখনো হতে পারে না, হয় তোমরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ন্যায় কাজের নির্দেশ করবে, অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে লোকদের বিরত রাখবে এবং জালিমদের হাত ধমন করে তার জুলুম বন্ধ করে দেবে এবং অন্যায় পথ থেকে তাকে ফিরিয়ে সত্যের দিকে চালিত করবে। একমাত্র সত্যের উপর তাকে প্রতিষ্ঠিত করে দেবে। অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের মনকে পরস্পরের দ্বারা সংঘাত ও পাপে জর্জরিত করে দেবেন এবং পূর্বকালের পাপিদের ন্যায় তোমাদের ওপরও অভিশাপ নাযিল করবেন।" (আবু দাউদ)[৪৮](পৃ:-১৮৩)

অন্য হাদীসে আসছে–

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُفِ وَلَتَنْهَوْنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَحَاضُّنَّ عَلَى الْخَيْرِ اَوْ لَيَسْحِتَنَّكُمْ اللهُ وَجَمِيْعًا بِعَذَابٍ اَوْ لَيُؤَمِّرُنَّ عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ ثُمَّ يَدْعُوْ خِيَارُكُمْ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ-

"নবী করীম (সা:) বলেন : তোমরা অবশ্য সৎ কাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজের নিষেধ করবে, লোকদের বিরত রাখবে এবং তাদেরকে কল্যাণময় কাজ করার জন্যে উৎসাহিত করবে। অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা যে কোন আযাবে তোমাদের সকলকেই ধ্বংস করে দিবেন কিংবা তোমাদের মধ্য হতে সর্বাধিক

পাপাচারী, অন্যায়কারী ও জালিম লোকদেরকে তোমাদের উপর শাসনকর্তা নিযুক্ত করে দিবেন। এই সময় তোমাদের মধ্যকার নেককার লোকেরা মুক্তি লাভের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ প্রার্থনা ও কান্নাকাটি করবে; কিন্তু তার কিছুই আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল করা হবে না।" (মুসনাদে আহমদ)[৪৮](পৃ:-১৮৯,১৯০)

প্রনিধানযোগ্য যে, কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য জায়গায় 'আমর বিল মা'রুফ ও নাহী আনিল মুনকার' করার জন্যে মুসলমানদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একথা সর্বজনবিধিত যে, আমর শব্দের অর্থ কেবল মৌলিক হুকুম দেয়া হতে পারে না; বরং এর সঠিক অর্থ হচ্ছে শক্তি প্রয়োগ করে কোন কাজ সম্পাদন করানো। অপর দিকে নাহী অর্থ মৌখিক নিষেধ নয়; বরং শক্তি প্রয়োগ করে কোন কাজ থেকে লোকদের বিরত রাখাই নাহী। আর এটি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছাড়া কার্যকর করা সম্ভব নয়। কাজেই اسباب الواجب واجب -ওয়াজিব পালনের উপায়-উপায়াদিও ওয়াজিব অর্থাৎ যে কাজ অবশ্য কর্তব্য সে কাজ যার উপর নির্ভরশীল তা-ও অপরিহার্য। অতএব মুসলমানদের জন্যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বা রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তগতকরণ অপরিহার্য কর্তব্য।

এক আয়াতে সুস্পষ্টভাবেই রাষ্ট্র ক্ষমতার কথা উল্লেখ আছে এবং ভালো কাজের আদেশ দান ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার বিষয়টি যে রাষ্ট্র ক্ষমতার সাথে জড়িত তাও উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ -

"এরা সেই লোক আমরা যদি তাদেরকে পৃথিবীতে রাষ্ট্রক্ষমতা প্রদান করি তাহলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে ও মন্দ কাজ প্রতিহত করবে।" (আল-কুরআন, সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত-৪১)

কুরআনের দৃষ্টিতে মুসলিম সমাজ মূলত: একটি রাষ্ট্রভিত্তিক সমাজ। রাষ্ট্র ব্যবস্থার ধারণাবিহীন মুসলিম সমাজের কোন ধারণাই কুরআন পেশ করে না অথবা কমপক্ষে অন্য কোন ধারণা সে পেশ করতে চায় না। তবে কুরআন সরাসরি বলে না যে, হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের জন্যে একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করো! একথা বলার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ এটি দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট ও স্থিরীকৃত সত্য সম্পর্কে ঘোষণা বাণীর বাহুল্যই হতো। যেখানে গ্রীষ্ম ও রৌদ্রের তীব্রতার আলোচনা চলে সেখানে সূর্যের অস্তিত্ব ব্যাখ্যার কোন সুযোগই থাকে না। মুসলমানদের নিকট তাদের নেতৃবৃন্দ ও শাসকবর্গের প্রতি আনুগত্যের দাবি করা ও তাদেরকে অপরাধীদের বিরুদ্ধে একজন শাসকের মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করার মতো দায়িত্বশীল গণ্য করা প্রকৃতপক্ষে একথাই প্রমাণ করে যে, তারা রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনে জীবন যাপন করে অথবা তাদেরকে এভাবে জীবন যাপন করা উচিত। নেতা ও শাসকবর্গের আনুগত্যের নির্দেশ দিয়ে কুরআন ঘোষণা করছে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য কর এবং আনুগত্য কর রাসূল (সা:) ও তোমাদের মধ্য হতে নেতৃবর্গের।" (আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত-৫৯)

অপরদিকে যে আয়াতগুলোয় মুসলমানদেরকে একটি সরকারের ন্যায় পদক্ষেপ গ্রহণ করার মতো দায়িত্বশীল গণ্য করা হয়েছে, তার মধ্যে একটি আয়াত হচ্ছে

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

"পুরুষ চোর বা মেয়ে চোর উভয়েরই হাত কেটে দাও।" (আল-কুরআন, সূরা মায়েদা, আয়াত-৩৮)

এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী লিখেছেন– কালাম শাস্ত্রে অভিজ্ঞ আলেমগণ এ আয়াতটিকে মুসলমানদের জন্যে নিজেদের মধ্যে একজন শাসক নিযুক্ত করার অপরিহার্যতার প্রমাণ বলে গণ্য করেছেন। তাঁদের যুক্তি হলো, আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতের মাধ্যমে চোরের শাস্তি দেয়াকে ওয়াজিব ঘোষণা করেছেন। অন্যদিকে অপরাধীদের শাস্তি দানের প্রশ্নে মুসলমানদের সর্বসম্মত মত হচ্ছে, শাসক ছাড়া আর কারোর জন্যে তাদেরকে শাস্তি দেয়া বৈধ নয়। কাজেই অপরাধীর শাস্তি দান করা যখন একটি অনিবার্য দায়িত্ব এবং একজন শাসক ছাড়া এ দায়িত্ব সম্পন্ন করা সম্ভব নয়, উপরন্তু এ-ও একটি সুস্পষ্ট সত্য যে, যে কাজের উপর কোন ওয়াজিব কাজ সম্পাদন নির্ভর করে এবং তা ক্ষমতা ও সামর্থ্য বহির্ভূত নয়, তা স্বত:স্ফূর্তভাবে ওয়াজিব হয়ে যায়– তখন শাসক নিয়োগ করা ওয়াজিব ও অবশ্যম্ভাবী। (তাফসীরে কাবীর,৩য় খন্ড,পৃ:৪১৫)। এভাবে কুরআনে হাকীমের হুদুদ সম্বলিত অন্যান্য আয়াতের ক্ষেত্রেও একই বিধান কার্যকর।

ইসলাম জিহাদের আহ্বান জানিয়েছে, প্রতিরক্ষার পূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহনের স্পষ্ট বলিষ্ঠ নির্দেশ দিয়েছে, হদ্দ সমূহ কার্যকর করার হুকুম দিয়েছে, অপরাধের শাস্তি বিধান করেছে ও তা প্রয়োজন অনুযায়ী অপরাধীর উপর প্রয়োগ করার হুকুম দিয়েছে, মজলুমের প্রতি ইনসাফ করার আহ্বান জানিয়েছে, জালিমকে প্রতিরোধ করতে বলেছে এবং অর্থ ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ বিধানও উপস্থাপিত করেছে। এসবের প্রতি লক্ষ্য দিলে এতে আর কোনই সংশয় থাকতে পারে না যে, আল্লাহ তা'আলা এমন একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করতে বলেছেন, যা এই সব আইন-বিধান-নির্দেশ পুরোপুরি ও যথাযথভাবে কার্যকর করবে।

এছাড়া মূল দ্বীন– ইসলামের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেও জানা যায় যে, ইসলামের মৌল বিধান ও নিয়ম-পদ্ধতি এই ধরনেরই এক পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি জানায়। অন্যথায় তা কখনই বাস্তবায়িত হতে পারে না। দুটি দিকে দিয়ে তার বিবেচনা করা চলে :

প্রথমত: কুরআন-সুন্নাহর অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে ইসলাম তার অনুসারী ও বিশ্বাসীদের ঐক্য ও একাত্মতা একান্তই অপরিহার্য বলে ঘোষণা করেছে। তাদের ছিন্ন-ভিন্ন, পরস্পর সম্পর্কহীন ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যাওয়া ও পরস্পর মতপার্থক্যে লিপ্ত হওয়া থেকে অত্যন্ত বলিষ্ঠতার সাথে নিষেধ করেছে। ফলে ইসলাম সম্পর্কে সকলেরই একথা জানা হয়ে আছে যে, ইসলামের ভিত্তি দু'টি কালিমার উপর প্রতিষ্ঠিত : তাওহীদের কালিমা (ঐক্যের বাণী) ও কালিমায় তাওহীদ (বাণীর একতা)। কুরআন মাজীদ উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছে :

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ -

"জেনে রাখবে, এটাই আমার সুদৃঢ় ঋজু পথ। অতএব তোমরা সকলে এ পথ অনুসরণ করেই চলতে থাক। নানা পথ তোমরা অনুসরণ করো না। তাহলে তোমাদেরকে সে পথসমূহ এই সঠিক দৃঢ় পথ থেকে বিচ্যুত করে বিভিন্ন দিকে নিয়ে যাবে। আল্লাহ তোমাদেরকে তার প্রদর্শিত পথ-ই অনুসরণ করবার নির্দেশ দিয়েছেন এই উদ্দেশ্যে যে, তোমরাই সেই বিভিন্ন পথ থেকে বাঁচতে পারবে।" (আল-কুরআন, সূরা আল আনআম, আয়াত-১৫৩)

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا -

"তোমরা সকলে মিলিত হয়ে শক্ত করে আঁকড়ে ধর আল্লাহ্‌র রজ্জু এবং তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না।"
(আল-কুরআন, সরা আলে ইমরান, আয়াত-১০৩)

এক কথায় ইসলামের লক্ষ্য হচ্ছে মুসলিম উম্মাতের ঐক্য ও একাত্মতা। এ কথারই ব্যাখ্যা করে নবী করীম (সা:) নিজের ভাষায় বলেছেন :

Dhaka University Institutional Repository

مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مِنَ الْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ الْمَرْصُوْصِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا-

"একজ মু'মিনের সাথে অপর মু'মিনের সম্পর্কের দৃষ্টান্ত হচ্ছে সীসাঢালা সুদৃঢ় প্রাচীরের মত। একজন অপরজনকে শক্ত ও দৃঢ় করে।" (মুসনাদ আহমদ : ৩য় খন্ড, আসহাবুস সিহ্হাহ ওয়াস মিনিন) [৪৫](পৃ:-২২)

মুসলমানদের এ ঐক্যবদ্ধ সামষ্টিক জীবন দুর্গের ন্যায় সুরক্ষিত রাখা আবশ্যক। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে রাসূলে করীম (সা:) বলেছেন :

مَنْ اَتَاكُمْ وَاُمْرُكُمْ جَمِيْعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيْدُ اَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ اَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوْهُ-

"তোমরা যখন এক ব্যক্তির নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ, তখন যদি কোন লোক তোমাদের আসিকে চূর্ণ করতে কিংবা তোমাদের সংঘবদ্ধতাকে ছিন্ন-ভিন্ন করতে চেষ্টিত হয়, তাহলে তোমরা সকলে মিলে তাকে হত্যা কর।" (মুসলিম শরীফে বর্ণিত) [৪৫](পৃ:-২২)

কুরআন ও হাদীস- ইসলামের এই মৌল উৎস উম্মতে মুসলিমার যে ঐক্য ও একাত্মতার বলিষ্ঠ তাকীদ করছে, নিজেদের মধ্যে পূর্ণ শৃঙ্খলাবদ্ধতা ও গভীর একাত্মতা সৃষ্টি করার জোর তাকীদ জানাচ্ছে, কোনক্রমেই প্রতিষ্ঠিত ঐক্য ও একাত্মতা চূর্ণ করতে বা চূর্ণ করার সুযোগ দিতেও নিষেধ করা হয়েছে। এমনকি কোন লোক সেই ঐক্যকে চূর্ণ করার চেষ্টা করলে তাকে সকলে মিলে হত্যা করতে পর্যন্ত স্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তা বাস্তবে কি করে সম্ভব হতে পারে? সকলেই স্বীকার করবেন যে, তা সম্ভব হতে পারে কেবলমাত্র ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে। অন্যথায় এ কাজ কখনই বাস্তবে সম্ভব হতে পারে না। একটি রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব বিভিন্ন লোকের মধ্যে মতের ঐক্য সৃষ্টি করা– ইসলামী আদর্শ সম্পূর্ণ বাস্তবায়নের মাধ্যমে। ইসলামী রাষ্ট্রই পারে সকল নাগরিকের সমান মানের কল্যাণ নির্ধারণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে পরম একাত্মতা সৃষ্টি করতে, পাস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা করতে, বিভ্রান্ত ও বিচ্ছিন্নতাকারীকে ঐক্যের দিকে ফিরিয়ে আনতে ও পুনরায় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করতে। মোট কথা, রাষ্ট্রই হচ্ছে ঐক্য সৃষ্টিকারী ঐক্য বিরোধী তৎপরতা প্রতিরোধকারী, পারস্পরিক মতবিরোধ ও পার্থক্য বিদূরণকারী।

দ্বিতীয়ত: নাগরিকদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক অধিকার, অর্থনৈতিক ন্যায্য প্রাপ্য পর্যায়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ইসলামের আইন-বিধানসমূহ অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা করলেও বোঝা যায় যে, এ সবের প্রকৃতিই একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থার দাবিদার।

এ পর্যায়ে রাসুল্লাহ (সা:)-এর আদর্শ সমস্ত দুনিয়ার নিকট সুস্পষ্ট। তিনি পরোক্ষভাবে প্রথম থেকেই হুকুম ও নির্দেশদাতা ছিলেন। কিন্তু হিজরতের পর তাঁর এ মর্যাদা বাহ্যত ও পারিভাষিক অর্থেও সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয় এবং এরপর থেকে তার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তা অধিকতর প্রকাশিত থাকে। ঈমানদারগণ এক জাতি, এক মিল্লাত ও এক দলভুক্ত ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা:) ছিলেন তাদের আমীর। সমস্ত মুসলিম এলাকা একটি রাষ্ট্র ও গভর্ণমেন্ট বলতে যা বুঝায় মুসলিম অধিবাসীগণ ও রাসূলুল্লাহ (সা:)-এর মাধ্যমে তা পরিপূর্ণ অস্তিত্ব লাভ করেছিল। এর অর্থ দাঁড়ায় : তাঁর মাদানী জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত সাক্ষ্য দেয় যে, ইসলামের সাথে, মুসলিম সমাজের সাথে, রিসালাতের পদ-মর্যাদার সাথে একটি রাষ্ট্র ও সরকারের ধারণা নীতিগতভাবে সব সময় এবং কার্যত: সম্ভাব্য পর্যায়ে অবশ্য সংশ্লিষ্ট ছিল। অন্যথায় স্বীকার করতে হবে যে, আল্লাহ্র রাসূল এমন একটি কাজ করেছেন এবং বার বার করেছেন, আল্লাহ্র দ্বীনের সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই। তিনি এমনই একটি মর্যাদা লাভ করেছেন যা নবুয়াতের দাবির সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল না। কিন্তু এই ধারণা পোষণ করা অন্যের জন্যে হয়তো সম্ভব হতে পারে, কিন্তু যারা রাসূলুল্লাহ (সা:)-কে নবী বলে স্বীকার করে তাদের জন্য সম্ভব নয়।

এ বিষয়ে সাহাবাদের (রা:) আদর্শ ছিল : যখন রাসূলুল্লাহ (সা:)-এর ইন্তেকাল হয়, তখন সাহাবীগণ যে কাজটিকে সবচেয়ে গুরুত্ব দেন এবং অন্যান্য কাজের ওপর যেটিকে অগ্রাধিকার দান করেন তা হলো রাসূলুল্লাহ (সা:)-এর খলীফা নির্বাচন ও খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা। এমনকি রাসূলুল্লাহ (সা:)-কে দাফন করার কাজটিও তাঁরা পিছিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) মৃতদেহ মোবারক রেখে দিয়ে তারা খলীফা নির্বাচনে ব্রতী হন এবং খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর দাফনকার্য সম্পন্ন করেন। সাহাবীগণের এ কার্যপদ্ধতিতে কোন মতানৈক্য ছিল না এবং এটি সাময়িকও ছিল না; বরং এটি ছিল সর্ববাদী সম্মত ও স্থায়ী কার্যপদ্ধতি।[29] অর্থাৎ তাঁরা সর্ব সম্মতিক্রমে এ পদ্ধতি গ্রহণ করেন তারপর পরবর্তীকালে এ একই নীতি 'উত্তরাধিকারী' নির্বাচন না করা পর্যন্ত তাঁরা তাঁর মৃতদেহ মোবারক দাফন করার দিকে নজর দেননি। (শরহে আকায়েদে নাসাফী, পৃ:-১১০) [১৫](পৃ:-৬৫)

সাহাবীগণের (রা:) এই সর্বসম্মত ও স্থায়ী কার্যপদ্ধতি রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রয়োজন ও গুরুত্ব সম্পর্কে তাদের যে গভীর অনুভূতির পরিচায়ক পৃথিবীর ইতিহাসে কদাচিৎ তার কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যেতে পারে। মুসলিম সমাজ কখনো একজন নেতা ও খলীফা ব্যতীত অন্য কথায় একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কাঠামো ছাড়া কোনভাবেই থাকতে পারে না সে সম্পর্কে এটি ছিল তাঁদের সংশয়াতীত ঐকমত্য।

কুরআন, হাদীস, রাসূলুল্লাহ (সা:)-এর কার্যাবলী ও বাণী এবং সাহাবীগণের কার্যাবলী রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রয়োজনের এমন সুস্পষ্ট ও চূড়ান্ত সাক্ষ্য দেয় যে, সেখানে শরীয়ত বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এছাড়া আর কিবা বলতে পারতেন যে, মুসলিম সমাজের জন্যে এটি একটি অনিবার্য প্রয়োজন। আর এ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা ও প্রতিষ্ঠিত রাখা তার দ্বীনি কর্তব্যের অঙ্গীভূত। তাই কাজী মাওয়াদী লিখেছেন :

عَقْدُهَا لِمَنْ يَقُوْمُ بِهَا فِي الْأُمَّةِ وَاجِبٌ بِالْإِجْمَاعِ-

"উম্মাতের মধ্যে যে ব্যক্তি নেতৃত্বের (খিলাফতের) দায়িত্ব পূর্ণ করার যোগ্যতা রাখে তার জন্যে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা সর্বসম্মতভাবে ওয়াজিব।" (আল্-আহকামুস সুলতানিয়া) [১৫](পৃ:-৬৭)

এমনিভাবে আল্লামা তাফতাযানী শরহে আকায়েদ আন নাসাফিয়ায় বলেছেন-

- اَلْاِجْمَاعُ عَلَى اَنْ نَصْبُ الْاِمَامِ وَاجِبٌ

"খলীফা নিযুক্ত করা ওয়াজিব, এ ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।"[১৫](পৃ:-৬৭)

অর্থাৎ উম্মাতের জন্যে নিজস্ব একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব। যদি সে নিজের এ দায়িত্ব পালন না করে তাহলে এটি হবে একটি সামষ্টিক অন্যায়। এজন্যে তাকে আল্লাহ্‌র নিকট জবাবদিহি করতে হবে। পরে তিনি এর স্বপক্ষে যুক্তি পেশ করে বলেন :

وَلِاَنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْوَاجِبَاتِ الشَّرْعِيَّةِ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ

"আর এজন্যে শরীয়তের অনেক ওয়াজিব অনুষ্ঠান এরই (নেতৃত্ব) ওপর নির্ভর করে।"[১৫](পৃ:-৬৭)

---

29 রাসূল (সা:)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর (রা:) বলেছিলেন-اَلَا اَنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَلَا بُدَّ لِهٰذَا الدِّيْنِ مَنْ يَقُوْمُ بِهِ. "জেনে রেখো, হযরত মুহাম্মাদ (সা:) ইন্তিকাল করেছেন এবং এখন এই দ্বীনের জন্যে এমন একজন লোকের প্রয়োজন যে এর (প্রতিষ্ঠা ও প্রবর্তনের) দায়িত্ব গ্রহণ করবে।" (কিতাবুল মাওয়াকীফ ওয়া শারাহহু, ৮ম খন্ড, ৩৪৬ পৃষ্ঠা)। একজন খলীফা নির্বাচন ও তার নিযুক্তি ছাড়া একথা বলার পেছনে হযরত আবু বকর (রা.)-এর আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। একথা সাহাবীগণের (রা.) বিশাল সমাবেশে বলা হয়। কিন্তু তাঁদের একজনও এর সত্যতা ও যথার্থতা অস্বীকার করেননি। তাছাড়া হযরত ওমর (রা)-এর বাণী لَااِسْلَامَ اِلَّا بِالْجَمَاعَةِ وَلَا جَمَاعَةَ اِلَّا بِاِمَارَةٍ.:-"জামাআত তথা সংঘবদ্ধতা ছাড়া ইসলাম সত্যিকার ইসলাম নয় এবং নেতৃত্বহীন জামা'আত সত্যিকার জামা'আত নয়।" (জামে বায়তুল ইসলাম)।

মূলত: এই ওয়াজিব কার্যগুলো সম্পাদন করাই শরীয়তের মৌলিক উদ্দেশ্য। রাষ্ট্র ছাড়া দীনের অসংখ্য ওয়াজিব নির্বাহ সম্ভব নয়, তা যদি অনুপস্থিত থাকে তাহলে দীন কিভাবে যথার্থরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে? সুতরাং স্বীকার করতে হবে যে, রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছাড়া ইসলাম যথার্থ ও পূর্ণাঙ্গরূপে কখনো বিকশিত হতে পারে না।

উসূলে ফিকহের গ্রন্থ মুসাল্লামাতুস সুবুতে লেখা আছে–

اَلاَتَرَي اَنَّ تَحْصِيْلَ اَسْبَابِ الْوَاجِبِ وَاجِبٌ وَتَحْصِيْلَ اَسْبَابِ الْحَرَامِ حَرَامٌ بِالاِجْمَاعِ-

"ওয়াজিব পালন করার জন্যে যে উপায়-উপকরণ আছে সে উপায়-উপকরণ অর্জন করাও ওয়াজিব, সেটাকি তোমরা চিন্তা কর না? এবং হারাম কাজের উপায়-উপলব্ধি অর্জন করাও যে হারাম সেটা কি তোমরা জান না। এটি সর্ব সম্মতভাবে সিদ্ধান্ত।"[৪৯](পৃ:-২৭)

তাহলে কি হলো, আল্লাহ্‌র শরীয়াত জারী করার জন্যে ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠা আবশ্যক। আর ইসলামী হুকুমত হলো আল্লাহ্‌র শরীয়াতের কানুন জারী করার আসবাব। অতএব সে জন্যে দরকার একটি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা। সুতরাং সে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করাও ফরয। হেদায়া কিতাবে বলা হয়েছে–

وَاَمَّا وَفُّ الْقَضَاءِ كَفَرْضِ الْكِفَايَةِ

"সুবিচার কায়েম করা ফরযে কিফায়া।"[৪৯](পৃ:-২৮)

আল-মাবসুত গ্রন্থের কিতাবুল কাজী অধ্যায় লেখা হয়েছে ঃ

بِاَنَّ الْقَضَاءَ بِالْحَقِّ مِنْ اَقْوَى الْفَرَائِضِ بَعْدَ الايْمَان بِاللهِ-

"আল্লাহ্‌র উপর ঈমানের পর ন্যায় বিচারই সবচেয়ে শক্তিশালী ফরয।"[৪৯](পৃ:-২৯)

হযরত ওমর (রা:) হযরত আবু মূসা আল-আশআরী (রা.)-কে একটি চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিটা খুবই প্রসিদ্ধ একটি চিঠি। সেখানে লেখা ছিল :

اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيْضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ

"ন্যায়বিচার ফয়সালা এটি সুদৃঢ় ফরয, যা রাসূল (সা:)-এর সুন্নাতের অনুসরণে পেয়েছি।"[৪৯](পৃ:-৩১)

তাহলে বুঝা গেল, যেহেতু ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা ফরয, সেহেতু اسباب الواجب واجب সূত্র অনুযায়ী ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাও ফরয। আল্লামা ইবনে হাযাম লিখেছেন :

عَلى وُجُوْبِ الاِمَامَةِ اِتَّفَقَ جَمْعُ اَهْلَ السُّنَّةِ وَجَمْعُ الْمُرْجِيًّا وَجَمْعُ الشِّيْعَةِ وَجَمْعُ الْخَوَارِجِ

"আল-ইমামাত অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রের হুকুমত চালাবার পরিচালক নিযুক্ত করা ফরয। এটি সমস্ত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, মুরজিযা, শিয়া এবং খারেজী সম্প্রদায় সবার সর্বসম্মত মত- এটি ফরয।"[৪৯](পৃ:-৩২)

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী তার হিজরাতুল খাকা কিতাবে লিখেছেন :

وَاجِبٌ بِالْكِفَايَةِ در مُسْلِمِيْنَ اِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ نَصْبُ الْخَلِيْفَةِ

"কয়েকটি শর্তভিত্তিক খলিফা কায়েম করা কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের ওপর ওয়াজিব– ফরয।"[৪৯](পৃ:-৩৩)

রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনয়িতা প্রমাণে ইসলাম উপস্থাপিত অকাট্য দলীলসমূহ যে কত, তা গুনে শেষ করা যাবে না। সহজেই বোঝা যায় যে, একটা প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও তার একজন দায়িত্বশীল পরিচালক ব্যতীত কোন জনসমষ্টি চলতে পারে না, বাঁচতে পারে না। বিশেষ করে দ্বীন ইসলামের আইন-বিধান সমূহ একটি রাষ্ট্র ছাড়া কিছুতেই বাস্তবায়িত হতে পারে না। মহান স্রষ্টা তা খুব ভালোভাবেই জানতেন বলেই মানব সমাজে রাষ্ট্রের ব্যবস্থা করেছেন এবং সে রাষ্ট্রের সুষ্ঠুরূপে চলবার জন্যে প্রয়োজনীয় আইন-বিধানও দিয়েছেন। ফলে সে রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনায় একদিকে যেমন আভ্যন্তরীণ লোকদের জীবন পরিচালন সম্ভব হচ্ছে, তেমনি সে জনসমষ্টির উপর শত্রুর আক্রমণকে প্রতিহত করা, তাদেরকে বৈদেশিক-বিজাতীয় শক্তির গোলামী থেকে রক্ষা করাও সম্ভবপর হচ্ছে। ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র ও সরকারের প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব এত বেশী যে, রাসূলে করীম (সা:)-এর হাদীসে একটি জনসমষ্টির কল্যাণ ও অকল্যাণ সুষ্ঠুতা ও বিপর্যয় একান্তভাবে রাষ্ট্র ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে :

صِنْفَانِ مِنْ اُمَّتِي اِذَا صَلُحَا صَلُحَتْ اُمَّتِيْ وَاِذَا فَسَدَا فَسَدَتْ اُمَّتِيْ .....قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللهِ وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ اَلْفُقَهَاءُ وَالْاُمَرَاءُ-

"আমার উম্মতের মধ্যে দু'টি শ্রেণী এমন যে, তারা ঠিক হলে গোটা উম্মাত ঠিক হয়ে যাবে, আর তারাই বিপর্যস্ত হলে গোটা উম্মাত বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। জিজ্ঞাসা করা হলো : তারা কারা হে রাসূল (সা:)! তিনি বললেন : তারা ফিকহ্বিদ ও প্রশাসকবৃন্দ।"[৪৫](পৃ:-২৫)

বস্তুত মানুষের বিশেষ করে সামষ্টিক জীবনে রাষ্ট্র ও সরকারের প্রয়োজনীয়তা বিবেক-বুদ্ধি ও শরীয়ত উভয়ের দৃষ্টিতেই অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ঐতিহাসিক বিচারেও মানব সমাজের বিকাশে কোন একটি সময় অতীতে ছিল না-[30] ভবিষ্যতেও থাকতে পারে না, যখন রাষ্ট্র ও সরকারের কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না বা হবে না। কাজেই এর প্রয়োজনীয়তা প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আরও দীর্ঘ ও বিস্তারিত কোন আলোচনার আবশ্যকতা আছে বলে মনে হয় না।

ইসলামে সামষ্টিক জীবন ও নেতৃত্ব :

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হাশরের দিনে মানব জাতির সমাবেশ ও বিচার প্রসঙ্গে কুরআন মজীদে ইরশাদ করেছেন -يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍ بِأِمَامِهِمْ- "সেদিন আমরা প্রতিটি জনগোষ্ঠিকে তাদের নেতাসহ আহ্বান করব।"

কুরআন মজীদের এই আয়াত থেকে মানব জাতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য অকাট্যভাবে জানা যায় যে, মানবজাতি স্বভাবগতভাবেই সামষ্টিক ও সংঘবদ্ধ জীবন ধারার অনুসারী এবং নেতৃত্বের আনুগত্যকারী। অবশ্য সংঘবদ্ধতার ধরণ-ধারণ ও নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যে ভিন্নতা রয়েছে। কিন্তু সংঘবদ্ধতা ও নেতৃত্ব মানব জাতির অস্তিত্বের সাথে এমন অবিচ্ছেদ্য যে, হাশরের মাঠেও মানুষ নেতৃত্বের পিছনে সংঘবদ্ধভাবে উত্থিত এবং বিচারার্থে আহুত হবে।

---

30 ইসলামের সাথে রাষ্ট্র ব্যবস্থার এই অপরিহার্যতা সম্পর্কে শুধু কুরআন ও শেখ নবীর (সা:) ইসলামের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং প্রত্যেক নবীর ইসলাম ও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেতির প্রত্যেকটি দ্বীন পর্যন্ত এর সীমা বিস্তৃত। তাই উম্মতে মুহাম্মাদীর পূর্ববর্তী জাতি বনী ইসরঈল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন–كَانَتْ بَنُوْا اِسْرَائِيْلَ تَسُوْسُهُمُ الْاَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ- "বনী ইসরাঈলদের শাসন পরিচালনা করতেন তাদের নবীগণ। একজন নবীর ইন্তেকাল হলে তার স্থলে আর একজন নবী প্রেরিত হতেন। (মুসলিম শরীফ কিতাবুল ইমারাত)। বিভিন্ন যুগে বাহ্যত এই শাসনের যে রূপ থাকুক না কেন, এতটুকু অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, সর্বাবস্থায় তা মূলত: একটি রাষ্ট্রব্যবস্থাই ছিল।

ইসলাম হচ্ছে মানুষের স্বাভাবিক জীবন পদ্ধতি (دين فطرة)। তাই আল্লাহ তা'আলা মানুষের স্বভাব-প্রকৃতিতে যে সহজাত প্রবণতা দিয়েছেন ইসলাম তাকেই হেফাযত ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পুনরুজ্জীবিত করেছে এবং বিকৃতি ও পথচ্যুতি থেকে রক্ষা করে স্বাভাবিক গতিধারায় প্রবাহিত করেছে। এ কারণেই মানুষকে ইসলাম যে জীবনধারার দিকে পথ প্রদর্শন করেছে তা হচ্ছে নেতৃত্বের অধীনে সমষ্টিবদ্ধ জীবনধারা। এ প্রসঙ্গে রাসূলে আকরাম (সা:)-এর ঘোষণা :

اِذَا كَانَ ثَلَثَةٌ فِى سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا اَحَدَهُمْ-

"সফরে এক সাথে তিনজন থাকলে তাদের মধ্য হতে একজনকে তারা যেন অবশ্যই আমীর (নেতা) বানিয়ে নেয়।" (আবু দাউদ শরীফ) [৪৮](পৃ:-২০৪)

হাদীসটিতে মুসলিম উম্মার সামষ্টিক জীবনের গুরুত্ব পরিস্ফুটিত। অতি ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও মুসলমানকে অবশ্যই সংঘবদ্ধ জীবন-যাপন করতে হবে। কেবল একটি সমাজে ও রাষ্ট্রে এবং নিজ ঘরে ও জনপদে উপস্থিত থাকাবস্থায়ই নয়; এমনকি ঘর ও নিজ জনপদের বাইরে সফরে থাকাবস্থায়ও এই সংঘবদ্ধতা উপেক্ষা করা যাবে না। তখনও নিজেদের মধ্য হতে একজন লোককে আমীর বা নেতা বানিয়ে নিতে হবে। এই কথাটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, হাদীসের গ্রন্থাবলীতে কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবী নিজ নিজ ভাষায় এর বর্ণনা দিয়েছেন। মুসনাদে আহমদে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে কথাটি বর্ণিত হয়েছে এভাবে :

اَنَّ النَّبِىَّ ص قَالَ لاَ يُحِلُّ لِثَلاَثَةٍ يَكُوْنُ بِفَلاَةٍ مِنَ الاَرْضِ اِلاَّ اَمَّرُوْا عَلَيْهِمْ اَحَدَهُمْ

"নবী করীম (সা) বলেছেন : তিনজন লোক যখন কোন এলাকার মরুভূমির মধ্যে থাকবে, তখনো তাদের অসংগঠিত ও অসংবদ্ধ থাকা জায়েয নয়। তখনো তাদের মধ্য হতে একজনকে তাদের আমীর নিযুক্ত করে নেয়া কর্তব্য।" (মুসনাদে আহমদ)[৪৮](পৃ:-২০৪)

আবু দাউদ শরীফে হযরত আবু সাঈদ খুদরী ও হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসের ভাষ্য:

اِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فِى سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا عَلَيْهِمْ اَحَدَهُمْ

"তিনজন লোক যখন সফরে বের হবে, তখন অবশ্যই তাদের একজনকে তাদের আমীর বানিয়ে নিবে।" (আবু দাউদ শরীফ) [৪৮](পৃ:-২০৪)

বাজ্জার ও তাবারানীও এই হাদীস সহীহ সনদসূত্রে উদ্ধৃত করেছেন। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হতে কথাটির বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে নিম্নোক্ত ভাষায়:

اِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةٌ فِى سَفَرٍ فَأَمِّرُوْا اَحَدَكُمْ ذَلِكَ اَمِيْرٌ اَمَّرَهُ رَسُوْلُ اللهِ

"তোমরা যখন তিনজন লোক সফরে থাকবে। তখনও তোমাদের একজনকে আমীর বানিয় নিবে। সে হবে এমন আমীর যাকে স্বয়ং রাসূলে করীম (সা) নিযুক্ত করেছেন।" (বাজ্জার ও তাবরানী) [৪৮](পৃ:-২০৪)

এই সবকয়টি হাদীসে তিনজন লোক কথাটি স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখিত হয়েছে। এর অর্থ হলো ইসলামের সংঘবদ্ধ জীবনের নূন্যতম সদস্য সংখ্যা তিন। কাজেই যেখানে তিনজন মুসলমান উপস্থিত থাকবে সেখানেই তাদের মধ্যে সংঘ তৈরী করা আবশ্যক। আর যখন এর সংখ্য ততোধিক হবে তখন এই সংঘবদ্ধতার আবশ্যকতা অধিক তীব্র ও অনস্বীকার্য হয়ে দাঁড়ায়। এর কারণ প্রসঙ্গ ইমাম শাওকানী বলেন :

لِاَنَّ فِى ذَالِكَ السَّلاَمَةُ مِنَ الْخِلاَفِ الَّذِىْ يُؤَدِّىْ اِلَى التَّلاَفِ

"এটি এই জন্যে প্রয়োজন যে, যেসব মতবিরোধ, অমিল ও মনোমালিন্য সমাজকে নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়, সাংগঠনিক জীবন ও সংঘবদ্ধতার ফলে তা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।"[৪৮](পৃ:-২০৫)

বস্তুত সংঘবদ্ধ ও একজনের নেতৃত্বাধীন জীবন যাপন না করলে স্বাভাবিকভাবেই সমাজের প্রত্যেক সদস্য নিজ ইচ্ছামত কাজ কর্ম করতে শুরু করে। আর তার পরিণাম নিশ্চিত ধ্বংস ছাড়া কিছুই নয়। পক্ষান্তরে সংঘবদ্ধ থাকলে ও একজনের নেতৃত্ব মেনে চললে পারস্পরিক মতবিরোধ হ্রাস পায়, অন্তত এর ধ্বংসাত্মক পরিণতি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। তখন ঐক্যবদ্ধতা সকলের জীবনে আনে পরম শৃঙ্খলা। আর এ শৃঙ্খলারই ফল হচ্ছে নির্বিবোধ শান্তি ও সমৃদ্ধি।

ইমাম শাওকানী এইসব হাদীসের ভিত্তিতে লিখেছেন :

وَفِىْ ذَالِكَ دَلِيْلُ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ اَنَّهُ يُجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ نَصْبُ الاَئِمَّةِ وَالْوَلاَةِ وَالْحُكَّامِ

"এই সব হাদীস প্রমাণ করে যে, নেতা নির্বাচন ও দায়িত্ব সম্পন্ন লোক ও বিচার ব্যবস্থাপক নিয়োগ করা মুসলমানদের পক্ষে অবশ্যই কর্তব্য- ওয়াজিব। ইসলামের অধিকাংশ বিশেষজ্ঞই এই মত প্রকাশ করেছেন।"[৪৮](পৃ:-২০৫)

আল্লামা জুরজানী বলেন :

اِنَّ نَصْبُ الاَمَامِ مِنْ اَتَمِّ مَصَالِحُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاَعْظَمِ مَقَاصِدِ الدِّيْنِ

"ইমাম বা রাষ্ট্রনায়ক নিয়োগ মুসলমানদের কল্যাণ সাধনের পূর্ণতম ব্যবস্থা এবং দ্বীন-ইসলামের সর্বোচ্চ লক্ষ্যের সর্বাধিক মাত্রার বাস্তবায়ন।"[৪৫](পৃ:-১২৩)

আল্লামা নসাফী আহলিস সুন্নাত ওয়াল জাম'আতের আকিদা হিসেবে লিখেছেন :

وَالْمُسْلِمِيْنَ لاَبُدَّلَهُمْ مِّنْ اِمَامِ يَقُوْمُ بِتَنْفِيْذِ اَحْكَامِهِمْ وَاِقَامَةِ حُدُوْدِهِمْ وَسَدِّ ثُغُوْرِهِمْ وَتَجْهِيْزِ جُيُوْشِهِمْ وَاَخْذَ صَدَقَاتِهِمْ وَقَهْرِ الْمُتَغَلِّبَةِ وَالْمُتَلَصِّصَةِ وَقُطَّاعِ الطَّرِيْقِ وَاِقَامَةِ الْجُمَعِ وَالاَعْيَادِ وَقَطْعِ الْمُنَازَعَاتِ الْوَاقِعَةِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَقُبُوْلِ الشَّهَادَةِ الْقَائِمَةِ عَلَى الْحُقُوْقِ وَتَزْوِيْجِ الصِّغَارِ وَالصَّغَائِرِ الَّذِيْنَ لاَاَوْلِيَاءَ لَهُمْ وَقِسْمَةِ الْغَنَائِمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الاُمُوْرِ الَّتِىْ لاَ يَتَوَلاَّهَا اَحَادُ الاُمَّةِ-

"মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্যে একজন ইমাম-রাষ্ট্রনায়ক অবশ্যই থাকতে হবে। সে আইন কানুনসমূহ কার্যকর করবে, শরীয়তে নির্দিষ্ট শাস্তি সমূহ জারি করবে, বিপদ-আপদের সকল দিক বন্ধ করবে, সেনাবাহিনীকে সুসজ্জিত ও সদা প্রস্তুত করে রাখবে শত্রুর আগ্রাসন বন্ধের লক্ষ্যে লোকদের নিকট থেকে যাকাত -সাদাকাত ইত্যাদি গ্রহণ ও বন্টন করবে, বিদ্রোহী-দুষ্কৃতিকারী, চোর, ঘুষখোর ও ডাকাত-ছিনতাইকারীদের কঠিন শাসনে দমন করবে। জুম'আ ও ঈদের নামায সমূহ কায়েম ও তাতে ইমামতি করবে, লোকদের অধিকার প্রমাণের জন্যে সাক্ষ্য গ্রহণ করবে (বিচার বিভাগ চালু করবে) অভিভাবকহীন দুর্বল অক্ষম বালক-বালিকাদের বিবাহের ব্যবস্থা করবে, জাতীয় সম্পদ জনগণের মধ্যে বন্টন করবে। আর এই ধরনের বহু কাজই সে আঞ্জাম দেবে, যা কোন ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে আঞ্জাম দিতে পারে না।" [৪৫](পৃ:-১২৩,১২৪)

ইমাম-রাষ্ট্রপ্রাধানের দায়িত্ব ও কর্তব্যের এই তালিকাই স্পষ্টভাবে বলে দেয় যে, মুসলিম উম্মাতের সুষ্ঠু জীবনের জন্যে যেমন রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন একজন ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধানের। অন্যথায় এই জরুরী কার্যসমূহ কখনই আঞ্জাম পেতে পারে না।

বস্তুত নামাযের জামা'আতে যেমন একজন ইমাম প্রয়োজন, তেমনি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনেও আবশ্যক মুসলমানদের মধ্য হতে একজনকে আমীর, নেতা বা রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগ করা। রাসূল (সা.) বলেন:

مَا مِنْ ثَلَثَةٍ فِى قَرْيَةٍ وَلاَ بُدَّ وَلاَ تُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلَوةُ اِلاَّ قَدْ اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَاِنَّهَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةِ

"কোন জনপদে তিনজন লোকও যদি একত্রে বসবাস করে আর তারা যদি তখন (জামা'আত বদ্ধভাবে) নামায পড়ার ব্যবস্থা না করে, তবে তাদের উপর শয়তান অবশ্যই প্রভুত্ব ও অধিপত্য বিস্তার করবে। অতএব জামা'আতবদ্ধ হয়ে থাকা তোমাদের কর্তব্য। কেননা পাল থেকে বিচ্ছিন্ন ছাগলকে নেকড়ে বাঘ সহজে খেয়ে ফেলে।" (আবু দাউদ শরীফ) [৪৮](পৃ:-২০৫)

ইসলামে নেতৃত্বের আনুগত্য ও জরুরী গুনাবলী:

ইসলামী সমাজ সংগঠনে নেতৃত্বের আনুগত্য একটি অত্যন্ত জরুরী বিষয়। এটি এতই মৌলিক গুরুত্বের অধিকারী যে, এছাড়া কোন ইসলামী সমাজ সংগঠন কার্যত: গড়ে উঠতে, টিকে থাকতে এবং আপন লক্ষ্যস্থলে উপনীত হতে পারে না। তাই পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ ও রাসূল (সা.)-এর আনুগত্যের নির্দেশের সাথে সাথেই নেতৃ-আনুগত্যের নির্দেশ স্থান পেয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যকার দায়িত্বশীল লোকদেরও আনুগত্য কর।" (আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত-৫৯)

ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানের - খলীফাতুল মুসলিমীনের আনুগত্য করা প্রত্যেকটি মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু যে ব্যক্তি এইরূপ আনুগত্য প্রত্যাহার করবে; বিচারের দিন সে আল্লাহর সম্মুখে এর কোন কৈফিয়তই দিতে পারবে না। রাসূল (সা.) বলেন :

مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِىَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِىْ عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً

"যে ব্যক্তি আনুগত্য হতে হাত গুটিয়ে নিল, কিয়ামতের দিন সে যখন আল্লাহর সম্মুখে হজির হবে, তখন তার কিছুই বলার থাকবে না। আর যে ব্যক্তি এইরূপ অবস্থায় ইন্তেকাল করবে যে, তার গলায় আনুগত্যের কোন রজ্জু নেই, তার মৃত্যু সম্পূর্ণ জাহিলিয়াতের উপর হবে।" (মুসলিম শরীফ) [৪৮](পৃ:-২০৬)

ইসলামী সমাজ সংগঠনে নেতার আনুগত্য শুধু নেতা পর্যন্তই সীমিত থাকে না, তা প্রসারিত হয় আল্লাহ্ ও রাসূলের অনুগত্য পর্যন্ত। তাই আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীসে রাসূলে আকরাম (সা.) বলেন :

مَنْ اَطَاعَنِىْ فَقَدْ اَطَاعَ اللهُ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ عَصَى اللهُ وَمَنْ يُّطِعِ الاَمِيْرَ فَقَدْ اَطَاعَنِى وَمَنْ يَّعْصِ الاَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِى

"যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহকে মেনে চলল। আর যে ব্যক্তি আমার নির্দেশ শুনলনা, সে ঠিক আল্লাহর নাফরমানী করল। আর যে ব্যক্তি আমীরকে (নেতাকে) মেনে চলল। সে ঠিক আমারই আনুগত্য করল আর যে আমীরের নির্দেশ শুনলনা, সে ঠিক আমাকেই অমান্য করল।" (বুখারী-মুসলিম) [৪৮](পৃ:-২০৭)

ইসলামে নেতার এই আনুগত্য এতই অপ্রতিরোধ্য যে, এ ব্যাপারে অনুবর্তীর ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের কোন অবকাশ নেই। আদেশ শোনামাত্র তার আনুগত্য করে যাওয়াই অনুবর্তীর একমাত্র কর্তব্য। তাই সহীহ মুসলিমে উদ্ধৃত একটি হাদীসে উবাদা ইবনে সামেত (রা.) বলেন :

دَعَانَا النَّبِيُّ ص فَبَايَعْنَا فَكَانَ فِي مَا اَخَذَ عَلَيْنَا اَنْ بَايَعْنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرِهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا

"একদা রাসূলে করীম (সা.) আমাদের ডাকলেন। আমরা তাঁর কাছে বাইয়াত বা অনুগত্যের শপথ করলাম। তিনি নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর আমাদের শপথ করালেন : আমাদের পছন্দ হোক বা অপছন্দ, আমরা সচ্ছল থাকি কি অসচ্ছল সর্বাবস্থায় আমরা আপন নেতৃবৃন্দের আদেশ শুনব ও তাদের আনুগত্য করব।" (মুসলিম শরীফ) [৫১](পৃ:-৩২)

অপর হাদীসে রাসূল (সা.) বলেন :

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ اِلَّا اَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ

"মুসলিম ব্যক্তির উপর কর্তব্য হলো নেতৃ- আদেশ শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা এমন সব ব্যাপারেই যা সে পছন্দ করে আর যা তার পছন্দনীয় নয়। কিন্তু যদি কোন নাফরমানী বা গুনাহের কাজে আদেশ করা হয়, তবে তা স্বতন্ত্র কথা।" (বুখারী-মুসলিম) [৫১](পৃ:-৩২)

ব্যক্তিগত রুচি-অরুচির কারণে নয়, একমাত্র আল্লাহর নাফমারনীর কাজে আদেশ করা হলেই শুধু নেতৃ-আদেশ অমান্য করা যাবে অন্যথায় নয়। কারণ রাসূল (সা.) এর স্পষ্ট নির্দেশ :

لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

"স্রষ্টার নাফরমানী করে কোন সৃষ্টির অনুগত্য করা যাবে না।"[৫১](পৃ:-৩২)

বস্তুত ইসলামী সমাজের রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য সকলের জন্যে অপরিহার্য। কিন্তু রাষ্ট্রনেতা যদি ইসলামী আদর্শবাদী ও ইসলামের বাস্তব অনুসারী না হয়, তা যদি হয় ইসলাম বিরোধী মতাদর্শে বিশ্বাসী ও ইসলাম পরিপন্থী চরিত্রে ভূষিত, তাহলে তার অধীনে ইসলামী ও চরিত্রবান জীবন-যাপন করা কখনই সম্ভবপর হতে পারে না। তার পরিণতি হচ্ছে অধীনস্থদের চরম গুমরাহী ও পথভ্রষ্টতা। এর কুফল যে, সর্বগ্রাসী ও মারাত্মক, তার বড় প্রমাণ হলো, বিচারের দিন এই নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তার অধীনস্থরা আল্লাহর নিকট প্রচন্ড অভিযোগ পেশ করবে এই বলে :

رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ

"হে পরওয়ারদিগার! এই লোকেরাই আমাদেরকে দ্বীন ইসলাম থেকে গুমরাহ করেছিল। অতএব তুমি এদেরকে জাহান্নামের দ্বিগুন আযাবে নিক্ষেপ কর।" (আল-কুরআন, সূরা আল আরাফ, আয়াত-৩৮)

তারা আরো বলবে :

رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا – رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا

"হে আমাদের রব্ব! আমরা আমাদের সরদার- বড় বড় নেতাদের অনুসরণ করেছিলাম। ফলে ওরা আমাদেরকে আসল পথ থেকে বিভ্রান্ত করেছে। হে আমাদের রব্ব! তুমি আজ তাদেরকে দ্বিগুন আযাব দাও। আর তাদের ওপর বড় রকমের অভিশাপ বর্ষণ কর।" (আল-কুরআন, সূরা আল আহযাব, আয়াত-৬৭-৬৮)

এই কারণে কুরআনের দৃষ্টিতে সকল পর্যায়ের নেতৃত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। কুরআন যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা পেশ করেছে, তাতে বিশেষভাবে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের জন্যে কতগুলো জরুরী গুণের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করেছে। সেই গুণ সমূহ যার মধ্যে পাওয়া যাবে, ইসলামী রাষ্ট্রের নেতা বা প্রধান তাকেই বানানো যেতে পারে। গুনগুলো হলো :

১। ঈমান : দ্বীন- ইসলামের প্রতি গভীর, দৃঢ় ও পূর্ণাঙ্গ ঈমান হচ্ছে সর্বপ্রথম জরুরী গুণ। দ্বীন ইসলামই সর্বোত্তম নির্ভূল, মানব জীবনের যাবতীয় সমস্যার একমাত্র সমাধানকারী ও সার্বিক কল্যাণ দানকারী বিধানরূপে মনে ঐকান্তিক ঈমান থাকতে হবে। এক কথায় এক ও একক আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং আল্লাহর শরীয়াতের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস। এই শর্তের কারণে কোন কাফির ব্যক্তি মুসলিম জনগণের নেতৃত্ব ও প্রশাসকত্ব লাভ করতে পারে না। আল্লাহ্ তাআলার ঘোষণা :

وَلَنْ يَّجْعَلَ اللهُ لِلْكَفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلاً

"আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন লোকদের উপর কাফির লোকদের কর্তৃত্ব করার কোন পথ-ই রাখেন নি।" (আল-কুরআন, সূরা আন নিসা, আয়াত-১৪১)

২। রাষ্ট্রীয় দায়িত্বসমূহ উত্তমভাবে পালনের যোগ্যতা : প্রশাসানিক কর্তব্য ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা সূচারুরূপে পালনের জন্যে তার স্বভাবগত যোগ্যতা একান্ত অপরিহার্য। নেতৃত্বদান ও প্রশাসনিক কর্তৃত্বের জন্যে মৌলিক শর্ত হচ্ছে প্রতিষ্ঠানিক দায়িত্ব পালনের সর্বোচ্চ মানের যোগ্যতা। নেতৃত্ব স্বত:ই এ শর্তের অপরিহার্যতা প্রমাণ করে। রাসূলে করীম (রা.) এ শর্তের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে বলেন :

لاَ تصْلُحُ الاِمَامَةُ الاَّ لِرَجُلٍ فِيْهِ ثَلاَثُ خِصَالٍ وَرَعٌ يُحْجِزُهُ عَنْ مَعَاصِىْ اللهِ وَحِلْمٌ يَمْلِكُ بِهِ غَضَبَهُ وَحُسْنُ الوِلاَيَةِ عَلَى مَنْ يَّلِىْ حَتَّى يَكُوْنَ كَالْوَلَدِ

"সামাজিক-রাজনৈতিক নেতৃত্বদান কেবল মাত্র পুরুষদের পক্ষেই সম্ভব। তার জন্যও তিনটি শর্ত রয়েছে : এমন সততা-ন্যায়পরতা, আল্লাহ পরস্তি যা তাকে আল্লাহর নাফরমানীর কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং ধৈর্য্য স্থৈর্য, যেন তদ্বারা সে স্বীয় ক্রোধ দমন করতে পারে। যাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করবে তাদের উপর উত্তম নেতৃত্ব দান, যেন তারা সবাই তার সন্তান-তুল্য হয়ে যায়।"[৪৫](পৃ:-১২৭)

হযরত আরী (রা.) বলেছেন : লোকদের উপর নেতৃত্ব দানের অধিক অধিকারী হবে সেই ব্যক্তি, যে তাদের সকলের তুলনায় অধিক দৃঢ় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও অধিক শক্তিশালী হবে। আল্লাহর বিধান সম্পর্কে অন্যদের চেয়ে অধিক জ্ঞানী ও বিদ্বান হবে, কেউ গন্ডগোল করলে তাকে অভিযুক্ত করবে, তাতে দমিত না হলে তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র কার্যক্রম গ্রহণ করবে।" (নাহজুল বালাগাহ, খুতবা-১৭২) [৪৫](পৃ:-১২৭)

৩। রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় দূরদৃষ্টি ও বুদ্ধিমত্তায় সর্বাগ্রসর : নিছক প্রাতিষ্ঠানিক যোগ্যতা ও উত্তম নেতৃত্বের গুণাবলীই ইসলামের দৃষ্টিতে নেতৃত্বের জন্যে যথেষ্ট নয়; বরং রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় দূরদৃষ্টি ও বৃদ্ধিমত্তায় নেতাকে অন্যান্য সকলের তুলনায় অনেক বেশী অগ্রসর হতে হবে। মুসলিম উম্মাহর সর্বোচ্চ প্রশাসককে অবশ্যই তার সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি অতীব উন্নতমানের হওয়া বাঞ্চনীয়। তবেই তার

পক্ষে মুসলিম উম্মাতকে সঠিক ও নির্ভূল নেতৃত্ব দেয়া সম্ভব হবে এবং কালের অগ্রগাতির সাথে সাযুজ্য রক্ষা করে জনগণকে অগ্রগতির দিকে নিয়ে যাওয়া সহজতর হবে। এজন্যে তাকে সাম্প্রতিক কালের আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অবস্থা ও উত্থান-পতন পর্যায়ে উচ্চতর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। তাহলে তার পক্ষে নিজ জাতিকে আন্তর্জাতিক ঘাত-প্রতিঘাতের ক্ষতি থেকে রক্ষা করা সম্ভবপর হবে।

৪। ন্যায়পরতা, নিরপেক্ষতা ও সুবিচার : রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির পর সর্বোচ্চ রাষ্ট্রনেতাকে অপর যে গুণে অধিক গুণান্বিত হতে হবে, তা হচ্ছে সুবিচার, ন্যায়পরতা ও নিরপেক্ষতার গুণ। অবশ্যই সকল প্রকার গুনাহ ও নাফরমানী থেকে তো তাকে দূরে থাকতেই হবে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সুবিচার ও ন্যায়পরতা উচ্চতর মহত্তর গুণের অধিকারী না হলে তার পক্ষে স্বীয় দায়িত্ব যথাযথ পালন করা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি জনগণের সত্যিকার অর্থে কোন কল্যাণ সাধনও অসম্ভব।

মূলত: কোন ফাসিক তথা আল্লাহর বিধান লংঘনকারী ব্যক্তিকে মুসলিম উম্মাহর সর্বোচ্চ শাসক নয়; বরং কোন পর্যায়ের শাসকরূপে নিয়োগ করা ইসলামের মানব কল্যণমূলক আদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ

"তোমরা এই জালিমদের প্রতি ঝুকে পড়ো না। নতুবা তোমরা জাহান্নামের আওতায় পড়ে যাবে। তখন তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে কোন বন্ধু-পৃষ্ঠপোষক পাবে না, যে তোমাদেরকে আল্লাহ্র (আযাব) থেকে রক্ষা করতে পারে এবং কোন দিক থেকে কোন সাহায্যও তোমরা পাবে না।" (আল-কুরআন, সূরা হুদ, আয়াত-১১৩)

আরও স্পষ্ট ভাষায় আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

"যে লোকের অন্তর আমার (আল্লাহ্র) স্মরণশুন্য-আনুগত্যমূলক ভাবধারাহীন এবং স্বীয় বন্ধন-নিয়ন্ত্রণহীন কামনা-বাসনার অনুসারী, আর একারণে যার কাজকর্ম বাড়াবাড়িপূর্ণ তুমি তার অনুসরণ কখনই করবে না।" (আল-কুরআন, সূরা আল কাহফ, আয়াত-২৮)

মোটকথা, আল্লাহর ভয়ে ভীত নয়, তাঁর শরীয়াতের অনুগত নয়, এমন কোন ব্যক্তির নেতৃত্ব ও প্রশাসনিক কর্তৃত্ব মুসলিম উম্মাহর কখনই মেনে নেয়া ও বরাদাশত করা উচিত নয়। এ কারণে মুসলিম উম্মাহর নেতা ও প্রশাসককে অবশ্যই আত্ম-সংযমশীল, ইসলামী শিক্ষায় পূর্ণ শিক্ষিত এবং পূর্ণ মাত্রায় ইসলামী চরিত্রে চরিত্রবান হতে হবে। ইসলামের বিধান কার্যত অনুসরণকারী ও বাস্তবভাবে প্রবর্তনকারী হতে হবে।

নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন :

يَوْمٌ وَاحِدٌ مِنْ سُلْطَانٍ عَادِلٍ خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَحَدٌّ يُقَامُ فِي الْأَرْضِ أَزْكَى مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ

"সুবিচারক ন্যায়বাদী শাসকের অধীন একটি দিন চল্লিশ দিনের বৃষ্টিপাতের কল্যাণের চেয়েও অধিক উত্তম এবং পৃথিবীতে আল্লাহ নির্ধারিত একটি শাস্তি কার্যকর হওয়া এক বছরের নফল ইবাদতের তুলনায় অধিক পরিশুদ্ধতা সৃষ্টিকারী।" (আল মুসতাদরাক লিল হাকেম, ৩য় খন্ড, পৃ:-২১৬) [৪৫](পৃ:-১৩০)

তিনি আরো বলেন :

اَحَبُّ النَّاسِ اِلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَاَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا اِمَامٌ عَادِلٌ وَاَبْغَضُ النَّاسِ لِلّٰهِ وَاَبْعَدُهُمْ مِّنْهُ مَجْلِسًا اِمَامٌ جَائِرٌ

"কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাধিক প্রিয় ও আসন গ্রহণের দিক দিয়ে তাঁর সর্বাধিক নিকটবর্তী ব্যক্তি হবে সুবিচারক নেতা ও শাসক এবং সেদিন আল্লাহর নিকট সর্বাধিক ঘৃণ্য ও আসন গ্রহণের দিক দিয়ে অধিক দূরবর্তী হবে অন্যায়কারী অত্যাচারী নেতা বা শাসক।" (তিরমিযী, জামেউল-উসূল, ৩য় খন্ড, পৃ:-৫৫) [৪৫](পৃ:-১৩১)

অপর হাদীসে তিনি বলেন :

اِنَّ الْمُقْسِطِيْنَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرِ مِنْ نُّوْرِ عَنْ يَّمِيْنِ الرَّحْمٰنِ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنُ الَّذِيْنَ يَعْدِلُوْنَ فِى حُكْمِهِمْ وَاَهْلِهِمْ وَمَا وَلُّوْا

"কিয়ামতের দিন সুবিচারকারী ন্যায়বাদী শাসকরা আল্লাহ্ রহমানের ডান দিকে নূর এর উচ্চাসনে আসীন হবে- আল্লাহ্‌র দুটি দিকই ডান। তারা সেই লোক, যারা তাদের শাসনকার্যে ও বিচার-আচারে তাদের জনগণ ও বন্ধুদের মধ্যে ন্যায়বিচার ও নিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা করবে।" (মুসলিম, জামেউল উসূল, ৩য় খন্ড, পৃ:-৫৩) [৪৫](পৃ:-১৩১)

৫। পুরুষ হওয়া : মুসলিম উম্মাহর সর্বোচ্চ শাসক প্রশাসককে অবশ্যই পুরুষ হতে হবে। ইসলামী জীবন বিধানে ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এ এক জরুরী শর্ত। ইসলাম এ শর্ত আরোপ করে নারীদের সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার কিছুমাত্র হ্রাস করেনি, নারীর প্রতি প্রকাশ করেনি কোন হীনতা বা ছোটত্ব। বরং নারীর সৃষ্টিগত ও স্বভাবগত যোগ্যতা, ভাবধারা ও অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

একথা সর্বজন স্বীকৃত যে নারী পুরুষ অপেক্ষা অধিক স্নেহ প্রবণ, বিনম্র হৃদয়, আবেগ সংবেদনশীলতার মূর্ত প্রতীক। কঠিন-কঠোরতা ও অনমনীয়তা তার প্রকৃতি পরিপন্থী। অথচ রাষ্ট্র পরিচালনায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় কঠিন্যতা অনেক বেশী প্রয়োজন। তাছাড়া রাষ্ট্র প্রধানকে অনেক কঠিন কঠিন দায়িত্ব পালন করতে হয়, দূরূহ ও সামস্টিক সমস্যাবলীর সামাধান করতে হয়, সর্বাবস্থায় দেশীয়-আন্তর্জাতিক উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকতে হয়, যা স্বভাবত নারীদের নারীত্ব প্রকৃতির পরিপন্থী।[31] তাই ইসলাম নারীকে সকল প্রকারের কঠিন-কঠোর পরিশ্রমের কাজ থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছে। কেননা ইসলামের স্থায়ী-শাশ্বত নিয়মই হচ্ছে কারোর উপর এমন কাজের দায়িত্ব না চাপানো, যা করা তার পক্ষে স্বভাবতই কঠিন, কষ্টদায়ক ও সাধ্যাতীত।[32] বিবাদ-বিসম্বাদ, তর্ক-বিতর্ক ও যুদ্দ-বিগ্রহে অগ্রনী ভূমিকা পুরুষকেই পালন করতে হয়ে, নারী এ ক্ষেত্রে অক্ষম।

তাই কুরআন মজীদে বলা হয়েছে : اَوَمَنْ يُّنَشَّؤُا فِى الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِى الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِيْنٍ-

"নারীরা তো সেই মানুষ, যারা অলংকারে প্রতিপালিত হয়। আর তারা তর্ক-বিতর্কে-দুর্ধর্ষ প্রতিপক্ষের সাথে মুকাবিলা করায় নিজেদের বক্তব্য পূর্ণমাত্রায় স্পষ্ট করে বলতে অক্ষম।" (আল-কুরআন, সূরা আল-যুখরুফ, আয়াত-১৮)

---

31 হ্যাঁ নারীদের মধ্যেও কোন কোন নারী এ ধরনের সক্ষমতা রাখে, তবে এটি খুবই দুর্লভ ও ব্যতীক্রম মাত্র। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যতীক্রম ধর্তব্য নয়; বরং উসূল হলো, الاكثر حكم الكل -আধিক্যের উপরই সিদ্ধান্ত বর্তায়। তাছাড়া মাঝে-মধ্যে দু'একজন নারী এ ধরণের দায়িত্বপূর্ণ পদ পেয়ে থাকলেও কার্যত তারা সুষ্ঠু ও যথার্থ কার্য সম্পাদনের পরিবর্তে বিশৃংখলারই জন্ম দিয়ে থাকেন। তাইত ইউরোপ-আমেরিকার তথাকথিত নারীবাদীরা মুখে নারীদের নিয়ে মাতামাতি করলেও কার্যক্ষেত্রে তাদের দেশসমূহে নারী রাষ্ট্রপ্রধান কারো নজরে আসে না।

32 আল্লাহ তা'আলা সূরা বাকারার ২৮৬ নং আয়াতে স্পষ্টত বলেন : لَهَا لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا "আল্লাহ্ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার চাপিয়ে দেন না।"একই সাথে আয়াতের শেষভাগে আল্লাহ তা'আলা কষ্টসাধ্য দায়িত্ব থেকে মুক্তির জন্যে বান্দাকে দোয়াও শিখিয়ে দিয়েছেন: رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ "হে আমাদের প্রভু! এবং আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করিও না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই।"

কুরআন ঘোষিত নীতিতে স্বাভাবিক অবস্থারই প্রতিফলন হয়েছে। প্রতিপক্ষ সাধারণত প্রবল ও দুর্ধর্ষই হয়ে থাকে, তা যে কোন ক্ষেত্রেই হোক। রাষ্ট্রীয় ও সামষ্টিক পর্যায়ের প্রতিপক্ষের দুর্ধর্ষতা প্রশ্নাতীত। অথচ নারী সমাজ স্বভাবতই এই ক্ষেত্রে অক্ষমতার পরিচয় দিয়ে থাকে তাদের প্রকৃতিগত অক্ষমতার কারণেই। তবে ব্যতিক্রম কখনই নীতি নির্ধারণের ভিত্তি হতে পারে না।

রাসূলে আকরাম (সা.) তাঁর সারা রাষ্ট্রীয় জীবনে এই পর্যায়ের কোন দায়িত্ব কখনই কোন নারীর উপর অর্পণ করেন নি, কোন কোন নারীর মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে কিছু না কিছু মাত্রার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও। শুধু তাই নয়, সমগ্র মুসলিম শাসনামলে উমাইয়্যা-আব্বাসীয়- মোগল-তুর্কী-ওসমানীয় বা আন্দুলুসিয়ার শাসনের ইতিহাসে এর ব্যতিক্রম কোথাও দেখা যাবে না। যদিও খিলাফতে রাশেদার পরে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ আদর্শ পুরোপুরি ও যথাযথভাবে অনুসৃত হয়নি।[33]

রাসূলে করীম (সা.) বলেন :

لاَيُفْلِحُ قَوْمٌ وَّلِيَّتُهُمْ اِمْرَأَةٌ

"যে জনগোষ্ঠীর প্রধান কর্তা হচ্ছে নারী, তারা কখনই কল্যাণ পেতে পারে না।" (কিতাবু আদাবুল কাযী, পৃ: ২৩) [৪৫](পৃ:-১৩৪)

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوا اَمْرَهُمْ اِمْرَأَةً-

"সে জনগোষ্ঠ কখনই কল্যাণ লাভ করতে পারে না, যারা একজন নারীকে নিজেদের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব সম্পন্ন বানিয়েছে।"(তিরমিযী, নাছায়ী, জামে-উল-উসূল), [৪৫](পৃ:-১৩৪)

বর্ণনাটির অপর একটি বাখ্য হচ্ছে :

لاَ يُفْلِحُ قَوْمٌ اِسْنَدُوْا اَمْرَهُمْ اِلى اِمْرَاَةٍ

"যে জনগণ তাদের সামষ্টিক দায়িত্ব কোন মেয়েলোকের নিকট সোপর্দ করেছে, তারা কোনক্রমেই সাফল্য লাভ করতে পারে না।" (কানযুল আমাল, ২য় খন্ড, পৃ:-১১) [৪৫](পৃ:-১৩৪)

হযরত আবু হুযরায়রা (রা.) থেকে এ পর্যায়ের বর্ণিত হাদীসটির ভাষ্য হলো:

اِذَا كَانَ اُمَرَاءُ كُمْ شِرَارُكُمْ وَاَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلاَءَكُمْ وَاُمُوْرُكُمْ اِلى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الاَرْضُ خَيْرٌ لَّكُمْ مِّنْ ظُهُوْرِهَا

"তোমাদের সামষ্টিক কার্যাবলীর কর্তৃত্ব যখন তোমাদের মধ্যকার অধিক দুষ্ট ও খারাপ লোকদের হাতে চলে যাবে, তোমাদের সমাজের ধনীরা যখন হবে কৃপণ এবং তোমাদের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব-কর্তৃত্ব নারীদের নিকট

---

33 নারী বিচার বিভাগে নিযুক্ত হতে ও বিচারকার্য সম্পাদন করতে পারে কিনা এ বিষয়ে ইসলামী মনীষীগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। প্রখ্যাত ফিকহবিদ ইবনে কুদামা তার আল-মুগনী গ্রন্থে লিখেছেন : সর্বোচ্চ নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব বা দেশ শাসনের দায়িত্ব পালনে নারী যোগ্য নয়। নবী করীম (সা:)-এর শাসনামলে, খুলাফায়ে রাশেদীন বা পরবর্তী যুগে কোন নারীকে এই ধরনের কাজে নিযুক্ত করা হয়নি। শায়খ তুসী বলেছেন, নারী বিচার কার্যে নিযুক্তি পেতে পারে না। ইমাম শাফেয়ীর (রহ)ও একই মত। ইমাম আবু হানিফা (রহ) বলেছেন, যেসব ব্যাপারে নারী সাক্ষী হতে পারে, সে সব ব্যাপারে বিচারকও হতে পারে। তা হদ্ ও কিসাস ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রেই হতে পারে। ইবনে জারীর তাবারীও এই মতই লিখেছেন। কেননা নারীও ইজতিহাদের যোগ্যতার অধিকারী হতে পারে। আর বিচারকার্যে ইজতিহাদেরই প্রয়োজন বেশী।

ন্যস্ত হবে, তখন পৃথিবীর উপরিভাগের তুলনায় অভ্যন্তর ভাগই তোমাদের জন্যে অধিক কল্যাণকর হবে (বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয় হবে)।" (তিরমিযী, কিতাবুল ফাতান) [৪৫](পৃ:-১৩৫)

এসব কারণে নারীদের জন্যে আযান, ইকামতও বলা জরুরী করা হয়নি। নারীদের জন্যে ইসলাম যে সম্মান ও মর্যাদা নির্দিষ্ট করেছে, তাতে এসব কাজের দায়িত্ব তাদের জন্যে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বস্তুত ইসলামের পরিবার সংস্থায় সার্বিক নেতৃত্ব যেমন পুরুষের তেমনি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্বেও পুরুষদেরই অগ্রবর্তিতা। এসব নীতি কুরআনে হাকীমের এই আয়াতেই বিধৃত :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

"পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল এই জন্যে যে আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এজন্যে যে, তারা তাদের অর্থ ব্যায় করে।" (আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, আয়াত-৩৪)

৬। আইন-জ্ঞানে দক্ষতা, পারদর্শিতা : ইসলামী হুকুমাত যেহেতু আল্লাহ্‌র আইন বিধান ভিত্তিক জনগণের উপর আল্লাহর আইন কার্যকর করণেরই অপার নাম, তাই রাষ্ট্রপ্রধান ও সর্বোচ্চ শাসককে অবশ্যই ইসলামী আইন-বিধানে যথেষ্টে মাত্রায় দক্ষ ও পারদর্শী হতে হবে। পবিত্র কুরআন তালুতকে বনী ইসরাঈলের বাদশাহ নিযুক্তি প্রসঙ্গে তাঁর গুন-বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে বলেছে :

وَزَادَهُ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ-

"আল্লাহ তাকে প্রভুত পরিমাণে মানসিক (জ্ঞানগত) ও শারীরিক যোগ্যতা দান করেছেন।" (আল-কুরআন, সূরা আল বাকারা, আয়াত-২৪৭)

অন্য আয়াতে জ্ঞান ও অজ্ঞনতার মধ্যে তুলনা করে কুরআন প্রশ্ন রাখছে :

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ

"হে নবী! লোকদের জিজ্ঞেস কর, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি কখনো সমান?"(আল-কুরআন, সূরা আয্-যুমার, আয়াত-৯)

এই দুই শ্রেণীর লোক কখনো সমান নয় বলেই কুরআনের নির্দেশ :

فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ-

"তোমরা নিজেরা যদি নাই জান, তাহলে যারা জানে তাদের থেকে জেনে নাও।" (আল-কুরআন, সূরা আন্ নাহল, আয়াত-৪৩)

রাসূলে করীম (সা.) ইলম বা জ্ঞানকে সকল কল্যাণের উৎসরূপে আখ্যায়িত করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত একটি হাদীসে তিনি বলেন :

مَنْ يُّرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ-

"আল্লাহ্ তা'আলা যাকে কল্যাণ দান করতে চান, তাকে তিনি দ্বীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ও সমঝ দান করেন।" (মুসনাদে আহমদ)[৫১](পৃ:-১৩)

দ্বীনি ব্যাপারে অগ্রগণ্যতা লাভের মাপকাঠি হচ্ছে দ্বীন সম্পর্কিত ইলম ও জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব। এটি যেমন নামাযের ইমামতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তেমনি ইসলামী সমাজে রাষ্ট্রীয় মর্যাদার ব্যাপারেও অবশ্যই লক্ষ্যণীয়।

তাই রাসূল (সা.) হযরত আবু মাসউদ (রা.) বর্ণিত একটি হাদীসে ইসলামী নেতৃত্বের গুণাবলী উল্লেখ করে বলেন :

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَاهُمْ لِكِتَابِ اللهِ فَإِنْ كَانُوْا فِى الْقِرْأَةِ سَوَاءً فَاعْلَمُهُمْ بِسُنَّةٍ فَإِنْ كَانُوْا فِى السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوْا فِى الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا وَلاَ يَؤُمَّنَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِى سُلْطَانِهِ وَلاَ يَقْعُدُ فِى بَيْتِهِ عَلَى مَقْعَدِهِ

"লোকদের ইমাম (নেতা) হবে সে ব্যক্তি, যে তাদের মধ্যে কুরআনী জ্ঞানে দক্ষ। এদিক দিয়ে সকলে সমান হলে সে ব্যক্তি অগ্রসর হবে যে সুন্নাহ সম্পর্কে অধিক বিজ্ঞ। এতেও সকলে সমান হলে যে হিজরতের (আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ বর্জনে অগ্রবর্তী) ব্যাপারে অগ্রবর্তী সে ইমাম হবে। এতেও সমমানের হলে যে বয়সে বড় তিনিই অগ্রগণ্য হবেন। কোন ব্যক্তি যেন অপর কোন ব্যক্তির প্রভাব-প্রতিপত্তির স্থানে ইমামতি না করে এবং তার ঘরে তার গদির উপর তার অনুমতি ছাড়া যেন কেউ না বসে।" (মুসলিম, মুসনাদে আহমদ)[৪৮](পৃ:-২১৭)

এই হাদীসও জ্ঞানকে অগ্রাধিার দিয়েছে। বস্তুত ইলম ছাড়া কোন ব্যক্তি নেতৃত্বের যোগ্যতা অর্জন তো দূরের কথা, সে নিজেও সঠিক পথে চলতে পারে না। তাই ইসলামী নেতৃত্বের গুনাবলী নির্দেশ করতে গিয়ে হযরত আলী (রা.) বলেন :

مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنَّاسِ إِمَامًا فَلْيَبْدَأْ بِتَعْلِيْمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِيْمِ غَيْرِهِ-

"যে ব্যক্তি নিজেকে লোকদের নেতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে তার কর্তব্য হলো, অপরকে শিক্ষাদানের পূর্বে নিজেকে শিক্ষাদান করা।"[৫১](পৃ:-১৪)

মোটকথা একজন ইসলামী নেতা-ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধানকে অবশ্যই কুরআন ও হাদীসের মৌল শিক্ষা ও দর্শন থেকে শুরু করে জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। অন্যথায় আল্লাহর আইনের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করা এবং রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক কার্যাবলীতে শরীয়াতের অনুসরণ করা কার্যত তার পক্ষে সম্ভব হবে না।

৭। আল্লাহ্‌র উপার নির্ভরতা : দুনিয়ার যে কোন কাজে সাফল্য অর্জনের জন্যে চেষ্টা সাধনা ছাড়া শুধুমাত্র সদিচ্ছা পোষণ করেই কোন লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভবপর নয়। তবে সেই সাথে এও সত্য যে, মানুষের চেষ্টা সাধনা তার সফলতার একমত্র গ্যারান্টি নয়, এর জন্যে প্রয়োজন আল্লাহ্‌র মদদ ও সাহায্য। কেননা, চেষ্টা সাধনা কোন কাজের জন্যে অপরিহার্য হলেও তার মূল সম্পাদনকারী হচ্ছেন আল্লাহ। তাঁর অনুমতি না হলে বিশ্বলোকে কোন ঘটনাই সংঘটিত হতে পারে না। মানুষ যতই বুদ্ধিমান ও কুশলী হোক না কেন, সে প্রতিটি কাজেই আল্লাহ্‌র মদদ ও সাহায্যের মুখাপেক্ষী। পবিত্র কুরআন এ সত্যটিই মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছে ঃ

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে, তিনিই তার জন্যে যথেষ্ট।" (আল-কুরআন, সূরা আত-তালাক, আয়াত-৩)

তিনি মুমিনদেরকে তাগিদ দিয়ে বলেছেন :

وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ-

"আল্লাহ্‌র উপরই মুমিনদের (সর্ব বিষয়ে) নির্ভর করা উচিত।"(আল-কুরআন, সূরা ইব্রাহীম, আয়াত-১১)

মুমিনদের এই সাধারণ তাগিদ দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা ইসলামী সমাজ সংগঠনের নেতৃত্বকে সরাসরি সম্বোধন করে বলেন :

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ-

"তুমি যখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর, তখন আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর কর।" (আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১৫৯)

এ থেকে স্পষ্টত : প্রতীয়মান হয় যে, দ্বীন-ইসলামের প্রতিষ্ঠা কিংবা তার প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত যে কোন কর্মকান্ডে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করা ইসলামী সমাজ-সংগঠন-রাষ্ট্রের নেতার অবশ্য কর্তব্য। এটা হবে তাঁর অন্যতম প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

৮। দ্বীনের পথে অবিচল নিষ্ঠা : দ্বীন ইসলামের প্রতিষ্ঠা বা তার প্রতিরক্ষার জিহাদ হচ্ছে সত্যের পথে এক নিরবিচ্ছিন্ন লড়াই। এ লড়াইয়ে নানা প্রতিকূলতা, বাধা-বিপত্তি ও ঘাত-প্রতিঘাতের মুকাবিলা করতে হয় দ্বীন কায়েমের প্রতিটি সাচ্চা মুজাহিদকে। তাই এ লড়াইয়ে, টিকে থাকতে হলে অত্যন্ত তীব্র প্রয়োজন হচ্ছে দ্বীনের পথে ইস্তিক্বামত বা অবিচল নিষ্ঠার। এই নিষ্ঠা বা দৃঢ়তাই হচ্ছে দীন প্রতিষ্ঠার জিহাদের একজন মুমিনের সবচেয়ে বড় পাথেয়। এটাই তাকে দ্বীনের পথে টিকিয়ে রাখার সবচেয়ে বড় গ্যারান্টি।

তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন :

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُوْنَ-

"যারা (দৃঢ়তার সাথে) ঘোষণা করে যে, আল্লাহ আমাদের প্রভু এবং একথার উপর অবিচল থাকে, তাদের কোন ভয় নেই, তারা কোন দুশ্চিন্তাও করবেনা।" (আল-কুরআন, সূরা আল আহকাফ, আয়াত-১৩, ১৪)

এই সাধারণ আশ্বাসবাণীর পর আল্লাহ তাআলা মানব জাতির সর্বোত্তম আদর্শ পুরুষকে লক্ষ্য করে বলেন :

فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ

"(হে নবী!) তুমি (দ্বীনের পথে) অবিচল ও দৃঢ় হয়ে থাক, যেমন তোমাকে আদেশ করা হয়েছে।"(আল-কুরআন, সূরা হুদ, আয়াত-১১২)

এই নির্দেশ স্পষ্টভাবে বলছে যে, ইসলামী সমাজ সংগঠনের নেতা-রাষ্ট্রনায়ক দ্বীনের সাথে তার সম্পৃক্ততার কথা শুধু মুখে মুখেই ঘোষণা করবেন না, তাকে দ্বীনের পথে টিকে থাকতে হবে অবিচলত, নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সাথে এবং সকল ভয় ভীতি ও প্রলোভনকে জয় করে। এটাই তার প্রতি আল্লাহর নির্দেশ।

৯। মানবিক ও উন্নতমানের চরিত্র : এসব ব্যক্তিগত গুণ ছাড়াও ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্টপ্রধানকে অবশ্যই উন্নত মানের মানবিক ও ইসলামী চারিত্রিক গুণে ভূষিত হতে হবে। কুরআন মজীদে এ গুণসূহের সমন্বিত গুণ-তাকওয়ার কথা বলা হয়েছে–

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ اَتْقَاكُم

"আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্য থেকে সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি সে, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক তাকওয়া সম্পন্ন।" (আল-কুরআন, সূরা আল হুজুরাত, আয়াত-১৩)

এছাড়া হাদীসের দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তিকেই উচ্চতর পদের জন্যে প্রার্থী হওয়া ও ক্ষমতা লাভের জন্যে লোভ করা, লালায়িত হওয়া ও নিজস্বভাবে চেষ্টা চালানোও স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ। কেননা তাতে ব্যক্তির কোন সদিচ্ছার পরিচয় পাওয়া যায় না। মনে হয় সে উচ্চ পদ বা ক্ষমতা লাভ করে নিশ্চয়ই নিজস্ব কোন বৈষয়িক স্বার্থ উদ্ধার করতে বা কোন অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চায়। মূলত এই উচ্চতর পদ ও ক্ষমতা একটি আমানত। এ

আমানত যেমন আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বসাধারণের প্রতি, তেমনি সর্বসাধারণ থেকে বিশেষ ব্যক্তির প্রতি। তাই যে লোক নিজ থেকে তা পাওয়ার জন্যে উদ্যোগী হবে, সে নিজেকে ক্ষমতালোভী হিসেবে চিত্রিত করবে। আর ইসলামী সমাজে ক্ষমতা লোভীর কোন স্থান নেই।

রাসূল করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন :

انا وَاللهِ لا نُوَلِّى هَذَا الْعَمَل اَحَدًا سَاَلَهُ اَو اَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ

"আল্লাহর শপথ! আমি এই দায়িত্বপূর্ণ কাজে এমন কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করব না, যে তা পাওয়ার জন্যে প্রার্থী হবে, অথবা এমন কাউকেও নয়, যে তা পাওয়ার জন্যে লালায়িত হবে।" (মুসলিম শরীফ) [৪৮](পৃ:-২২৩)

হাদীসটি হযরত আবু মূসা আল আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবেই দেখতে পয়েছিলেন : তাঁরই চাচার বংশের দুই ব্যক্তি রাসূলে করীম (রা.) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাদের একজন বলল ;

يَارَسُوْلُ اللهِ اَمِّرْنَا عَلَى بَعْضٍ مَاوَلَّاكَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ-

"হে রাসূল (রা.)! আল্লাহ আপনাকে যে বিরাট কাজের দায়িত্বশীল বানিয়েছেন তার মধ্যে কোন কোন কাজে আমাদেরকে নিযুক্ত করুন।"[৪৮](পৃ:-২২৩) অপরজনও অনুরূপ দাবি-ই পেশ করল। তখন নবী করীম (সা.) উভয়কে লক্ষ্য করেই উপরোক্ত সিদ্ধান্তটি ঘোষণা করেন।

আবুদুর রহামান ইবনে সামুরাতা বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) বলেছেন :

يَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الْاِمَارَةَ فَاِنَّكَ اِنْ اُعْطِيْتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ اُعِنْتَ عَلَيْهَا وَاِنْ اُعْطِيْتَهَا عَنْ مَسْاَلَةٍ وُكِّلْتَ اِلَيْهَا-

"হে আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা! তুমি নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব পেতে চেও না। কেননা তা পেতে চাওয়া ছাড়াই যদি তোমাকে তা দেয়া হয়, তাহলে সে দায়িত্ব পালনে তোমাকে সাহায্য করা হবে। আর চাওয়ার পর যদি দেয়া হয়, তাহলে তোমাকে সেই কাজে অসহায় করে ছেড়ে দেয়া হবে।" (বুখারী ও মুসলিম) [৪৮](পৃ:-২২৩)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) বরেছেন :

اِنَّكُمْ سَتَحْرِصُوْنَ عَلَى الْاِمَارَةِ وَسَتَكُوْنَ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ

"তোমরা হয়ত দায়িত্ব-কতৃত্বশীল পদ পাওয়ার জন্যে লালায়িত হবে। আর তাই কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্যে লজ্জার কারণ হয়ে দেখা দেবে।"[৪৫](পৃ:-১৪০)

যে লোক বাস্তবিকই এই কঠিন দায়িত্ব পালনে অক্ষম, দুর্বল তাকে তা গ্রহণ করতে নিষেধ করাই শ্রেয়। হযরত আবু যার গিফারী (রা.) কে লক্ষ্য করে নবী করীম (রা.) বলেছিলেন :

اِنَّكَ ضَعِيْفٌ وَاِنَّهَا اَمَانَةٌ وَاِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ خِزْىٌ وَنَدَامَةٌ اِلَا مَنْ اَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَاَدَّ الَّذِىْ عَلَيْهِ فِيْهَا

"হে আবু যার! তুমি দুর্বল ব্যক্তি, আর এ কাজ এক গুরুত্বপূর্ণ আমানত বিশেষ। একারণে তা তোমার জন্যে কিয়ামতের দিন লজ্জা ও অপমানের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। অবশ্য যে তা গ্রহণ করে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবে, তার জন্যে তা হবে না।"[৪৫](পৃ:-১৪০)

অপর হাদীসে রাসূল (সা.) বলেন :

اَلْاِمَامَةُ الضَّعِيْفِ عَنِ الْحَقِّ مَلْعُوْنٍ

"যে রাষ্ট্রনেতা দুর্বল, দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে অক্ষম, সে যদি এতদসত্ত্বেও রাষ্ট্রনেতা হয়েই থাকে তবে সে অভিশপ্ত।"[৪৫](পৃ:-১৪০)

ইসলামী হুকুমাতের বিশেষত্ব :

কুরআনের দৃষ্টিতে ইসলামী হুকুমাতের কয়েকটি বিশেষত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বিশেষত্ব সমূহ ইসলামী হুকুমাতকে অন্যান্য ধরনের হুকুমাত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করে। বস্তুত ইসলামী হুকুমাতের প্রথম ভিত্তি হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর সার্বভৌমত্ব। আর দ্বিতীয় ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহর কুরআন ও রাসূলের সুন্নাহই আইনের একমাত্র উৎস।

যে সরকারে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব নিরংকুশভাবে গৃহীত নয় বরং আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কারোর-জনগণের, কোন ব্যক্তির, কোন বংশের বা কোন শ্রেণীর সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত, তা কখনই ইসলামী সরকার হতে পারে না। কুরআনের দৃষ্টিতে সার্ববৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর, সার্বভৌম আল্লাহ ছাড়া আর কেউ-ই নয়; তাঁর মুকাবিলায় মানুষের স্থান ও মর্যাদা শুধু সেই সার্বভৌম আল্লাহর দাসত্ব করা, একান্ত অনুগত দাস হয়ে জীবন যাপন করা। তিনিই মানুষের দাসত্ব ব্যবস্থা নাযিল করেছেন তাঁরই মনোনীত সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মাধ্যমে। রাসূল (সা.) আল্লাহর আইন-বিধান অনুসরণ ও কার্যকরণের মাধ্যমেই আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বাস্তবায়িত করেছেন। কুরআন মজীদের বহু আয়াতে এ কথাই অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় বলা হয়েছে।

ইরশাদ হচ্ছে :

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

"চূড়ান্ত হুকুম দেয়ার-সার্বভৌমত্বের অধিকার একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারোরই নেই। তিনি পরম সত্য কথা বলেন, আর তিনিই হচ্ছেন সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।" (আল-কুরআন, সূরা আল-আনআম, আয়াত-৫৭)

অন্য আয়াতে আসছে : اَلا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ اَسْرَعَ الْحٰسِبِيْنَ

"তোমরা জেনে রাখবে, সার্বভৌমত্ব কেবলমাত্র আল্লাহরই, আর তিনিই হচ্ছেন সর্বাধিক দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।" (আল-কুরআন, সূরা আল-আনআম, আয়াত-৬২)

অপর আয়াতে আল্লাহ বলেন : اَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ -"সাবধান! সৃষ্টি তাঁর, নিরংকুশ ও নি:শর্ত হুকুম তাঁরই চলবে।" (আল-কুরআন, সূরা আল আ'রাফ, আয়াত-৫৪)

অপর আয়াতে বলা হয়েছে :

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ

"বলুন (হে নবী!) ইয়া আল্লাহ তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও।" (আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত-২৬)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اَلَمْ تَعْلَمُ اَنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

"তুমি কি জান না যে আসমান সমূহ ও জমীনের রাজত্ব কেবলই আল্লাহর?" (আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত-১০৭, মায়েদা-আয়াত-৪০)

আল্লাহর শুধু সার্বভৌমত্ব স্বীকার করলেই হবে না, আল্লাহর একক আইনকেও পূর্ণ স্বীকৃতি দিতে হবে। আল্লাহর কালাম কুরআন মজীদ এবং এর বাহক রাসূল (সা.) এর সুন্নাহকে আইনের উৎস- তাঁরই আইনকে দেশের আইনরূপে স্বীকৃতি দিতে ও জারি করতে হবে। অন্যথায় আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকারকারী রাষ্ট্রকেও ইসলামী রাষ্ট্র বলা যাবে না। কেননা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের বাস্তবতা তো আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমেই সম্ভব। আল্লাহর আইন বাস্তবায়নে অনীহা দেখালে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা প্রাকৃতিক জগতের একমাত্র স্রষ্টা নিয়ন্ত্রনকারী ও পরিচালক এখানেই শেষ নয়; বরং তিনি মানব জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় আইন-বিধান দাতাও। মৌলিকভাবে এ অধিকারও কেবলমাত্র আল্লাহরই জন্যে সংরক্ষিত। কেননা এই সৃষ্টি তাঁর, এর উপর হুকুম চালাবার অধিকার একমাত্র তাঁরই হতে পারে। তবে তিনি নিজেই যদি কাউকে তাঁর দেয়া শিক্ষা ও বিধানের ভিত্তিতে হুকুম দেয়ার অনুমতি দেন, তবে সেই অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তিও শর্ত সাপেক্ষে হুকুম দিতে পারবে। এক্ষত্রে দু'টি শর্ত: একটি, মূলত সার্বভৌমত্ব ও হুকুম দেয়ার অধিকার যে একমাত্র আল্লাহর একথা তাকে অকপটে ও নি:শর্তে মেনে নিতে হবে। আর দ্বিতীয়টি, তার হুকুম দেয়ার প্রাপ্ত ক্ষমতা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যবহার করতে হবে।

আল্লাহর পরে হুকুম দেয়ার অধিকার আল্লাহই দিয়েছেন তাঁর নিজ মনোনীত নবী-রাসূলগণকে। কুরআনে এ পর্যায়ের বহু আয়াত রয়েছে। একটি আয়াতে হযরত দাউদ (আ.) কে সম্বোধন করে আল্লাহ বলেন :

اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ

"হে দাউদ, আমরা তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করেছি। অতএব, তুমি লোকদের মধ্যে পরম সত্যতা সহকারে হুকুম চালাও এবং তুমি নিজের ইচ্ছা-বাসনা-খাহেশকে অনুসরণ করে হুকুম দিওনা। যদি তাই কর তাহলে তোমার এই ইচ্ছা-বাসনা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে ভ্রষ্ট করে দেবে।" (আল-কুরআন, সূরা ছোয়াদ, আয়াত-২৬)

এ আয়াতের প্রথম কথা, হযরত দাউদ (আ.) নিজে সার্বভৌম নন, তিনি সার্বভৌমের খলীফা। দ্বিতীয়ত তিনি মানুষের মধ্যে হুকুম চালাবেন নিজের খাহেশের বশবর্তী না হয়ে পরম সত্যতা সহকারে অর্থাৎ আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী। বিশ্বনবী (সা.) এর প্রতি আল্লা তা'আলার নির্দেশ :

اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ اللهُ- وَلاَ تَكُنْ لِلْخَائِنِيْنَ خَصِيْمًا-

"নিশ্চয়ই আমরা তোমার প্রতি পূর্ণ কুরআন শরীফ পরম সত্যতার সাথে এই জন্যেই নাযিল করেছি যে, তুমি মানুষের ওপর ঠিক আল্লাহ প্রদর্শিত পন্থায় রাষ্ট্র পরিচালনা করবে- বিচার ফয়সালা করবে। (কুরআনকে

যারা এই কাজে ব্যবহার করতে চায়না, তারা এই মহান আমানতের খিয়ানত কারী) তুমি এই খিয়ানতকারীদের সাহয্য ও পক্ষ সমর্থনকারী হইও না।" (আল-কুরআন, সূরা আন নিসা, আয়াত-১০৫)

হযরত রাসূলে করীম (সা.) একবার সাহাবাগণকে সম্বোধন করে বলেছিলেন : এমন এক সময় আসবে যখন নিরন্দ্র অন্ধকার রাতের ন্যায় ফেতনা ফাসাদ সমগ্র দুনিয়া কে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। একজন সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন ; ইয়া রাসূলুল্লাহ! সেই বিপদ থেকে বাঁচার উপায় কি? উত্তরে বিশ্বনবী (সা.) বলেন :

كِتَابُ اللهِ تَعَالَى فِيْهِ نَبَأُ مَنْ قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ بَيْنَكُمْ وَهُوَ فَصْلٌ لَيْسَ بِالْهَزْلِ

"আল্লাহর কুরআনই বাঁচবার একমাত্র উপায়। তাতে অতীত কালের জাতিগুলোর ইতিহাস আছে, ভাবিষ্যতের মানব বংশের অবস্থা ও ঘটনাবলী সম্পর্কে ভবিষ্যাদ্বানী আছে এবং বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে তোমাদের পারস্পরিক বিষয় সম্পর্কীয় রাষ্ট্রীয় আইন কানুনও তাতে আছে। বস্তুত তা এক চূড়ান্ত বিধান, তা কোনো বাজে জিনিস নয়।" (তিরমিযী শরীফ) [৪৬](পৃ:-৫৬)

অত:পর নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেলেন :

مَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ وَمَنْ عَصَمَ بِهِ فَقَدْ هُدِىَ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

"যে ব্যক্তি এই বিধান অনুসারে জীবন যাপন করবে, সে এর প্রতিফল লাভ করবে। যে এর অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালানা করবে তার শাসন সুবিচারপূর্ণ হবে এবং যে একে দৃঢ়রূপে আঁকড়ে ধরবে সে সঠিক এবং সত্যিকার কল্যাণের পথে পরিচালিত হতে পারবে।" (বাহরুস সাখিত) [৪৬](পৃ:-৫৬)

তাছাড়া অপর এক আয়াতে হযরত নবী করীম (সা.) কে একই সাথে মুসলিম উম্মাহকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে :

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

"আল্লাহর বিধান অনুযায়ী মানুষের ওপর হুকুমাত কায়েম কর, তাদের মনের খেয়াল-খুশী ও ধারণা-বাসনার অনুসরণ করো না।" (আল-কুরআন, সূরা আল মায়েদা, আয়াত-৪৯)

এই সব আয়াত ও হাদীস থেকে সন্দেহাতীতভাবে জানা গেল যে, ইসলামী হুকুমাতের বুনিয়াদী আইন হচ্ছে কুরআন ও হাদীস।[34] মানুষের নিছক অভিজ্ঞতা নিজস্ব মনোভাব কিংবা বিশেষ শ্রেণীর বা দলের বিশেষ স্বার্থের ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্রে আইন রচনা করা যেতে পারে না। তবে আল্লাহর দেয়া মৌলিক নীতির ওপর ভিত্তি করে প্রত্যেক যুগের বা প্রত্যেক দেশের বিশেষ প্রয়োজনে ইসলামী আইন প্রণয়ন করার ইসলামী আইনজ্ঞ মানুষের এক্ষেত্রে পূর্ণ অধিকার আছে। ইসলামী পরিভাষায় এই প্রচেষ্টার নাম ইজতিহাদ যা কিয়ামত পর্যন্ত উন্মুক্ত।

---

34 মহানবী (সা:) বিদায় হজ্জের ভাখণে মুসলিম উম্মাহর লাঞ্ছনা-বাঞ্ছনা ও অপমান থেকে রক্ষার একমাত্র অবলম্বন কুরআন-সুন্নাহকেই নির্ধারণ করেছেন :. تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه "তোমাদের জন্যে আমি দু'টি জিনিস [redacted] রেখে যাচ্ছি, যে দু'টি তোমরা আঁকড়ে ধরলে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রে এই দুইটির অনুকরণ-অনুসরণ করলে তোমরা কখনই পথভ্রষ্ট হবে না, জিনিস দু'টি হলো আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ।" সুতরাং এ থেকেও বুঝা যায়, ইসলামী আইনের মূল উৎস কুরআন ও সুন্নাহ।

ইসলামী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য :

আল্লাহর একচ্ছত্র প্রভুত্ব, আধিপত্য ও আইন রচনার অধিকার এবং সকল মানুষের সমানভাবে আল্লাহর দাস হওয়া ও তাঁর কাছে সকলের জবাবদিহি করার স্পষ্ট ও সক্রিয় ধারণার ভিত্তিতে যে রাষ্ট্র স্থাপিত হবে তাই ইসলামী রাষ্ট্র। ইসলামী রাষ্ট্রনীতিকে ইংরেজীতে বলা হয় Rulership of God on the people by pious men with Justiec. [৪৬](পৃঃ-৫২) ইসলামী রাষ্ট্রের একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য ও নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে।

কুরআন শরীফে আল্লাহ তা'আলা সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যর কথা পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ

"আমরা আমাদের রাসূলগণকে আকাট্য যুক্তি ও সুস্পষ্ট বিধানসহ পাঠিয়েছি এবং তাদের কাছে আল কিতাব ও আল মীজান প্রেরণ করেছি যেন মানুষ ইনসাফ কায়েম করতে পারে। আমরা লৌহও নাযিল কারেছি, এর মধ্যে বিরাট শক্তি নিহিত আছে এবং আছে প্রভূত কল্যাণের সম্ভাবনা।" (আল-কুরআন, সূরা আল হাদীদ, আয়াত-২৫)

উল্লেখিত আয়াতে লোহ অর্থ রাষ্ট্রশাক্তি এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁর আসমানী কিতাবে যে সামঞ্জস্য-ভারসাম্যপূর্ণ জীবন-বিধান আল-মীজান নাযিল করেছেন, সেই অনুসারে রাষ্ট্র শক্তিকে পরিচালিত করে সামাজিক সুবিচার (Social Justiec) ব্যাবস্থার প্রতিষ্ঠা করাই রাসূলগণের কর্তব্য নির্দিষ্ট হয়েছে।

আর রাসূলগণের পরে যারা এই দায়িত্ব পালন করবে তাদের কর্তব্য সম্পর্কে অন্যত্র বলা হয়েছে :

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ

"ইসলামী হুকুমত পরিচালনার দায়িত্ব এমন লোকদের ওপর ন্যাস্ত করতে হবে যে তাদেরকে পৃথিবীর প্রতিপত্তি ও রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করলে তারা নামায পড়ার স্থায়ী ব্যবস্থা কায়েম করবে, যাকাত আদায়ের সামাজিক প্রথার প্রচলন করবে, (জনগণকে) পূণ্য,ন্যায় ও সৎকাজের নির্দেশ দান করবে এবং অন্যায় ও পাপ থেকে বিরত রাখবে।" (আল-কুরআন, সূরা আল হাজ্জ, আয়াত-৪১)

এই আয়াতে ইসলামী রাষ্ট্রের চারটি উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে : ১। নামায কায়েম করা, ২। যাকাত আদায় করা ৩। সকল ন্যায় ও কল্যাণকর কাজের প্রতিষ্ঠা করা এবং ৪। সকল অন্যায় ও পাপ কাজের প্রতিরোধ করা।

নামায কায়েম করার অর্থ ব্যক্তিগতভাবে শুধু নামায পড়াই নয়, বরং যাবতীয় শারীরিক ইবাদতকে শ্রেণীমতে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত ও চালু করাই এর উদ্দেশ্য। যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা করার অর্থও শুধু ব্যক্তিগতভাবে যাকাত দেয়া নয়; বরং দেশের গোটা অর্থ-ব্যবস্থাকে ঢেলে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ আদর্শ অনুযায়ী গঠন করাই এর তাৎপর্য। আর ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ অর্থ : যে ন্যায় ও প্রচলিত কাজ মানুষের পক্ষে প্রকৃত কল্যাণকর, একেই সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে পূর্ণরূপে চালু করতে হবে এবং যে অন্যায় ও ঘৃণিত কাজ মানুষের প্রগতির পথে অন্তরায় হতে পারে তার প্রতিরোধ করতে হবে। সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি স্তর থেকে তা নির্মূল করতে হবে।

বস্তুত কুরআনের উপস্থাপিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার উদ্দেশ্য মানুষকে শুধু পারস্পরিক জুলুম ও শোষণ থেকে রক্ষা করা, তাদের স্বাধীনতা ও ধন-প্রাণের শুধু রক্ষনাবেক্ষণ এবং রাষ্ট্রকে বহিক্রামন থেকে শুধু বাঁচানোই নয়, এর লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী সামাজিক সুবিচারের একটি পূর্ণ শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা। এর উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলা নির্ধারিত সমস্ত পাপ ও অন্যায়ের উৎস মূলকে চিরতরে বন্ধ করে দেয়া এবং আল্লাহ নির্দেশিত যাবতীয় পূর্ণ ও ন্যায়পন্থাকে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠা করা।

ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগ :

আধুনিক কালের প্রতিটি স্বাধীন রাষ্ট্রের তিনটি শাখা প্রধান : ১। নির্বাহী বিভাগ (Exicutive), ২। আইন প্রণয়ন বিভাগ (Lagislature), ৩। বিচার বিভাগ (Judiciary) এই তিনটি বিভাগের ভারসাম্যপূর্ণ সক্রিয়তা ও সমন্বয়ের মাধ্যমেই গড়ে উঠে একটি পূর্ণাঙ্গ সরকার ব্যাবস্থা। ইসলামী রাষ্ট্রেরও তিনটি প্রধান বিভাগ রয়েছে। দেড় হাজার বছর পূর্বে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম প্রতিষ্ঠালগ্নেই ইললাম রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীকে এই তিনটি বিভাগে বিভক্ত করেছে। যদিও তার স্বতন্ত্র নামকরণ করা হয়নি এবং সেজন্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রাসাদে ভিন্ন ভিন্ন দপ্তরও খোলা হয়নি। তথাপি কুরআন মজীদ ও রাসূলের সুন্নাতেই এ বিভক্তি স্পষ্টভাবে বিধৃত।

ক) মজলিসে শুরা (আইন প্রণয়ন বিভাগ) :

ইসলামী রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন বিভাগ যেহেতু কুরআন ও সুন্নায় বিধৃত আইন সমূহকে মৌলিক ও শাশ্বত বিধান হিসেবে মেনে নেবে, তাই এখানে পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পার্লামেন্টের ন্যায় স্বাধীনভাবে যথেচ্ছা আইন রচনা করার কোন অধিকার থাকবে না, বরংআল্লাহ-রাসূল প্রদত্ত মৌলিক বিধান সমূহ বাস্তবায়িত করার উপায় উদ্ভাবনই হবে মজলিসে শুরা বা সংসদের প্রধান করণীয়। কেননা ইসলামী রাষ্ট্রে মৌলিকভাবে কোন আইন প্রণয়নের কাজ নেই। ইসলামে আইনদাতা (Law giver) হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। তাই এখানে কাজ শুধু রাসূলে আকরাম (সা.) এর সুন্নাতের আলোকে আল্লাহর আইন সমূহকে সন্ধান করা, ধারাবদ্ধ (Codify বা Codification) করা এবং আইন কার্যকর করণের পদ্ধতি ও প্রেক্ষিত রচনা করা।[৪৫](পৃ:-১৫৮) বলা যায়, ইসলামী আইনের কার্যকর হওয়ার চারটি পর্যায় :

১. আইন রচনা– আল্লাহর কাজ,
২. আইন সন্ধান, ধারাবদ্ধকরণ ও প্রেক্ষিত নির্ধারণ–
৩. আইন কার্যকর করণ নির্বাহী কর্মকর্তার কাজ; এবং
৪. আইনের ভিত্তিতে পারস্পরিক নিস্পত্তি ও অপরাধীকে দন্ডাদান বিচার বিভাগের কাজ।

কুরআনের ঘোষণানুযায়ী সমগ্র জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারাদিতে পরামর্শ দেয়ার, রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণের সমস্ত দায়িত্ব মজলিসে শুরাকেই বহন করতে হয়। অতএব, রাষ্ট্র প্রধান নির্বাচন ও নিয়োগের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য কাজ হচ্ছে মজলিসে শুরা গঠন। কুরআন মজীদে মুসলমানদের গুন ও কার্যপদ্ধতির পরিচয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ -"তাদের যাবতীয় কাজকর্ম নিজেদের মধ্যে পরস্পরিক পরামর্শ নিয়ে সাধিত হয়।" (আল-কুরআন, সূরা আশ শুরা, আয়াত–৩৮)

অন্যত্র হযরত নবী করীম (রা.) কে আদেশ করা হয়েছে : وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ -"(সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়) কাজকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর।" (আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১৫৯)

এজন্যেই ইসলামী রাষ্ট্রনীতিতে, মজলিসে শুরা গঠন করার স্থায়ী নিয়ম করা হয়েছে। বস্তুত এই হচ্ছে ইসলামী ও ন্যায়সঙ্গত গণখিলাফতের বুনিয়াদ।

মজলিসে শুরা গঠনের মূলনীতি :

আমীর এবং মজলিসে শরার সদস্য নির্বাচনের জন্যে একটি মূলনীতি আল্লাহ তা'আলা ঠিক করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : -اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ اَتْقَاكُمْ-"নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে সে লোকই আল্লাহর কাছে অধিক সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ, যে তোমাদের মধ্যে সকলের চেয়ে বেশী আল্লাহভীরু ও ধার্মিক।" (আল-কুরআন, সূরা আল হুজুরাত, আয়াত-১৩)

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যাবস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারী নির্বাচন ও নিয়োগে জনগণ নিজেদের মধ্যে যাকে সবচেয়ে ধার্মিক, আল্লাহভীরু, বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় যোগ্যতা ও প্রতিভা সম্পন্ন লোক বলে মনে করবে তাকে আমীর পদে এবং এই ধরনের গুনে গুনান্বিত ব্যক্তিগণকে মজলিসে শুরার সদস্য পদে নির্বাচিত করবে।

বেতন বা মজুরীর বিনিময়ে শ্রমিক-কর্মচারীকে কাজে লাগাতে গেলে সেই কর্মচারীকেও শক্তি ও কর্মক্ষমতা সম্পন্ন এবং সর্বোপরি বিশ্বস্ত হওয়া কুরআনের দৃষ্টিতে কাম্য। তাই কুরআনে বলা হয়েছ– :

اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاجَرْتَ الْقَوِىُّ الاَمِيْنُ

"তুমি যাকে কোন কাজে মজুরীর বিনিময়ে নিযুক্ত করবে, তার শক্তিশালী ও যোগ্যতা সম্পন্ন এবং অতীব বিশ্বস্ত-আমানতদার হওয়াই সর্বোত্তম।" (আল-কুরআন, সূরা আল কাসাস, আয়াত-২৬)

কাজেই রাষ্ট্রপ্রধানের ন্যায় মজলিসে শুরার সদস্যেরও অধিক যোগ্যতা সম্পন্ন ও বিশ্বস্ত হওয়াই ইসলামের দৃষ্টিতে কাম্য।

শুরা সদস্যদের গুনাবলী ও যোগ্যতা

মজলিসে শুরার সদস্যদের কি গুন ও যোগ্যতা থাকা বাঞ্চনীয়, সে সম্পর্কে নিম্নলিখিত দু'টি হাদীস হতে অধিক সুস্পষ্ট নির্দেশ লাভ করা যায়। হযরত আলী (রা.) নবী মুস্তফা (সা.) এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন : কুরআন ও সুন্নাতে কোনো বিষয়ের নির্দেশ না পেলে তখন আমাদের পক্ষে সঠিক পন্থা কী হবে? উত্তরে নবী করীম (সা.) বললেন :

تَجْعَلُوْنَهُ شُوْرَا بَيْنَ اَهْلِ الْفِقْهِ وَالعَابِدِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلَاتَقْضِ فِيْهِ بِرَاْيِكَ خَاصَّةً

"ফকীহ বা ইসলামী শাস্ত্রবিদ, ধর্মপরায়ন মুসলমানদের নিয়ে গঠিত মজলিসে শুরার সম্মুখে বিষয়টি পেশ করবে, কেবল নিজের মতের ভিত্তিতেই কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না।" (তিবরানী বর্ণিত) [৪৬](পৃ:-৭৩)

অর্থাৎ মজলিসে শুরার অধিকাংশ সদস্যের সুচিন্তিত মতে যে সিদ্ধান্ত হবে তাকেই গ্রহণ করতে হবে। অন্যান্য সদস্যদের মতামতের গুরুত্ব না দিয়ে আমীর বা রাষ্ট্রপ্রধান কেবল নিজের মতের প্রাধান্যে কিছুই ফয়সালা করবে না। বরং সকলের পরামর্শের ভিত্তিতে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করবে।

অন্য একটি হাদীসে হযরত নবী করীম (সা.) আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) কে আদেশ করেছেন :

وَاسْتَشْرِ فِيْ اَمْرِكَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اللهَ

"তোমাদের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সমূহে ঐসব লোক নিয়ে পরামর্শ করো, যারা আল্লাহকে ভয় করে কাজ করে।" (মুসতাদরাক) [৪৬](পৃ:-৭৪)

মজলিসে শুরার উপর অর্পিত দায়িত্ব হচ্ছে, কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে ইসলামী আইন বের করা ও ধারা হিসেবে সজ্জিত করা। এজন্য শুরা সদস্যদের– অন্তত তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্যদের যে কুরআন-সুন্নাহ পারদর্শী হতে হবে তাতে কোনই সন্দেহের অবকাশ নেই।

এ পর্যায়ে আল্লাহ্‌র নির্দেশ হচ্ছে :

فَاسْئَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ

"তোমরা নিজেরা যদি নাই জানো, তাহলে যারা জানে, তাদের নিকট জিজ্ঞেস কর।" (আল-কুরআন, সূরা আন্ নাহল, আয়াত-৪৩)

মজলিসে শুরার মর্যাদাই হচ্ছে এই যে, তার নিকট যাবতীয় বিষয়ে ইসলামী আইন চাওয়া হচ্ছে। তাকে নিযুক্তই করা হয়েছে জাতীয়, সামষ্টিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারাদিতে ইসলামী আইন দেয়ার জন্যে। আর ইসলামী আইনের একমাত্র উৎস যেহেতু কুরআন ও সুন্নাহ, তাই শুরার সদস্যদেরকে কুরআন ও সুন্নাহতে মৌলিকভাবে ইজতিহাদী যোগ্যতা সম্পন্ন জ্ঞানী হতে হবে। অন্যথায় তাদের দ্বারা দায়িত্ব পালন কোনক্রমেই সম্ভব হতে পারে না। আয়াতের 'আহলিয-যিকর' অর্থ 'আহলিল ইলম'– কুরআন-সুন্নাহর ইলম এর অধিকারী।

এ প্রসঙ্গে সুনানে আবু দাউদ-এ বর্ণিত হাদীসে নবী করীম (সা:) বলেছেন :

اَجْمِعُوا الْعَالِمِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاجْعَلُوْهُ شُوْرَى وَلَا تُقْضُوْا فِيْهِ بِرَأْيِ وَاحِدٍ

"তোমরা কুরআন সুন্নায় পারদর্শী মুমিন লোকদের একত্রিত কর। অত:পর তাদের সমন্বয়ে শুরা গঠন কর। তবে তাদের কোন একজনের মতের ভিত্তিতে কেবল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না।" (আবু দাউদ)[৪৫](পৃ:-১৬২)

ইসলামী রাষ্ট্রের মজলিসে শুরায় এ ধরণের যোগ্যতা সম্পন্ন যথেষ্ট সংখ্যক লোক থাকতে হবে, যারা কুরআন-সুন্নাহ সামনে নিয়ে গভীর সূক্ষ্ম গবেষণা চালিয়ে প্রয়োজনীয় আইন বের (استنباط) করতে সক্ষম। অন্যথায় নিত্য পরিবর্তনশীল দুনিয়ায় নিত্যনব সংঘটিত ঘটনা ও ব্যাপারাদিতে ইসলাম সম্মত আইন ধারাবদ্ধ করা মজলিসে শুরার পক্ষে সম্ভব হবে না। এ কারণে আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে অন্তত কিছু সংখ্যক লোককে উচ্চতর দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের জন্যে বের হয়ে আসার এমনকি প্রয়োজন হলে বিদেশে গমণ করার জন্যে উৎসাহিত করেছেন। বলেছেন :

فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

"জনগণের মধ্যের প্রত্যেকটি গোষ্ঠী থেকে কিছু সংখ্যক লোক কেন বের হয়ে যায় না দ্বীন সম্পর্কে গভীর সূক্ষ্ম জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে এবং এই উদ্দেশ্যে যে, তারা ফিরে এসে স্বজাতিকে-গোষ্ঠীকে সতর্ক করবে? তাহলে আশা করা যায় যে, তারা সতর্ক হবে।" (আল কুরআন, সূরা আত তাওবা, আয়াত-২২)

মজলিসে শুরার কার্যবিধি :

মজলিসে শুরার সম্মুখে ইসলামের বুনিয়াদি বিধান একটি অপরিবর্তনীয় ব্যবস্থা, এরই ভিত্তিতে শুরার সকল ব্যাপারে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। আল্লাহ তা'আলার উচ্চতর প্রভুত্ব-শক্তি এবং রাসূল চরিতের পথ-নির্দেশ ও নেতৃত্ব সেখানে চিরন্তন ও সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করে থাকে। শুরা একটি সুসংগঠিত ও সুসংবদ্ধ একাত্মক ব্যবস্থা বলে এর সদস্যগণের প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র অস্তিত্বের মালিক, ব্যক্তিগত স্বাধীন ও সত্য মত

প্রকাশের অধিকারী। মজলিসে শুরায় কোনো দলাদলি বা grouping থাকতে পারে না। মেজরটি আর মাইনরটি তথা সরকারী দল ও বিরোধী দল কিংবা মজুর-কৃষক ও ধনী-গরীবের কোন স্থায়ী দলবাদের অবকাশ এতে নেই। শুরার সদস্যগণ ইসলামের সুনির্দিষ্ট বিধান সামনে রেখে সকল ব্যাপারে নিজ নিজ স্বাধীন মতামত প্রকাশ করবে, সত্য মতের সমর্থন ও পক্ষপাতিত্ব এবং মিথ্যা ও অন্যায় মতের প্রতিবাদ ও বিরোধিতা করবে এটাই প্রতিটি সদস্যের জাতীয় ও ধর্মীয় কর্তব্য।

এ পর্যায়ে কুরআন মজীদের একটি আয়াত থেকে মজলিসে শুরার কার্যক্রম পরিচালনা সম্পর্কে কয়েকটি মূলনীতির নির্দেশ পাওয়া যায়। আয়াতটি হলো :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ **وَاتَّقُوا اللَّهَ** الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

"হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা যখন পারস্পরিক বিষয়ে পরামর্শে লিপ্ত হও, তখন যেন তোমরা গুনাহের কাজ, অন্যায় বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন এবং রাসূলের নাফরমানীর বিষয় নিয়ে পরামর্শ না কর; বরং তোমরা যাবতীয় কল্যাণময় ও আল্লাহ্‌র ভয়মূলক কাজেরই পরামর্শ করবে আর তোমরা সেই আল্লাহকে ভয় করো, যার কাছে তোমাদেরকে বিচারের জন্যে একত্রিত করা হবে।" (আল-কুরআন, সূরা আল মুজাদিলা, আয়াত-৯)

এই আয়াতে স্পষ্টভাবে যে কয়টি মূলনীতি বিবৃত হয়েছে তাহলো: প্রথমত ঈমানদার লোকদের পারস্পরিক বিষয়ে পরামর্শ করা এবং পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আবশ্যক। দ্বিতীয়ত পরামর্শের ব্যাপারে নৈতিবাচক ও ইতিবাচক কয়েকটি সীমাকে অবশ্যই রক্ষা করে চলতে হবে।

নেতিবাচক ভাবে মোট তিনটি সীমা রক্ষা করতে হবে :

১। কোনো গুনাহের কাজে পরামর্শ করা যাবে না, পরামর্শ করে কোনো গুনাহের কাজের সিদ্ধান্ত করা যাবে না।

২। সীমালঙ্ঘন হয় যে কাজে তার সিদ্ধান্ত করা যাবে না। এই সীমা আল্লাহ্‌র কুরআন ও রাসূলের সুন্নাহ দ্বারা নির্দিষ্ট। সামগ্রিক কাজ-কর্ম সম্পর্কে যে পর্যায়ে যে সীমা কুরআন-সুন্নাহ কর্তৃক নির্দিষ্ট হয়েছে, তা পরামর্শ করণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও আইন প্রণয়ন কিছুতেই লঙ্ঘন করা যাবে না।

৩। সামাজিক ও সামগ্রিক কাজ সম্পাদনের ও বিস্তারিত বা খুঁটিনাটি বিষয়ে নিয়ম-প্রণালী বা আইন প্রণয়নে রাসূলে করীম (সা:)-এর অনুসৃত আদর্শ এবং প্রদর্শিত পথ ও পন্থাকে পরিহার করা যাবে না। বরং তা অনুসরণ করেই মজলিসে শুরার যাবতীয় দায়িত্ব পালন করতে হবে।

আর ইতিবাচকভাবে দু'টি ভাবধারাকে ভিত্তি করে পরামর্শ করতে হবে :

১। 'বির' তথা জনগণের সর্বাত্মক কল্যাণই হবে শুরার লক্ষ্য এবং যাতে নির্বিশেষে সকলের কল্যাণ সাধিত হয় তারই বাস্তব কার্যসূচী গ্রহণ করা হবে শুরার একমাত্র দায়িত্ব। যদিও তা করতে হবে আল্লাহ্‌র বন্দেগীমূলক নীতি অবলম্বনের মাধ্যমে।

২। 'তাকওয়া' অর্থাৎ এসব কাজ সম্পাদন করার ব্যাপারে শুরা সদস্যদের মনের প্রধান উদ্বোধক, নিয়ামক, প্রেরণাদাতা ও নিয়ন্ত্রনকারী ভাবধারা হবে আল্লাহ্‌র ভয়। আল্লাহকে ভয় করেই তাঁর নিষিদ্ধ কাজ বর্জন ও তাঁর আদেশ সমূহকে যথাযথ মর্যাদা দান ও পালন করতে হবে।

খ) নির্বাহী বিভাগ (Executive) :

রাষ্ট্রের দ্বিতীয় বিভাগ হচ্ছে আইন সমূহ বাস্তবায়ন ও আইনের ভিত্তিতে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনকারী নির্বাহী বিভাগ। মজলিসে শুরা বা পার্লামেন্টে ধারাবদ্ধ আইন পাস হওয়ার পর আধুনিক নিয়মে তাতে রাষ্টপ্রধানের সম্মতিসূচক স্বাক্ষর হতে হয়। অন্যথায় কোন আইনই আইন হিসেবে পরিগণিত হয় না। রাষ্ট্রপ্রধানের স্বাক্ষর

Dhaka University Institutional Repository

হওয়ার পরই নির্বাহী কর্মকর্তাদের দ্বারা সারা দেশে তা কার্যকর হয়। তাই নির্বাহী বিভাগ বা আইন প্রয়োগকারী অথোরিটি (Authority) আধুনিককালের প্রত্যেকটি সরকারের একটি অপরিহার্য বিভাগ।

আধুনিক কালের প্রশাসনিক কাঠামোতে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার হলে প্রেসিডেন্ট ও তার মন্ত্রীসভা (Cabinet) আর পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার হলে প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রীদের সমন্বয়েই এ নির্বাহী বিভাগ গঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে প্রাদেশিক কর্মকর্তা আর ইউনিটারী সরকার হলে বিভাগীয় ও জিলা– প্রভৃতি প্রশাসনিক বিভাগসমূহের কর্মকর্তারা নির্বাহী সরকার যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ। আর বাস্তবতার দৃষ্টিতে এ সরকারই হয়ে থাকে একটি দেশের শাসক ও প্রশাসক।

ইসলামে স্পষ্টভাবেই প্রশাসনিক সংঘ– নির্বাহী ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ ও আইন নির্ধারক মজলিসে শুরা– আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান উপস্থাপিত এ তিনটি বিভাগই পুরোপুরি বর্তমান। কেননা ইসলামী আদর্শ তো সর্বতোভাবে বাস্তবায়িত হওয়ার বিধান। আর তা এ বিভাগ সমূহের সক্রিয়তার মাধ্যমেই সম্ভব হতে পারে। ইসলাম বিশ্ব মানবতার জন্যে যে কল্যাণ নিয়ে এসেছে, তা এসব বিভাগ ও সংস্থার পূর্ণাঙ্গ কার্যকরিতার মাধ্যমেই তো জনগণের নিকট পৌঁছানো সম্ভব হতে পারে।

উপরন্তু কুরআন মজীদের সূরা আলে ইমরানের ১০৪ নং আয়াত সহ অপরাপর আয়াতে বর্ণিত 'ওয়াল তাকুম-মিনকুম উম্মাতুন'– তোমাদের মধ্যে এমন লোক সমষ্টি অবশ্যই থাকতে হবে বলে যে 'আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার'- ন্যায় ও আইন সম্মত কার্যাবলীর কার্যকর করা ও আইন বিরোধী কার্যাবলী করতে ও হতে না দেয়ার যে গুরুদায়িত্বের কথা বলা হয়েছে, তা তো কেবল এই প্রশাসনিক সংস্থার মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হতে পারে।

সুতরাং বলা যায়, 'আমর বিল মারূফ ও নাহী অনিল মুনকারের' নিয়মাবলী তার সমস্যা ও শর্তসমূহ পূরণের জন্যে একটি সংস্থা গড়ে তোলা আবশ্যক। এই সংস্থাই হচ্ছে কার্যত ইসলামী রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগ (Executive Department)। ইসলামের আইনসমূহ বলবৎ করা ও প্রয়োগ করার জন্যে এটি দায়িত্বশীল। আইন বিভাগ কর্তৃক সাব্যস্ত করা আইন ও বিচার বিভাগের রায়সমূহ যথাযথভাবে কার্যকর করা এই সংস্থাটি ব্যতীত কখনই সম্ভব হতে পারে না। তাই ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজে আল্লাহ্‌র আইনসমূহ কার্যকর করার পূর্ণ দায়িত্ব এ বিভাগটির উপর অর্পিত।

বস্তুত ইসলামী রাষ্ট্রে নির্বাহী বিভাগ সদা কার্যকর না থাকলে মজলুম মানুষেরা নিরাপত্তা পেতে পারে না। বেকার ও অচল করে রাখা আল্লাহ্‌র হদ্দ ও দন্ডসমূহ কার্যকর ও বাস্তবায়িত হতে পারে না। সমাজে সাধারণ সংস্কারমূলক কার্যাদি সুসম্পন্ন হতে পারে না। আল্লাহ্‌র আইন-বিধান আদেশ, নিষেধ সমূহ কার্যকর হতে পারে না। কুরআনের ঘোষণানুযায়ী এই বিভাগটিই হচ্ছে 'আমর বিল মারূফ ও নাহী আনির মুনকার' বিভাগ। এই বিভাগটি অবশ্যই সরকারী পর্যায়ে সরকারী শক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ **الْمُنكَرِ**

"তারা সেই লোক, যাদেরকে আমরা যদি পৃথিবীতে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করি তাহলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে এবং আমর বিল মারুপ ও নাহী আনিল মুনকার করবে।" (আল-কুরআন, সূরা আল হাজ্জ, আয়াত, ৪১)

এ আয়াত স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার-এর কাজ যথার্থভাবে করার জন্যে শক্তি সামর্থ প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তির প্রয়োজন, যা কেবল রাষ্ট্র শক্তির পৃষ্ঠপোষকতা ও সমর্থনের মাধ্যমেই পাওয়া যেতে পারে। এজন্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কার্যকর প্রয়োগ একান্তই অপরিহার্য। আর এ কাজের ব্যর্থতার জন্যে দায়ী থাকবে ইসলামী সরকারের এ নির্বাহী বিভাগ।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ - لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ -

"তোমরা দেখতে পাও, এদের (ইয়াহুদী) অনেক লোকই গুনাহ, জুলুম, বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন মূলক কাজে প্রবল প্রতিযোগিতা ও চেষ্টা-সাধনা করে যাচ্ছে। এরা নির্ভয়ে হারাম খাচ্ছে। বস্তুত এরা যা করছে, তা অত্যন্ত খারাপ। এদের মধ্যকার আলিম ও পুরোহিতরা– শাসকরা তাদেরকে এসব পাপের কথা, কাজ ও হারাম মাল ভক্ষণ থেকে কেন বিরত রাখছেনা। এরা যা কিছু করছে তা নি:সন্দেহে অত্যন্ত খারাপ।"
(আল-কুরআন, সূরা আল মায়েদা, আয়াত-৬২, ৬৩)

কুরআন মজীদে উল্লেখিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলীতে লক্ষ্য করা যায় যে, সমাজের লোকেরা যখনই আল্লাহ্‌র নাফরমানী কাজে লিপ্ত হয়েছে এবং তাদের মধ্যকার সাধারণ সুস্থ বুদ্ধির লোকেরা, আলিম ও পন্ডিত লোকেরা সর্বোপরি শাসন কর্তৃপক্ষ জনগণকে সেই নাফরমানী কাজ থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করেনি, বাধা দেয়নি, তখনই সেই সমাজের উপর আল্লাহ্‌র কঠিন আযাব এসেছে এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং সন্দেহাতীত ভাবে বলা যায়, সমাজ-রাষ্ট্রের জনগণের অন্যায়-পাপাচারের জন্যে সমাজপতি, রাষ্ট্রপতি, সমাজের নির্বাহী বিভাগকেই কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ্‌র দরবারে জবাবদিহি করতে হবে, যদি না তারা এর প্রতিকার প্রতিরোধের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

গ) বিচার বিভাগ :

বিচার বিভাগ মজলিসে শুরা কর্তৃক পাশকৃত ও সংকলিত (Codified) কুরআন-সুন্নাহর আইনের ভিত্তিতে বিচার কার্য সম্পন্ন করবে। এই বিভাগ রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক গঠিত এবং এর বিচারকমন্ডলী রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক নিয়োগকৃত হলেও গোটা বিভাগের বিচারকমন্ডলী হবে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ। এই বিভাগের মর্যাদা হচ্ছে কুরআন-সুন্নাহ উপস্থাপিত সুবিচার ও ন্যায়পরায়তা বাস্তবায়নের জন্যে পূর্ণমাত্রায় দায়িত্বশীল। নাগরিকদের যে কোন আইন সঙ্গত দাবি যে কারো বিরুদ্ধে এমনকি রাষ্ট্র প্রধানের বিরুদ্ধেও যে কোন অভিযোগ বিচার বিভাগের নিকট উত্থাপিত হতে পারবে এবং বিচার বিভাগ প্রয়োজন মনে করলে রাষ্ট্রপ্রধানকে বিবাদী হিসেবে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে বাধ্য করতে পারবে। অনুরূপভাবে স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার যে কোনো নাগরিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আদালতে দায়ের করে বিচার প্রার্থনা করতে পারবে। এমনকি, আদালতি কার্যক্রম সম্পন্ন না করে কোনো নাগরিককে কোনো অপরাধের জন্যে দায়ি করতে বা শাস্তি দিতে স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধানও পারবে না। আদালতের সম্মুখে বাদী-বিবাদী সে যেই হোক নির্বিশেষে সকলেই সমান। বিচার কার্যের ওপর কোন দিক দিয়েই কোনরূপ প্রভাব বিস্তার, হস্তক্ষেপ বা নিয়ন্ত্রণ করার একবিন্দু অধিকার কারো নেই। বরং এরূপ করার জন্যে যে কোনো চেষ্টাকারীই আইনের বিচারে অপরাধি ও শাস্তিযোগ্য বিবেচিত হবে।

বিচার ও ইনসাফ প্রতিটি মানুষের অতি স্বাভাবিক অধিকার। পানি, আলো ও বাতাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন দেশের প্রতিটি মানুষই পেতে পারে এ অধিকার হতে কেউ কাউকেও বঞ্চিত করতে পারে না, তেমনি সুবিচারও প্রতিটি মানুষের সমানভাবে প্রাপ্য! এ ব্যাপারে ধনী-গরীব, রাজা-প্রজা, জমিদার-কৃষক, পুঁজিদার-মজুর, কালো-গোরা, এমনকি কাফের-মুসলিমেরও কোনো পার্থক্য করা চলে না। এটাই বিশ্ব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল ও স্বাভাবিক নিয়ম এবং এটাই ইসলামের চিরন্তনী ব্যবস্থা।

আল-কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণা :

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ

"মানুষের পরস্পরের মধ্যে যখন কোনো ব্যাপারে তোমরা ফয়সালা করবে, তোমরা পূর্ণ সুবিচার ও নিরপেক্ষ, ইনসাফের সাথে ফয়সালা কর। আল্লাহ তোমাদেরকে অতীব ভালো কাজের উপদেশ দিচেছন।" (আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা, আয়াত-৫৮)

উপরন্তু নবীর প্রতি কুরআন শরীফ নাযিল হওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্যই হলো তাদ্বারা মানুষের মধ্যে সুবিচার ব্যবস্থা কায়েম করা। আল্লাহ্ বলেন :

وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ -

"নবীগণের কাছে আমরা কিতাব এবং নিরপেক্ষ ও নির্ভরযোগ্য মানদন্ড নাযিল করেছি– যেন মানুষ এই সবের সাহায্যে পরস্পরের মধ্যে সুবিচার ও ইনসাফ কায়েম করে।" (আল-কুরআন, সূরা আল হাদীদ, আয়াত-২৫)

অপর আয়াতে বলা হয়েছে :

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ- وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

"হে নবী! নিশ্চয়ই আমরা তোমার প্রতি এ কিতাব সত্যতার সাথে নাযিল করেছি এই উদ্দেশ্যে যে, তুমি লোকদের পরস্পরের মধ্যে বিচার ফয়সালা করবে আল্লাহ্র দেখানো নিয়মে এবং তুমি কখনই খিয়ানতকারী লোকদের পক্ষপাতকারী হবে না।" (আল-কুরআন, সূরা আন নিসা, আয়াত-১০)

নবী (সা:)-কে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন :

وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"তুমি যদি বিচার ফয়সালা কর (হে নবী!) তাহলে তাদের মধ্যে পূর্ণ ইনসাফ সহকারে বিচার ফয়সালা কর। কেননা ইনসাফকারী ও সুবিচারকারীদের আল্লাহ খুবই ভালোবাসেন।" (আল-কুরআন, সূরা আল মায়েদা, আয়াত-৪২)

অন্যত্র বলেন :

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

"হে নবী আমরা তোমার প্রতি এই কিতাব পরম সত্যতা সহকারে নাযিল করেছি, যা তার পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী ও তার সংরক্ষক। অতএব তুমি লোকদের মধ্যে আল্লাহ্র নাযিল করা বিধান অনুযায়ী বিচার ফয়সালা কর এবং তোমার নিকট আগত পরম সত্য থেকে বিমুখ হয়ে লোকদের ইচ্ছা- বাসনা, কামনার অনুসরণ করো না।" (আল-কুরআন, সূরা আল মায়েদা, আয়াত-৪৮)

কেবল নবী-রাসূলগণেরই এ দায়িত্ব নয়। আল্লাহ্র বিধানের ভিত্তিতে স্বাধীনভাবে বিচার-ফয়সালা করার এবং এই জন্যে বিচার বিভাগ কায়েম করার দায়িত্ব নির্বিশেষে সকল ঈমানদার লোকেরই। ইরশাদ হচ্ছে :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ -إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرً

"আল্লাহ তা'আলা নিশ্চিতভাবে তোমাদেরকে আদেশ করছেন যে, তোমরা আমানত সমুহ তাদের মালিক তথা প্রকৃতই যোগ্যদের নিকট যেন ফিরিয়ে দাও। আর তোমরা যখন জনগণের মধ্যে বিচার কার্য সম্পন্ন করবে তখন যেন পূর্ণমাত্রায় ন্যায়পরতার সাথে ফয়সালা কর। বস্তুত আল্লাহ অতীব উত্তম বিষয়ে তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চিত জানবে, আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।" (আল-কুরআন, সূরা আন নিসা, আয়াত-৫৮)

মামলার বিচারকার্য সম্পদানের সময় কোন পক্ষের প্রতি বিদ্বেষ কিংবা কারো প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসা যেন বিচারককে অবিচার করতে বাধ্য না করে, সে ব্যাপারে আল্লাহ্ পাক হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন :

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

-"কোন বিশেষ দলের প্রতি শত্রুতা তোমাদেরকে যেন এতদূর ক্ষুব্ধ করে না তোলে যে, (তার ফলে) তোমরা সুবিচার করা থেকে বিরত থেকে যাবে, তোমরা অবশ্যই ন্যায়বিচার করবে। বস্তুত তা আল্লাহ পরস্তির সাথে খুবই সামঞ্জস্যশীল। আর তোমরা সব সময়ই আল্লাহকে ভয় করতে থাকবে। নিশ্চিত জানবে, তোমরা যা কিছুই কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে পুরোপুরিভাবে অবহিত রয়েছেন।" (আল-কুরআন, সূরা আল মায়েদা, আয়াত-৮)

এমনকি পক্ষপাতিত্বের জন্যে বিচারককে উল্টো আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। আল্লাহ বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا -

"হে ঈমানদারগণ! ইনসাফের ব্যাপারে দৃঢ়তা অবলম্বন কর। আল্লাহ তা'আলার জন্যে সত্যের সাক্ষ্যদাতা হও। সে সত্যের সাক্ষ্য যদি তোমাদের পিতা-মাতা কিংবা নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধেও হয়; সে ধনী হোক আর গরীবই হোক (সত্যের সাক্ষ্য দিতে এতটুকুও কুণ্ঠিত হয়ো না) তাদের প্রতি আল্লাহ তোমাদের চেয়ে অধিক সহানুভূতিশীল। কাজেই তোমরা দুষ্প্রবৃত্তির দাসত্ব করে ইনসাফ ও ন্যায় বিচার পরিত্যাগ করো না। কিন্তু তবুও তোমরা যদি সত্যের বিপরীত সাক্ষ্য দাও কিংবা সত্য প্রচারের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করো; তবে (জেনে রেখো) আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজকর্ম সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবহিত আছেন।" (আল-কুরআন, সূরা আন নিসা, আয়াত-১৩৫)

নিরপেক্ষ সুবিচার ও ইনসাফ করার জন্য ইসলামের এটাই চরম ও অমোঘ নির্দেশ। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিজের জীবনেই আল্লাহর এ নির্দেশর বাস্তব কর্মরূপ দিয়ে গেছেন। মদীনার এক উচ্চ ধনী ও অভিজাত বংশের একটি মেয়েলোক চুরি করে ধরা পড়েছিল। হযরতের দরবারে এই মুকদ্দমা দায়ের হলো। হযরত উসামা ইবনে জায়েদ (রা.) আসামীর পক্ষ্যে সুপারিশ করতে লাগলেন।

নবী মোস্তফা (সা.) তার উত্তরে জলদ গম্ভীর স্বরে বললেন :

اَتَشْفَعُ فِى حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ؟ اِنَّمَا اَهْلَكَ الَّذِيْنَ قَبْلَكُمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَاِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ اَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ – وَايْمُ اللهِ لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

"আল্লাহর অনুশাসন কার্যকর করার ব্যাপারে সুপারিশ করো? পূর্ববর্তী মানুষ ঠিক তখনই ধ্বংস হয়ে গেছে, যখন তাদের আভিজাত বংশের কোনো লোক চুরি (কিংবা কোনো অপরাধ) করত, তখন তারা তাকে রেহাই দিত; কিন্তু যখন কোনো দুর্বল বা নিচু বংশের লোক চুরি (কিংবা কোনো অপরাধ) করত, তার ওপর জগদ্দল

শাসনভার চাপিয়ে দিত। আল্লার শপথ! আমি মুহাম্মদ (সা.)-এর কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করে তবে (জেনে রেখো, কুরআনের বিচার ব্যবস্থা অনুসারে) আমি তারও হাত কেটে দেব, তাতে কোন সন্দেহ নেই।" (বুখারী ও মুসলিম) [৪৬](পৃ:-১১৮)

ইসলামী শরয়িাত বিশেষজ্ঞরা এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, আল্লাহ নির্ধারিত শাস্তি (হদ্দ) কার্যকর করার ক্ষেত্রে কোনরূপ শাফায়াত বিংবা সুপারিশ করা এবং সেই সুপারিশ গ্রহণ করা সম্পূর্ণ হারাম। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.)-এর একটি বর্ণনা অনুসারে রাসূলে করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন :

تَعَافُوْا الْحُدُوْدَ فِيْمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِيْ مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ

-

"তোমরা আল্লাহর নির্ধারি শাস্তি (হদ্দ) কার্যকর হওয়ার যোগ্য অপরাধ পারস্পরিক পর্যায়ে ক্ষমা করতে পার; কিন্তু এ ধরনের অপরাধের অভিযোগ আমার নিকট পেশ করা হলে তা অবশ্যই কার্যকর করা হবে।" (সুনানে আবু দাউদ)[৪৫](পৃ:-২৩২)

এ পর্যায়ে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) রাসূলে করীম (সা.)-এর এই হাদীসটিও বর্ণনা করেছেন :

مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُوْنَ حَدٍّ مِّنْ حُدُوْدِ اللهِ فَقَدْ ضَاءَ اللهُ فِى اَمْرِهِ

"আল্লাহ নির্ধারিত শাস্তিগুলোর মধ্যে কোন একটি শাস্তির পথে যদি কারো সুপারিশ বাধা হয় দাঁড়ায় তাহলে সে আল্লাহর বিধান কার্যকর হওয়ার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালো।" (সুনানে আবু দাউদ)[৪৫](পৃ:-২৩২)

সাক্ষ্যদান ও সাক্ষ্যগ্রহণ এবং বিচারকদের প্রতি নির্দেশনা :

নিরপেক্ষ, ইনসাফপূর্ণ বিচারের জন্যে নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ একান্ত আবশ্যক। পক্ষান্তরে নির্ভুল প্রমাণ হতে পারেনা- যদি নিরপেক্ষ ও স্পষ্ট সত্যবাদী সাক্ষী না পাওয়া যায়। মানব রচিত বিধানেও বিচার সাক্ষ্য ব্যতীত সম্ভবর নয়, কিন্তু সেখানে সাক্ষীর সত্যবাদী হওয়ার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। সাক্ষী যদি এজলাশে দাঁড়িয়ে পরিষ্কার মিথ্যা কথা বলে বেঁচে যেতে পারে, তাবে সেই মিথ্যা সাক্ষ্যের ভিত্তিতে অন্যায় রায় প্রদান কোনো বাধা হয় না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি ব্যাপারের বিচার ও রায়দান সম্পর্কে বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী সাক্ষী অপরিহার্য বলে ঘোষণা করেছেন :

وَاَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ

"প্রতিটি বিচার্য ব্যাপারে তোমাদের মধ্য হতে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী বানাও।" (আল-কুরআন, সূরা আত্-তালাক, আয়াত-২)

وَمِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

"সাক্ষী হিসেবে পছন্দ করো এমন লোককে তোমরা সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত কর।"

অন্য কথায় ন্যায়পরায়ণ ও জনগণের আস্থাভাজন লোকেরাই বিচারের ব্যাপারে সাক্ষ্যদানের উপযুক্ত। এজন্যে কুরআন মজীদ মুসলমানদের প্রতি প্রথমত সত্য সাক্ষ্য সুস্পষ্ট ও নির্ভিকভাবে প্রদানের আদেশ করেছে এবং সাক্ষ্য গোপন করতে তীব্র ভাষায় নিষেধ করেছে :

وَلَا تَكْتُمُوْا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهُ اٰثِمٌ قَلْبُهُ

"সাক্ষ্য গোপ করিও না। যে তা গোপন করবে, তার আত্মা ভয়ানক পাপী- সন্দেহ নেই।" (আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, আয়াত-২৮৩)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন :

اِذَا أَرَأَيْتَ مِثْلُ الشَّمْسِ فَاشْهَدْ وَالاَ تَدَعْ

-"তুমি যদি ঘটনাটি সূর্যকে দেখার মতো স্পষ্ট করে দেখে থাকো তাবেই সাক্ষ্য দেবে। অন্যথায় সাক্ষ্য দান পরিহার করবে।"[৪৬](পৃ:-১২১)

মোট কথা, ইসলামের দৃষ্টিতে সাক্ষী ন্যায়বাদী ও ন্যায় পন্থী হওয়া এতটাই জরুরী যতটা জরুরী স্বয়ং বিচারকের ন্যায়বাদী-ন্যায়পন্থী হওয়া। ইসলামের দৃষ্টিতে বিচার্য বিষয় সম্পর্কে বিচারকের নিজস্ব প্রত্যক্ষ্য জ্ঞান থাকলেও তারই ভিত্তিতে কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়া রায় দান করার কোনো অধিকার বিচারকের নেই।

দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুক (রা.) হযরত আলী (রা.) কে জিজ্ঞেস করলেন :

مَاقَوْلُكُمْ لَوْ اَنَّ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ شَاهَدَ اِمْرَاَةً عَلَى مَعْصِيَةٍ؟

-

"বিচারক, খলীফা বা আমীরুল মু'মিনিন নিজেই যদি কোন নারীকে পাপ কাজে লিপ্ত দেখতে পায়, তবে এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর নির্ভর করেই কি সে তাকে অভিযুক্ত করতে ও দন্ড দান করতে পারবে?"

তখন হযরত আলী (রা.) বললেন :

يَأْتِىْ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ اَوْ يُحَدُّ حَدُّ الْقَدَفِ شَانُهُ فِىْ ذَلِكَ شَانُ سَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ-

"খলীফা বা বিচারককেও চারজন সাক্ষী পেশ করতে হবে। অন্যথায় তাকেও জেনার মিথ্যা অভিযোগ তোলার দরুন শাস্তি ভোগ করতে হবে। এই ব্যাপারেও তার অবস্থা সাধারণ মুসলমানদেরই সমান।"[৪৬](পৃ:-১২৩)

ইসলামের বিচার ব্যবস্থায় বর্তমান পদ্ধতির ওকালতী প্রথার বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। সেখানে আইনবিদগণ মুকদ্দমার স্বরূপ নির্ধারণ এবং ঘটনার বিশ্লেষণের জন্যে বিচারকের সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করবেন। মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে কিংবা ওকালতীর মারপ্যাচের জোরে প্রকৃত অপরাধীকে যারা বেকছুর খালাস করে দেয় বা দেয়ার চেষ্টা করে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে হুঁশিয়ার করে বলেন :

هَا أَنتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَّنْ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا-

"শোন, তোমরা এমন লোক যে, তোমরা দুনিয়ার জীবনে তো অপরাধীদের পক্ষে ওকালতী করলে, কিন্তু বল দেখি, কেয়ামতের দিন তাদের পক্ষে আল্লাহর কাছে কে ওকালতী করবে?" (আল-কুরআন, সূরা আন নিসা, আয়াত-১০৯)

ইসলাম শুধু বিচারের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেনি। বিচার কার্য সম্পাদনের জন্যে কতিপয় নিয়ম-নীতিও নির্দিষ্ট করে দিয়েছে যা বিচারকের জন্যে অবশ্যই পালনীয়। রাসূল করীম (সা.) বলেছেন :

مَنِ ابْتُلِىَ بِالْقَضَاءِ فَلاَ يُقْضِىْ وَهُوَ غَضْبَانُ

"যে লোক বিচারক হওয়ার বিপদে পড়বে, সে যেন ক্রুদ্ধ অবস্থায় কখনই বিচারের কাজ না করে।" (জামিউল উসূল, ১০ম খন্ড, পৃ:-৫৪৯) [৪৫](পৃ:-২২৮)

তিনি আরো বলেছেন :

اِذَا تَقَاضَى اِلَيْكَ رَجُلاَنِ فَلاَ تَقْضِ لِلْاَوَّلِ حَتَّى تَسْمِعَ مِنَ الْاٰخَرِ فَاِنَّكَ اِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقُضَاءُ

"দুই ব্যক্তি যদি তোমার নিকট বিচার প্রার্থী হয়, তাহলে প্রথম জনের জন্যে রায় দেয়ার পূর্বেই দ্বিতীয় জনের বক্তব্য শুনে নেবে। তুমি যদি সেরূপ কর তাহলে তোমার বিচারকার্য সুষ্ঠু ও সুস্পষ্ট হবে।"[৪৫](পৃ:-২২৮)

হযরত আলী (রা.) কে ইয়ামেনের বিচারপতি নিযুক্ত করে রাসূল (সা.) তাঁকে এই নির্দেশনা দিয়ে পাঠিয়েছিলেন যে :

اِنَّ اللهَ سَيَهْدِىْ قَلْبَكَ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ فَاِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلاَ تَقْضِىْ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الاٰخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْاَوَّلِ فَاِنَّهُ اَحْرٰى اَنْ يَّتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমার অন্তরকে হেদায়াত দান করবেন, তোমার জিহ্বাকে দৃঢ়বাক করে দেবেন। বিবাদমান দুই পক্ষ যখন তোমার সম্মুখে বসবে, তখন এক পক্ষের বক্তব্য শুনার পর অনুরূপভাবে দ্বিতীয় পক্ষের বক্তব্য না শুনা পর্যন্ত তুমি কখনই বিচারকার্য সম্পাদন করবে না, রায় দিবে না। এভাবে করলেই তোমার জন্যে বিচারকার্য সহজসাধ্য ও সুস্পষ্ট করে তোলার খুব বেশী অনুকূল হয়ে দাঁড়াবে।"[৪৫](পৃ:-২১৭)

হযরত মুয়ায (রা.) কে বিচারপতি নিয়োগ করেও রাসূল (সা.) অনুরূপ দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন। রাসূলে করীম (রা.) বিচারকের পদের গুরুত্ব, তার মর্যাদা ও তার দায়িত্ব, জবাবদিহির বিরাটত্ব সম্পর্কে অত্যন্ত কঠোরতা আরোপ করেছেন। তিনি বলেন :

اَلْقُضَاةُ ثَلٰثَةٌ وَّاحِدٌ فِى الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِى النَّارِ فَاَمَّا الَّذِىْ فِى الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ قَضٰى بِهٖ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِى الْحُكْمِ فَهُوَ فِى النَّارِ وَرَجُلٌ قَضٰى لِلنَّاسِ عَلٰى جَهْلِهٖ فَهُوَ فِىْ النَّارِ

"বিচারকরা তিন ধরনের হয়। এক ধরনের বিচারক জান্নাতে যাবে, আর অপর দুই ধরনের বিচারক জাহান্নামে যাবে। জান্নাতে যাবে সেই বিচারক, যে প্রকৃত সত্য অনুধাবন ও হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী বিচার করেছে। পক্ষান্তরে যে বিচারক প্রকৃত সত্য জানতে ও বুঝতে পেরেও বিচারকার্যে সত্যের বিপরীত রায় দিয়েছে, সে জাহান্নামে যাবে। আর যে বিচারক প্রকৃত সত্য না জেনে, না বুঝে বিচার কার্য ফয়সালা করেছে সেও জাহান্নামে যাবে।" (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ) [৪৫](পৃ:-২২৩)

বস্তুত : ইসলামী রাষ্ট্রে নির্বাহী, বিচার ও আইন এই তিনটি বিভাগ সমন্বিত, পরস্পর সামঞ্জস্যশীল। প্রতিটি বিভাগের দায়িত্ব ও লক্ষ্য অভিন্ন এবং তা হচ্ছে কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে আল্লাহর বিধানকে পূর্ণ ও যথার্থরূপে বাস্তবায়ন। তাই ইসলামী রাষ্ট্রে পাশ্চাত্য বিচার নীতির ন্যায় কোর্ট ফি দেয়ার কোনো ব্যবস্থা থাকতে পারে না। কেননা এখানে বিচার পয়সার বিনিময়ে বিক্রয় হবে না, ক্রয়ও করা যাবে না। ইসলামী বিচারনীতিতে আইনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে আইনের প্রয়োগ পর্যায়ে আইনবিদদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে। তবে বর্তমানে যেভাবে আইনের মার-প্যাঁচ ও ঘোরানো-ফেরানো ব্যাখ্যা দিয়ে অপরাধীকে বাঁচাবার ও নিরপরাধকে অপরাধী সাজাবার চেষ্টা অবাধ চলে, তার কোন অবকাশই ইসলামী বিচার

ব্যবস্থায় থাকতে পারে না। এক্ষেত্রে ইসলামের সাক্ষ্য, আইন ও সাক্ষ্যদান পদ্ধতিও অত্যন্ত শানিত। মিথ্যা বা পক্ষপাতমূলক সাক্ষদানেরও কোনো সুযোগ ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় নেই।

ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান বির্বাচন দায়িত্ব ও ক্ষমতা :

পূর্বোক্ত বিস্তারিত আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, ইসলামী হুকুমতের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন এবং ইসলামী আইন জারি ও কার্যকর করার জন্যে একজন আমীর বা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করা আবশ্যক। আমীর বা রাষ্ট্র প্রধান মুসলিম জনগণের ভোটেই নির্বাচিত হবে। জনগণ আল্লাহ প্রদত্ত তাদের ব্যক্তিগত খিলাফত [35] অধিকার তার কাছে আমানত রাখবে, আর আমীর জনগণের তরফ থেকে কেন্দ্রীয় খিলাফত বা ক্ষমতার পরিচালক হবে। সমস্ত মুসলামান স্বেচ্ছায় নিজেদের খিলাফতের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে আমীর বা রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে অর্পণ করবে। তাই রাষ্ট্রপ্রধান একদিকে যেমন আল্লাহর নিকট দায়ী থাকবে অন্যদিকে সমস্ত খলীফা বা প্রতিনিধি যারা তাকে দায়িত্ব অর্পণ করেছে তাদের নিকটও তাকে জবাবহিদি করতে হবে।

ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানকে অবশ্যই নির্বাচিত হতে হবে। কোন লোক নিজেকে রাষ্ট্রপ্রধান বানিয়ে নিলে বা দাবি করলেই কেউ রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারে না, তাকে রাষ্ট্রপ্রধান মেনে নেয়া যায় না। মসজিদের নিযুক্ত ইমাম যার প্রতি নামাযীগণ আস্থা রেখে তারই ইমামতিতে নিয়মিত নামায পড়ে আসছে তাকে জোরপূর্বক সরিয়ে দিয়ে কেউ ইমাম হয়ে দাঁড়ালে যেমন তার এ ইমামত জায়েয হবেনা, তার ইমামাতিতে নামায হবে না, ঠিক তেমনি জনমতের ভিত্তিতে ও সমর্থনে কর্মরত কোন রাষ্ট্রপ্রধানকে অস্ত্রের ভয় কিংবা পেশি শক্তির বলে জোরপূর্বক সরিয়ে দিয়ে কেউ রাষ্ট্রপ্রধান সেজে বসলে তার এই রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া ও সম্পূর্ণ হারাম এবং তাকে রাষ্ট্রপ্রধান মেনে নেয়া ও তার শাসনকে সমর্থন দেয়াও জনগণের জন্যে ঠিক তেমনি হারাম।

রাসূলে করীম (সা.)-এর পর চারজন খলীফ- খুলাফায়ে রাশেদীন জনগণের মত ও সমর্থনের ভিত্তিতেই রাষ্ট্রপ্রধান বা খলীফা নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁদের একজনও এই পদের দাবিদার ছিলেন না;বরং পদ পেয়ে নিজেদেরকে ছোট ভেবে জনগণের খাদেম হিসেবে আত্মনিয়োগ করেন এবং জনসাধারণ ও আল্লাহ তা'আলার নিকট জবাবদিহিতার অনুভূতি নিয়ে সার্বিক কাজে তাদের সহযোগিতা কামনা করে ভাষণ দেন ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। অতএব, খলীফা-রাষ্ট্রপ্রধান নিযুক্তিতে জনগণের স্বত:স্ফুর্ত রায়ই হতে হবে প্রধান ও একমাত্র অবলম্বন।

বস্তুত ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান- মুসলিম উম্মাহর যোগ্য কেবলমাত্র সেই ব্যক্তি, যার মনোভাব হবে প্রথম নির্বাচিত খলীফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর মনোভাবের মত। তিনি খলীফা নির্বাচিত হয়ে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা নিম্নরূপ :

---

35 আল্লাহ তায়ালা বলেন: وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ- "যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে তাদের প্রতি আল্লাহ্র এই প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে এ পৃথিবীতে খিলাফত বা প্রতিনিধিত্ব দান করবেন যেমন দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীগণকে।" কুরআন শরীফের এ আয়াতের মাধ্যমে দু'টি বিষয় স্পষ্ট : ১। ইসলাম শাসনের পরিবর্তে খিলাফত শব্দ ব্যবহার করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে যেহেতু শাসনের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্রই। সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান প্রকৃত পক্ষে মহান শাসক আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধি মাত্র; তিনি শুধু অর্পিত দায়িত্বের প্রতিনিধিত্ব করবেন; ২। আল্লাহ খলীফা বা প্রতিনিধি করবার প্রতিশ্রুতি সমস্ত মুমিনকে দিয়েছেন। এমন বলেন নি যে, তোমাদের মধ্য হতে একজনকে প্রতিনিধি স্থির করব। কাজেই আয়াত দ্বারা এটিই প্রমাণিত যে, খিলাফতের দায়িত্ব স্বতন্ত্রভাবে সকল মুমিনের। খিলাফত কোন ব্যক্তি, গোত্র, বংশ কিংবা কোন দল বিশেষের একচেটিয়া ব্যাপার নয় যে, কেবল তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে; বরং প্রত্যেক মুমিনই নিজ নিজ জায়গায় আল্লাহ্র প্রতিনিধি এবং প্রতিনিধি হিসেবে প্রত্যেককেই আল্লাহ্র সম্মুখে জওয়াবদিহি করতে হবে। হাদীস শরীফে আছে : তোমাদের প্রত্যেকেই এক একজন রাখাল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ পাল সম্পর্কে জওয়াবদিহি করতে হবে।

يَاايُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ ظَنَنْتُمْ اَنِّىْ اَخَذْتُ خلافَتَكُمْ رَغْبَةً فِيْهَا اَوْ اِرَادَةً اِسْتِئْثَارًا عَلَيْكُمْ وَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَلَا وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ مَا اَخَذْتُهَا رَغْبَةً فِيْهَا وَلَا اِسْتِئْثَارًا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَى اَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا حَرَصْتُ عَلَيْهَا يَوْمًا وَّلَا لَيْلَةً قَطُّ وَلَا سَأَلْتُ اللهَ سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً وَلَقَدْ تَقَلَّدْتُ اَمْرًا عَظِيْمًا لَا طَاقَةَ لِى بِهِ اِلَّا اَنْ يُّعِيْنَ اللهُ وَلَوَدِدْتُ اَنَّهَا اِلَى اَىِّ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم على اَنْ يَّعْدِلَ فِيْهَا فَهِىَ اِلَيْكُمْ رَدٌّ وَلَا بَيْعَةَ لَكُمْ عِنْدِىْ فَاقْعُدُوْا لِمَنْ تُحِبُّوْنَهُ فَاِنَّمَا اَنَا رَجُلٌ مِّنْكُمْ.

"হে জনগণ! তোমরা যদি ধারণা করে থাক যে, আমি নিজ আগ্রহের ভিত্তিতে তোমাদের এই খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছি, অথবা ইচ্ছা করে নিজেকে তোমাদের ও অন্যান্য সব মুসলামানদের উপর প্রাধান্য প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, তাহলে জেনে রাখবে, একথা কিছুমাত্র সত্য নয়। যাঁর হাতে আমার প্রাণ, সেই আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, আমি তা নিজ আগ্রহে গ্রহণ করিনি, নিজেকে তোমাদের বা কোন একজন মুসলমানের তুলনায় বড় মনে করে- বড় করে তোলার জন্যে তা গ্রহণ করিনি। আমি কখনই তা পাওয়ার লোভ করিনি না কোন দিনে, না রাতে। এজন্যে আল্লাহর নিকটও কখনও প্রার্থনা করিনি না গোপনে আর না প্রকাশ্যে। আসলে একটা অনেক বড় বোঝা বহনের জন্যে আমাকে বাধ্য করা হচ্ছে। যা বহন করার কোন সাধ্যই আমার নেই। তবে একমাত্র ভরসা যদি আল্লাহ সাহায্য করেন। আমি বরং মনে মনে কামনা করেছি, এ দায়িত্ব রাসূলে করীম (সা.)-এর অপর কোন সাহাবীর উপর অর্পিত হোক, তিনি একাজে ন্যায়পরতা অবলম্বন করবেন। তাহলে এই খিলাফত তোমাদের নিকটই ফেরত যাবে, তখন আমার হাতে করা এই বায়'আত তোমাদের উপর বাধ্যতাপূর্ণ থাকবে না। তোমরা তা তখন তোমাদের পছন্দ করা কোন লোকের উপর অর্পণ করবে। আর আমি তোমাদের মধ্যেরই একজন সাধারণ মানুষ হয়েই থাকব।"[৪৫](পৃ:-১৪৪)

তিনি রাসূল (সা.)-এর মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছিলেন :

هَلْ مِنْ كَارِهٍ فَاَقِيْلُهُ ثَلَاثًا يَّقُوْلُ ذَلِكَ.

"তোমাদের মধ্যে আমার খিলাফত অপছন্দ করে এমন কেউ আছে কি? থাকলে আমি তার সাথে কথা বলে তা দূর করতে চেষ্টা করব। তিনি পরপর তিনবার একথাটি বললেন।"[৪৫](পৃ:-১৪৫)

তখন হযরত আলী (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন :

لَا وَاللهِ لَا نُقِيْلُكَ وَلَا نَسْتَقِيْلُكَ مَنْ ذَالَّذِىْ يُؤَخِّرُكَ وَقَدْ قَدَّمَكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"না আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, আমরা আপনাকে এ দায়িত্ব থেকে সরে যেতে দেব না। কাউকে তা করতেও দেবনা। স্বয়ং রাসূরে করীম (রা.)-ই আপনাকে অগ্রবর্তী করেছেন। আপনাকে পেছেনে ফলতে পারে এমন কে কোথায় আছে?"[৪৫](পৃ:-১৪৫)

বস্তুত এ-ই হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগের মৌলিক দর্শন। মুসলিম জনগণই তাকে নিজেদের সন্তুষ্টি ও স্বত:স্ফূর্ত ইচ্ছা- উদ্যোগের ভিত্তিতে নিয়োগ করবে। এছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই। রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনে জনমতের অংশগ্রহণ কুরআনী বিধান অনুযায়ী অপরিহার্য। কেননা আল্লাহ তা'আলা মুসলিম উম্মাহর কার্য সম্পাদনের স্থায়ী নীতি হিসেবে ঘোষণা করেছেন : وَأَمْرُهُمْ شُوْرَىٰ بَيْنَهُمْ -"মুসলিম জনগণের সামষ্টিক ব্যাপারাদি পারস্পারিক পরামর্শের ভিত্তিতেই সম্পন্ন হয়ে থাকে।" (আল-কুরআন, সূরা আশ্শুরা, আয়াত-৩৮)

স্বৈরতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক পার্থক্যের এ একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই কারণে নবী করীম (সা.) ঘোষণা করেছেন :

مَنْ بَايَعَ اَمِيْرًا عَنْ غَيْرِ مَشْوَرَةِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلَا بَيْعَةَ لَهُ وَلَا الَّذِىْ بَايَعَهُ

"মুসলিম জনগণের সাথে পরামর্শ না করে তাদের মত জেনে না নিয়ে কেউ কাউকে নেতা হিসেবে রায়'আত করলে বা মেনে নিলে তা আদৌ গ্রহণযোগ্য হবে না।" (মুসনাদে আহমদ)[৪৫](পৃ:-১৪৬)

কিন্তু বাস্তবে তা কিভাবে সম্ভব হতে পারে? এ প্রশ্নের জবাবে বলা যায়, একটি দেশের পূর্ণ বয়স্ক নারী পুরুষ বির্বিশেষে সকল নাগরিকই হবে ভোটার, সারাটি দেশ হবে একটি মাত্র নির্বাচনী এলাকা (Constituency)। নির্দিষ্ট তারিখে প্রত্যেক ভোটার নিজ নিজ ইচ্ছ ও পছন্দমত কাজের গুরুত্ব ও দায়িত্বের বিরাটত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করার তীব্র অনুভূতি নিয়ে ভোট প্রদান করবে। কেউ প্রার্থী নেই, কোন ক্যানভাসার নেই। ভোটের জন্যে কারোর প্রলোভন বা ভয়-ভীতির সম্মুখীন হতে হবে না কোন ভোটারকে। কেউ তার কাছে ভোট প্রার্থনা করবে না, ভোট খরিদ করার জন্যেও সেখানে কেউ থাকবে না। ভোটারগণ ভোটকে একটি গুরুত্বপূর্ণ আমানত এবং ভোট দেয়াকে একটি দীনি কর্তব্য মনে করবে। আল্লাহর আদেশ : أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا 'প্রতিটি আমানতকে এর যোগ্য অধিকারীর কাছে অর্পণ কর' (আল-কুরআন, সূরা আন নিসা, আয়াত-৫৮)। নীতির অনুসরণে উপযুক্ত পাত্রেই এই ভোট প্রদানকে ফরয বলে বিশ্বাস করবে। নিজেকে নির্দিষ্ট পদের জন্যে উপযুক্ত মনে করলেও কেউ নিজেকে ভোট দিবে না। ফলে সারা দেশে যার পক্ষে সর্বাধিক ভোট পড়বে, সেই রাষ্ট্র প্রধান নির্বাচিত হবে।

অথবা উপরোক্ত নিয়মে প্রথমত: জাতীয় সংসদের নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য নির্বাচিত করে তাদের ভোটে দুই বা ততোধিক নামের একটা প্যানেল তৈরী করা যেতে পারে এবং তারই মধ্য থেকে সর্ব সাধারণের অবাধ ভোটের মাধ্যমে একজনকে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করা যেতে পারে।

ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব-কর্তব্য :

ইসলামী রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের জনসাধারণের উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করে। জনগণের বৈষয়িক জীবনকে সুষ্ঠুরূপে পরিচালানার এবং তাদের পরকালীন জীবনে মুক্তি ও সাফল্যের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব হিসেবে, ইসলাম দুটি কথার উল্লেখ করেছে। একটি হচ্ছে, দ্বীন-ইসলামকে পূর্ণরূপে কার্যকর ও সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, ইসরামের রীতি-নীতি অনুযায়ী গোটা রাষ্ট্রকে পরিচালিত করা। এক কথায় বলা যায় দ্বীন ইসলামকে বাস্তবায়িত করাই রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

ইসলামী রাষ্ট্রের মৌল উদ্দেশ্যই হচ্ছে দ্বীন ইসলামকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করা, দ্বীনকে পূর্ণমাত্রায় বাস্তবায়িত করা, দ্বীনের মান-মর্যাদা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা এবং সেখানকার জনগণের জীবনকে সকল প্রকারের ভয়-ভীতি ও বিপদ আশঙ্কা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করে স্বাধীন নির্বিঘ্ন জীবন-যাপনের সুব্যবস্থা করে দেয়া। বস্তুত দুনিয়ায় প্রতিটি দেশের নাগরিকদের এটাই কাম্য এবং তা সবকিছুই পূর্ণমাত্রায় বাস্তবায়িত হতে পারে কেবলমাত্র ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। আর এ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানই এইসব কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্যে প্রধান দায়িত্বশীল। আল্লাহ বলেন :

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا

"তোমাদের মধ্য থেকে যারাই ঈমান আনবে ও ঈমান অনুযায়ী নেক আমল করবে, তাদের জন্যে আল্লাহ ওয়াদা করছেন যে, তাদেরকে তিনি পৃথিবীতে খলীফা-রাষ্ট্র পরিচালক বানাবেন যেমন করে তাদের পূর্ববর্তীদের

তিনি খলীফা বানিয়েছিলেন এবং যেন তাদের জন্যে তার পছন্দ করা দ্বীনকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাদের ভয়-ভীতি আশঙ্কার পর পূর্ণ নির্ভীকতা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারেন। এই লোকেরা কেবলমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব করবে, তাঁর সাথে সামান্য বিষয়কেও শরীক করবে না।" (আল-কুরআন, সূরা আন্ নূর, আয়াত-৫৫)

বৈদেশিক আক্রমণ থেকে দেশ ও দেশের জনগণ এবং তাদের ধন-সম্পদ, জান-প্রাণ ও মান-ইজ্জত রক্ষা করা এবং এজন্যে প্রয়োজনীয় শক্তি-সামর্থ অর্জনও রাষ্ট্র প্রধানের একান্ত কর্তব্য। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ

"এবং তোমরা শত্রুপক্ষের মুকাবিলা করার লক্ষ্যে যথা-সাধ্য শক্তি ও যানবাহন সংগ্রহ ও প্রস্তুত কর। তদ্বারা তোমরা আল্লাহর দুশমনদের ভীত-সন্ত্রস্ত করবে তোমাদের নিজেদের শত্রুদেরও। এদেরে ছাড়া আরও অনেক শত্রু আছে যাদের তোমরা চিনো না, আল্লাহ তাদের চিনেন।" (আল-কুরআন, সূরা আল আনফাল, আয়াত-৬০)

উভয় আয়াতে বলা কথা ও কাজ যদিও সামষ্টিকভাবে মুসলিম উম্মতের জন্যে, কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধানই যেহেতু মুসলিম উম্মাহর প্রতিনিধি, সকলের পক্ষ থেকে দায়িত্বশীল, তাই রাষ্ট্রপ্রধানকেই-এ কাজসমূহ করতে হবে। কুরআনের ঘোষণা হলো :

فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

"বস্তুত : যারা তোমাদের উপর জবরদস্তি করেছে তোমরাও তাদের উপর জবরদস্তি কর, যেমন জবরদস্তি তারা করেছে তোমাদের উপর।" (আল-কুরআন, সূরা আল বাকারা, আয়াত-১৯৪)

তাছাড়া সূরা হজ্জের বিখ্যাত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব বর্ণনা করে বলেন :

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ

"ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তা ও প্রশাসক যাদেরকে আমরা বানাই তারা সালাত ব্যবস্থা কায়েম করে, যাকাত আদায়-বন্টনের ব্যবস্থা কার্যকর করে, কেবলমাত্র ভাল ও কল্যাণকর কাজের আদেশ করে ও যাবতীয় অকল্যাণকর ও ক্ষতিকর কাজ করতে নিষেধ করে।" (আল-কুরআন, সূরা আল হাজ্জ, আয়াত-৪১)

দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন- দুর্বলকে শক্তিশালী করা ও সবলদের সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করা, সকল নাগরিককে সমান মর্যাদা ও অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করা এবং শরীয়াত ঘোষিত হদ্দ ও কিসাস কার্যকরণের নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রপ্রধানের অন্যতম দায়িত্ব। একই সাথে বিবাদমান পক্ষসমূহের উপর আল্লাহর আইন কার্যকর করণ ও ন্যায় সঙ্গতভাবে ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করণ এটিও ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধানের কর্তব্য।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"তোমরা যখন জনগণের মধ্যে বিচার কার্য সম্পন্ন করবে তখন যেন তোমরা পূর্ণমাত্রায় ন্যায়পরতার সাথে ফয়সালা কর। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা অতীব উত্তম বিষয়ে তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চিত জানবে, আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।" (আল-কুরআন, সূরা আন নিসা, আয়াত-৫৮)

রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা :

বস্তুত ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা একটি পরামর্শ ভিত্তিক বিধান। লোকদের সাথে পরামর্শ করে তারপরই রাষ্ট্রীয় কাজ আঞ্জাম দেয়া যেতে পারে। এপর্যায়ে রাসূলে করীম (সা.)-এর ঘোষণা অবশ্যই স্মরণীয় :

وَأَمْرُكُمْ شُوْرَى بَيْنَكُمْ – فَظَهْرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهِ.

"তোমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারদি পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হলে তোমাদের জীবন মৃত্যুর তুলনায় শ্রেয়।" (তিরমিযী) [৪৫](পৃ:-১৪৮)

অতএব ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধানকে পরামর্শ করতে হবে, জনমত জানতে হবে এবং সম্মুখবর্তী সামাষ্টিক ব্যাপারে জনগণ তা অগ্রাহ্য করবে না; বরং মতের বিভিন্ন দিক আলোচনা পর্যালোচনা ও চুল-চেরা বিশ্লেষণ করে গভীর ও সক্ষ্মভাবে বিচার-বিবেচনার পর সার্বিক দৃষ্টিতে যে মত সর্বোত্তম বিবেচিত হবে, তাই গ্রহণ করবে। তারপর فاذا عزمت 'তুমি যখন সংকল্পবদ্ধ হবে' পরামর্শ গ্রহণ ও সর্বোত্তম মত গ্রহণের সিদ্ধান্তের পর, তখন توكل على الله 'আল্লাহর উপর পূর্ণ নির্ভরতার' সাথে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই সংকল্প করা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ কি শুরার পরামর্শের ভিত্তিতেই হতে হবে নাকি শুরার পরামর্শ উপেক্ষা করেও রাষ্ট্রপ্রধান একাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে?

কিছু সংখ্যক মনীষীর মতে শুরার সিদ্ধান্ত ছাড়াও রাষ্ট্রপ্রধানের নিজস্ব বিচার-বিবেচনা ও কল্যাণ চিন্তার ভিত্তিতে একান্ত নিজস্বভাবে সংকল্প ও পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকার রয়েছে। রাষ্ট্রপ্রধান শুরার পরমর্শ বা সিদ্ধান্তের অধীন নয় এবং সে তা মেনে নিতে একান্তভাবে বাধ্যও নয়। সে পরামর্শ নেবে; কিন্তু প্রকৃত সিদ্ধান্ত ও সংকল্প গ্রহণের অধিকার রাষ্ট্রপ্রধানের এবং তার এটা কর্তব্যও। তবে এ মতের একটি মারাত্মক দিক হচ্ছে, এরূপ ইখতিয়ার ও অধিকার থাকলে রাষ্ট্র প্রধানের স্বৈরতন্ত্রিক ভূমিকা অবলম্বন অনিবার্য পরিণতি হয়ে দাঁড়ায়; কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র-দর্শনে এই ভূমিকা অবলম্বনের কোন অবকাশ নেই।

তাই অন্যান্য মনীষীদের মত হচ্ছে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও কার্যত পদক্ষেপ গ্রহণ রাষ্ট্রপ্রধানেরই কাজ এবং দায়িত্ব। তবে তাকে তা করতে হবে মজলিসে শুরার পরামর্শ ও সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে, তা বাদ দিয়ে বা এড়িয়ে গিয়ে নয়।"(ফাতহুল কাদীর) [৪৫](পৃ:-১৪৯)। কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে রাচিত তার মত যদি মজলিসে শুরার সিদ্ধান্ত হতে ভিন্নতর হয়ে পড়ে, তাহলে সে তার মতকে শুরার কাছে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করার পরও শুরা কর্তৃক গৃহীত না হলে সেই মত অনুযায়ী কাজ করার অধিকার জরুরী অবস্থায় সাময়িকভাবে রাষ্ট্রপ্রধানের থাকবে। কিন্তু স্পষ্টত মনে রাখতে হবে, এই অধিকার সবসময় এবং সর্বাবস্থার জন্যে নয়; বরং তা বিশেষ বিশেষ সময় জরুরী অবস্থার জন্যে সীমাবদ্ধ। তবে সর্বাবস্থায় কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে এ ধরণের মতবিরোধ হতেই পারে, রাষ্ট্র-কর্তাদের সাথে মতবিরোধ করার অধিকার জনগণের আছে। সে ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে তা মীমাংসা করে নেয়াই ইসলামী নেতা তথা রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতি আল্লাহ তাআলার নির্দেশ। ইরশাদ হচ্ছে :

Dhaka University Institutional Repository

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

"কোনো বিষয়ে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে মতবিরোধ ও তর্কের সৃষ্টি হলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরাও।" (আল-কুরআন, সূরা আন নিসা, আয়াত-৫৯)

বর্তমানকালে রাষ্ট্রপ্রধানগণ বিশেষ ও ব্যাপক সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকে। অনেক রাষ্ট্রপ্রধানই নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার সাথে সাথে বেতন-ভাতা ইত্যাদির দিক দিয়ে সীমাহীন ও অপরিমেয় বিলাস-ব্যসন ভোগ করার সুযোগ কেড়ে নেয়। কোন কোন রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত সংসদে পাস করা আইনের ওপর ভেটো প্রয়োগ করতে, এমনকি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত সংসদকেও বাতিল করে দিতে পারে। তাকে এত অধিক ক্ষমতা (Discretionary power) দেয়া হয় যে, সর্বোচ্চ আদালতও তাকে নির্দেশ নামা (Mandamus) জারি করে কোনো কাজ থেকে বরত রাখতে পারে না। কিন্তু ইলামী রাষ্ট্রের প্রধান এই ধরণের কোনো ক্ষমতাই ভোগ করতে পারে না। তার যাবতীয় ক্ষমতা-ইখতিয়ার কুরআন-সুন্নাহর আইনের মধ্যে সীমিত। আর বেতন ভাতা বলতে সে কিছুই পেতে পারে না।

এ পর্যায়ে কুরআন মজীদে ঘোষিত এই মূলনীতিই কার্যকর হবে :

وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ

"সচ্ছল-ধনী হলে সে কিছুই গ্রহণ করবে না। আর দরিদ্র হলে প্রচলিত মান অনুযায়ী গ্রহণ করবে।" (আল-কুরআন, সূরা আন নিসা, আয়াত-৬)

এই বিধান অনুযায়ী প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) দায়িত্ব গ্রহণের পর শুরুতে কিছুই নেননি। স্বীয় ব্যবসায়ের আয় থেকেই পরিবারবর্গের প্রয়োজন পূরণ করতেন। কিন্তু খিলাফতের দায়িত্ব ও ব্যবসায়ী দায়িত্ব একসাথে চালানো সম্ভব না হওয়ায় সাহাবীগণের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবসা ত্যাগ করে খিলাফতের দায়িত্ব পালনে একাত্ম হলেন। তখন তাঁর জন্যে যে ভাতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, এর পরিমাণ দৈনিক দুই ও দুই-তৃতীয়াংশ দিরহাম মাত্র। আমাদের দেশীয় মুদ্রায় তা বড়জোর শোয়া এক টাকা হবে। কিন্তু জীবন সায়াহ্নে বায়তুলমাল হতে এই বাবদ যা কিছু গ্রহণ করেছিলেন তা সবই তিনি বায়তুলমালে ফেরত দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমরকেও (রা.) অনুরূপ ভাতা দেয়া হতো। খুবই কষ্টের মধ্য দিয়েই তাঁকে জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছে। এমনকি বায়তুলমাল থেকে পাওয়া নিজের এক টুকরো কাপড়ের সাথে ছেলের পাওয়া অংশ মিলিয়ে জামা তৈরী করায় জনগণের নিকট তাঁকে জবাবদিহিও করতে হয়েছিল। হযরত উসমান (রা.) নিজে ধনী ছিলেন বলে তিনি বায়তুলমাল থেকে কিছুই গ্রহণ করেননি।

ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধানের পদচ্যুতি ও সমালোচনা :

ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্য যেমন বিরাট তেমনি মহান। তাই দু'টি কারণে রাষ্ট্রপ্রধান তার এই পদের অযোগ্য প্রমাণিত হয়। একটি তার ব্যক্তিগত সততা-বিশ্বস্ততা ক্ষুণ্ন হওয়া। আর দ্বিতীয়টি তার দৈহিক বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগত ত্রুটি ও অক্ষমতা।

ব্যক্তিগত সততা ও বিশ্বস্ততা ক্ষুণ্ন হওয়ার অর্থ রাষ্ট্রপ্রধানের 'ফাসিক' শরীয়াতের সীমালংঘনকারী প্রমাণিত হওয়া। এরও দু'টি দিক। প্রথমত লালসা-কামনা চরিতার্থ করা অর্থাৎ হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া, শরীয়াতে

ঘৃণিত-নিষিদ্ধ কাজে জড়িত হয়ে পড়া। যৌন-লালসার দ্বারা চালিত হয়ে কোন জঘন্য কাজ করা। যেমন যিনা-ব্যভিচার, মদ্যপান, সীমাতিরিক্ত ক্রোধ, এ ধরণের চরিত্রগত দোষ থাকলে তার পক্ষ্যে ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় : সন্দেহ-সংশয়ের উদ্রেক। এ ধরনের সীমালংঘন মূলক কাজের সম্পর্ক আকীদা বিশ্বাসের সাথে। আকীদা বিশ্বাসে 'ফিসক' দেখা দিলে সে রাষ্ট্রপ্রধান পদে নিযুক্ত থাকার অধিকার হরিয়ে ফেলে। কেননা আকীদায় ফিসক দেখা দিলে তা কুফর পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া অসম্ভব নয়। অথচ, কোনো অমুসলিম বা ইসলামী আদর্শ অমান্যকারী ব্যক্তি ইসলামী রষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারবে না। যদি এমন কোন ব্যক্তি মুসলিম সমাজে রাষ্ট্রনেতা হয়ে বসে, কিংবা রাষ্ট্রপ্রধান নিযুক্ত হওয়ার পর ইসলামের সীমা লঙ্ঘন করে স্বেচ্ছাচারিতা শুরু করে, অথবা রাষ্ট্রীয় কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে অযোগ্য প্রমাণিত হয়, তবে তার আনুগত্য করা বা একে রাষ্ট্রপ্রধানের আসনে সমাসীন রাখা মাত্রই জায়েয নয়; এবং একে পদচ্যুত করে সর্বদিক দিয়ে উপযুক্ত এক খাঁটি মুসলিম ব্যক্তিকে সেই পদে নিযুক্ত করা সর্বসাধারণ মুসলমানের কর্তব্য।

আল্লাহ তা'আলা পরিষ্কার বলেছেন :

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

"যার অন্তর আমার স্মরণ শুন্য, নিজের নফসের অনুসরণ করাই যার অভ্যাস এবং যে ব্যক্তি যাবতীয় কাজ-কর্মে সীমালংঘন করে, তার আনুগত্য মাত্রই করো না।" (আল-কুরআন, সূরা আল কাহাফ, আয়াত-২৮)

অন্য আয়াতে বলেছেন :

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ - الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

"যেসব লোক সীমালঙ্ঘন করে দুনিয়ায় অশান্তি ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে- শান্তি, শৃংখলা এবং কল্যাণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে না, তাদের নেতৃত্ব বা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব কখনই স্বীকার করো না, তাদের মাত্রই আনুগত্য করো না।" (আল-কুরআন, সূরা আশ শোয়ারা, আয়াত-১৫১-১৫২)

নিম্নোক্ত আয়াতে আরো সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا - فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا.

"নিশ্চয়ই আমরা তোমার প্রতি (হে নবী!) কুরআন নাযিল করেছি (যাতে তোমার জন্যে আইন-কানুন পরিষ্কার লিখে দেয়া হয়েছে), অতএব ধৈর্য ধারণ করে কেবল আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করতে থাক; সমাজের কোনো পাপী, ফাসেক কিংবা কাফের লোকের অনুগত্য করো না।" (আল-কুরআন, সূরা আদ দাহর, আয়াত-২৩, ২৪)

হযরত উবাদাতা ইবনুস সামিত (রা.) বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসে বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট করা হয়েছে তিনি বলেন :

بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَاثَرَةٍ عَلَيْنَا وَاَنْ لَا نُنَازِعَ الْاَمْرَ اَهْلَهُ اِلَا اَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ فِيْهِ مِنَ اللهِ بُرْهَانٌ.

"আমরা রাসূলে করীম (সা.)-এর নিকট বায়'আত করেছি, আমাদের আনন্দ-অসন্তুষ্টি, কঠিনতা, সুবিদা ও আমাদের স্বার্থ- সর্বাবস্থায়ই আমরা শুনব ও মানব- অনুগত থাকব। আর দায়িত্বশীলের সাথে কোন ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ করব না। তবে এমন কুফরী যদি দেখতে পাই যা স্পষ্ট ও প্রকাশ্য- সর্বজনবিধিত এবং যার কুফর হওয়ার অকাট্য দলীল আল্লাহর নিকট থেকে থাকবে, তাহলে শুনা ও মানা- আনুগত্যের উক্ত শপথ কার্যকর নয়।"[৪৫](পৃ:-১৫১)

হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.) রোমান সম্রাটের দরবারে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তার একটি কথা থেকেও এ পর্যায়ে স্পষ্ট পথ-নির্দেশ পাওয়া যায়। তিনি বলেছিলেন :

اَمِيْرُنَا رَجُلٌ اِنْ عَمِلَ بِكِتَابِنَا وَسُنَّةِ نَبِيِّنَا قَرَّرْنَاهُ عَلَيْنَا وَاَنْ عَمِلَ بِغَيْرِ ذَالِكَ عَزَلْنَاهُ مِنَّا

"আমাদের রাষ্ট্রপ্রধান আমাদের মধ্যেরই একজন লোক। সে যদি আমাদের কিতাব ও আমাদের নবীর সুন্নাত অনুযায়ী কাজ করে, তবে আমরা তাকে আমাদের ওপর বহাল ও প্রতিষ্ঠিত রাখি। আর যদি এ ছাড়া এবং এর পিপরীত কাজ করে, তবে আমরাই তাকে পদচ্যুত করি।" (ফুতুহুশ শাম) [৪৬](পৃ:-৬৮)

রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রীয় কাজ-কর্মে মজলিসে শুরার সদস্যদের সাথে পরামর্শ করা ত্যাগ করলেও তাকে পদচ্যুত করা ইসলামী রাষ্ট্রনীতির বুনিয়াদী প্রয়োজন। তথাকথিত গণতান্ত্রিক নিয়ম অনুযায়ী তাঁর পদের আয়ুষ্কাল পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষা করা ইসলামের দৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গত নয়।

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস সমূহের বর্ণনায় পরিষ্কাররূপে প্রমাণিত যে, ইসলামী হুকুমতের আমীর (রাষ্ট্র প্রধান) এবং তাঁর সহকারী মজলিসে শুরার সদস্যবৃন্দ যেমন জনগণের ভোটেই নির্বাচিত হবে, তেমনি প্রয়োজন হলে জনসাধারণেরই অনাস্থায় তাদেরকে পদচ্যুতও করা যাবে।

দ্বিতীয়ত : কোনো ব্যাক্তিই নিজের ব্যাক্তিগত অধিকারের বলে আমীর কিংবা অন্য কোন পদে অভিষিক্ত হতে পারব না। আমীর এবং মজলিসে শুরার সদস্য সম্পর্কে অবাধে ও প্রকাশ্যভাবে সমালোচনা করা যাবে। রাষ্ট্রনায়কদের সমালোচনা করার অধিকার ইসলামী হুকুমাতের প্রতিটি নাগরিকেরই অত্যন্ত স্বাভাবিক অধিকার।

বিশ্বনবী (সা.) বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেন : اَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ.

"অত্যাচারী- ইসলামের নির্ধারিত সীমালংঘনকারী রাষ্ট্রনায়কের সম্মুখে স্পষ্ট সত্য কথা বলা সবচেয়ে উত্তম জিহাদ।"[৪৬](পৃ:-৬৮)

এ হাদীস হতে শুধু সমালোচনার অধিকারই প্রমাণিত হয় না, বরং এ দ্বারা প্রত্যেক জালেম ও ইসলামের বিরুদ্ধাচারী রাষ্ট্রনায়কের যাবতীয় কাজ-কর্মের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ও স্পষ্ট জনমত গঠন করা একটি দ্বীনি ফরয বলে প্রমাণিত হয়। এই ফরয যারা ভুলে যায় তারা প্রকারান্তরে জুলুমেরই সহায়তা করে ইসলামী হুকুমতের ধ্বংস সাধন করে। শরীয়তে এই শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কে আযাবের কথা উল্লেখিত হয়েছে।

আল্লাহ বলেন :

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا اَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“যে কঠিন বিপর্যয় তোমাদের মধ্য হতে কেবলমাত্র জালেমদেরকেই নয়, সমগ্র মানুষকে গ্রাস করবে, তা হতে সতর্ক হয়ে থাক। জেনে রেখো, আল্লাহ্ বড় কঠিন আযাবদাতা।” (আল-কুরআন, সূরা আল আনফাল, আয়াত-২৫)

হাদীসে তাদেরকে شيطان اخرس ‘বোবা শয়তান’ নামে অভিহিত করা হয়েছে। বস্তুত এরাই ইসলামী হুকুমতের দুশমন ও বিশ্বাসঘাতক। এই প্রসঙ্গে প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর বিখ্যাত খুতবা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর সমবেত ইসলামী জনতাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন :

اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ قَدْ وُلِّيْتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِ كُمْ فَاِنْ اَحْسَنْتُ فَاَعِيْنُوْنِىْ وَاِنْ اَسَأْتُ فَقَوِّمُوْنِىْ – اَلصِّدْقُ اَمَانَةٌ وَالْكِذْبُ خِيَانَةٌ وَالضَّعِيْفُ فِيْكُمْ قَوِىٌّ عِنْدِىْ حَتَّى اَخُذَا لَهُ حَقَّهُ وَالْقَوِىُّ ضَعِيْفٌ عِنْدِىْ حَتَّى اَخُذَا الْحَقَّ مِنْهُ – اَطِيْعُوْنِىْ مَالَ طَعْتُ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَاِنْ عَصَيْتُ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَلَا طَاعَةَ لِىْ عَلَيْكُمْ-

“হে সমবেত জনগণ! আমাকে তোমাদের রাষ্ট্রপ্রধান নিযুক্ত করা হয়েছে, অথচ আমি তোমাদের চেয়ে উত্তম ব্যক্তি নই। আমি যদি ভালো কাজ করি, তোমরা আমাকে সাহায্য করিও, আর যদি অন্যায় করি, তবে আমাকে ঠিক পথে পরিচালিত করিও, সত্যবাদিতা আমানত আর মিথ্যা ধ্বংসকারী। দুর্বল ব্যক্তি আমার কাছে শক্তিশালী, তার সব পাওনা আমি আদায় করে দেব এবং শক্তিমান আমার কাছে দুর্বল, তার কাছ হতে অপরের পাওনা আমি উশুল করব। আমার আনুগত্য করে চলিও যতদিন আমি আল্লাহ এবং তার রাসূলের আনুগত্য করতে থাকব। আর আমি যদি আল্লাহ্ এবং তার রাসূলের নাফরমানী করি, তাহলে আমার আনুগত্য করতে তোমরা বাধ্য হবে না।” [৪৬](পৃ:-৬৯)

দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুকও (রা.) খলীফা পদে নিযুক্ত হয়ে এরূপ উক্তিই করেছিলেন। তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে গায়ের জামা সম্পর্কে জিজ্ঞেসিত হওয়া ও এর যথাযথ কারণ ব্যাখ্যা করা এটি ইসলাম প্রদত্ত জনসাধারণের ব্যক্তি স্বাধীনতার এবং রাষ্ট্র প্রধানের সমালোচনার অধিকারের চরম পরাকাষ্ঠা।

ইসলামে আমীর ও অন্যান্য রাষ্ট্রকর্তাদের কেবল সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন সম্পর্কেই সমালোচনা করা যাবে তাই নয়, বরং তাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন সম্পর্কেও খোলাখুলিভাবে সমালোচনা করা যাবে। মানুষের জীবনকে প্রাইভেট ও পাবলিক এই দু’টি ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা এবং প্রাইভেট জীবনকে অজ্ঞানতার অন্তরালে আচ্ছন্ন রেখে কেবলমাত্র পাবলিক জীবনের ওপর সব কিছু গুরুত্ব আরোপ করা নতুন আল্লাহহীন গণতান্ত্রিক যুগের কীর্তি! ইসলামের দৃষ্টিতে এ দু’টি স্বতন্ত্র জীবন নয়, একিই জীবনের দু’টি আলাদা ক্ষেত্র মাত্র। তাই জীবনের এই উভয় ক্ষেত্রের মাঝে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপিত হওয়া একান্তই আবশ্যক। অন্যথায় সামাজিক ও সামষ্টিক জীবনে কখনই নীতি-নীষ্ঠা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কাজেই এই সব দিক দিয়ে যাদের নৈতিক চরিত্রের ওপর সবচেয়ে বেশী আস্থা ও ভরসা রাখা যাবে, তাদেরই ওপর অর্পণ করতে হবে এই ইসলামী রাষ্ট্র পারিচালনার বিরাট দায়িত্ব।

উপসংহার ঃ

ইকবাল ছিলেন ইসলামী রেনেসাঁর এক মহান স্বপ্নদ্রষ্টা। তিনি মুসলিম উম্মাকে একটি স্বতন্ত্র জাতিসত্তা রূপে চিহ্নিত করেছেন এবং ইসলামী চেতনায় উজ্জীবিত হযে তারা আবার দুনিয়ার বুকে মাথা তুলে দাঁড়াবে, এ স্বপ্ন তিনি আজীবন লালন করেছেন। তিনি উপমহাদেশের মুসলিম গরিষ্ঠ অঞ্চল গুলোকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করার জন্যেও প্রবলভাবে তাগিদ করেছেন। ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের গৃহীত ‘লাহোর

প্রস্তাবে' তাঁর রাষ্ট্র-চিন্তারই প্রতিফলন ঘটে যদিও পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে তাঁর চিন্তাদর্শের যথার্থ রূপায়ন হয়নি।

ইকবাল ছিলেন এক কালোত্তীর্ণ চিন্তাবিদ ও দার্শনিক। তাঁর চিন্তা-বাবনা ছিল স্থান-কাল-পাত্রের উর্ধ্বে গোটা মুসলিম উম্মাহর জন্যে এক চিরন্তন দিক-নির্দেশনা। সমসাময়িক ধর্মীয় , রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোল সমূহের প্রতিও কবি-দার্শনিক ইকবালের দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত গভীর ও সুদূরপ্রসারী। তখনকার দিনের পাক-ভারত উপমহাদেশের রাজনৈতিক আদর্শসমূহের প্রভাবে ইসলামের মৌলিক কাঠামো ও প্রকৃতি প্রভাবিত হবার সম্ভাবনা দেখেই কবি রাজনীতির প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগী হয়েছিলেন। যদিও ইকবাল যে তথাকথিত রাজনীতি চর্চাকারীদের ন্যায় কোন রাজনীতিক ছিলেন না, তা সর্বজনবিদিত। কিন্তু সে সাথে একথাও সত্য যে, তিনি জাতিকে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বদানে কখনও কুণ্ঠিত হতেন না। তিনি নিজেই নিজের সম্পর্কে বলেছেন ঃ

هزار شکر نہین ہی دماغ فتنہء تراش
هزار شکر طبعیت ہی ریزہ کار میری
ہواءی بزم سلاطین دلیل مردہ دلی
کیاہی حافظ رنکین نوای رازیہ فاش

হাজার শোকর,
উচ্ছৃংখল নয় আমার মস্তিষ্ক,
স্বভাব আমার ভেঙ্গে গড়া,
শাহী দরবারে সম্মানের আকাঙ্ক্ষা-
সে তো মৃত মনেরই পরিচয়।
হাফিযের মধুক্ষরা কণ্ঠে
প্রকাশ লাভ করেছে এ রহস্য।

বস্তুত বৃটিশ ভারতের মুসলমানদের জাতীয় ওতমদ্দুনিক আন্দোলনের সাথে ইকবালের গভীর সম্পর্ক ও কর্যকরী যোগযোগ বর্তমান ছিল। ইকবাল প্রথম ব্যক্তি যিনি শুরু থেকেই মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার জন্যে কুরআন ভিত্তিক রাজনৈতিক দর্শন দিয়েছেন। তিনি মুসলিম জাতীয়তাবাদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন বলেই ১৯১১সালে হিন্দুদের চাপের মুখে বাংলার বিভক্তি বাতিল ঘোষণায় অত্যন্ত মর্মাহত হন। উক্ত ঘোষণার প্রতিবাদ জানাবার জন্যে ১ ফেব্রুয়ারী, ১৯১২ সালে লাহোরে মুচি দরওয়াজার বাইরে অনুষ্ঠিত মুসলমানদের জনসভায় প্রদত্ত বক্তৃতায় তিনি ইংরেজ শাসকদের তীব্র ভাষায় নিন্দা জানান।

ইকবাল রাজনীতি সম্পর্কে স্বতন্ত্র কোন গ্রন্থ রচনা করেন নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, তাঁর সকল প্রকার রচনাই বিভিন্ন রাজনৈতিক তত্ত্ব-বিশ্লেষণে ভরপুর। ইকবাল একজন আদর্শবাদী সমাজ-সংস্কারক ও সত্যনিষ্ঠ মুসলিম ছিলেন বলে বিশ্বের বিবর্তনশীল রাজনীতির দোষ-ত্রুটি সংশোধন এবং আল্লাহর বিধানের স্থায়ী বুনিয়াদে তাকে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি কখনই নিশ্চিন্ত ও নির্বিকার ছিলেন না। তাই তাঁর কব্যকে রাজনৈতিক চিন্তাধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার সুযোগ নেই।এই জন্যে বলতে হয় ঃ ইকবালের কাব্য ও রাজনীতি দান্তের কাব্য ও ফারিন্সের রাজনৈতিক চিন্তাধারার মতই পরস্পর বিজড়িত ও অবিচ্ছিন্ন।

ইকবাল মনে করতেন, ইসলাম স্রষ্টা ও বিশ্ব-প্রকৃতি, আত্মা ও বস্তু, উপাসনালয় ও রাষ্ট্র- এগুলোকে পৃথক করে দেখে না বরং এগুলো পরস্পর পরিপূরক। ধর্ম ও রাজনীতিকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললে অনিবার্যভাবেই মানুষের জীবনে নেমে আসবে চরম হতাশা ও দুর্ভাগ্য; আর সামগ্রিকভাবে সমগ্র মানবতা ও

সভ্যতার উপর নেমে আসবে নিশ্চিত ধ্বংস। তিনি বিশ্বাস করতেন ধর্ম হিসেবে ইসলাম এখনও সেই পৃথিবী গড়ার সামর্থ্য রাখে যেখানে মানুষের মর্যাদা নির্ধারিত হবে না বংশ, বর্ণ কিংবা অর্জিত সম্পদের ভিত্তিতে বরং তা নির্ধারিত হবে তার জীবনের প্রতি ধারণা ও কর্ম দ্বারা; যেখানে গরীব কর গ্রহণ করবে ধনীর কাছ থেকে; যেখানে মানব সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে উদরের সাম্যের উপর নয়, আত্মার সাম্যের উপর। আর এটির পূর্ণ পরিস্ফুটন কেবল খিলাফত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপূঞ্জি

১. আল্লামা ইকবাল, আল্লামা ইকবাল সংসদ, ঢাকা, নভেম্বর ১৯৮৯ ।

২. আবদুল্লাহ,ড. মুহাম্মদ, ইকবাল কাব্যে ইসলামী ভাবধারা, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ২০০৬।

৩. আল্লামা ইকবাল সংসদ পত্রিকা, আল্লামা ইকবাল সংসদ, ঢাকা, এপ্রিল-সেপ্টেম্বর– ১৯৯৫।

৪. আল্লামা ইকবাল সংসদ পত্রিকা, আল্লামা ইকবাল সংসদ, ঢাকা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ৯৬।

৫. আজরফ,মোহাম্মদ, জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, চতুর্থ মুদ্রণ, জুন-১৯৮২।

৬. আলী,অধ্যাপক মোহাম্মদ ইন্নাস, মীর লুৎফুল কবীর সা'দী, বিজ্ঞান সমাজ ধর্ম, কসমিক পাবলিশার্স, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারী ২০০৮।

৭. আল্লামা ইকবালের ১১৭ তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে আল্লামা ইকবাল সংসদ আয়োজিত জাতীয় প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রদত্ত বিশেষ অতিথি হিসেবে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের কালচারাল কাউন্সিলর জনাব আলী আভারসাজীর ভাষণ।

৮. আল্লামা ইকবাল সংসদ পত্রিকা, আল্লামা ইকবাল সংসদ, ঢাকা, অক্টোবর-ডিসেম্বর-১৯৯৬, জানুয়ারী-মার্চ ১৯৯৭।

৯. আল্লামা ইকবাল সংসদ পত্রিকা, আল্লামা ইকবাল সংসদ, ঢাকা, এপ্রিল-জুন, জুলাই-সেপ্টেম্বর– ১৯৯৯।

১০. আল্লামা ইকবাল সংসদ পত্রিকা, আল্লামা ইকবাল সংসদ, ঢাকা, জানুয়ারী-মার্চ' ৯৫।

১১. আল্লামা ইকবাল সংসদ পত্রিকা, আল্লামা ইকবাল সংসদ, ঢাকা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ৯৫।

১২. ইসলামী বিশ্বকোষ, ৩য় খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮৭।

১৩. ইসলাম, ড: আমিনুল, মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, চতুর্থ মূদ্রণ, আগস্ট ২০০৮।

১৪. ইসলাম, ড. মোঃ নুরুল, সমাজ ও পরিবেশ, নিউ এজ পাবলিকেশন্স,ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর-২০০৫।

১৫. ইসলাহী, মাওলানা সদরুদ্দীন, ভাষান্তরঃ আবদুল মান্নান তালিব, ইসলামের সমাজ দর্শন, আরজু পাবলিকেশন্স, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, প্রকাশকাল ২০০৩।

১৬. ইসলাম,আমিন, সমাজ সংস্কৃতি ও সাহিত্য, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ১৯৯১।

১৭. ইসলাহী, মাওলানা সদরুদ্দীন, অনুবাদ, আব্বাস আলী খান, ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ৫ম সংস্করণ (আধু: ১ম প্রকাশ) নভেম্বর ১৯৯৮।

১৮. ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা, গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, প্রকাশকাল, নভেম্বর–২০০৪।

১৯. উদ্দিন, মাওলানা মোহাম্মদ ছমির, ইরানে ইসলামী বিপ্লব, দ্বীনে হক প্রকাশনী, গাজীপুর, প্রকাশকাল : আগস্ট-১৯৮৮।

২০. কুতুব, মুহাম্মদ, সম্পাদনায়: ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ৩য় সংস্করণ, জুন ১৯৯৩।

২১. কাদের, অধ্যাপক আহমদ আবদুল, আধুনিক যুগে খিলাফত রাষ্ট্রব্যবস্থা, আলবালাগ পাবলিকেশন লিমিটেড, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর-২০১০।

২২. কাছীর (রহ.), আল্লামা ইবনে, অনুবাদক, অধ্যাপক আখতার ফারুক, তাফসীরে ইবনে কাছীর, প্রথম খন্ড, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, পঞ্চম সংস্করণ, মার্চ-২০১১।

২৩. খাল্লেকান, ইবনে, ওয়াফায়াতুল আই'যান, ২য় খন্ড, মাকতাবাতুন নাহযাতিল মসরিয়্যাহ, কায়রো, ১৯৪৮।

২৪. খালদুন, ইবনে, দ্বিতীয় খণ্ড, পরিশিষ্ট, আল-মাতবাআতুল কুবরা, মিসর, ১২৮৪ হিজরী।

২৫. ছিফাতুল্লাহ, আবুল কাশেম মুহাম্মদ, ইসলামী আইন ও রাষ্ট্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, মে-২০০৭।

২৬. জামান,ডক্টর হাসান, সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ, মে -২০০৭।

২৭. তাবারী, মহিবুদ্দীন আত-, আররিয়াযুন নায়েবা ফী মানাকিবিল আশারা, ২য় খন্ড,হোসাইনিয়া প্রেস, মিসর, ১৩২৭ হিজরী।
২৮. তাইমিয়া (রহ.), ইমাম ইবনে, অনুবাদ : জুলফিকার আহমদ কিসমতী, শরীয়তী রাষ্ট্রব্যবস্থা, আহসান পাবলিকেশন, ঢাকা, প্রকাশকাল, জানুয়ারী ২০০৮।
২৯. দর্শন ও প্রগতি, গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২৩ শ বর্ষ: ১ম ও ২য় সংখ্যা, জুন-ডিসেম্বর, ২০০৬।
৩০. দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, অষ্টম সংস্করণ, জুন ২০০৯।
৩১. নূরুদ্দীন, ড. আবু সাঈদ, মহাকবি ইকবাল, আল্লামা ইকবাল সংসদ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৬।
৩২. পারভেজ, ড. মাহফুজ, আল্লামা ইকবাল ও সমকালীন বাস্তবতা, ৯ নভেম্বর, আল্লামা ইকবালের ১৩১ তম জন্ম দিন উপলক্ষে আয়োজিত জাতীয় প্রেস ক্লবে অনুষ্ঠিত সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধ।
৩৩. বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, সমাজ বিজ্ঞান, প্রথম পত্র,এইচ এস সি প্রোগ্রাম, পুনর্মুদ্রণঃ মে-২০০৪ ।
৩৪. বায়হাকী, আস্-সুনানুল কুবরা, ১০ম খন্ড, দায়েরাতুল মাআরেফ, হায়দারাবাদ, ১ম সংস্করণ, ১৩৫৫হি:।
৩৫. মওদুদ, আবদুল, মুসলিম মনীষা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা-২০০৫।
৩৫. ম্যাকাইভার, আর. এম. সামাজিক বিজ্ঞানের মূলসূত্র, অনুবাদ : নাঈমা রহমান, সম্পাদনা : ড. সৈয়দ আলী নকী, নওরোজ কিতাবিস্তান,ঢাকা, প্রথম সংস্করণ : ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯।
৩৭. মুসনাদে আহমাদ, ১ম খন্ড, হাদীস নম্বর ৩৯১, তৃতীয় সংস্করণ, দারুল মাআরেফ, মিসর,১৯৪৯।
৩৮. মাওয়ার্দী, আল, আল আহকাম আল সুলতানিয়াহ, কায়রো ১৯০৯।
৩৯. মেশকাত শরীফ, বঙ্গানুবাদ, ৯ম খন্ড, এমদাদিয়া পুস্তকালয় (প্রা:) লি: ঢাকা, সপ্তম মুদ্রণ, জানুয়ারী, ২০১১।
৪০. মুআফিরী (রহ),আবূ মুহাম্মদ মালিক ইবন্ হিশাম, সীরাতুন নবী (সা), দ্বিতীয় খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর-২০০৭।
৪১. মজিদী, নূর হোসেন, ইসলামী রাষ্ট্র ও নেতৃত্ব, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, প্রকাশকাল: জুন-১৯৯৭।
৪২. রহমান, ফাহমিদ-উর, ইকবাল মননে অন্বেষণে, আল্লামা ইকবাল সংসদ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ১৯৯৫।
৪৩. রহীম,মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর, ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধারা, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, তৃতীয় প্রকাশ-জুন ২০০২ ।
৪৪. রহীম, মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর, খিলাফতে রাশেদা, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, ৯ম প্রকাশ, জুন ২০০৯।
৪৫. রহীম, মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর, আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার, খায়রুন প্রকাশীন, ঢাকা, ৫ম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৭।
৪৬. রহীম, মওলানা মুহাম্মদ আবদুর, ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, এগারতম প্রকাশ, ডিসেম্বর-২০০৭।
৪৭. রহীম, মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর, রাসূলুল্লাহর বিপ্লবী দাওয়াত, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, তৃতীয় প্রকাশ, এপ্রিল–২০০০।
৪৮. রহীম, মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর (র.), সংকলিত, হাদীস শরীফ ১ম খন্ড, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, ২৫তম প্রকাশ, আগস্ট-২০০৮।
৪৯. রহীম, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর, দ্বীন কায়েমে অংশ গ্রহণ সবার জন্যে ফরয, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, প্রকাশকাল, মে-২০০৬।
৫০. রহমান, মুহাম্মদ আমিনুর, বিশ্বায়ন তাগুত খিলাফাহ, রেডিয়্যান্ট, ১৭৩/২, ফকিরাপুল, ঢাকা–১০০০, তৃতীয় প্রকাশ–২০০৪।
৫১. রহমান, মুহাম্মদ হাবীবুর, দ্বীন প্রতিষ্ঠার জিহাদে সংগঠন ও শৃঙ্খলা, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ- মার্চ ১৯৯৫।
৫২. স্রষ্টা ও ইসলাম, গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ।
৫৩. সুবহানী, আয়াতুল্লাহ জাফর, অনুবাদ: মোঃ মাঈন উদ্দিন, ইমামিয়া বিশ্বাসের সনদ, দারুল কুরআন ফাউন্ডেশন, ঢাকা, প্রকাশকাল: মে-২০০৭।

৫৪. হোছাইন, শায়খুল হাদীস মওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল, সম্পাদনা– ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা:) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, চতুর্থ প্রকাশ, মার্চ ২০০২।

৫৫. হুসেন, সায়্যিদ আতহার, অনুবাদ : মুহাম্মদ সিরাজ মান্নান, গৌরবময় খিলাফত, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, মে ২০০৮।

৫৬. The oxford Encyclopaedia of the Modern Islamic World, Vol. 11, by Hafeez Malik, oxford, 1995.

৫৭. M.M. Sharif, A History of Muslim philosophy, Vol. 11, Wisbaden, 1963.

৫৮. Dr Javed Iqbal, Iqbal's Contribrtion to Liberalism in Modern Islam, Pubished in Iqhal studies by ALLAMA IQBAL SANGSAD, DHaka, April, 1989.

৫৯. Sayed Abdul Vahid (ed), Political thought in Islam, Thoughts and Reflections of Iqbal, Lahore, 1964।

৬০. Imam Ragib Ispahani, AL. Mufradatul Quran. Dar-al-Nashrat, Labnan, 1952.